বিশ্বায়ন ও নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প (১৯৯২-২০১২)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক : সৈকত মিস্ত্রী

রেজিস্ট্রেশন নং : A00BE1200417

তারিখ : 27.11.2017

তত্ত্বাবধায়ক : ড. বরেন্দু মণ্ডল

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

২০২২

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

'বিশ্বায়ন ও নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প (১৯৯২-২০১২)' submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Barendu Mandal, Professor, Department of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor: Candidate:

Dated: Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বিশ্বায়ন ও নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প (১৯৯২-২০১২)' শিরোনামের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নির্মাণের প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যাঁর কথা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেই হয়, তিনি আমার এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সম্মাননীয় ড. বরেন্দু মণ্ডল মহাশয়। গবেষণার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে সমাপ্তির ক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ধারাবাহিক সাহচর্য, সুপরামর্শ, সংশোধন, পরিমার্জন ইত্যাদির দ্বারা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর নিরন্তর শিক্ষাদান, উপযুক্ত তথ্যাদির সন্ধান প্রদান, সর্বোপরি তাঁর অনুকরণযোগ্য পরিশ্রমী ও দৃঢ়চেতা মনোভাব আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ নির্মাণে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একেবারে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে আজ এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ সমাপ্তির মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ে বারে বারেই তাঁর কাছ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখে চলেছি। আশা রাখি এই শেখার সুযোগ আজীবন তাঁর কাছ থেকে লাভ করব। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বাংলা বিভাগের সম্মাননীয় অধ্যাপক এবং বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ড. জয়দীপ ঘোষ মহাশয় আমার গবেষণা উপদেশক সমিতির সদস্য হিসাবে গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন, শুধু এটুকুতেই তাঁর ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর কাছেও স্নাতকস্তর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের সম্মাননীয় অধ্যাপক ড. পার্থসারথি ভৌমিক মহাশয়ের কাছে স্নাতকোত্তর স্তরে কিছুদিন পাঠগ্রহণের সুযোগে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমার গবেষণা উপদেশক সমিতির সদস্য হিসাবে বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর একাধিক উপদেশ আমার পাথেয় হয়েছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এই অবসরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমি আরও

যাঁদের কাছে পাঠগ্রহণ করেছি, সেই সম্মাননীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদেরকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

লেখিকা তথা অধ্যাপিকা অহনা বিশ্বাস তাঁর একাধিক গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। লেখক নীহারুল ইসলামের কাছেও বার বার তাঁর গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। লেখক সুকান্তি দত্ত তাঁর একাধিক গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে আমাকে গবেষণায় সাহায্য করেছেন। তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধা জানাই। লেখিকা তন্বী হালদার শুধু আমাকে তাঁর গ্রন্থগুলির সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁর লেখার একজন পাঠক তথা সমালোচক হিসাবে আমার উপর তাঁর সস্নেহ মনোভাব আমার পাথেয় হয়েছে। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। স্বল্প সময়ের জন্য লেখক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটেছিল। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের অভিজ্ঞতা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে পাথেয় হয়েছে। তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধা জানাই। লেখক তথা 'পরশপাথর' প্রকাশনার কর্ণধার অরিন্দম বসুর কথা এক্ষেত্রে স্মরণ করতেই হয়। তিনি স্বয়ং তাঁর বই আমাকে খুঁজে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য কয়েকজন ছোটোগল্পকারের গল্পগ্রন্থ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। লেখক সাত্যকি হালদার তাঁর ছোটোগল্পের বইয়ের সন্ধান দিয়ে আমাকে গবেষণায় সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। লেখিকা নন্দিতা বাগচী এই গবেষণার বিষয়ে আমাকে একাধিক তথ্য প্রদান করে সাহায্য করেছেন। তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধা জানাই। অধ্যাপক অরূপ পলমল আমাকে লেখক সৈকত রক্ষিত সম্পর্কে একাধিক তথ্য প্রদান করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি আমার গবেষণায় সাহায্য করেছে। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকে এই গবেষণার বিষয়ে যে সাহায্য পেয়েছি, সেজন্য শ্রীমতী আইভি আদক এবং শ্রী হরিশ মণ্ডলকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে এই গবেষণার জন্য যে সাহায্য পেয়েছি, সেজন্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদেরকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কলিকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রী সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে এই গবেষণার ব্যাপারে যে সহযোগিতা লাভ করেছি, সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা জানাই। কলেজ স্ট্রিট, কলকাতার দে'জ পাবলিশার্স, করুণা পাবলিশার্স, মিত্র ও ঘোষ, উবুদশ, এবং মুশায়েরা ইত্যাদি প্রকাশন সংস্থা এবং তাদের কর্মীদেরকে বারে বারে একাধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি জোগান দেওয়ার কারণে এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মহর্ষি সরকারকে এই গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমার গবেষক বন্ধু শ্রী সুশীল মালিককে একাধিক সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার কর্মস্থল ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবং বাংলা বিভাগে আমার সহকর্মীদেরকে এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।

আমার বাবা, হাওড়া জেলার বালি শিক্ষানিকেতন বালক বিভাগ (উচ্চমাধ্যমিক) বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধানশিক্ষক শ্রী রবীন্দ্রনাথ মিস্ত্রী, যিনি আশৈশব আমাকে পড়াশোনা এবং মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত করে চলেছেন, তাঁকে এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। আমার মা, শ্রীমতী আরতি সরদার মিস্ত্রী, যিনি আমার হাত ধরে শৈশবে লিখতে শিখিয়েছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে বসিয়েছেন একাধিকবার; আমার পড়াশোনার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে যিনি আজও অকুণ্ঠ পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম

জানাই। খানপুর নির্মলাবালা সরকার গার্লস হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)-এর ইতিহাসের ভূতপূর্ব শিক্ষিকা দিদি কমলা সরদারকে এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই, যিনি আমাকে একেবারে শৈশব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থ উপহার দিয়ে আমার বিদ্যায়তনিক চলার পথটিকে সুগম করে তুলেছেন। বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক আমার কাকা ড. ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রীকে এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর গবেষণার দিনগুলিতে সংগৃহীত একাধিক বইপত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় নিছক কৌতূহলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, তা আমার সার্বিক জ্ঞানার্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। আমার কন্যা মেঘমন্দ্রিতা মিস্ত্রীকে এই প্রসঙ্গে অনেক অনেক স্নেহ জানাই। গবেষণার এই দীর্ঘ সময়ে আমার অনেক বিনিদ্র রাতে সে একা ঘুমিয়ে পড়েছে। পিতার সাহচর্য বঞ্চিত হয়ে অনেক ত্যাগও স্বীকার করেছে সে, যা হয়তো তার বয়সে সম্পূর্ণত অনুধাবনযোগ্য নয়। তবু সে এই গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু বইপত্র কিংবা পরিভাষার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে পরিচিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে তার পাথেয় হয়ে উঠবে বলে আশা করি। সবশেষে, যার কথা বলতেই হয়, সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতকস্তর থেকে আমার সহপাঠী, বন্ধু, বর্তমানে আমার সহধর্মিণী দেবাংকৃতা সরদার, গবেষণার এই দীর্ঘ পথে তার সহযোগিতার কথা অনস্বীকার্য। তাকে এই প্রসঙ্গে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পরিসরে হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার শ্রদ্ধেয় এবং ধন্যবাদার্হ আরও কয়েকজন ব্যক্তি কিংবা কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাকি থেকে গেল, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সোনারপুর | সৈকত মিস্ত্রী

আগস্ট, ২০২২

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১-১১
প্রথম অধ্যায়:	বিশ্বায়ন: প্রেক্ষিত, পটভূমি	১২-৬৮
দ্বিতীয় অধ্যায়:	বিশ্বায়ন ও পুঁজি প্রসারের বৈচিত্র্য (নির্বাচিত)	৬৯-১৫৪
তৃতীয় অধ্যায়:	বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি ও বাংলা ছোটোগল্প	১৫৫-২৭৭
চতুর্থ অধ্যায়:	বিশ্বায়ন, চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র ও বাংলা ছোটোগল্প	২৭৮-৩৪০
পঞ্চম অধ্যায়:	বিশ্বায়ন, পরিযাণ এবং বাংলা ছোটোগল্প	৩৪১-৪০৭
ষষ্ঠ অধ্যায়:	বিশ্বায়ন, পরিবার ও ব্যক্তি সম্পর্কের বদল এবং বাংলা ছোটোগল্প	৪০৮-৪৭৩
সপ্তম অধ্যায়:	বিশ্বায়ন, বিবিধ	৪৭৪-৫৭৩
উপসংহার		৫৭৪-৫৭৯
পরিশিষ্ট		৫৮০-৫৮১
গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাপঞ্জি		৫৮২-৫৯৩
বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি (অন্তর্জাল সূত্র)		৫৯৪-৬০৫

ভূমিকা

উনিশ শতকের শেষ পর্বে বাংলা ছোটোগল্পের ধারাটির সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী প্রায় সার্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এই সংরূপটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তালাভের পাশাপাশি এর উপর প্রভাব পড়েছে এক-একটি কালের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির। সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে প্রবাহিত বাংলা ছোটোগল্পের ধারাটি এইসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির প্রভাবে নতুন নতুন মোড় নিয়েছে। বদলেছে ভাষারীতি, উপস্থাপনের ধরন, আখ্যানের বিষয়, আঙ্গিক, আকারসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। এইভাবে কালের নিয়মে বদলে চলার পাশাপাশি বাংলা ছোটোগল্প একইসঙ্গে ধারণ করেছে জনমানসের পরিবর্তনের একাধিক মাত্রাকে। 'বিশ্বায়ন ও নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প (১৯৯২-২০১২)' শিরোনামের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ ভারতীয় তথা বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘটা প্রধানত একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব বাংলা ছোটোগল্পে কীভাবে এসে পড়েছিল, তা অনুসন্ধান করতে চেয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতার পর যে যে ঘটনা বাংলা ছোটোগল্পের জগতকে প্রভাবিত করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৯১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত মুক্ত অর্থনীতি কিংবা তার ফলে ভারতে আগত বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়া। বস্তুতপক্ষে ১৯৯১ সালের ২৪ শে জুলাই তারিখের পর এই পরিবর্তন শুরু হয়েছিল একথা মনে হলেও, বাংলা ছোটোগল্পে এর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল কিছু আগে থেকেই। তারই সাক্ষ্য মেলে কয়েকজন ছোটোগল্পকারের একাধিক গল্পে, যেগুলি তাঁরা রচনা করেছিলেন ১৯৯১ সালের কয়েক বছর আগে। অর্থাৎ তাঁরা কালের গতিকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিছু পূর্বেই। আর তাঁদের সেই অনুমানকে সত্যি করে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার পরে দেশে প্রযুক্তির ঝড় বয়ে যায়। পুঁজির বিকাশ হতে থাকে দ্রুত গতিতে।

ভারতের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় বিশ্বের পুঁজির কাছে। দেশীয় কোম্পানিগুলির উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এতদিন ধরে প্রদত্ত রক্ষাকবচ। দেশি-বিদেশি পুঁজির খানিকটা অসম প্রতিযোগিতায় দেশের বাজারের চেহারা দ্রুত বদলাতে থাকে। তার সঙ্গে দ্রুত বদলে যেতে থাকে মানুষের উপার্জনের মাধ্যম কিংবা পদ্ধতিসমূহ। আর এইভাবে উৎপাদনব্যবস্থার বদল দ্রুত বদলে দেয় সমাজকাঠামোকে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বদল ঘটে। মানব-পরিযাণ বৃদ্ধি পায়, প্রযুক্তির একের পর এক ঢেউ মানুষকে বিহ্বল করে তোলে। নতুন প্রযুক্তির আগমনে পরিত্যক্ত হতে থাকে পূর্ববর্তী প্রযুক্তিসমূহ। স্বাভাবিকভাবে পুরানো প্রযুক্তিকে যে মানুষ আঁকড়ে ধরেছিল উপার্জনের আশায়, তাদেরকেও পরিত্যক্ত হতে হয় প্রতিযোগিতার ময়দান থেকে। সেইসঙ্গে অবসান ঘটতে থাকে তাদের আশা-স্বপ্নের। এইভাবে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রনীতি থেকে সরে গিয়ে দেশ নিজের ধ্বসে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে যোগ্যতমের বেঁচে থাকাকে স্বীকার করে নেয়। অন্যদিকে নতুন এই অর্থনীতির প্রভাবে বেসরকারিকরণ বৃদ্ধি পায়, মানুষের উপার্জন অনেকক্ষেত্রেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। প্রযুক্তির আগ্রাসন মানুষের জীবিকাকে গ্রাস করার দিকে যেতে থাকে। বৃহৎ পুঁজির দাপটে ক্ষুদ্র পুঁজিসংলগ্ন মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে। বিপুল সংখ্যক মানুষ আর গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চয়তাটুকু পায় না। এইভাবে এক অস্থির সময় আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে হতে এগোতে থাকে। যে প্রভাব পরবর্তী তিন দশক পরে আজ নতুন সব মাত্রা ধারণ করেছে।

দেশীয় অর্থনীতিতে বিদেশি পুঁজির আগমনের ফলে দেশের সামাজিক গঠনের ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন এসেছে, পরিবর্তন এসেছে মানুষের মূল্যবোধ, নীতিবোধে এবং পরিবর্তিত হয়েছে জীবনযাপনরীতি। চিন্তাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও বদল দেখা দিয়েছে। বিশ্বায়ন দ্রুত প্রসারণশীল প্রযুক্তির মাধ্যমে মুছে দিয়েছে দেশ ও সীমানার ধারণা। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠছে বন্ধুত্ব, আবার ঘৃণাবাহী বক্তব্যও ছড়িয়ে পড়ছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়,

লঙ্কার সীমারেখা ছাড়িয়ে ঘটে যাচ্ছে লঙ্কাকাণ্ডেরও বিশ্বায়ন। জীবনযাত্রার বদল ঘটেছে। তথ্য-প্রযুক্তির দৌলতে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে একই সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে যুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতায় পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের জৈবঘড়ি। দেশের সীমারেখা মুছে যাওয়া, প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ কিংবা পরিযাণ বৃদ্ধির মতো আরও অন্যান্য কারণে মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিও প্রচলিত সীমার বাঁধন মুছে নতুন ধরনের সম্পর্কসমূহকে সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি প্রযুক্তির অতিব্যবহার মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, প্রকৃত মানুষকে সরিয়ে নিয়ে পুনঃস্থাপন করেছে ভার্চুয়াল মানুষ দ্বারা। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন মনোবিকলন। বস্তুগত চাহিদাপূরণের ক্ষেত্রে মানুষের দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রাপ্তির মাধুর্য হয়ে পড়েছে বিরল। বিলাসদ্রব্যের দ্রুততর সহজলভ্যতা মানুষকে বাস্তবজগতে করে তুলছে অসহিষ্ণু। এই সমস্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে এই বিশ্বায়ন নামক পদ্ধতিটি চলাকালে তার সমকালীন সাহিত্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ছাপগুলিকে তার স্তরে স্তরে ধরে রেখেছে। ইতোমধ্যে উৎপাদনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। মার্ক্সীয় তত্ত্বের পরিভাষায় সাহিত্য কিংবা সংস্কৃতি হল শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অধিকাঠামো (Super Structure)। আর অধোকাঠামো (Base) হল উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সমাজের চিরাচরিত কাঠামো আর বজায় থাকে না। সমাজ বদলালে সংস্কৃতি এবং সাহিত্যেরও বদল ঘটে। সুতরাং সংগতভাবেই দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের লেখককুলও বিশ্বায়নের পদচিহ্নকে তাঁদের সৃষ্টিতে অঙ্কিত করে রেখেছেন। এই বিশ্বায়নের সময়ের বাংলা ছোটোগল্প সমকালের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে, যেমন—কর্মহীনতা, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, সম্পর্কের অনিশ্চিতি, আর্থসামাজিক ও মূল্যবোধগত অবক্ষয়, জীবিকার উদ্দেশ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিযাণ, সরকারি পরিষেবাক্ষেত্রগুলির (শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি) ভেঙে পড়া, এর

বিপরীতে যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়াই নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে গড়ে ওঠা বেসরকারি পরিষেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য, তথ্য-প্রযুক্তির জগতে বিস্ফোরণ এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে এইসমস্ত বিষয়সমূহের প্রভাব।

'বিশ্বায়ন ও নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প (১৯৯২-২০১২)' শিরোনামের গবেষণা অভিসন্দর্ভে ১৯৯২-২০১২ সময়পর্বে বাংলা ছোটোগল্পে বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়াটি কী কী প্রভাব ফেলেছিল এবং ছোটোগল্পের মাধ্যমে লেখকরা সেই পরিবর্তনগুলিকে কীভাবে তুলে ধরেছিলেন তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ছোটোগল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিভাষাসমূহ, উপস্থাপনের ধরন, আখ্যানের বিষয়বস্তু কিংবা আকারসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে । 'বিশ্বায়ন ও নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প (১৯৯২-২০১২)' শিরোনামের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ মূলত ভারতীয় তথা বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘটা প্রধানত একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং তার ফলে সংঘটিত আরও কিছু আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের প্রভাব বাংলা ছোটোগল্পে কীভাবে এসে পড়েছিল, সেই দিকগুলি অনুসন্ধান করতে চেয়েছে। বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে লেখা বাংলা ছোটোগল্পের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণই এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন ব্যাপারটি কী সেই সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি বিশ্বায়নের প্রেক্ষিত ও পটভূমি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সারা পৃথিবীর প্রেক্ষিতে এবং ভারতীয় প্রেক্ষিতে বিশ্বায়নকে দেখতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে তার অগ্রগতি কিংবা প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের একেবারে প্রথমে ইংরেজি 'Globalization' শব্দটির উৎপত্তি, প্রথম ব্যবহার, ব্যবহারকর্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর উক্ত

শব্দটি থেকে বাংলায় 'বিশ্বায়ন' শব্দটির আগমন, তাৎপর্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ধাপে ধাপে আলোচ্য সময়পর্বে 'Globalization' বা 'বিশ্বায়ন' ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে একাধিক প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্বের বিশ্বায়নের পটভূমি সম্পর্কে এরপর আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে 'GATT' চুক্তির প্রসঙ্গ। এর পরবর্তী 'ডাঙ্কেল প্রস্তাব'-এর কথাও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপর আলোচিত হয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার পটভূমি। তার পরেই তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে কোন পরিস্থিতিতে কাদের নেতৃত্বে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হয়েছিল সেই পর্বটিকে। এরপর পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে মুক্ত অর্থনীতিকে গ্রহণ ও তার প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর আলোচিত হয়েছে ভারতে টেলিকম এবং বিপিও শিল্পের প্রসারের কথা। সারা দেশ জুড়ে পরিকাঠামো তথা রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রসারের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যা বিশ্বায়নের প্রভাবে সংঘটিত হয়েছিল। বদলে যাওয়া কর্মসংস্কৃতি, বিনোদন কিংবা জীবনবোধ সম্পর্কে এরপর সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বিশ্বায়নের ফলে নারী সমাজের উপর সৃষ্ট প্রভাব সম্পর্কে। শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে এরপর আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে বিশ্বায়ন নামক ব্যবস্থাটির মন্দ-ভালো প্রসঙ্গে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে বিশ্বায়নের ফলে ভারতে প্রসারিত পুঁজির কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটেছিল, সেই দিকগুলি। প্রধান প্রধান কয়েকটি ক্ষেত্রকে নির্বাচনের মাধ্যমে এই অধ্যায়টি নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলি হল—ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, তথ্য-প্রযুক্তি, বিনোদনের জগৎ, শিক্ষাব্যবস্থা, নির্মাণক্ষেত্র, পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্প, সামাজিক মাধ্যম, চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র, পোশাক ও ফ্যাশন, বাজার-বিগবাজার-ই-কমার্স ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক

আলোচনার মাধ্যমে এগুলির প্রসার কিংবা তার ফলে জনজীবনের একাধিক পরিবর্তনকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই ক্ষেত্রগুলির ক্রমবিবর্তনের একাধিক দিককে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বায়নের কারণে পুঁজির প্রসার ঘটার ফলে মানুষের জীবনে সার্বিকভাবে যে যে পরিবর্তন পূর্বের তুলনায় ঘটেছিল, সেই দিকগুলিকে এখানে বিশ্লেষণ করতে চাওয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাচিত ছোটোগল্পকারদের বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়পর্বে লেখা প্রাসঙ্গিক এবং নির্বাচিত ছোটোগল্পসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে বিস্তার লাভ করা প্রযুক্তি মানবজীবন তথা বাংলা ছোটোগল্পকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য লেখকদের জন্মসালের কালানুক্রমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ষোলোজন ছোটোগল্পকারকে। এঁদের কয়েকজন প্রাতিষ্ঠানিক লেখক, কয়েকজন প্রতিষ্ঠানবিরোধী, কয়েকজন আবার দুই জগতেই লেখক হিসাবে সক্রিয়। বয়সে প্রবীণ থেকে নবীন একাধিক ছোটোগল্পকারকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার লিঙ্গগতভাবে পুরুষ ছোটোগল্পকারদের পাশাপাশি একাধিক নারী ছোটোগল্পকারের গল্পও বিশ্লেষণের তালিকায় উপস্থিত। এইভাবে বিভিন্ন মাত্রার উপস্থিতিতে বেশ কিছু ছোটোগল্পকে বেছে নিয়ে এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, গল্পগুলিতে যান্ত্রিকতা কীভাবে প্রাধান্যের জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে। বাংলা ছোটোগল্পে প্রযুক্তিনির্ভর শব্দাবলির ব্যবহার কীভাবে বেড়ে চলেছে, তাও হয়ে উঠেছে এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ের বাংলা ছোটোগল্পে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র সংক্রান্ত বিষয় কীভাবে উঠে এসেছে এবং তার উপযোগী শব্দাবলিসহ গল্পে হাজির হয়েছে, তা

বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য নির্বাচিত লেখক-লেখিকাদের নির্বাচিত ছোটোগল্পসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে বাংলা ছোটোগল্পের অন্দরে জায়গা করে নিচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দাবলি। অন্যদিকে চিকিৎসাব্যবস্থার পণ্যায়ন মানুষের জীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, সেই দিকটিকেও এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর বিপরীতে বিশ্বায়ন-পরবর্তী পুঁজিনির্ভর চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের শহরকেন্দ্রিকতা যে গ্রামভারতের মানুষের নাগাল থেকে অনেক দূরে ছিল, সেই বিষয়টিও এই অধ্যায়ে ছোটোগল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি লাভ করা পরিযাণ বাংলা ছোটোগল্পে কীভাবে উঠে এসেছে, তা নির্বাচিত গল্পকারদের বেছে নেওয়া ছোটোগল্পের নিরিখে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। কী কী কারণে কোন কোন জনস্তরের মধ্যে পরিযাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বিশ্লেষণের পাশাপাশি এই অধ্যায়ে ছোটোগল্পের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে চাওয়া হয়েছে পরিযাণের প্রভাবকে। এই অধ্যায়ে ভারতের অভ্যন্তরে শিক্ষালাভ কিংবা উপার্জনের কারণে পরিযাণ যেমন ছোটোগল্পের মাধ্যমে উঠে এসেছে, অন্যদিকে ভারতের বাইরেও একই কারণে পরিযাণের কথা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে আমেরিকায় জঙ্গি হানা কিংবা দেশের অভ্যন্তরে গুজরাট দাঙ্গা পরবর্তী পরিস্থিতির প্রভাব পরিযাণে কীভাবে প্রভাব তৈরি করেছে, তাও উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে। অন্যদিকে এই অধ্যায়ের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া মানুষদের প্রতি দেশে বসবাসকারী মানুষদের মনোভাবকেও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যায়টির মধ্যে দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে তৃতীয় বিশ্বের মেধা প্রবাহিত হয়ে প্রথম বিশ্বের উন্নতিতে কাজে লাগছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে নির্ণায়ক হিসাবে পরিযাণ যে একটি বড়ো ভূমিকা নিচ্ছে, সেই দিকটিও এখানে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে একাধিক ছোটোগল্পে

পরিলক্ষিত হয়েছে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে শ্রমিকদের পরিযাণ। বিশ্বায়নের সাপেক্ষে যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে বিশ্বায়ন কীভাবে ব্যক্তি কিংবা পরিবার সম্পর্কের বদল ঘটিয়েছে। পুঁজির কাজই যে পরিবারের ভাবালু আবরণকে ছিঁড়ে ফেলা, তা এই অধ্যায়ে বেশ কয়েকজন ছোটোগল্পকারের গল্পে উঠে এসেছে। বিশ্বায়নের পণ্য-সংস্কৃতি যে মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের নিয়ামক হয়ে উঠেছে, তাও বেশ কিছু ছোটোগল্পের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। মানুষে মানুষে দূরত্ব বেড়েছে, বেড়েছে বৃদ্ধাশ্রম। অন্যদিকে মানুষের সাহচর্য কমে গিয়ে বেড়ে গিয়েছে প্রযুক্তির সাহচর্য। প্রযুক্তি মানুষকে ভার্চুয়াল জগৎ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আরও একাকী করে তুলেছে। বিশ্বায়নের ফলে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙন ঘটেছে। এমনকি পরের দিকে নিউক্লিয়ার পরিবারের স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেও অসীম দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। পারস্পরিক সামান্য সাহচর্যের পরেই মানুষ বেশি সময় অতিবাহিত করছে প্রযুক্তির দুনিয়ায়। পণ্য ব্যবহারের ক্ষমতার উপরে গড়ে উঠছে সামাজিক সংলগ্নতা। জিনিস কেনার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠছে মানুষ। ভাবছে না কম ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের কথা। পিতা-মাতা এবং সন্তানের মধ্যে বেড়ে চলেছে দূরত্ব। শিশুদের জগতটিও সাংঘাতিকভাবে বদলে গিয়েছে। তাদেরকে নিউক্লিয়ার পরিবারের একাকীত্ব ভোলাতে প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বায়ন কেড়ে নিচ্ছে মানুষের অবসর। দাম্পত্য-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অস্থিরতা এবং ভাঙন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমকালীন বাংলা ছোটোগল্পের পরিসরে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে ধরা পড়েছে তা এই অধ্যায়ের আলোচ্য হয়ে উঠেছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বিশ্বায়নের বিবিধ প্রভাব বাংলা ছোটোগল্পের মধ্যে কীভাবে এসে পড়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে বদলে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের জীবিকা, বিজ্ঞাপন-নির্ভর জীবনভাবনা, নারীর পণ্যায়ন ইত্যাদি বিষয় একাধিক লেখকের ছোটোগল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বেশকিছু ছোটোগল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন কিংবা পুঁজির অবাধ প্রসারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাষ্ট্রবিরোধী একাধিক আন্দোলনের কথা। ক্রমবর্ধমান ফ্ল্যাটনির্ভর সংস্কৃতি, ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের বিস্তার, ব্যক্তিমানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি যেমন বেশ কিছু ছোটোগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে, তেমনই দ্রুত নগরায়ণ, পুরানো পেশার মৃত্যু, নতুন পেশার প্রযুক্তিনির্ভরতা ইত্যাদিও অন্যান্য ছোটোগল্পকারদের গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে উঠে এসেছে। বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়ের অপমৃত্যু, মফস্‌সলের সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের ছোঁয়া লাগা, ভোগবাদী সময়, কোক-পেপসির আগমন তথা স্থানীয় সংস্কৃতির পণ্যায়ন বেশ কিছু ছোটোগল্পের বিষয় হিসাবে এই অধ্যায়ে ধরা পড়েছে। কোনও কোনও লেখকের ছোটোগল্পে উঠে এসেছে পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা। মাল্টি লেভেল মার্কেটিং, যৌনতার আরও বেশি করে পণ্য হয়ে ওঠা কিংবা মানুষের একা হয়ে পড়ার একাধিক দিক এই অধ্যায়ে বেশ কয়েকজন ছোটোগল্পকারের গল্প বিশ্লেষণ করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের পরে যুক্ত করা হয়েছে উপসংহার অংশ। এই অংশে খুব সংক্ষেপে বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে বিশ্বায়নের ভালো দিক এবং বিশ্বায়নের মন্দ দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পুঁজির প্রভাব এবং প্রযুক্তি কীভাবে মানুষের জীবনের নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে তা এই অংশে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি প্রায় দুই দশকের বেশি সময়কালে ছোটোগল্পকাররা কীভাবে বিশ্বায়নকে তাঁদের ছোটোগল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, তা এই অংশে সংক্ষেপে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

উপসংহারের পরে যুক্ত করা হয়েছে পরিশিষ্ট অংশ। এখানে সংযুক্ত হয়েছে GATT-1947-এর চুক্তির একটি পৃষ্ঠা। এর পর **১৯৯১** সালের ২৪ শে জুলাই ভারতীয় পার্লামেন্টে অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ কর্তৃক পেশ করা বাজেট বক্তৃতার একটি পৃষ্ঠা নমুনা হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

পরিশিষ্টের পরে যুক্ত করা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি। সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করার কাজে ব্যবহৃত বাংলা আকর গ্রন্থ, বাংলা সহায়ক গ্রন্থ, ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ, বাংলা পত্র-পত্রিকা, বাংলা এবং ইংরেজি অভিধান, গবেষণা-পদ্ধতি গ্রন্থ, বৈদ্যুতিন তথ্য উৎস ইত্যাদি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে।

'বিশ্বায়ন ও নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প (১৯৯২-২০১২)' শিরোনামের গবেষণা অভিসন্দর্ভে এইভাবে একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের প্রেক্ষিতে একাধিক ছোটোগল্পকারের রচিত বাংলা ছোটোগল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই সময়ের একাধিক বৈশিষ্ট্যকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে যেগুলি প্রভাব ফেলেছিল ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে।

সোনারপুর সৈকত মিস্ত্রী
আগস্ট, ২০২২

গবেষণা পদ্ধতি

'বিশ্বায়ন ও নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প (১৯৯২-২০১২)' শিরোনামের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে—

- ❖ প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয় নির্বাচনের পর একটি শিরোনাম এবং গবেষণাপ্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ বিষয়ের অভিমুখ অনুযায়ী আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ, সহায়ক পত্র-পত্রিকা, আর্কাইভাল ও বৈদ্যুতিন তথ্য (আন্তর্জালিক তথ্য) সংগ্রহ করা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার, ওয়েবসাইট ও সংগৃহীত গ্রন্থাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।
- ❖ সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার, ভূমিকা, বিষয়ানুগ সাতটি অধ্যায়, উপসংহার, পরিশিষ্ট এবং গ্রন্থপঞ্জি—এইরকম বিভাজনে বিভক্ত করা হয়েছে।
- ❖ গবেষণার সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী তুলনামূলক পদ্ধতি, পাঠ্য-বিশ্লেষণ ভিত্তিক পদ্ধতি এবং কোথাও কোথাও বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।
- ❖ সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় (প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিসমূহের একাংশ ব্যতিরেকে) অভ্র সফটওয়্যারের কালপুরুষ ফন্টে ১৪ ফন্টসাইজে লিখিত হয়েছে। দুটি লাইনের মধ্যে দূরত্ব রাখা হয়েছে ১.৫। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার না করে উদ্ধৃতাংশটি ২ পয়েন্ট ছোটো করে ১২ ফন্টসাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলি ইনডেন্ট-এর মধ্যে রাখা হয়েছে বলে উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জিত হয়েছে।
- ❖ উদ্ধৃতি ছাড়া সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
- ❖ গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের প্রয়োজনে MLA হ্যান্ডবুকের সপ্তম সংস্করণ অনুসৃত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বায়ন: প্রেক্ষিত, পটভূমি

পৃথিবীর ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীতে যে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, তার একটি নিঃসন্দেহে ছিল এই শতাব্দীর শেষ দশকে ভারত সরকার কর্তৃক মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নিয়ে 'বিশ্বায়ন' নামক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়া। প্রকৃতিগত দিক থেকে এই বিশ্বায়ন ছিল মূলত অর্থনৈতিক, তবে তা প্রভাবগতভাবে বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহকে বদলে দিয়েছিল। তিন দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকারের গৃহীত সেই অর্থনৈতিক নীতির দ্বারা আজকের ভারত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। আজকের দিনের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র, বিনোদনসহ আরও বহু ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন শুধু যে ক্রিয়াশীল তাই নয়, তা রীতিমতো নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আসীন। সুতরাং সেই বিশ্বায়নকে বুঝতে হলে জানতে হবে তার উৎপত্তির ইতিহাসকে, কিংবা অনুসন্ধান করতে হবে কোন সময়পর্বে কীভাবে এই বিশ্বায়ন ভারতের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়েছিল এবং তার পরবর্তীকালে তার প্রভাবসমূহই বা কী হয়েছিল, সেই দিকগুলিকে।

১.১॥

বাংলায় 'বিশ্বায়ন' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজি শব্দ 'Globalization'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে। 'Globalization' শব্দটির অর্থ সন্ধানে অগ্রসর হলে যে অর্থ আমরা পাই তা এরকম—

> the increase of trade around the world, especially by large companies producing and trading goods in many different countries"; "when available goods and

services, or social and cultural influences, gradually become similar in all parts of the world.[১]

অর্থাৎ ইংরেজি ‘Globalization’ শব্দের অর্থ অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে দেখা গেল তা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃহৎ কোম্পানিগুলি—যারা পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা করে; তাদের দ্বারা বাণিজ্যবৃদ্ধি। পণ্য, পরিষেবা কিংবা সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক প্রভাবের দ্বারা তা বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে অভিন্ন হয়ে ওঠে।

ইংরেজিতে ‘Globalization’ পরিভাষাটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে, তার আগে মোটামুটি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে অন্য বিষয়ে পরিভাষাটি চালু হয়েছিল। এই পরিভাষাটির জনপ্রিয়করণে যাঁর ভূমিকা সর্বাধিক, তিনি হলেন Theodore Levitt (1925-2006), যিনি ১৯৮০-র দশকে এই শব্দটিকে ব্যবহার করেন।[২] বাংলায় ‘বিশ্বায়ন’ শব্দটির যে অর্থ অভিধানে উপস্থিত সেটি হল—

অর্থনীতি প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া।[৩]

আভিধানিক এই অর্থপ্রাপ্তির পর আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে ‘বিশ্বায়ন’ শব্দটির মধ্যে দুটি শব্দ জোড়া রয়েছে; বিশ্ব এবং অয়ন। এখানে বিশ্ব শব্দটির অর্থ সাধারণভাবে ‘পৃথিবী’ ধরে নিলেও ব্যাপকার্থে তা পৃথিবী ও তার চারপাশের গ্রহ-নক্ষত্রসমন্বিত সমগ্র মহাকাশ। এরপর দ্বিতীয় যে শব্দটি পড়ে থাকল সেটি ‘অয়ন’। অয়ন শব্দের অর্থ পথ, গতি বা অবলম্বন[৪]। সামগ্রিকভাবে যে অর্থটি মোটের উপর আমাদের কাছে অভিধান থেকে এসে পৌঁছায়, তা হল বিশ্বায়ন= বিশ্বের পথ বা বিশ্বের গতি।

১.২॥

বিশ্বায়ন শব্দটির বিশালতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা খুবই কঠিন। কারণ সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতির প্রেক্ষিতে এই শব্দের অর্থ অনেক বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে *GLOBALIZATION: Myth and Reality* (Concept, New Delhi, 2004) গ্রন্থের 'Globalization: Concept and Nature' প্রবন্ধে অধ্যাপক Anil Dutta Mishra জানিয়েছেন—

> Globalization is not new but present era has some distinctive features such as shrinking space, shrinking time and disappearing borders are linking people's lives more deeply, more intensively and more immediately than ever before. Globalization is a process integrating not just the economy but culture, technology and governance. Globalization is considered to be neo-liberal. Its normative base is the celebration of the market. In other words it is a triumph not only over so-called global "historic alternatives" [F. Fukuyama (92), *The End of History and the Last Man*] but also over unions and Keynesian states. In fact, elites on behalf of the states are real authors of Globalization.
>
> Globalization has become the current *mantra* or even panacea to solve all human problems. It is believed that the achievements of globalization would make the people all over globe happy, prosperous and contended and that there would be no conflicts, no poverty and inequality, no violation of human rights, no malnutrition, no illiteracy and no disease, etc. ... There would be nation-state without boundary. It is said that global markets, global technologies, global ideas and global solidarity can enrich the lives of people everywhere, greatly expanding their choices. ... This era of globalization opening many opportunities for millions

> of people around the world. Increased trade, new technologies, foreign investments, expanding media and Internet connections are fueling economic growth and human advance.[৫]

এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, বিশ্বায়ন যেন এক সর্বরোগহরণকারী ওষুধে পরিণত হয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষের সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু তা যে বাস্তব নয়, সেকথা তিনি প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে 'বিশ্বায়ন' বিষয়টি নতুন নয়, তা আগেই ঘটেছিল, তবে বিশ্বায়নের যে পর্বটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তার কিছু নতুন দিক ছিল। যেমন, নতুন বাজারসমূহ, যেখানে সারা পৃথিবীর ফরেন এক্সচেঞ্জ এবং ক্যাপিটাল মার্কেটগুলি সর্বক্ষণ যুক্ত থাকছে, তারা সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে চলেছে। নতুন যন্ত্রপাতি, যেমন ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। নতুন কার্যকরী সংস্থাসমূহ, যেমন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, যা কিনা বিভিন্ন দেশের সরকারের উপর কর্তৃত্ব জাহির করতে সক্ষম। তার সঙ্গে আছে বহুজাতিক সংস্থা, যাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কোনও কোনও দেশের থেকেও বেশি। এছাড়াও বর্তমান বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে বেশ কিছু নিয়মকানুন, যা বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বিভিন্ন দেশের সরকারি সিদ্ধান্তকে তা জাতীয় নীতি প্রণয়নে বাধা দেয়।[৬]

অনিন্দ্য ভুক্ত তাঁর *বিশ্বায়ন শব্দকোষ* (বাঙলার মুখ, জুলাই ২০১৫) নামক গ্রন্থে 'বিশ্বায়ন' সম্পর্কে লিখেছেন—

> বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতাবৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে তোলা। এতটাই নিবিড় যে পণ্য, পরিষেবা, প্রযুক্তি, পুঁজি এমনকি শ্রমশক্তির এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের পথে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এতটাই নিবিড়, যে দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সীমারেখা যেন কেবল রাজনীতির প্রয়োজনেই থাকে, আর্থনীতিক সম্পর্কের পথে তা যেন প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়। একটু ভালোভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করলে বোঝা যাবে, বিশ্বায়নের এই তত্ত্ব আসলে

বাজার দখলের সুচতুর এক কৌশল।... বস্তুত এই শব্দটির আবির্ভাব 1940-র দশকে, যখন মন্দাক্রান্ত হয়ে উন্নত বিশ্বের সমস্ত অর্থনীতিই পরিত্রাণের পথ খুঁজছে। খুঁজছে বাজার। আবির্ভাবের এই সময়কালই বলে দেয় তত্ত্বটির আসল উদ্দেশ্য।[৭]

বিশ্বায়নের যে প্রথম পর্বটির কথা বলা হয়, যার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, মোটামুটিভাবে ১৮৭০-এর দশক থেকে, সেই সময়ও লগ্নিপুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে তখন যেটি ছিল না সেটি হল বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচা। সারা পৃথিবী জুড়েই তখন চালু ছিল আবদ্ধ বিনিময় হার প্রথা। বিনিময় ততটুকুই হত, যতটুকু বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন।[৮]

প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে 'নিবিড়' সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বিশ্বায়নের কারণে তৈরি হয়, তা প্রকৃতপক্ষে ছিল বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জনের কৌশল। বাণিজ্যিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলি প্রকৃতপক্ষে এইভাবে তুলনামূলকভাবে বাণিজ্যে পিছিয়ে থাকা দেশগুলির বাজারকে দখল করতে চেয়েছিল।

১৮৭০-এর দশক থেকে যে বিশ্বায়ন শুরু হয়েছিল সেই বিশ্বায়নের আগেও বিশ্বায়নের কয়েকটি ধারা লক্ষ করা যায়। অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী এসম্পর্কে তাঁর 'বৈষয়িক বিশ্বায়নের রূপরেখা' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে—

এক ভূখণ্ড থেকে আরেক ভূখণ্ডে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে জনসমষ্টির অভিগমনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। কিছু প্রত্নতত্ত্ববিদ মনে করেন আফ্রিকা মহাদেশেই মানবজাতির উদ্ভব এবং অন্যান্য মহাদেশের জনসমষ্টির মূলে আছে সেই মহাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে অন্য ভূখণ্ডে অভিগমন। একইভাবে প্রযুক্তির বিশ্বব্যাপী বিস্তারও বহুদিনের ইতিহাস; বন্য জন্তু শিকার ও বৃক্ষের ফল আহরণ করে বেঁচে থাকার পরে যেভাবেই হোক না কেন আধুনিক মানুষের পূর্ব-পুরুষ বন্য জন্তুকে পোষ মানাতে এবং চাষ করে খাদ্যশস্য ফলাতে শেখে সেই প্রযুক্তি প্রায় জাতি উপজাতি নির্বিশেষে আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার

বছর আগে থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তারও পরে এল তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা এবং অন্যান্য ধাতু ও ধাতুমিশ্র ব্যবহারের বিশ্বায়ন।

যখন মানুষ বাণিজ্য করতে শিখল, দেশ বিদেশের মধ্যে পণ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত হল। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো সভ্যতার সঙ্গে নিনিভে আসিরিয়ার বাণিজ্যের, গ্রিক ও রোমক সভ্যতার সঙ্গে গাঙ্গেয় উপত্যকার সভ্যতার বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তি বিনিময়ের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পাশাপাশি বণিকের স্বার্থবাহী আন্তর্দেশীয় সঞ্চালনের নিদর্শন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে।... বিভিন্ন দেশের মধ্যে মহাজনী মূলধনের আদানপ্রদানও প্রাচীন। ভারতীয় মহাজনদের 'হুন্ডি' বা আর্মেনীয় বণিকদের ঋণপত্র অথবা ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, ভেনিসের মতো ইতালির নগররাষ্ট্রের শাসকশ্রেষ্ঠীদের ঋণপত্রের বেচাকেনা ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্র ও জনগণকে এক বিশাল বাণিজ্যিক বন্ধনসূত্রে সম্পৃক্ত করেছিল। এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় বন্ধনের ইতিহাস বহুক্ষেত্রে এক থেকে দু'হাজার বছরের বা আরও বেশি পুরানো। সেই ইতিহাসে মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে। যুদ্ধ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির ফলে অনেক মহাজন-বণিক সম্প্রদায়রাষ্ট্র লোপ পেয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান কখনই সম্পূর্ণ থেমে যায় নি।[৯]

অর্থাৎ বিশ্বায়নের যে পর্বটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, তার পূর্বে সংঘটিত বিশ্বায়নের এক ভিন্ন রূপকে প্রাবন্ধিক এইভাবে তুলে ধরেছেন। সেইখানেও বাণিজ্য ছিল, কিন্তু তা আলোচ্য পর্বের বিশ্বায়নের মতো নয়। এই আলোচনায় অগ্রসর হয়ে পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই তিনি আরও জানিয়েছেন যে—

বিশ্বায়নের আধুনিক দিকগুলোর উদ্ভব অথবা আধুনিক কিছু বৈশিষ্ট্যের গতিপ্রাপ্তি ইউরোপীয় মহাদেশে ধনতান্ত্রিক সমাজরাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টীয় পনের থেকে ষোল শতাব্দীর মধ্যে এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেছেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৌশক্তি ও প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায়, বণিক ও নাবিকদের উদ্যমে ইউরোপীয়রা আটলান্টিক পার হয়ে পশ্চিম গোলার্ধের দুই বিশাল মহাদেশে যাওয়ার ও সেখানকার প্রাকৃতিক ও

মানবিক সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারের পথ পেয়ে গেল। প্রায় একই সঙ্গে তারা ইউরোপ থেকে আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্বভাগ ঘুরে ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার সাগরপথ 'আবিষ্কার' করল। আন্তর্মহাদেশীয় এইসব সাগরপথ খুলে যাওয়ার ফলে দূরপাল্লার বাণিজ্যের উপর ইউরোপীয় বণিক ও শাসকশ্রেণির দখল উত্তরোত্তর বেড়ে গেল। ক্রমান্বয়ে সেই বাণিজ্যের প্রবাহও দ্রুততর হল। সতের শতক থেকে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম হল ইংল্যান্ডের এবং হল্যাণ্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং অন্যান্য আরও কিছু কোম্পানি, যেমন অস্টেড কোম্পানি, আফ্রিকা কোম্পানি ইত্যাদি। এগুলোকে আধুনিক বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার পূর্বসূরী বলা যেতে পারে। ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে এবং নেদারল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন্দোনেশিয়ায় যথাক্রমে ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ শাসন কায়েম করল।

ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মহাজনী পুঁজি দেশ থেকে দেশান্তরে চালান হতে থাকল। প্রথমে আমস্টারডাম, তারপর লন্ডন ও প্যারিস এবং শেষে নিউইয়র্ক, টোকিও, ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক মহাজনী পুঁজির বাজারের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বিদেশে পুঁজি লগ্নি করে পণ্য উৎপাদন করার উদাহরণ পাওয়া যেত প্রধানত আখ এবং আখ থেকে তৈরি চিনি, তুলো, নীল ইত্যাদি খামারজাত পণ্যের ক্ষেত্রে। উনিশ শতক থেকে সুতোকল, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, খনিজ তেল ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রেও আমরা বিদেশী পুঁজি প্রত্যক্ষভাবে লগ্নি করে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের উদাহরণ প্রতি মহাদেশে পেতে শুরু করলাম। তারই সঙ্গে জন্ম হল নতুন ধরনের বহুজাতিক কোম্পানির। এই কোম্পানিগুলো কোনো রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই নিজেদের আর্থিক শক্তি, উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের ক্ষমতা এবং উন্নত প্রযুক্তির জোরে একাধিক দেশে নিজেদের কারখানা, খামার খনি এবং অফিস বিস্তার করতে থাকল।[১০]

এইভাবে তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে শ্রী অমিয়কুমার বাগচী খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে কীভাবে প্রথমে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য চলেছে তা যেমন স্পষ্ট করে তুলেছেন, তেমনই তুলে ধরেছেন উনিশ শতক থেকে বহুজাতিক কোম্পানির উদ্ভবের দিকটি। এই সময়ে এই

কোম্পানিগুলির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমে এসেছিল। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে উনিশ শতকে উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা আর এক ধরনের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছিল মূলত ব্রিটিশ সরকার, যে বিশ্বায়নের পণ্য হয়ে উঠেছিল মানুষ—একেবারে আক্ষরিক অর্থেই—

উনিশ শতকের শেষ দিকে বহু দেশে, বিশেষ করে অশ্বেতকায় অধ্যুষিত পরাধীন দেশগুলোতে এবং লাতিন আমেরিকায় ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অবাধ বাণিজ্যের নীতি বিস্তারলাভ করল। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহ স্রোতস্বতী থেকে মহানদীর আকার লাভ করল। সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে আরেকটি নিষ্ঠুর পণ্যের আদান-প্রদান বিশাল আকার ধারণ করল এবং উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে প্রভূত সম্পদের উৎস হয়ে দাঁড়াল। এই 'অমানবিক' পণ্যটি হচ্ছে আফ্রিকা থেকে বন্দী করে আনা ক্রীতদাসসমষ্টি। প্রতি বছর হাজারে হাজারে নর-নারী, শিশু ও যুবক-যুবতী শৃঙ্খলিত অবস্থায় আফ্রিকা থেকে আটলান্টিক পার হয়ে ক্যারিবিয়ানের দ্বীপগুলোতে, ব্রাজিলে, মেক্সিকোতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস হিসাবে কাজে নিযুক্ত হল। এদের মধ্যে অনেকে সমুদ্রযাত্রার সময়েই মৃত্যুবরণ করত। কমপক্ষে ১ কোটি ১০ লক্ষ দাসকে এইভাবে আফ্রিকা থেকে পাচার করা হয়েছিল। বিশ্বায়নের এই ভয়াল প্রকাশে গোটা পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা বিধ্বস্ত হয়েছিল বলা চলে।

উনিশ শতক থেকে আরম্ভ করে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত আরেকটি জনপ্রবাহ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই জনপ্রবাহ হল ইউরোপের সাধারণ মানুষের অভিগমন। উত্তর ও লাতিন আমেরিকায়, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় সেইসব মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের নির্মূল অথবা পদানত করে শ্বেতকায়রা নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষ থেকেও কয়েক লক্ষ লোক অর্ধদাস-দশা বরণ করে মরিশাস, ফিজি, ত্রিনিদাদ, বার্বাডোজ, নাটাল ইত্যাদি অঞ্চলে অভিগমন করেছিল। তুর্কী (তুরস্ক), গ্রিস, আলজেরিয়া, মরোক্কো থেকে শ্রমজীবীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানিতে, ফ্রান্সে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পুনর্নির্মাণে হাত লাগিয়েছিল, ঠিক যেমনভাবে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে এবং ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে কয়েকলক্ষ লোক ব্রিটেনে গিয়ে ফ্যাক্টরিতে, বাসে, ট্রেনে, দোকানপাটে নিম্ন মজুরির শ্রমিক হিসাবে কাজে লেগেছিল। একইভাবে বহু লক্ষ মানুষ

মেক্সিকো ও লাতিন আমেরিকার অন্য দেশ থেকে আইনি ও বেআইনি পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে রুজিরোজগারের পথ খুঁজে নিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাকার ধনী দেশ অন্য সব বিষয়ে বিশ্বায়নের দৃঢ় সমর্থক, কিন্তু অশ্বেতকায় লোকদের ধনী দেশে অভিগমনের পথে নতুন নতুন বাধা সৃষ্টি করতে তাদের উৎসাহ প্রবল।[১১]

বর্তমান প্রেক্ষিতের পূর্বে এভাবেই আরও এক বিশ্বায়ন দেখা গিয়েছিল। সেই বিশ্বায়নের পণ্য হয়ে উঠেছিল মানুষ। পরিযাণ তখনও ছিল। তার মাত্রা ছিল আলাদা। আজকের প্রেক্ষিতে বিশ্বায়নের ফলে সরাসরি মানবপাচার না হলেও তা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রমবর্ধমান নারীপাচার তারই বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে সরাসরি দাস হিসাবে মানুষকে ব্যবহার না করা গেলেও আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে প্রথম বিশ্বের কাজগুলিকে যেভাবে স্বল্পমূল্যে তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে দিয়ে করানো হচ্ছে, তা শোষণেরই নামান্তর। ভিসা আইনের নিত্যনতুন বদল ঘটিয়ে এখনো অশ্বেতকায় লোকদের ধনী দেশে অভিগমনের পথে বাধা তৈরি অব্যাহত রয়েছে।

১.৩॥

বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্বায়নের যে পর্বটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, সেই পর্বটির পটভূমি সম্পর্কে অনিন্দ্য ভুক্ত তাঁর *বিশ্বায়ন শব্দকোষ* (বাঙলার মুখ, জুলাই ২০১৫) নামক গ্রন্থে জানিয়েছেন যে—

আজকের বিশ্বায়নের পটভূমি তৈরি হতে শুরু করে ১৯৭০-এর দশক থেকে। ১৯৭৩ সালে ওপেক (Organization of the Petroleum Exporting Countries)-ভুক্ত দেশগুলি একজোট হয়ে এক ধাক্কায় তেলের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং এই দামবৃদ্ধি থেকে এক বিপুল পরিমাণ সম্পদ অল্প সময়ের মধ্যে তাদের করায়ত্ত হয়। বিনিয়োগের অন্য কোনো জায়গা না থাকায় এই বিপুল পরিমাণ টাকা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে ঋণদানের কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। কিন্তু ঋণের

অপরিণামদর্শী বিস্তার আশির দশকের গোড়াতেই একটি ঋণসংকট তৈরি করে ফেলে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তৃতীয় বিশ্বের , বিশেষত লাতিন আমেরিকার দেশগুলি। অবস্থা দেখে ঋণ নেবার ব্যাপারে একটা অনীহা, আতঙ্ক তৈরি হয়ে যাচ্ছিল বিভিন্ন দেশের মধ্যে। ঋণ নয়, সবাই চাইছিল বিদেশি বিনিয়োগ হিসাবে ওইসব টাকা দেশে ঢুকুক। এই সময়েই আবার উন্নত দেশগুলিতে মন্দা শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলিও চাইছিল বাইরের বাজার। দুই চাহিদা মিলে মিশে শুরু হয় দেশে দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং এই বিনিয়োগের রাস্তা সুগম করে দিতে বিকাশশীল দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনেই বাধ্য হয় খোলামেলা নীতির দিকে ঝুঁকতে। এই ব্যাপারে তাদের যেটুকু দ্বিধা ছিল তা কাটাতে উত্তমর্ণ হিসাবে চাপ দিতে শুরু করে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক-এর মতো সংস্থাগুলি। সব মিলিয়ে আস্তে আস্তে বিশ্বায়ন শব্দটি হয়ে দাঁড়ায় এই সমস্ত দেশের জপমন্ত্র।[১২]

অর্থাৎ দেখা যায় বিদেশি বিনিয়োগ-এর বিস্তার ঘটার পশ্চাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির যেমন চাহিদা ছিল, তেমনই উন্নত দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির প্রয়োজন ছিল বাইরের বাজার। এইসময়ে অনুঘটকের কাজ করে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কিংবা বিশ্বব্যাঙ্ক।

১৯৭০-এর দশকে ত্বরান্বিত বিশ্বায়নের ভিত্তিভূমিটি তৈরি হচ্ছিল ১৯৪০-এর দশক থেকে। এই সময়টি মোটামুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী। অমিয় বাগচী তাঁর 'বৈষয়িক বিশ্বায়নের রূপরেখা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে জানিয়েছেন যে—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস নামক একটি জায়গায় তথাকথিত মিত্রশক্তির সরকারগুলো মিলে দুটি সংস্থার সৃষ্টি করেছিল—একটি হল International Monetary Fund অর্থাৎ 'আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার', আর অন্যটি হল International Bank for Reconstruction and Development অর্থাৎ 'পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক'। পরে লোকমুখে এই দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির প্রচলিত নাম হয় World Bank অর্থাৎ বিশ্বব্যাঙ্ক। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য—বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের অস্থিরতারোধ।

আর বিশ্বব্যাঙ্কের কাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য তার নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সেই লক্ষ্য হল যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত উৎপাদন ক্ষমতা ও পরিকাঠামোর পুনর্নির্মাণ এবং অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নসাধন।[১৩]

'আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার' ও 'বিশ্বব্যাঙ্ক' গড়ে ওঠার পর ১৯৪৭ সালে সারা পৃথিবীতে অবাধ বাণিজ্যের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ মূলত আলোচনার উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়। এই মঞ্চের নাম ছিল GATT বা 'শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি (General Agreement on Tariffs & Trade)। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরবর্তী প্রায় পাঁচ দশক এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল। ১৯৯৪ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) স্থাপনের পর GATT-এর অবসান ঘটেছে।[১৪]

GATT-এর মতো একটি পারস্পরিক চুক্তিভিত্তিক মঞ্চ গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায়—

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধজনিত পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনাস্থা থেকে বিভিন্ন দেশ প্রতিরোধমূলক বাণিজ্যের রাস্তা ধরে। প্রতিরোধমূলক বাণিজ্য বলতে অন্য দেশের পণ্যকে নিজের দেশে ঢুকতে না দেওয়া। এর জন্য আমদানির ক্ষেত্রে নানারকম শুল্কীয় ও অশুল্কীয় বাধার প্রাচীর তোলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামিল হয়েছিল মূলত ইউরোপের দেশগুলি। কিন্তু তারা নিজেদের অর্থনীতিকে বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে নিয়ে যেতে শুরু করলে পালটা প্রতিক্রিয়া হিসাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও একই রাস্তা অনুসরণ করতে শুরু করে। কিছুটা এর ফল হিসাবে আর কিছুটা অন্যবিধ কারণে ১৯২৯ সাল থেকে এক মহামন্দার কবলে পড়ে যায় বিশ্ব অর্থনীতি। শুরু হয়ে যায় আরও বেশি করে খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়া। ১৯৩০ সালে আমেরিকা আইন পাস করে আমদানি শুল্কের হার ঐতিহাসিক উচ্চতায় নিয়ে চলে যায়, ১৯৩২ সালে ব্রিটেন কমনওয়েলথ বহির্ভূত যে-কোনো দেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির উপর

শুল্ক বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। বস্তুত মহামন্দার সূত্রপাতের দু-বছরের মধ্যে কম-বেশি ষাটটি দেশ তাদের আমদানি শুল্কের হার বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মহামন্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার রাস্তা যে এটা নয়, সেটা বুঝতে অবশ্য দেরি হয়নি। বুঝতে দেরি হয়নি বাণিজ্য সবসময়ই দুই বাণিজ্যসঙ্গী দেশের পক্ষেই লাভজনক। ১৯৩৪ সালে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের উদ্যোগে আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে এই অচলাবস্থা কাটাতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। 'রেসিপ্রোকাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট অ্যাক্ট' নামে একটি আইনও প্রণয়ন করে আমেরিকা। এই আইনের বক্তব্য ছিল, কোনো দেশ যদি তার শুল্কের পরিমাণ ৫০ শতাংশ কমাতে রাজি হয়, তাহলে পালটা হিসাবে আমেরিকাও সেই দেশের ৫০ শতাংশ শুল্ক ছেড়ে দেবে। এইভাবে এই চুক্তির মাধ্যমে এক দেশ অন্য দেশকে 'সব থেকে পছন্দের দেশ' হিসাবে গণ্য করবে। আমেরিকার এই উদ্যোগে সাড়া মিলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই এমন ৩১টি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায়।[১৫]

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশসমূহের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সন্দেহ কিংবা অবিশ্বাসের অবসান ঘটতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। সারা পৃথিবীজোড়া অর্থনৈতিক মন্দা মানুষের প্রভূত ক্ষতি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই কারণেই এই বাতাবরণ কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা শুরু হলেও এসে যায় আর একটি বিশ্বযুদ্ধ। প্রভাবগতভাবে যা ছিল পূর্বের তুলনায় আরও ধ্বংসাত্মক। তাই এইসময়ে যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি কিংবা আলোচনা স্তিমিত হয়ে গেলেও বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তা গতি লাভ করে—

অতঃপর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অবাধ করে তোলার প্রক্রিয়াটি সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৩৪-৩৯, এই অল্প সময়ের মধ্যেই শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়াটির হাত ধরে আমেরিকা মন্দার হাত থেকে ৫০ শতাংশ উদ্ধার পেয়ে গিয়েছিল। কম-বেশি একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল অন্যান্য দেশগুলিরও। ফলে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ স্থগিত করে দেওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। যুদ্ধ শেষ হবার পরই তাই ১৯৪৭-৪৮ সালে হাভানা শহরে বসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাণিজ্য ও

কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্মেলন। সম্মেলন থেকে উঠে আসে যে সিদ্ধান্ত, যা পরিচিত হাভানা সনদ নামে, সেখানেই প্রস্তাব রাখা হয় একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন গড়ে তোলার, যে সংগঠনের কাজ হবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং বাণিজ্য নীতি বিষয়ে বিবাদ মীমাংসা করা। একদিকে যখন এই হাভানা সম্মেলন চলছে, তখন ঐ একই সময়ে (১৯৪৭) জেনেভা শহরেও ৫৪টি দেশ আলোচনা চালাচ্ছিল শুল্ক হ্রাস ও একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন তৈরি নিয়ে। যতক্ষণ না এই সংগঠনটি গড়ে তোলা যাচ্ছে, ততক্ষণ সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে শুল্ক সংক্রান্ত আলোচনার জন্য একটি মঞ্চ গড়ে তোলা হয়। এর নামকরণ করা হয় শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি, সংক্ষিপ্ত ইংরেজিতে "গ্যাট"।

শেষপর্যন্ত হাভানা সনদটি অনুমোদন করেনি আমেরিকান সেনেট। অজুহাত ছিল এই যে, এই সনদ অনুযায়ী বাণিজ্য সংগঠনটি গড়ে তোলা হলে তা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতেও নাক গলাবে। ফলে পুরোদস্তুর একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনের পরিবর্তে গ্যাটই হয়ে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনার একমাত্র জায়গা।[১৬]

এইভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে GATT-এর মতো আন্তর্জাতিক একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য গতি লাভ করে। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাতে বহুল পরিমাণে লাভবান হয়েছিল প্রথম বিশ্বের দেশগুলি। কারণ তারা পুঁজি কিংবা প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক বেশি পরিমাণে উন্নত ছিল।

১.৪॥

GATT প্রায় পাঁচ দশক ক্রিয়াশীল ছিল। এরপর এই মঞ্চের অভ্যন্তরে ঐকমত্যের অভাবে আলোচনা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। সেইসময় ১৯৯১ সালে GATT-এর ডিরেক্টর আর্থার ডাংকেল একটি খসড়া চুক্তি হাজির করেন, যা ডাংকেল প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই খসড়া চুক্তি এনে

সদস্য দেশগুলিকে বলা হয় এতে সম্মতি দিতে অথবা অসম্মতি জানিয়ে সরে যেতে। এইরকম প্রস্তাবে বিতর্ক বাড়লেও শেষ পর্যন্ত কিছু সংযোজন-বিয়োজন সহ এই খসড়া চুক্তিটিতেই ১২৩টি দেশ স্বাক্ষর করে। সেই অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) কাজ শুরু করে। এর মাধ্যমে GATT-এর অবসান ঘটে।[১৭] বর্তমানে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশের সংখ্যা ১৬৪ ।[১৮]

GATT-এর অবসান ঘটেছিল ১৯৯৪ সালের ১৫ই এপ্রিল ম্যারাকেশ চুক্তির দ্বারা। এই চুক্তির বলে ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) কার্যকরী হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটানোই ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং উন্নতি ঘটানো এর প্রধান লক্ষ্য ছিল। বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্কের বাধা কাটানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রয়াসী হয়েছিল। এই প্রয়াসের ক্ষেত্রে সংস্থাটি পাঁচটি নীতি প্রণয়ন করে। এগুলি হল—

১. বঞ্চনাহীনতার নীতি।
২. পারস্পরিকতার নীতি।
৩. চুক্তি ও দায়বদ্ধতার নীতি।
৪. স্বচ্ছতার নীতি।
৫. নিজস্ব নিরাপত্তার নীতি।[১৯]

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) ছিল (GATT)-এর তুলনায় আরও বেশি শক্তিশালী একটি সংস্থা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়ে যায়।

১.৫॥

১৯৪৪ সালে গঠিত গ্যাট বা ১৯৯৫ সালে কার্যকরী বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা—এই দুটিরই সদস্য ছিল ভারত। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটি তার নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর স্বার্থে বাধ্য হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অবলম্বন করতে। মিশ্র অর্থনীতি বলতে বোঝায় যেখানে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষণায় চলা বাণিজ্যিক সংস্থা এবং বাণিজ্যিক গোষ্ঠীসমূহের সংস্থাগুলি যে অর্থনীতিতে একত্রে বর্তমান ও ক্রিয়াশীল থাকে।[২০] এক্ষেত্রে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার মূল ক্ষমতাটি রাষ্ট্র তার নিজের হাতে রাখে। ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সেরকমই ছিল। এজন্য মুক্ত বাণিজ্যের উদ্যোগের স্বপক্ষে থাকা চিন্তাবিদরা প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এ.ডি. শ্রফ (১৮৯৯-১৯৬৫) নামে একজন অর্থনীতিবিদ যিনি ১৯৫৪ সালে 'ফোরাম ফর ফ্রি এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি সংস্থা চালু করে বেসরকারি ক্ষেত্রে সক্রিয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করতেন। তাঁর মতে এভাবে চললে সামনের দশ বছরের মধ্যে অতি দ্রুত শিল্পায়ন ঘটানো সম্ভব। এই একই সময়ে ফিলিপ স্প্র্যাট (১৯০২-১৯৭১) নামে একজন সাংবাদিকও অবাধ উদ্যোগের পক্ষ নিয়ে পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি পঞ্চাশের দশকে ব্যাঙ্গালোর থেকে 'MysIndia' নামে মার্কিন সমর্থক এক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকেন। সেখানে তিনি ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পলিসিগুলির বিরুদ্ধে যুক্তি সাজাতে থাকেন। তিনি বলেন, এইসব পলিসিতে একজন উদ্যোগপতিকে যেন এক অপরাধী বলে গণ্য করা হয়, 'এমনই এক অপরাধী যে নিজের মাথা খাটিয়ে রাষ্ট্রের থেকে নিরপেক্ষভাবে সম্পদ সৃজন করতে পারে এবং লোকের কর্মসংস্থান করতে পারে।'[২১] ১৯৬৬ সালে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানোর পরে আশা করা হয়েছিল যে বাণিজ্যক্ষেত্র কিছু পরিমাণে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধি (১৯১৭-১৯৮৪)

কংগ্রেসকে ভেঙে দু'টুকরো করার পর নতুন করে এক প্রস্থ শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়, ফিরে আসে অর্থনৈতিক স্বৈরশাসন। তারপর ১৯৭০-এর শেষের দিকে জনতা আমলে সমাজতন্ত্রীরা আইবিএম ও কোকাকোলার মতো বিদেশি সংস্থাকে বহিষ্কার করে ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে খুব নাটকীয়ভাবে জাহির করেন।[২২] পরবর্তীকালে অর্থনীতিকে ষাটের দশকেই প্রতিযোগিতার মুখে ছেড়ে না দেওয়া নিয়ে টাটা গোষ্ঠীর প্রধান জে আর ডি টাটা (১৯০৪-১৯৯৩) সমালোচনা করেন। প্রতিযোগিতার মুখে ছেড়ে দিলে কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রাজস্ব দ্রুত বাড়ত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ইতিহাস থেকে বর্তমানে সরে এসে এই শিল্পপতি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দিয়ে তফাতটা একবার দেখবার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, সিঙ্গাপুর এবং তাইওয়ান প্রভৃতি দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নতি এইজন্যই ঘটেছে যে, 'এইসব দেশ, যেখানে সদ্য শিল্পায়ন ঘটছে, তারা মূলত বেসরকারি উদ্যোগের ওপরেই নির্ভর করে। তাদের দেশের সরকারের অর্থনৈতিক পলিসি এমন যে তা ওইসব উদ্যোগকেই উৎসাহিত করে ও সমর্থন করে।'[২৩]

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেশের অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতার মুখে ছেড়ে দেওয়ার প্রতি জোরালো মত বেশ কিছু বছর ধরে আসতে থাকলেও ভারত সরকার খুব সহজে তা মেনে নিয়েছিল এমন নয়। তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি হওয়া দেশের সংকটময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সরকারকে মুক্ত অর্থনীতি গ্রহণ করার পথে নিয়ে যায়। নরসিমহা রাও-এর জীবনীভিত্তিক *HALF LION* (Penguin, 2017)-গ্রন্থে Vinay Sitapati ভারতে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার প্রাক-মুহূর্তকে তুলে ধরেছেন—

> Two weeks after Narasimha Rao became prime minister, a convoy of vans left the vaults of Reserve Bank in South Bombay. The security around the armoured vans

was worthy of a head of state, for inside was India's honour, around twenty-one tonnes of pure gold. The convoy travelled thirty-five kilometres north to Sahar airport, where a plane from Heavy Lift Cargo Airlines stood waiting. The gold flew by plane to London, into the vaults of the Bank of England. In return, the Narasimha Rao government received dollars that allowed it to delay default on its outstanding loans. Gold is wrought with sentiment in India, and when news of the deal leaked, the public uproar was accompanied by private shame. The economy was now so wrecked that India was pawning its family jewellery.[২৪]

এই সময়ে দেশের অর্থনীতি এতটাই করুণ অবস্থায় পৌঁছিয়েছিল, যে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের কাছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সোনা বন্ধক দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯৯১ সালের জুন মাসে ভারত সরকারের কাছে মাত্র দু'সপ্তাহের মতো আমদানি খরচ অবশিষ্ট ছিল। এর পশ্চাতে ছিল একাধিক কারণ—

The simplest way to explain the financial mess that prime minister Narasimha Rao faced was that, by June 1991, India had enough foreign exchange reserves to pay for just two weeks of imports, while a minimum safe level was considered six times that amount—enough for at least three months' worth of imports. Manmohan Singh, a former professor of international trade, knew what awaited India. He would say that in 1982, Mexico defaulted on its external debt obligations. For the next six years it was crippled by capital flight, inflation and unemployment. By the time the crisis ended in 1989, real wages had been halved.

Three proximate causes had dwindled India's dollar reserves. The Gulf War of 1990 had trebled the price of oil which India was buying from the world market, and had also diminished remittances from Indians working in the Middle

East. The second reason was that Indians living abroad had withdrawn 900 million dollars' worth of deposits from Indian banks between April and June 1991, panicking at political uncertainty in Lutyens Delhi. A third form of pressure on India's foreign exchange reserves was due to reckless borrowing during the Rajiv years. Many of these were short-duration loans, and by 1991, they were due.

To avoid a default, Rao's predecessor as prime minister, Chandra Shekhar, had taken a loan from the IMF in early 1991. So low was the trust in India's ability to repay that the IMF had wanted India pledge her gold. That loan had not been enough to solve India's balance of payments crisis. By mid-1991, India was in need of a second tranche. The IMF refused.[২৫]

এইভাবে প্রকৃতপক্ষে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে মুক্ত অর্থনীতিকে মেনে নেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তবে সেই বিষয়টি যে বাজেটে পেশ করার কথা ছিল, তা প্রস্তুত করতে হয়েছিল অত্যন্ত গোপনে। পূর্বোক্ত গ্রন্থে সেই সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন—

Since the budget was a sensitive document that businessmen would pay money to know in advance, its preparation was shrouded in secrecy. In the weeks before 24 July, everyone working on the budget lived locked-down in a basement in North Block. They had to eat and sleep there, with no telephones to connect them to the world. Only a select few, such as the finance minister, were allowed in and out of the basement. The draft would remain secret until it was read out by Manmohan in Parliament on 24 July.[২৬]

এইভাবে বাজেটের যে চূড়ান্ত কপিটি ২১ শে জুলাইয়ের মধ্যে প্রস্তুত হয়েছিল, তা লেখকের মতে ছিল অত্যন্ত পথপ্রদর্শক একটি বাজেট—

> The final draft of the budget, ready by 21 July, was groundbreaking. It overhauled the import-export policy, better connecting India to the world market. It also slashed subsidies, and made foreign investment easier. The budget was going to shatter the third pillar of the licence-permit-quota raj: isolation of India from the global economy.[২৭]

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতার মুখে ছেড়ে দেওয়ার প্রতি জোরালো মতামত তৈরি হচ্ছিল অনেককাল থেকেই। সেই সূত্রগুলিকে ভারত সরকার ধীরে ধীরে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তবে এই প্রক্রিয়াটিও একদিনে ঘটেনি। সেটি যেভাবে ঘটেছিল, সেই ঘটনাপ্রবাহকে রামচন্দ্র গুহ তাঁর *গাঁধী-উত্তর ভারতবর্ষ* (অনু. আশীষ লাহিড়ী, আনন্দ, জুন ২০১৬) গ্রন্থে তুলে ধরেছেন—

> ১৯৮০-র দশকে ভারত সরকার বাস্তবিকই বাণিজ্যের প্রতি তার অনীহা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছিল। বেসরকারি ক্ষেত্রকে আগের তুলনায় উৎসাহ দেওয়া হল, শিল্পের মূল ক্ষেত্রগুলিকে লাইসেন্সের বন্ধন মুক্ত করা হল। এগুলি ছিল 'বাণিজ্যমুখী' পলিসি যার দৌলতে ভারতীয় শিল্প আরও উৎপাদনশীল ও লাভজনক হয়ে উঠল। তবে এইসব পলিসি ভারতীয় ও বিদেশি কারবারের প্রবেশ বা প্রস্থানের পথ থেকে সব বাধা দূর করে, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে ভোক্তার বাছাইয়ের ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ততর করে, 'বাজারমুখী' হয়ে ওঠার ঠিক কিনারে এসে থমকে গেল। ভারতীয় রাষ্ট্রের একটা বড়ো মাপের সংকট এসে তবে অর্থনীতিকে আরও ব্যাপক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে তোলার দিকে প্রণোদিত করল।
>
> সেই সংকটটি সরকারের বহিঃঋণের ক্রমবর্ধমান মাত্রার সঙ্গে জড়িত ছিল। বিশ্বব্যাঙ্কের মতো বহুপার্শ্বিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ভারত বহুকাল থেকেই ঋণ নিচ্ছিল। রাজীব গাঁধীর জমানায় বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার মাত্রাও অনেক দ্রুত বাড়ে। ১৯৯১-এর গ্রীষ্মকালে ঋণের পরিমাণ গিয়ে পৌঁছয় ৭০ বিলিয়ন ডলারে, যার শতকরা ৩০ ভাগ নেওয়া হয়েছিল বেসরকারি মহাজনদের কাছ থেকে। একটা পর্যায়ে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার কমতে কমতে দুই সপ্তাহের আমদানির উপযোগী হয়ে ওঠে।

> ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী হন নরসিংহ রাও।... রাজীব গাঁধীর মৃত্যুর পর তাঁকে যখন ঠেলেঠুলে একেবারে শীর্ষে বসিয়ে দেওয়া হল তখন তিনি এমন এক সাহসিকতার পরিচয় দিলেন যা তাঁর এতদিনকার চেনা স্বভাবের সঙ্গে একেবারে বেমানান। তিনি অর্থমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করলেন ড. মনমোহন সিংহকে (জন্ম-১৯৩২), যিনি একজন অরাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রবিদ, যিনি এর আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থসচিব ও গভর্নর হিসাবে কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি অর্থমন্ত্রীকে আপন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী যা উচিত মনে হবে তাই করবার স্বাধীনতা দিলেন।[২৮]

অর্থমন্ত্রী হিসাবে কাজের স্বাধীনতা পেয়ে ড. মনমোহন সিংহ যে যে পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন, সেগুলি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাহসিকতার নিদর্শন ছিল এমন নয়, বরং সেই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে দেশের সমকালীন অর্থনীতি তাঁকে একপ্রকার বাধ্যই করেছিল। তবে একথাও স্বীকার্য যে, বেশ কিছু বছর আগে তিনি তাঁর গবেষণাপত্রে মুক্তবাণিজ্য অর্থনীতিতে ভারতের অংশগ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। রামচন্দ্র গুহ এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> সরকারি কৃত্যকে যোগ দেওয়ার আগে মনমোহন সিংহ অক্সফোর্ডে এক ডি ফিল থিসিস লিখেছিলেন যাতে তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারতের উচিত আরও খোলা বাণিজ্য জগতে প্রবেশ করা। তাঁর এই থিসিস লেখা হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকে; এবার তিন দশক পরে তিনি তাঁর সেই সুপারিশগুলোকে কাজে পরিণত করার এই সুযোগ পেলেন। টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানো হল, আমদানির ওপর থেকে কোটা সরিয়ে দেওয়া হল, শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হল, রপ্তানিকে উৎসাহ দেওয়া হল এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হল। অভ্যন্তরীণ বাজারও খুলে দেওয়া হল—'লাইসেন্স-কোটা-পারমিট রাজ' বহুল পরিমাণে তুলে দেওয়া হল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসারণকে নিরস্ত করা হল।...
>
> ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে প্রণীত নতুন শিল্পনীতি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল যে 'এখন থেকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সকল শিল্পের জন্যই লাইসেন্স নেওয়ার প্রথা উঠে গেল, তার বিনিয়োগের মাত্রা যাই হোক না কেন।'... পরিষেবা ক্ষেত্রও বিনিয়ন্ত্রিত হল। বিমা, ব্যাঙ্কিং, দূরসংযোগ,

বিমানভ্রমণ প্রভৃতি যেসব ক্ষেত্র আগে প্রায় পুরোপুরিই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল, সেসব ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া হল।[২৯]

এইভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মুক্ত অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের সূত্রপাত ঘটেছিল। অবসান ঘটেছিল ‘লাইসেন্স-কোটা-পারমিট-রাজ’-এর। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। প্রাথমিকভাবে এতে কিছু সুফল পরিলক্ষিত হলেও বেসরকারিকরণের সুদূরপ্রসারী ফলাফল জনমুখী হয় নি। পরবর্তীকালে বহুল পরিমাণে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত বেসরকারি ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে শোষণমূলক হয়ে ওঠে।

মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়া কিংবা তার ফলে পুঁজি-পরিচালিত বিশ্বায়ন-ব্যবস্থার ঢেউ যে এক সব পেয়েছির দেশ নির্মাণ করতে পারেনি, তা বলাই বাহুল্য। বরং এক শ্রেণির অর্থনীতিবিদ কিংবা রাজনীতিকের আশঙ্কা সত্যি করে দেশের বাজারকে মুক্ত করে দেওয়ার বেশ কিছু বিপরীত পরিণামও দেখা গিয়েছিল—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইত্যাদি দেশে শেয়ার বাজারের উপর প্রত্যক্ষ সরকারি খবরদারি না থাকলেও শেয়ার বাজারের নিজস্ব চৌকিদারি কমিশন প্রতিটি লেনদেনের উপর নজর রাখে। আমাদের দেশে শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজদের ও অসাধু মহাজনদের প্রতিপত্তি প্রবল। সুতরাং সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার পরপরই একদিকে যেমন ফাটকাবাজিতে শেয়ারের দাম তুঙ্গে উঠল, তেমনি অসাধু ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীর যোগসাজসে ৫,০০০ কোটির বেশি টাকা উধাও হয়ে গেল (একে Bank Scam বলা হয়)। এই হাপিস করার পিছনে হর্ষদ মেহতার কারসাজি অনেকখানি কাজ করেছে সকলেই জানে কিন্তু নাটকের আসল অধিকারীর ভূমিকায় ছিল সিটি ব্যাঙ্ক, গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা ইত্যাদি গুটি কয়েক বিদেশী ব্যাঙ্ক। অসতর্ক বিশ্বায়ন নীতি যে কী বিপজ্জনক হতে পারে, এই তথাকথিত ব্যাঙ্কস্ক্যাম তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই স্ক্যাম এবং শেয়ার বাজারের বেলুনের মতো ফেঁপে ওঠা এবং দু বছরের

মাথায় চুপসে যাওয়ার ফলে হাজার হাজার মধ্য ও স্বল্পবিত্ত লোক তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় উবে যেতে দেখেছে।

নতুন আর্থিক নীতি চালু হওয়ার অব্যবহিত পরে শিল্পক্ষেত্রে বড়ো রকমের মন্দা দেখা দেয়। ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বেড়েছিল। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই কয় বছরের ভালো বৃষ্টিপাত। একমাত্র ১৯৯৫-৯৬ সালে কৃষিতে উৎপাদন কমে গিয়েছিল। শিল্পের অগ্রগতি ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত ভাল ছিল। এতে অনেকখানি অবদান ছিল দেশের ধনী ও মধ্যবিত্তের জন্য তৈরি নানা মডেলের গাড়ি, কাপড় ধোয়ার যন্ত্র, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদির। কিন্তু ১৯৯৭ সালের গোড়া থেকে শিল্পে মন্দাগতি দেখা দিয়েছে। অনেক গাড়ির উৎপাদন ও বিক্রি কমে গিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বছর ধরে রপ্তানির হার যে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেই গতিও অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে।[৩০]

সুতরাং দেখা গিয়েছিল যে, মুক্ত অর্থনীতি কিংবা বিশ্বায়ন-ব্যবস্থার কিছু আপাত সুফল প্রাথমিকভাবে দেখা গেলেও বৃহত্তরভাবে তা দেশের সাধারণ মানুষের জন্য অনিরাপদ হয়ে ওঠে। অধ্যাপক রতন খাসনবিশ তাঁর *বিশ্বায়ন ও ভারতবর্ষ: অর্থনীতির ইডিওলজি* (প্রগ্রেসিভ, মে ২০০৫) গ্রন্থে লিখেছেন—

পুঁজিবাদের ইডিওলজি যখন মুক্ত বাজারের জয়গান করে বিশ্বায়নের ধুয়া তুলেছে, তখনও আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্যে আছে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ।... এই ভণ্ডামির ইডিওলজি যখন তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রনীতিকে বিশ্বায়নের আদলে পুনর্গঠিত করে তখন তার মধ্যে যুক্ত হয় ভণ্ডামির আর একটি মাত্রা। রাষ্ট্রকে উন্নয়নের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় কিন্তু হস্তক্ষেপের রাজনীতির অবসান হয় না। হস্তক্ষেপ অবশ্যই ঘটে কিন্তু সেটি ঘটে উন্নতদেশের বিপরীত মুখে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে ওঠা অর্থনীতির বুনিয়াদটিকেই সংস্কারের নামে চুরমার করে দেওয়া হয়—পশ্চিমের দেশগুলিতে যা করবার কথা কোনো রাষ্ট্রনেতা কল্পনাও করতে পারে না। ভারতের বিশ্বায়ন কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। এদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল এজেন্ট ছিল রাষ্ট্র—রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ চাহিদাকে চাঙ্গা

রাখতো এবং তার ভরসায় বেসরকারি বিনিয়োগ তার বিনিয়োগ কর্মসূচী কার্যকর করতো। গত দশ বছর ধরে নিপুণ কায়দায় ক্রমাগত এই সরকারী বিনিয়োগের গতি কমানো হয়েছে। ১৯৯০-১৯৯১ সাল থেকে ২০০০-২০০১ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষিতে সরকারী বিনিয়োগ কমেছে ৪০.৩ শতাংশ, কয়লা উৎপাদনে ৬৬.৫০ শতাংশ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৫০ শতাংশ এবং ইস্পাত শিল্পে ৭৫ শতাংশ। জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে সরকারী পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ, যা থেকে সরকারী বিনিয়োগের সিংহভাগ এসে থাকে, সেটি কমেছে। ৭.০৬ শতাংশ থেকে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪.১৮ শতাংশে। এসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে কমেছে বেসরকারী বিনিয়োগের গতি।[৩১]

এই উদ্ধৃতি ও পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় ভারতে মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তারা বিশ্বায়নের সাফল্য নিয়ে যা দাবি করছিলেন, তার কিছু বিপরীত সত্যও রয়েছে।

১.৬॥

যে মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নিয়ে ভারত সরকার ১৯৯১ পরবর্তী কালে খোলাবাজার অর্থনীতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, বহুল পরিমাণে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল লাইসেন্স, কোটা, পারমিট রাজ, সেই অর্থনৈতিক নীতিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর শর্ত অনুযায়ী মেনে নিতে বাধ্য ছিল প্রতিটি রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম ছিল না। যদিও সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন ছিল মার্ক্সবাদী মতাদর্শী একাধিক দলের সমন্বয়ে গঠিত বামফ্রন্ট সরকার, এবং তাঁদের ঘোষিত নীতি ছিল পুঁজিবাদের বিরোধিতা, তবুও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরে থাকার কারণে তাঁরা মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নিতে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর (১৯১৪-২০১০)[৩২] মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে (২১/০৬/১৯৭৭—০৫/১১/২০০০) এই বিষয়টি সরকারিভাবে মেনে নিতে বাধ্য হলেও দলগতভাবে তাঁরা পুঁজিবাদের বিরোধিতা বজায় রেখেছিলেন। মিটিং

মিছিল বা অন্যান্য উপায়ে গণ আন্দোলনে তাঁরা পুঁজিবাদের ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার প্রচেষ্টা জারি রেখেছিলেন। পাশাপাশি কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীগণ ধারাবাহিক লেখালিখির মাধ্যমে মুক্ত অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের কুপ্রভাব সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত রেখেছিলেন। কিন্তু জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের ফলে একের পর এক কলকারখানা যখন বন্ধ হতে শুরু করেছিল, হাজার হাজার শ্রমিক এবং তাঁদের উপরে নির্ভরশীল মানুষজন যখন খাদ্য ও আশ্রয়ের নিরাপত্তা থেকে চ্যুত হচ্ছিলেন, তখন থেকে বামপন্থী দলগুলি একতরফাভাবে পুঁজির বিরোধিতা থেকে সরে এসে কিছুটা ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করে। জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বকালের শেষ দশ বছর (১৯৯১—২০০০) বামফ্রন্ট সরকারকে বিশ্ববাণিজ্যনীতির সঙ্গে অনেকাংশে আপস করতে হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতির কারণে। এরপর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (জন্ম-১৯৪৪)[৩৩]। সংস্কৃতিমনা এবং প্রগতিশীল বামপন্থী এই মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকালে (০৬/১১/২০০০—১৩/০৫/২০১১) বামপন্থী দলগুলির অভ্যন্তরে বিবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি শিল্প অর্থনীতি ও পুঁজির অগ্রসরণে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এরই পাশাপাশি বাঙালি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের স্বপ্নপূরণে খুব দ্রুতহারে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে প্রচুর বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। মেডিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রেও খুব দ্রুত বেসরকারি পুঁজি শিকড় চারিয়ে দিতে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। সম্পন্ন অভিভাবকগণ বিপুল ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে সন্তানদের ডাক্তারি পেশায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এর আগে পর্যন্ত বাঙালি পড়ুয়ার ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দক্ষিণভারতের রাজ্যগুলি ছিল গন্তব্য। এই সময় থেকে নিজরাজ্যেই পড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এই ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো পেশাভিত্তিক শিক্ষাপ্রচেষ্টা এমনি এমনি

জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। মুক্ত অর্থনীতির হাত ধরে বিদেশি পুঁজি ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করার পর বিনিয়োগের যে যে ক্ষেত্রগুলি বিকশিত হয়েছিল, তার অন্যতম ছিল তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্র। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও সরকারি ব্যবস্থাপনার উপরে মানুষ আর ভরসা রাখতে পারছিল না। সরকার পরিচালিত চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে অভিজ্ঞতা ও মেধাসম্পন্ন অনেক চিকিৎসক থাকলেও জনসংখ্যার বিচারে তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। এছাড়া পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের একাংশের অনীহা জনগণকে বিকল্পের সন্ধানে ব্যাপৃত রেখেছিল। ফলে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য সবসময়েই একটি দক্ষিণভারতমুখী ভিড় লেগেই থাকত। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে পুঁজির সম্প্রসারণের ফলে প্রচুর পরিমাণে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম তৈরি হয়। প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রচুর চিকিৎসক, সহায়ক কর্মী এবং সেবিকাসমূহের। এর সঙ্গে বিকাশ ঘটে বিমা ক্ষেত্রের। চিকিৎসা পাওয়ার প্রয়োজনে, কিংবা মৃত্যুজনিত কারণে বিমার আওতায় আসার হার অনেক বেড়ে যায়। চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশায় প্রচুর মানুষের প্রয়োজন হয়। তৈরি হতে থাকে নার্সিং কলেজ, কিংবা মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানের পাঠ্যক্রমে ভিড় বাড়তে থাকে প্রচলিত বিষয়সমূহ পড়বার বদলে। এ ছাড়াও ব্যবস্থাপনা বিদ্যা (Management) পড়ার চাহিদাও সারা ভারতের প্রেক্ষিতে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কারণ বেসরকারি বিনিয়োগে যত ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছিল সেগুলিকে লাভজনক উপায়ে চালানোর লোক দরকার হয়ে পড়ছিল।

শুধুমাত্র শিক্ষা, চিকিৎসা কিংবা ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনাময় তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ দেশি বিদেশি বিনিয়োগ এসে পড়ে। ১৯৯৫ সালে ভারতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটেছিল, অচিরেই তা গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়তে থাকে। দেশি এয়ারটেল কিংবা বিদেশি হাচ কোম্পানি মোবাইল পরিষেবা দেওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। পাশাপাশি কিছু পরে রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিফোন সংস্থা

বি.এস.এন.এল. বা এম.টি.এন.এল. ও এই দৌড়ে পিছিয়ে ছিল না। এর সঙ্গে ভারতে দরকার হয়ে পড়েছিল বিপুল পরিমাণে মোবাইল হ্যান্ডসেটের। এই কারণে ফিনল্যান্ড, কোরিয়া, জাপান ও চিন সহ অন্যান্য দেশ থেকে পুঁজিপতিরা ভারতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার বাজারটি ধরতে তৎপর হয়ে ওঠেন। দেশীয় টাটা এবং পরবর্তীকালে রিলায়েন্স গোষ্ঠীও এই বাজারে অংশগ্রহণ করে। এরপর কিছুটা একচেটিয়াভাবে আসতে থাকে চিনা বিনিয়োগের ঝড়। মোবাইল পরিষেবা শুরুর পরবর্তী দশ বছরে দেশের মধ্যবিত্ত তথা নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের হাতে তা পৌঁছে যায়। তারও পরবর্তী দশ বছরে দেশের নিম্নবিত্ত জনগণের হাতেও মোবাইল পরিষেবা পৌঁছে গিয়ে উৎপাদনক্ষেত্রে তা প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এর পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবস্থার প্রসার পরিষেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা আনার পাশাপাশি উপভোক্তা বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়ে ওঠে।

১.৭॥

ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিশ্বায়ন দেখা গিয়েছিল, তার ভিত্তিভূমির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটি ১৯৮০-র দশক থেকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই কাজ যাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ত্বরান্বিত হয়েছিল তাঁর নাম সত্যনারায়ণ গঙ্গারাম পিত্রোদা বা সংক্ষেপে স্যাম পিত্রোদা (জন্ম-১৯৪২)। এই ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল ও সুদূরপ্রসারী অবদানের জন্য তাঁকে ভারতীয় টেলিযোগাযোগ বিপ্লবের জনক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ওড়িশার টিটলাগড়ে জন্মগ্রহণকারী সত্যনারায়ণ পড়াশোনার জন্য গুজরাটে প্রেরিত হন, কারণ তাঁর পরিবার গভীরভাবে গান্ধিজীর জীবনদর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি গুজরাটের বদোদরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্স ও ইলেক্ট্রনিক্স-এ এম.এসসি করার পর আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম.এসসি পাস করেন। ১৯৭৫ সালে ইলেকট্রনিক ডায়েরি আবিষ্কারের কারণে তাঁকে মনে করা হয় তিনি হস্তধৃত কম্পিউটারের পথপ্রদর্শক। ১৯৭৪ সালে তিনি যোগ দিয়েছিলেন 'ওয়েসকম সুইচিং'-এ। এটি ছিল প্রথমদিকের সুইচিং কোম্পানিগুলির অন্যতম। চার দশকের বেশি সময় ধরে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে থাকাকালীন পিত্রোদা টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে বহু পেটেন্টের অধিকারী হন। সাম্প্রতিক এই সংক্রান্ত পেটেন্ট ছিল মোবাইল ফোন ভিত্তিক অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রযুক্তি বিষয়ক।[৩৪]

এহেন স্যাম পিত্রোদা ইন্দিরা গান্ধি ও রাজীব গান্ধির[৩৫] সঙ্গে প্রায় একদশক কাটিয়েছিলেন ভারতের তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের নির্মাতা হিসাবে। তাঁর কাজ ছিল দেশের প্রতিটি প্রান্তে প্রত্যন্ত গ্রামে ডিজিট্যাল সংযোগ পৌঁছে দেওয়া। এজন্য তিনি 'C-DOT' বা Centre for the Development of Telematics নামক সংস্থা নির্মাণ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা হিসাবে (জল, সাক্ষরতা, অনাক্রম্যতা, তৈলবীজ উৎপাদন, টেলিকম ও দুগ্ধশিল্প বিষয়ে) কাজ করেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন ভারতের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ২০০৪ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতে এসে তিনি ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের চেয়ারম্যান (২০০৫-২০০৯) এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা হন।

১৯৮১ তে ভারতে এসে তিনি দেখেছিলেন যে তাঁর আমেরিকায় বসবাসকারী পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলা এক দুরূহ ব্যাপার। এজন্য তিনি ভারতের টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রটিকে আধুনিক করে তুলতে উদ্যোগী হলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি কর্তৃক ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমন্ত্রিত হলেন। দেশে ফিরে তিনি 'C-DOT' প্রতিষ্ঠা করলেন। এটি ছিল একটি স্বায়ত্তশাসিত টেলিকম গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা। ইন্দিরা গান্ধির পর তিনি রাজীব গান্ধির

উপদেষ্টা নির্বাচিত হন এবং হয়ে ওঠেন ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক টেলিকমিউনিকেশন নীতির রূপায়ক।

ভারতে নব্বইয়ের দশকের কিছু আগে থেকে যে ব্যক্তিদের উদ্যোগে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা যে দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হতে থাকে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন স্যাম পিত্রোদা। মূলত তাঁর পরিচালনাতেই এই দশকে আবির্ভাব হয় হলদে রঙের পিসিও বুথের, যার সাহায্যে জনগণ সস্তায় দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বিদেশে কথা বলতে শুরু করে। পরবর্তীকালে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার যে দ্রুত অগ্রগতি ভারতের অভ্যন্তরে ঘটেছিল, তার ভিত্তি হিসাবে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৩৬]

টেলিকম ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত বৃদ্ধির ব্যাপারটি অবশ্যই দেশের উন্নতির পরিচয় দেয়। মোবাইল ফোন আসার পরে কম খরচে সংযোগ উৎপাদনের ক্ষেত্রটিকে বহুগুণ ত্বরান্বিত করেছিল। যোগাযোগ করার জন্য আগে যে বহুল পরিমাণে ব্যয় হত, সেই ব্যয় অত্যন্ত কমে যায়। এরফলে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, পাশাপাশি যোগাযোগের ব্যয় কমে গিয়েছিল অভূতপূর্বভাবে। এইপ্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে যে টেলিকম ক্ষেত্রে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা ছিল বেসরকারি কোম্পানিগুলির অংশগ্রহণে ও প্রভাবে, আর এই বিস্ফোরণ ঘটেছিল মূলত মোবাইল ফোনের জগতে; ল্যান্ডলাইন টেলিফোনের ক্ষেত্রে নয়।

১৯৯৯ সালের ৩রা মার্চ ভারত সরকার দ্বারা ঘোষিত নিউ টেলিকম পলিসির মাধ্যমে জানা যায় যে রাজীব গান্ধির শাসনকালের দশ বছর পরে দেশে দশ লক্ষ মোবাইল গ্রাহক ছিলেন। ১৯৮৯-১৯৯৯ এই দশ বছরে টেলি ডেনসিটি (দূরভাষ-ঘনত্ব) ০.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২.৮ শতাংশ। ২০১২ সালের অক্টোবরে গিয়ে গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ কোটিতে। ১৯৯৯-২০১২

পর্বে ২.৮ শতাংশ থেকে টেলি-ডেনসিটি বেড়ে দাঁড়ায় ৭০ শতাংশ। এর দ্বারাই বোঝা যায় কীরকম দ্রুত হারে এই ক্ষেত্রটি প্রসার লাভ করেছিল। অবশ্য কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরবিন্দ পানাগড়িয়া (জন্ম-১৯৫২) তাঁর *India: The Emerging Giant* (2008) বইতে টেলিকম বিপ্লবের কৃতিত্বের দাবিদার হিসাবে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী (১৯২৪-২০১৮)-র কথা তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তুলে এনেছেন বাজপেয়ী জমানায় টেলিকম ক্ষেত্রকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আসার প্রচেষ্টাকে। যার অন্যতম প্রকাশ ছিল ২০০০ সালের ১লা অক্টোবরে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের (BSNL) প্রতিষ্ঠার ঘটনা। অটলবিহারী বাজপেয়ী এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন BSNL কে কর্পোরেট সংস্থায় পরিণত করার মাধ্যমে। এই কাজে তাঁর বিরোধিতা করে হরতাল ডেকেছিল ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশনের চার লক্ষ কর্মী। বাজপেয়ী সরকার কর্মীদের দাবিদাওয়া মেনে নিলেও মূল সংস্কারপ্রস্তাব থেকে সরে আসেন নি। ২০০০ সালের ১৫ই আগস্ট দেশের অভ্যন্তরে দূরবর্তী স্থানগুলিতে টেলিফোনে যোগাযোগের ক্ষেত্রটিতে সীমাহীন প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করা হয়। এর সঙ্গে ২০০০ সালে যশবন্ত সিংহ যে বাজেট পেশ করেন তাতে বিদেশ থেকে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। বিদেশে ফোন করার ক্ষেত্রে বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেডের (VSNL) একচেটিয়া প্রাধান্য কমিয়ে আনা হয়।[৩৭] টেলিকম ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য কীভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল তা বুঝতে অরবিন্দ পানাগড়িয়াকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> To offer some sense of the magnitude of the success India has achieved in the telecommunications sector, consider the following facts. India had barely 5.1 million telephones *in aggregate* in 1991. In contrast, it added 5.2 million telephones *per month* during the year ending on November 30, 2006. Even at this

high average rate, growth had been accelerating at the margin, with the number of new telephones during the month of November 2006, at 6.75 million, exceeding the monthly average in the preceding year by a wide margin.

In aggregate, India had 183.5 million telephones as of November 30, 2006, with the nationwide tele-density reaching 16.3 percent. Between 1998 and 2005, urban tele-density rose from 5.8 to 33 percent, and rural tele-density from 0.4 to 2 percent. In terms of price, as of March 1, 2006, customers could call anywhere in India for one rupee (2 cents) per minute, using fixed-line service offered by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), the public sector telephone company. Private sector companies such as Reliance offer similar, even cheaper, services though their networks.[৩৮]

টেলিকম ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য যে ১৯৯১ সালের পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল, এই উদ্ধৃতি থেকেই তা বুঝে নেওয়া যায়। তবে ভারতের এই ক্ষেত্রটিতে তথাকথিত সেই 'সাফল্য' দ্রুতগামী ছিল নাগরিক ভারতীয়দের জন্য। সেখানে টেলি-ডেনসিটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেলেও গ্রাম-ভারতের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেনি। সেখানে খুব শ্লথ গতিতে সেটি এগিয়েছিল। এ থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির নিরিখেও বিশ্বায়নের অসাম্যের দিকটি আর একবার প্রকট হয়ে ওঠে।

১.৮॥

ভারতীয় টেলিকম ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিপিও শিল্প দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় অন্য কোনো দেশে এই পরিমাণ ফোনের কানেকশন নেই।

এই প্রাচুর্য বিপিও শিল্পের সূত্রপাত ঘটাতে সাহায্য করেছিল ১৯৯৯ সাল নাগাদ। ১৯৯৯ সালেই নতুন টেলিকম বিধি প্রণয়ন করে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেডের একচেটিয়া আধিপত্য কমিয়ে ফেলা হয়। বিদেশি কোম্পানিগুলি এর পাশাপাশি প্রতিযোগিতার বাজারে নেমে পড়ে। ফলে দ্রুত কমতে থাকে বহির্ভারতীয় ক্ষেত্রে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগের খরচ। অন্যদিকে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলি স্বল্প খরচে তাদের শিল্পের একাংশকে আউটসোর্স করতে উদ্যোগী ছিলেন। কারণ নিজভূমে সেই কাজ একজন স্বদেশীয় কর্মীর দ্বারা করাতে একজন ভারতীয় কর্মীর তুলনায় অনেক বেশি বেতন দিতে হত। এই কারণে মার্কিন কোম্পানিগুলি তাদের শিল্পের একটি অংশ ভারতের মতো দেশে আউটসোর্স করে দিতে শুরু করেছিল।[৩৯] কারণ ভারতে এই কাজ করার জন্য ছিল ইংরেজি বলতে পারা এবং কম্পিউটারে দক্ষ অল্পবয়স্ক কর্মীর প্রাচুর্য, যারা তুলনামূলকভাবে অনেক কম বেতনে কাজ করবে। কিন্তু কী এই আউটসোর্স? জানা যাচ্ছে—

> Outsourcing is the business practice of hiring a party outside a company to perform services and create goods that traditionally were performed in-house by the company's own employees and staff. Outsourcing is a practice usually undertaken by companies as a cost-cutting measure. As such, it can affect a wide range of jobs, ranging from customer support to manufacturing to the back office.
>
> Outsourcing was first recognized as a business strategy in 1989 and became an integral part of business economics throughout the 1990s. The practice of outsourcing is subject to considerable controversy in many countries. Those opposed argue it has caused the loss of domestic jobs, particularly in the manufacturing sector. Supporters say it creates an incentive for businesses and

companies to allocate resources where they are most effective, and that outsourcing helps maintain the nature of free market economies on a global scale.[৪০]

অর্থাৎ আউটসোর্সের মাধ্যমে কোনো কোম্পানি নিজেদের কর্মীদের বদলে দক্ষ পেশাদার দলকে নিযুক্ত করে অপেক্ষাকৃত কম খরচে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অনিন্দ্য ভুক্ত তাঁর 'উৎপাদনের বিশ্বায়ন' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন—

...কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি অংশের কাজের বরাত অন্যের হাতে তুলে দেবার নামই আউটসোর্সিং। অর্থাৎ, উৎপাদন আর চার দেওয়ালের সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকছে না, তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরে। আর বাইরে বলতে যখন দেশের সীমানা টপকে বাইরের বিশ্বের কথা বলা হয় তখন কিন্তু তার একটি আলাদা নাম আছে, অফশোরিং। বর্তমানে আউটসোর্সিং বলতে কিন্তু এই অফশোরিংকেই বোঝানো হচ্ছে।[৪১]

১৯৯০-এর দশকের আগে যে আউটসোর্সিং হত, তাতে কোনো দেশ কোনো পণ্যের অংশবিশেষকে অন্য দেশ থেকে নির্মাণ করিয়ে আনত। কিন্তু এই দশক থেকে ধারণাটা পাল্টাতে থাকে। যে পরিষেবাগুলির ক্ষেত্র তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর, সেগুলিকেই বহুলভাবে বাইরে থেকে করিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। এজন্যই এর নাম হয়ে উঠেছিল বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা সংক্ষেপে বিপিও। আর উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে কোম্পানিগুলির স্বাভাবিক গন্তব্য হয়ে উঠেছিল ভারতের মতো রাষ্ট্র, যেখানে পাশ্চাত্যের দেশগুলির তুলনায় গড় মজুরি ৭০-৮০ শতাংশ কম। উপরন্তু আউটসোর্সিং করা কাজ দ্রব্যমূল্য বাড়লেও নির্ধারিত চুক্তিমূল্যেই গ্রহীতা কোম্পানিগুলি করে দিতে বাধ্য থাকে বলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে হয় না। এইসমস্ত কারণে ভারতে বিপিও শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনিন্দ্য ভুক্ত তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন—

২০০২-০৩ সালে এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল ১.৮০ লক্ষ এবং এই শিল্প থেকে রপ্তানী বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ২৪৮ কোটি ডলার। ২০০৪-০৫ সালে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে, অংকদুটি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩.৪৮ লক্ষ এবং ৫০৯.৫০ কোটি ডলারে। এই বৃদ্ধির অস্বাভাবিক হার এখনও অব্যাহত। বৃদ্ধির বাৎসরিক গড় হার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ।[৪২]

ভারতের বিপিও শিল্পের বৃদ্ধি ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারণে। ভারতের বিপিও শিল্পের আয়ের ষাট ভাগেরও বেশি আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এর পালটা প্রভাবে সেদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে আউটসোর্স বন্ধ করা।[৪৩]

ভারতে বিপিও শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটাচ্ছিল ইংরেজি ভাষা ও কম্পিউটার জানা তরুণ প্রজন্ম, যাদের বয়স কুড়ির আশেপাশে। বয়সগত শারীরিক ক্ষমতা এইকাজে তাদের সহায়ক হচ্ছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিচ্ছিল এর আড়ালে। দ্রুত এই ধরনের চাকরি করার লক্ষে তরুণ প্রজন্ম দীর্ঘদিন ধরে উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথে না গিয়ে চটজলদি অল্প শিখে এইসব কাজে ঢুকে যাচ্ছিল। এতে দেশের সুদূরপ্রসারী ক্ষতি হচ্ছিল। পাশাপাশি তরুণ এই প্রজন্ম দ্রুত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর পরিণতি কী, সে সম্পর্কে তাদের ভাবনা ছিল না। ফলে তারা দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল দুই দেশের মিশ্র সংস্কৃতিতে। এর ফলে ভারতের স্থানীয় সংস্কৃতি যেমন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনি মার্কিনী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রাস করে নিচ্ছিল এই তরুণ ভারতীয় জনসংখ্যাকে। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে এর ফলে একধরনের শৃঙ্খলাহীন সমাজ তৈরি হতে পারে।[৪৪]

১.৯॥

বিশ্বায়নের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের নগরগুলিতে যত দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল, গ্রামগুলিতে তার প্রসার ছিল সেই তুলনায় ধীরগামী। এর কারণ হিসাবে গ্রামীণ এলাকায় সচ্ছল উপভোক্তার অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করা যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামগুলির মতো পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিও ছিল উন্নয়নের পরিকাঠামো থেকে বঞ্চিত। যথাযথ রাস্তাঘাট এবং বিদ্যুতায়নের অভাবে বিশ্বায়নের ফলাফল থেকে দেশের সিংহভাগ মানুষ বঞ্চিত ছিল। মোবাইল, ইন্টারনেট পরিষেবা কিংবা তার উপরে নির্ভরশীল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এই কারণে দেশের প্রান্তে বহুদিন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন কিংবা রাস্তা নির্মাণের মতো পরিকাঠামোর উন্নয়ন যে বহুদিন পর্যন্ত ব্যাহত ছিল, তার কারণ এই ক্ষেত্রগুলিতে বেসরকারি পুঁজির বিনিয়োগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ পরিষেবায় বেসরকারি পুঁজির আগমন ঘটলেও তা মূলত ছিল নগরকেন্দ্রিক।

পুঁজির প্রভাব সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে দেশব্যাপী দ্রুত পণ্যবাহী যান চলাচলের সুবিধার্থে সরকার রাস্তাঘাট নির্মাণে জোর দিয়েছিল। বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী (১৯২৪-২০১৮)-র[৪৫] কার্যকালে (১৯৯৮-২০০৪) এজন্য সোনালি চতুর্ভুজ[৪৬], প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা[৪৭] কিংবা ভারতমালা[৪৮] প্রকল্প চালু করা হয়। সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্পের ফলস্বরূপ ২০০১-২০১২ সালের মধ্যে ষাটহাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮৪৬ কিলোমিটার উন্নতমানের রাস্তা তৈরি করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রাস্তা ছিল চার থেকে ছয় লেনের। দেশের চার প্রান্তের চারটি মেগাসিটিকে এই রাস্তাগুলি দিয়ে জোড়ার পাশাপাশি অসংখ্য ছোটো শহরকেও এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা দ্বারা দেশের গ্রামগুলিকে সমস্ত আবহাওয়ায় টেঁকসই মজবুত রাস্তা দ্বারা জুড়ে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের অধীনে ২০০০-২০১৭ পর্বে কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল কৃষিজাত পণ্য

দ্রুত বাজারে আনা এবং বেশিরভাগ রাস্তাকে এজন্য ট্রাক চলাচলের উপযোগী করে তোলা। ভারতমালা প্রকল্পে জুড়ে দিতে চাওয়া হয়েছিল গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, জম্মু, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত অঞ্চল হয়ে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ থেকে অরুণাচলপ্রদেশ পর্যন্ত। এই প্রকল্পে মোট ৮৩,৬৭৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই রাস্তা নির্মাণের প্রকল্পগুলির সূচনাকাল পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, তা আসলে মুক্ত অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এর ফলে প্রান্তিক মানুষের দরজাতেও পুঁজি পৌঁছে গিয়েছিল।

দেশের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রভাব এসে পড়েছিল। যদিও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব কলকাতাকেন্দ্রিক, তবুও তার প্রভাব চুঁইয়ে পৌঁছিয়েছিল ছোটো শহর কিংবা মফস্বলেও। কলকাতার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যে বড়ো বড়ো উড়ালপুল নির্মাণ, যেগুলির দ্বারা অল্প সময়ে পৌঁছে যাওয়া যায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কিংবা বিমান বন্দরে। দেখা গিয়েছিল মেট্রো রেলের অগ্রগতি, যা এখনো ঘটে চলেছে। আর তার মাধ্যমে কলকাতা সংলগ্ন আরও বৃহৎ এলাকা সংযুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে। রাস্তার পাশে তৈরি হয়েছে লক্ষ লক্ষ বর্গফুটের ঝাঁ চকচকে শপিং মল। সেখানে পসরা সাজিয়েছে দেশি বিদেশি সব কোম্পানি। সমগ্র কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে শত শত শপিং মল তৈরি হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া চলমান। শুধুমাত্র শপিং মলই নয়, তৈরি হয়েছে ডিস্ক, পাব, তন্ত্র প্রভৃতি বল্গাহীনভাবে জীবনকে উদযাপন করার জায়গা। আর এই সবকিছুর সঙ্গেই দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে উঠছে অল্পবয়সী প্রজন্ম। তারা যত সহজে এই সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে পেরেছে, তত সহজে আপন করে নিতে পারেন নি চল্লিশোর্ধ বয়সের প্রজন্ম। তাঁদের মধ্যে বিশ্বায়ন এবং তার ক্রেতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একধরনের মানসিক রোধ তৈরি হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের মতো তাঁরা আপন করে নিতে পারেন নি এই সংস্কৃতিকে। তাই ভারতের পটভূমিতে বিশ্বায়ন এখনো পর্যন্ত

একটি মিশ্র প্রজন্মের উপরে ক্রিয়াশীল। আগামী সময়ে পুরানো প্রজন্মের অপসারণ একটি সম্পূর্ণ বিশ্বায়িত প্রজন্মকে রেখে যাবে।

১.১০॥

বিশ্বায়নের ফলে দ্রুত বদলে গিয়েছে কর্মসংস্কৃতি। বদলে গিয়েছে মানুষের জৈব ঘড়িও। অফিসে কাজের শেষে বাড়ি ফিরেও তাকে কাজ করতে হচ্ছে সারারাত। যেমন ধরা যায় বিপিও শিল্পের কাজ। আমেরিকায় যখন দিন, ভারতে তখন রাত্রি। সেজন্য আমেরিকার কর্মমুখর সময়ে তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে রাত্রিতেও এদেশের কর্মচারীকে সঙ্গত দিতে হয়। এই কর্মপ্রবণতা আমেরিকা ছাড়াও অন্য দেশের সঙ্গেও হতে পারে। এই ধরনের কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কর্মস্থল থেকেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। খাদ্য, ঘুম কিংবা বিনোদন, কোনোটিই আর নিয়ম মেনে গ্রহণ করতে পারছে না সে। এর ফলে মানুষের সম্পর্কসমূহের মধ্যে বদল আসছে। কমে যাচ্ছে সম্পর্কের উষ্ণতা। সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্কগুলি আস্তে আস্তে জটিল আকার ধারণ করছে। সুকুমার প্রবৃত্তিসমূহ, শখ, বিনোদন ইত্যাদি সবই পরিবর্তিত রূপ নিচ্ছে।

বিশ্বায়নের ফলে দ্রুত বদলে গিয়েছিল বিনোদনের জগৎটিও। ১৯৫৯ সালে পথ চলতে শুরু করা ভারতের সরকারি দূরদর্শনের মুষ্টিমেয় চ্যানেলের পাশাপাশি ১৯৯৩ সাল থেকে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বেসরকারি চ্যানেলের প্রবেশ ঘটে। আর এই ব্যবস্থার হাত ধরে দ্রুত বিদেশি চ্যানেলসমূহও এসে হাজির হয়। ১৯৬২ সালে যে ভারতে মাত্র ৪১টি টেলিভিশন সেট ছিল, ১৯৯৫ সালে গিয়ে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ কোটি, দর্শক সংখ্যা পৌঁছায় ৪০ কোটিতে আর চ্যানেলের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করে যায়।[৪৯] ১৯৯৫ সালের ৩১ শে জুলাই ভারতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের

সূত্রপাত হয়, আর তার সাক্ষী থাকে কলকাতা। মোদী-টেলস্ট্রা নামক প্রথম মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাটি ছিল ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মোদী ও টেলস্ট্রা কোম্পানির যৌথ উদ্যোগ। ২০15 সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতে টেলিফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে, যার নব্বই শতাংশের উপরে মোবাইল ফোন। ১৯৯৫ সালেই প্রথম দেশের সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য চালু হয় ইন্টারনেট পরিষেবা। কম্পিউটার প্রবেশ করে ব্যক্তি মানুষের কর্মহীন হয়ে পড়ার ভয়কে উপেক্ষা করে। দ্রুত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই কম্পিউটার ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমানে দেশের ৪১ শতাংশ মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করেন। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে ১২১ কোটিতে।[৫০] এর ফলে মানুষের বিনোদন ও মননের ক্ষেত্রে এসেছে অভিনব পরিবর্তন। টিভি চ্যানেলের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বহুজাতিক সংস্থাসমূহের বিজ্ঞাপনের প্রভাব। বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে এসেছে পপ মিউজিক, ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছে একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া। মানুষের অন্তর্গত প্রকৃত বন্ধুত্বের স্থান নিয়েছে সামাজিক মাধ্যমের কৃত্রিম বন্ধুত্ব। বৃদ্ধি পেয়েছে ফাস্ট ফুডের চাহিদা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের জগতের স্থানিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গিয়ে মানুষের পাতটিও খাদ্য বৈচিত্র্যের নিরিখে বিশ্বায়িত হয়ে উঠেছে। হ্যাম, বার্গার, কেক, পেস্ট্রি কিংবা পিৎজা মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যজগতের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। রেডিমেড খাবারের পাশাপাশি দ্রুত তৈরি করা যায় এবং দ্রুত খাওয়া যায়—এমন খাবারের চাহিদা এসময় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাল্লা দিয়ে শহরগুলিতে বেড়ে গিয়েছে অগণিত রেস্তোরাঁ। সেখানে নানাদেশের খাদ্যসম্ভার সচ্ছল ক্রেতাদেরকে স্বাগত জানাতে সদাপ্রস্তুত। এই ধরনের বহুজাতিক কোম্পানিগুলি শুধুমাত্র একটি দুটি নয়, তাদের বিপণির চেন বা শৃঙ্খল তৈরি করেছে সারা পৃথিবীতে। আর তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বায়নের হাত ধরে। মুক্ত অর্থনীতির জোয়ারে বিশ্বায়ন প্রবেশ করার আগে পর্যন্ত মানুষ অচেনা

জায়গায় খিদে পেলে তবেই হোটেলে খেতে যেত। বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে ক্ষুধার সঙ্গে খাদ্যের এই সরাসরি সম্পর্কটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের খাদ্যগ্রহণ আর ক্ষুধার অপেক্ষা রাখে না। শুধুমাত্র খাওয়ার গন্তব্যে অন্য কাজ ব্যতিরেকে মানুষ এই রেস্তোরাঁগুলিতে পৌঁছায়। কে কী খাচ্ছেন, তার উপরে নির্ভর করে তাঁর সামাজিক সম্মান। সেই অর্থে মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের ব্যাপারেও নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন।

বিশ্বায়ন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংস্কৃতির পাশাপাশি পানীয়ের জগৎ কিংবা মানুষের পানাভ্যাসও বদলে দিয়েছিল। আগে নরম পানীয় বিভিন্ন ধরনের সরবতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে সেই সীমা বহুগুণ বেড়ে যায়। বহুজাতিক পানীয় কোম্পানিগুলি তাদের নানাবিধ পানীয়ের সম্ভার নিয়ে ভারতের বাজারে প্রতিযোগিতার আসরে নেমে পড়ে। আর এগুলি জনপ্রিয় করে তুলতে বিনোদন কিংবা খেলা—সবরকমের টিভি চ্যানেলে দেখানো হতে থাকে বিপুল পরিমাণে বিজ্ঞাপন। জীবন মানেই যে এইসব পণ্য—এই কথাটি বারবার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জোর করে গেঁথে দেওয়া হয় জনমানসে। 'এ দিল মাঙ্গে মোর', 'আই ওয়াণ্ট মাই থান্ডার' বা 'ঠাণ্ডা মতলব কোকাকোলা' প্রভৃতি ক্যাচলাইনগুলি পণ্যকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি উস্কে দিয়েছিল উপভোক্তার পিপাসাকে। প্রকৃতপক্ষে উপভোক্তা নয়, এই পিপাসা ছিল পেপসি, থাম্বস আপ কিংবা কোকাকোলা কোম্পানির বাজার দখলের পিপাসা। ১৯৯০ এর দশকের দ্বিতীয় ধাপে এই কোম্পানিগুলির ব্যবসা ভারতের বাজারে দ্রুত বাড়তে থাকে।[৫১] সাধারণ পানীয় জলকে প্রতিস্থাপিত করে এই নরম পানীয় দ্রুত দখল করে ফেলে দেশের বাজার। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই পানীয়সমূহ পান করার হাতছানি আকর্ষণ করতে থাকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মনোযোগ। বিজ্ঞাপনী ভাষার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, বিশ্বায়নের বৃত্তে প্রবেশের অন্যতম ছাড়পত্র আন্তর্জাতিক এই পানীয়কে গ্রহণ। খুব দ্রুত এই ধরনের পানীয় হয়ে

ওঠে তারুণ্য, আগ্রাসন কিংবা জীবনকে উপভোগ করার প্রতীক, যার মাধ্যমে বিশ্বায়িত সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের একরকম অনুভূতি তৈরি করা হয়। পাশাপাশি প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অভিজাত বৃত্ত থেকে শুরু করে সাধারণের বৃত্তেও ছড়িয়ে পড়ে অসম্ভব দ্রুত গতিতে। এই ব্যবসায় আসলে পানীয় জল নয়, কোম্পানিগুলি মানুষের কাছে বিক্রি করছিল বিশুদ্ধতা ও জীবাণুমুক্ততার আশ্বাস। আর তারা এই কাজ সফলভাবে করতে পেরেছিল, তার পশ্চাতে ছিল দেশের সরকারের তরফ থেকে জনগণকে নিরাপদ পানীয় জল না দিতে পারার অক্ষমতা।

১.১১॥

শিক্ষা, চিকিৎসা, তথ্যপ্রযুক্তি, বিনোদন, খাদ্য বা পানীয়ই নয়, বিশ্বায়ন-পরবর্তী ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে মানুষের পোশাক আশাকের ধরনও বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছিল। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের দুনিয়া মানুষের ফ্যাশনের বোধকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। ইতোপূর্বে সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির দ্বারা মানুষের পোশাকভাবনা নিয়ন্ত্রিত হত। বিশ্বায়নের ফলে শুধুমাত্র বলিউড নয়, হলিউডের পোশাকের নিত্যনতুন পরিবর্তন পোশাকের রীতিতে বদল ঘটিয়ে দিয়েছিল। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছিল পোশাকের বিপণির সংখ্যা। বিদেশ থেকে সস্তায় আনা পোশাকে ছেয়ে গিয়েছিল ভারতের বাজার। অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টিও এইসব নতুন পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। বিশেষত তরুণ প্রজন্ম এর সঙ্গে দ্রুত অভিযোজিত হচ্ছিল। বরং কিছুটা হলেও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে উঠছিল চল্লিশোর্ধ্ব প্রজন্মের কাছ থেকে। এর কারণ হিসাবে এই প্রজন্মের হিসাবী মনোভাব, সঞ্চয়ের প্রবণতা এবং ক্রয়ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত রাখার মানসিক রোধ ক্রিয়াশীল হয়েছিল। তবু তরুণ প্রজন্মের কেনার অভ্যাসকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ডানা মেলেছিল 'সিটি মার্ট', 'বাজার কলকাতা' কিংবা

‘প্যান্টালুনস’ এর মতো রিটেল চেনগুলি। পোশাকের সংখ্যাও ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন এই প্রজন্মকে প্রয়োজনের গণ্ডি পেরিয়ে বিলাসিতার বৃত্তে হাজির করেছিল। প্রচলিত বিপণিগুলি টিমটিম করে ধুঁকছিল আর বাজারকে ম্লান করে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল একাধিক ‘বিগবাজার’।

বাঙালির চিরাচরিত বাজারের ধারণাও দ্রুত বদলে দিচ্ছিল বিশ্বায়ন। কোনোক্রমে বাঁশের চালা খাড়া করে রোজ চাতালে বসা বিক্রেতাদের বদলে দেখা দিল সুপারমার্কেটে কোট-প্যান্ট-টাই পরা নতুন বিক্রেতার দল। দোকানির কাছ থেকে চেয়ে জিনিস কেনা নয়, থরে থরে সাজানো জিনিসের মধ্যে কিনবার স্বাধীনতায় ক্রেতারা প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের সীমানা অতিক্রম করে যেতে থাকল। এই ঘটনা ঘটার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল হয়েছিল দেশি বিদেশি বিনিয়োগ। মানুষ প্রচলিত বাজারের ধারণা ত্যাগ করে সুসজ্জিত এই বাজারগুলিতে ভিড় জমাতে থাকল। একসঙ্গে বেশি পরিমাণ জিনিস কিনলে ছাড়ের হাতছানি তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একই ছাদের তলায় অল্প আয়াসে দ্রুত অনেক জিনিস একসঙ্গে পেয়ে যাওয়ার সুবিধা। তবুও এইরকম বাজারে ক্রেতা আর বিক্রেতাদের মুখোমুখি দেখা হওয়ার একটি পর্ব উপস্থিত ছিল, উৎপাদক থাকতেন অবশ্যই আড়ালে; পরবর্তী সময়ে ই-কমার্সের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই পর্বটিও ধ্বস্ত হয়েছিল। স্মার্টফোন আর দ্রুতগতির ইন্টারনেটের সহজলভ্যতায় ভারতের বাজারে প্রবেশ করা আমেরিকার অ্যামাজন-এর মতো কোম্পানির কল্যাণে বিক্রেতা আর ক্রেতার মুখোমুখি দেখা হওয়ার প্রয়োজন আর রইল না। স্মার্টফোনের স্ক্রিনে কয়েকটি স্পর্শের দ্বারা ভোগ্যপণ্যের সমুদ্র থেকে প্রার্থিত পণ্যটি বেছে নিয়ে আনতে দেওয়া কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার হয়ে যাওয়ায় শুধুমাত্র জিনিসটি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ববহনকারীর সঙ্গে ছাড়া আর কারোর সঙ্গে দেখা করার দায় থেকেও মুক্ত হল ক্রেতা। আর এইভাবে আধুনিক মানুষের ক্রেতা সত্তাটি প্রয়োজনের গণ্ডি অতিক্রম করে বিক্রেতার সঙ্গে যতটুকু মানবিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হতে পারত, তারও অবকাশ হারিয়ে গেল।

মানুষ আরও একাকী হয়ে পড়ল, আর পাড়ার, ফুটপাথের ধারের কিংবা পুরানো বাজারের দোকানগুলি অস্তিত্বের লড়াইয়ে সামিল হল।

১.১২॥

Liberalization, Privatization ও Globalization-এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত যোগ দিয়েছিল বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে। এর সরাসরি প্রভাব এসে পড়েছিল ভারতীয় সমাজকাঠামোয়। এই সমাজকাঠামোগত পরিবর্তন মূলত শহর ও গ্রামের নিরিখে পৃথক ছিল। শহরের শিক্ষিত সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুবিধা বৃদ্ধি করেছিল। শহরের নাগরিকের উপার্জন ও ক্রয়ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় দেশের নতুন গৃহীত নীতি ও বাজার অর্থনীতির প্রভাব তাদের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। নতুন নতুন কোম্পানির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে কর্মক্ষেত্রের যে প্রসার হয়েছিল তাতে শিক্ষিত নাগরিক পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষিত নারীরাও অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে তথ্য-প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও বিনোদন শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। এই শিল্পগুলিতে যোগদানের জন্য মানব-পরিযাণ বেড়ে গিয়েছিল। যেমন তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প ভারতের কয়েকটি বড়ো শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ফলে সেই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সেই নির্দিষ্ট শহরগুলিতে কাজের প্রয়োজনে বাস করতে হত। এর ফলে পরিবারে তরুণ প্রজন্মের অনুপস্থিতি বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে শিক্ষিত নারী সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরিযাণের বৃদ্ধি লক্ষ করা যেতে থাকে। কাজের প্রয়োজনে তাঁরাও শহরান্তরে এমনকি দেশান্তরেও গমন করতে থাকেন। ফলস্বরূপ মানুষের সমাজ ও প্রকৃতিনির্দিষ্ট ভূমিকাগুলিও পরিবর্তিত হতে থাকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের চাহিদায় বিবাহের গড় বয়স বাড়তে থাকে। বিবাহের পর সন্তান গ্রহণ কিংবা ধারণের

ব্যাপারটিকেও অর্থনীতির দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায় বিশ্বায়ন-পরবর্তী সমাজে। নারী নিজেই কর্মরত হওয়ার কারণে গর্ভধারণের সংখ্যা কমে একটিতে দাঁড়ায়, কখনো বা দম্পতির কর্মক্ষেত্রগত দূরত্বের কারণে সন্তান ধারণ আর হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে শহরের ক্ষুদ্র পরিবারগুলির বয়স্ক মানুষরা হয়ে পড়েন অরক্ষিত ও নিঃসঙ্গ। যদিও বা একই শহরে পুত্র কিংবা কন্যা কর্মরত থাকেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের বৃদ্ধ বাবা-মা কিংবা আত্মীয় পরিজনকে দেখভাল করবার সময় থাকে না। তাঁরা নিক্ষিপ্ত হন বৃদ্ধাশ্রমগুলিতে। এই জন্য আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের আবাসন গড়ে তুলে তাঁদের শেষ বয়সে পরিষেবা দেওয়ার জন্য একশ্রেণির পুঁজির মালিক তৈরি করেন বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত আবাসন। মোটা টাকার বিনিময়ে সেই আবাসনগুলিতে পুনর্বাসিত হন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। দেখা যায় নতুন উদ্ভূত এই পরিস্থিতি নতুন একটি বাণিজ্যের দিক নির্দেশ করেছে। এর পাশাপাশি দেখা যায় কর্মগত কারণে দূরত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা দম্পতিদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়াও বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি যৌন হেনস্থার হারও।

নাগরিক, শিক্ষিত,স্বনির্ভর এবং অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর নারীদের ক্ষেত্রে মাতৃত্ব তাঁদের কর্মক্ষেত্রের একটি বাধা হয়ে উঠেছিল এই বদলে যাওয়া নতুন অর্থনীতিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতৃত্বের চিরন্তনতা বনাম কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির লড়াইয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল দ্বিতীয়টিই। আর তাই সন্তানপালনের জন্য যে মাতৃত্বপূর্ণ সাহচর্য প্রয়োজন ছিল, তা হয়ে উঠেছিল ক্রয়যোগ্য পণ্য। বিশ্বায়নের নতুন অর্থনীতিতে এই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে এসেছিল ভেঙে পড়া কৃষি অর্থনীতিভিত্তিক গ্রামসমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণির নারীরা। তারা অর্থের বিনিময়ে পরিচারিকা হিসাবে বিনিময় করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের সময় ও মাতৃসত্তাকে।

গ্রামীণ সমাজে বিশ্বায়নের প্রভাব ছিল শহরের তুলনায় পৃথক। বহু বছর পর্যন্ত ভারতীয় গ্রাম সমাজ কৃষি নির্ভর ছিল এবং অর্থনীতিগতভাবে অনেকাংশে ছিল স্বনির্ভর। বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে দেশের নতুন গৃহীত অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব ভারতীয় গ্রামসমাজে পরিবর্তনসাধন করেছিল। সরকারিভাবে বীজ, সার ও কীটনাশকের উপরে যে ভর্তুকি দেওয়া হত, তার পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনা হয়। এতে করে গ্রামীণ ভারতীয় অর্থনীতি, যা মোট ভারতীয় অর্থনীতির প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ, যা ছিল কৃষি উৎপাদনকেন্দ্রিক, সেটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়তে থাকে। এর পাশাপাশি বিশ্বায়নের পুঁজি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা খাদ্যশস্য উৎপাদন ছেড়ে দিয়ে দ্রুত অর্থকরী ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারে তাদেরকে ব্যাঙ্ক কিংবা বহুজাতিক সংস্থাগুলি ঋণ দিতেও এগিয়ে এসেছিল। এর পরোক্ষ ফলাফলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে থাকে, চলে যেতে থাকে ক্রয়ক্ষমতার বাইরে আর বিপরীতদিকে দেশের সরকার রেশনে বরাদ্দের পরিমাণ কমিয়ে আনতে থাকে। ফলে কৃষকদের সমাজে গ্রাসাচ্ছাদন জোটাই ধীরে ধীরে দুরূহ হয়ে পড়ে। বৃদ্ধি পায় পোশাক, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ও পরিবহনের খরচও। ফলে মানুষ ন্যূনতম মূল চাহিদাগুলিকেও কাটছাঁট করতে বাধ্য হয়। এর সঙ্গে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে নগরায়ণ। নির্মাণশিল্পে প্রয়োজন হতে থাকে সস্তা শ্রমিকের। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক কৃষক কিংবা কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকরা সরাসরি নগদ উপার্জনের তাগিদে যোগদান করতে থাকে শিল্পের প্রসারণের অংশগুলিতে। প্রচুর পরিমাণে পরিযায়ী শ্রমিকের সৃষ্টি হয়। আর যেহেতু বিশ্বায়নের দ্বারা বিদেশি পুঁজির বহুল পরিমাণে আগমন ঘটেছিল, তার ফলস্বরূপ প্রচুর পরিকাঠামো নির্মাণের দরকার হয়ে পড়েছিল। বহুতল বাড়ি, রাস্তা, সেতু, কারখানা ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে এজন্য কৃষিক্ষেত্র থেকে এসে যোগ দিয়েছিল প্রচুর অদক্ষ শ্রমিক। এর সমান্তরালে দেখা যায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে এই সমাজের মহিলারাও এসে শ্রমিকের কাজে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু পুরুষের তুলনায় তাঁদের মজুরি

হত কম। ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের তুলনায় তাঁদের মজুরি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ কম হত। এইভাবে বিশ্বায়নের ফলে লিঙ্গ-অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার উপর শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষের মতো নারীরা সহজে পরিযাণ করতে না পারায় এই অসাম্য আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সমাজে নারীকে দেবী কিংবা শক্তি হিসাবে দেখার রীতি প্রচলিত থাকলেও কখনই তাদের পুরুষের সমমর্যাদা দেওয়া হয়নি। এমনকি বিশ্বায়নের পরেও তাদের অন্তর্গত কর্মশক্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে, মানবসম্পদ হিসাবে না বিবেচনা করে তাদেরকে বোঝা মনে করা হয়েছিল। অন্যদিকে বিশ্বায়নের ফলে পুরুষ কর্মীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, নারীরা অপ্রথাগত শ্রমিক হিসাবে কাজ করায় তাদের কর্মের জন্য কোনো মজুরি পেতেন না, ধীরে ধীরে তারা প্রান্তিক হয়ে পড়েন। প্রথাগত কাজকর্মের বদলে নতুন কাজের জগতে নারীদেরকে অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে কাজ করতে হত। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলি থেকেও মহিলাদেরকে দূরে রাখা হত।[৫২] 'নারীদের জীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব' নামক একটি প্রবন্ধে শ্যামলী গুপ্ত নারীরা কীভাবে বিশ্বায়নের ফলে কর্মচ্যুত হয়ে পড়ছেন সেই দিকগুলি বিশ্লেষণ করে লিখেছেন যে—

> জীবিকার ক্ষেত্রেও প্রথমেই আক্রান্ত হচ্ছে মেয়েরা। বেসরকারীকরণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি যখন হস্তান্তরিত হচ্ছে অথবা ভারীশিল্প ও মূল শিল্পগুলি রুগণ হয়ে পড়ছে তথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন প্রথম ছাঁটাই-এর খড়গ নেমে আসছে মহিলা শ্রমিকদের উপর। যখন কোনো শিল্পে নতুন প্রযুক্তি আমদানি হচ্ছে তখন সেই প্রযুক্তি আয়ত্ত করার প্রশ্নে স্বভাবতই প্রশিক্ষণের অভাবে মেয়ে শ্রমিক বা কর্মচারী তারা পিছিয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে তারা উদ্বৃত্ত বা প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। চিরাচরিত যে শিল্পগুলিতে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে নারীরা কাজ করে থাকে সেগুলি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। পাশাপাশি কৃষিকাজে কর্মরত নারীমজুররাও আজ সঙ্কটের কবলে। দক্ষিণ গোলার্ধের তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি মূলত কৃষিপ্রধান। কৃষিকাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ পঞ্চাশ থেকে আশি শতাংশ পর্যন্ত। কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি এবং গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে বহু মহিলা কর্মচ্যুত হচ্ছে।[৫৩]

বিশ্বায়নের ফলে এশিয়াসহ ভারতে নারীর পরিযাণ ঘটেছে, নারীকে পণ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাকে আধুনিক সময়ে নতুনভাবে দাসে পরিণত করা হয়েছে। এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে সেইখানে, যে ক্ষেত্রগুলিতে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বেশি, যেমন বস্ত্রবয়নশিল্প, বৈদ্যুতিন শিল্প, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদক শিল্প ইত্যাদি। তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতি মহিলাদেরকে আরও কর্মহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তারা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে আরও বেশি করে দূরে সরে গিয়েছে। এই সরে যাওয়া ঠেকাতে এবং পরিবারে আর্থিক সাহায্য তৈরি করতে তারা অন্য কোনো কাজে অল্প মজুরিতে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে। দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা মহিলাদেরকে বাধ্য করছে কাজের খোঁজে বিদেশে পাড়ি দিতে। পরিযাণ নীতিও নারীর অন্যদেশে কাজের সূত্রে আসলে পাচার হয়ে যাওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছে। বিশ্বায়ন আসলে নারীর পণ্যায়নের মাধ্যমে দেহব্যবসাকে পরোক্ষে বৃদ্ধি করেছে, আর এর পাশাপাশি বড় শহরগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে পর্যটন শিল্প। এর ফলে ভারতের মতো দেশে এইডস-এর মতো রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারীরাই এই পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছে সর্বাধিক পরিমাণে।[৫৪]

ভারতীয় সমাজে নারীর প্রতি খারাপ ব্যবহারের নজির বিশ্বায়নের আগে থেকেই বর্তমান ছিল। বিশ্বায়নের ফলে তা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বায়ন মানুষের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল, পাশাপাশি বদলে গিয়েছিল তাদের চিরাচরিত জীবনযাপন-প্রণালী। পূর্বে যৌথ পরিবার পদ্ধতিতে নারীদের উপরে এই ধরনের আচরণে একপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ছিল, কিন্তু বিশ্বায়ন পরবর্তী ক্ষুদ্র পরিবারগুলিতে নারী আরও খারাপ আচরণের স্বীকার হতে থাকে। এর সঙ্গে বিশ্বায়ন মানুষের মধ্যে লোভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল, উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধির লোভ, যা পরোক্ষে সমাজে পণের দাবিকে বৃদ্ধি করেছিল, যা আসলে নারীর অবস্থানকে আরও হীনতায় ও অত্যাচারে পর্যবসিত করে।[৫৫]

বিশ্বায়নের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ও উৎপাদনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক গঠনেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। উৎপাদনের নির্দেশতন্ত্রের বদলের সঙ্গে শিক্ষার দিকটিও প্রভাবিত হয়েছিল বিশ্বায়নের ফলে। আন্তর্জাতিক পরিযাণ বৃদ্ধিতে যোগাযোগ-রক্ষার কারণে বিশ্বের নিয়ন্ত্রক ভাষাসমূহ শেখার চল বাড়ছিল। একসময়ের ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে ভারতে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার প্রতি একধরনের অত্যাগ্রহ আগে থেকেই বজায় ছিল, বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে তা আরও বৃদ্ধি পায়। উনিশশো নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত সরকার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত সমাজের একটি অংশকেও ভরসা রাখতে দেখা যেত। কিন্তু নতুন উদার অর্থনীতি দ্রুত বেসরকারিকরণের দিকে নিয়ে যায় শিক্ষাব্যবস্থাকে। এখানেও পুঁজি বিলগ্নিকরণ করা হয়। এর পশ্চাতে প্রণোদনা হিসাবে শুধু দেশের অর্থনৈতিক সীমানায় আবদ্ধ না রেখে সন্তানকে সারা বিশ্বের নিরিখে তৈরি করার প্রবণতা কাজ করেছিল ভারতীয় অভিভাবকদের মনে। এর জন্য বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছিল ইংরেজি ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপরে। পরবর্তীকালে তথ্য- প্রযুক্তির ব্যবহার এই শিক্ষাব্যবস্থাকে জোরদার করে। এই সময়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরে ধ্রুপদী বিষয়ে উচ্চশিক্ষা কিংবা গবেষণার দিকে সন্তানকে না পাঠিয়ে কর্মমুখী শিক্ষার দিকে জোর দেওয়া হতে থাকে। শিল্প কিংবা বাণিজ্যের প্রয়োজনের অভিমুখ অনুযায়ী পাঠ্যসূচিরও বদল ঘটতে শুরু করে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিনু আনন্দ তাঁর একটি প্রবন্ধে চমৎকার করে তুলে ধরেছেন ব্যাপারটিকে—

> Globalization is an important phenomenon that has affected the entire world in the contemporary era. Its impact on the education system of a country is intrinsic. In the context of India, globalization has impacted upon the education system in complex and conflicting ways. There is an increased emphasis on preparing *global*

citizens who are ready to face the highly competitive world. There is a huge upsurge in the demand for learning English language, growing popularity of international schools, need for curriculum restructuring and inclusion of ICTs etc. While the basic aims of education are to enable children develop their potentials, define and pursue a meaningful purpose; globalisation has put an extra pressure on the education system to create 'winners' who are ready to battle in the race for the survival of the fittest.[৫৬]

অর্থাৎ দেখা গিয়েছিল, বিশ্বায়নের ফলে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনই ইন্ট্যারন্যাশনাল স্কুলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, পাঠ্যক্রমের পুনর্গঠন করা হয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার পূর্বতন উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে বিশ্বায়ন-পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থা 'বিজয়ী' তৈরির একরকম প্রচেষ্টা জারি রেখেছিল, যারা যোগ্যতমের উদ্বর্তনের দৌড়ে জিতবে।

অন্যদিকে সন্তানকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাপ্রদানের প্রাণপণ প্রচেষ্টা অভিভাবকদের তরফে মূলত পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেও একধরনের লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণ মূলত মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের তরফে লক্ষ করা যায়। তাঁরা যখন পুত্রসন্তানের জন্য বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর ব্যয়ভার বহন করতে সানন্দ ছিলেন, তখন তাঁদের কন্যা সন্তানদের জন্য বরাদ্দ ছিল সরকারি বাংলামাধ্যম স্কুল। এই সামাজিক প্রবণতার একটি অন্য দিকও ছিল। ইংরেজি ও বিজ্ঞানশিক্ষিত পুত্রসন্তানরা যখন দ্রুত চাকরির তাগিদে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রাঙ্গণটিকে শূন্য করে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ভরে তুলছিল, তখন ধীরে ধীরে অনাদৃত কন্যাসন্তানের দল সেই শূন্যস্থানে জায়গা করে নিচ্ছিল। ফলস্বরূপ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছিল।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বদলে বিশ্বায়ন পরবর্তী কালে দ্রুত তৈরি হচ্ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি আবার 'ইন্টারন্যাশনাল', অর্থাৎ একাধিক দেশে তাদের শাখা আছে। এর ফলে পেশার কারণে পরিযায়ী অভিভাবকগণ দেশ বদল করতে বাধ্য হলেও ভিন দেশে গিয়েও একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছিলেন। বেসরকারি পুঁজিদ্বারা নির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও দেশের অভ্যন্তরে বহু শাখা খুলছিল। এর পাশাপাশি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও শিক্ষার্থী আদানপ্রদান চালু করেছিল। ফলে একদিকে বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেশীয় শাখা কিংবা দেশীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী শাখায় সন্তানকে ভর্তি করে নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন অভিভাবকরা। তবে এজন্য তাঁদেরকে বহুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছিল। ফলে একান্নবর্তী পরিবার রক্ষার্থে কেউ আর অর্থব্যয় করতে রাজি ছিলেন না। এজন্য দ্রুত একান্নবর্তী পরিবারগুলি টুকরো হয়ে গিয়ে বাবা-মা আর এক বা দুই সন্তানের 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'-তে পরিণত হচ্ছিল। এর ফলে সমাজে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। শিশুরা হয়ে পড়েছিল একা, আর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন বৃদ্ধাশ্রমে। বেবিসিটার, আয়া কিংবা কাজের লোক নিযুক্ত হচ্ছিল সেই শূন্যস্থান পূরণে। তবে যে মানসিক নৈকট্যপ্রদান করতে পারতেন কিংবা আশ্রয় হয়ে উঠতে পারতেন রক্ত-সম্পর্কিত মানুষগুলি, তাঁদের সেই শূন্যস্থান শূন্যই থেকে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি থেকে রুটিনমাফিক ছাত্র ছাত্রীদেরকে বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হতে থাকল। এতে সেই বিদ্যালয়গুলির প্রসপেক্টাসে দেওয়ার মতো ছবি সংগৃহীত হতে লাগল আর একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদেরকে 'ভ্যালু এডুকেশন'ও দেওয়া হল। এইভাবে বিশ্বায়ন-পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকল শিশুদের জগৎ, ভারি ভারি বইখাতা, ওজনদার ব্যাগ আর মাতৃভাষায় কথা বললে রক্তচক্ষুর শাসন বা জরিমানার ভয় তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। সর্বক্ষণ

প্রতিযোগিতার দৌড়ের ফাঁকের মানবিক সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন অবসরগুলি ভরিয়ে রাখার জন্য ততদিনে তথ্য-প্রযুক্তির জগতে এসে গিয়েছে নিত্যনতুন ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট।

ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও পুঁজি বিনিয়োগের ফলে একের পর এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে শুরু করে। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ তৈরি করা হয়। শিল্প ও বাণিজ্য অভিমুখী বিভিন্ন পাঠ এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেওয়া হতে থাকে। তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হতে গেলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দরকার ছিল, তার সংস্থান দেশের অনেক মানুষের ছিল না। এমনিতেই বহুকাল ধরে ভারতীয় সমাজ বর্ণব্যবস্থার কুফল ভোগ করছে, তার উপর অর্থনৈতিক অসাম্য নতুন প্রান্তিকতার জন্ম দিতে শুরু করেছিল এই পর্বে। এই কারণে সমাজেও এর প্রভাব এসে পড়েছিল।

১.১৩॥

বিশ্বায়ন ভালো, না খারাপ—এই প্রশ্নের এক কথায় কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রক্রিয়াটি যে আগ্রাসী তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশ্বায়নের বিকাশের ফলে একধরনের অসাম্য তৈরি হতে থাকে। কোনও দেশ বা গোষ্ঠী এর ফলে লাভবান হয়েছে, কেউ বা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক Anil Dutta Mishra তাঁর প্রবন্ধে এ সম্পর্কে জানিয়েছেন যে—

> Globalization, polarization, wealth concentration and marginalization are therefore linked through the same process. A World Bank study finds that the poorest 40 per cent of people in developing countries have seen their incomes fall since liberalization began. The evidence is powerful and it discredits the

claims of Western government ministers that trade liberalization lessens poverty. The rapid growth of the global economy in recent decades is perhaps most clearly shown by the fact that in 1970 the total number of Transnational Corporations (TNCs) was about 700, but grew by 1998 to at least 53,607 TNCs that were contracted with at least 448,917 foreign subsidiaries. The six largest corporations in the World (Exxon, General Motors, Ford, Mitsu, Daimler-Chrysler, and Mitsubishi) have combined revenues larger than the combined budgets of 64 nations that include 58 per cent of the world's population (including India, Indonesia, Brazil, Russia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, and Mexico). Only seven nations have budgets larger than Ford, Exxon or General Motors: namely France, the United Kingdom, Italy, China, Japan, Germany, and the United States.[৫৭]

বিশ্বায়নের ফলে দেখা গিয়েছিল মেরুকরণ, সম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা কিংবা এক শ্রেণির মানুষের প্রান্তিক হয়ে পড়া। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গিয়েছিল যে, বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির চল্লিশ শতাংশ মানুষের উপার্জন উদারীকরণ-পরবর্তী সময়ে কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে দেখা গিয়েছিল যে, বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত দ্রুতহারে বহুজাতিক কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, পাশাপাশি তাদের কয়েকটির মিলিত সম্পদ পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের মিলিত সম্পদকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। এই তথ্য থেকে বিশ্বায়নের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

বিশ্বায়নের ফলে নিয়ন্ত্রক অর্থনীতির সংস্কৃতিটি যে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সংস্কৃতিকে দমন করে চেপে বসে, তা বলাই বাহুল্য। এই কারণে ভারতের মতো বিশাল ভূখণ্ডে প্রান্তিক সমাজের

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যগুলি অনেকাংশে বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হয়েছে। অধ্যাপক অনিন্দ্য ভুক্ত সার্থকভাবেই বলেছেন—

> আসলে বিশ্বায়নের এটিই প্রকৃত স্বরূপ। তা যেমন এক দেশ থেকে ছড়িয়ে পড়ে আরেক দেশে, তেমনই ছড়িয়ে পড়ে এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে। অর্থনীতির বিশ্বায়ন সহজেই রূপ পালটে হয়ে যায় সামাজিক বিশ্বায়ন; উৎপাদনের বিশ্বায়ন আহ্বান করে সংস্কৃতির বিশ্বায়নকে। বিশ্বায়ন, তা সে যে ধরনেরই হোক, প্রকৃত অর্থেই তাই বিশ্বায়ন। আবিশ্বকে গ্রাস করে সে। ধীরে, কিন্তু অব্যর্থ লক্ষ্যে।[৫৮]

এতৎসত্ত্বেও এই বিশ্বায়নের কয়েকটি ভালো দিকের কথা উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয় যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান কিংবা পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশ্বায়ন অনেক ইতিবাচক ভূমিকাও নিয়েছিল। অন্তত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চুক্তির দায়ে দেশে সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে যে হারে রাস্তাঘাট, তথ্য-প্রযুক্তি কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটেছিল, তার কিছুটা উপজাত সুফল অবশ্যই দেশের প্রান্তিক মানুষও পেয়েছিল। তবে একথা মানতেই হয়, যে বিশ্বায়নের ভালো দিকগুলির সুবিধা নিতে পেরেছিল দেশের সেই অংশের মানুষ, যারা শিক্ষায় কিংবা অর্থনৈতিক সামর্থ্যে অনেক অগ্রবর্তী ছিল। এই প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ Joseph E Stiglitz (জন্ম-1943) তাঁর *Globalization And Its Discontents* (2012) নামক গ্রন্থে বলেছেন—

> TODAY, GLOBALIZATION is being challenged around the world. There is discontent with globalization, and rightfully so. Globalization can be a force for good: the globalization of ideas about democracy and of civil society have changed the way of people think, while global political movements have led to debt relief and the treaty on land mines. Globalization has helped hundreds of millions of people attain higher standards of living, beyond what they, or most economists, thought imaginable but a short while ago. The globalization of the economy has benefited

countries that took advantage of it by seeking new markets for their exports and by welcoming foreign investment. Even so, the countries that have benefited the most have been those that took charge of their own destiny and recognized the role government can play in development rather than relying on the notion of a self-regulated market that would fix its own problems.

But for millions of people globalization has not worked. Many have actually been made worse off, as they have seen their jobs destroyed and their lives become more insecure. They have felt increasingly powerless against forces beyond their control. They have seen their democracies undermined, their cultures eroded.[৫৯]

অর্থাৎ, বিশ্বায়ন নামক ব্যাপারটি সারা পৃথিবীতে আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। এই ব্যবস্থাটি সম্পর্কে অসন্তুষ্টি রয়েছে। একদিকে যেমন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের ভাবনা-চিন্তার ধরন বদলেছে, অন্যদিকে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে, তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে আবার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে বিশ্বায়ন কোনও কাজ করেনি। অনেকের ক্ষেত্রে অবস্থা পূর্বের তুলনায় আরও খারাপ হয়েছে। তাদের জীবিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, জীবন হয়ে পড়েছে নিরাপত্তাহীন। তারা বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদেরকে ক্রমাগত ক্ষমতাহীন অনুভব করেছে। তাদের গণতন্ত্রকে তারা অবমূল্যায়িত হতে দেখেছে, তাদের সংস্কৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং দেখাই যায় সমগ্র বিশ্ব কিংবা ভারতীয় প্রেক্ষিতেও জনগণের অবস্থা কিংবা অবস্থানের নিরিখে বিশ্বায়ন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। যার প্রভাব পরবর্তী দশকগুলিতেও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Third Edition, Cambridge University Press, 2008, pp. 610

২. https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization#Etymology_and_usage Accessed on 10.06.2018 at 8.14 pm

৩. জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ৯৯১

৪. *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৭

৫. Mishra, Anil Dutta. 'Globalization: Concept and Nature.' *GLOBALIZATION: MYTH AND REALITY*, edited by Govind Prasad, Anil Dutta Mishra, Concept Publishing, 2004, pp. 3-4

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫-৬

৭. ভুক্ত, অনিন্দ্য, 'বিশ্বায়ন', *বিশ্বায়ন শব্দকোষ,* কলকাতা: বাঙলার মুখ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৫৩

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৪

৯. বাগচী, অমিয়কুমার, 'বৈষয়িক বিশ্বায়নের রূপরেখা', *বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা* ১ম খণ্ড, অমিয়কুমার বাগচী (সম্পা.), কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৬৬

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮

১২. ভুক্ত, অনিন্দ্য, 'বিশ্বায়ন', *বিশ্বায়ন শব্দকোষ,* কলকাতা: বাঙলার মুখ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৫৪

১৩. বাগচী, অমিয়কুমার, 'বৈষয়িক বিশ্বায়নের রূপরেখা', *বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা* ১ম খণ্ড, অমিয়কুমার বাগচী (সম্পা.), কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

১৪. ভুক্ত, অনিন্দ্য, 'গ্যাট', *বিশ্বায়ন শব্দকোষ,* কলকাতা: বাঙলার মুখ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৬০

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০-৬১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

১৭. ভুক্ত, অনিন্দ্য, 'গ্যাট', *বিশ্বায়ন শব্দকোষ,* কলকাতা: বাঙলার মুখ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৬০

১৮. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization Accessed on 10.06.2018 at 9.15 pm

১৯. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization#History Accessed on 16.06.2022 at 5.58 am

২০. https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_economy Accessed on 10.06.2018 at 9.33 pm

২১. গুহ, রামচন্দ্র, *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* (অনু. আশীষ লাহিড়ী), কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৬২২-৬২৩

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২৩

২৩. পূর্বোক্ত

২৪. Sitapati, Vinay. 'Rescuing the Economy, 1991-92'. *HALF LION.* Haryana: Penguin. 2017, pp. 107

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮

২৮. গুহ, রামচন্দ্র, *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* (অনু. আশীষ লাহিড়ী), কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৬২৪

২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২৪-৬২৫

৩০. বাগচী, অমিয়কুমার, 'বৈষয়িক বিশ্বায়নের রূপরেখা', *বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা* ১ম খণ্ড, অমিয়কুমার বাগচী (সম্পা.), কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৭৬

৩১. খাসনবিশ, রতন, ‘রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও উন্নয়ন: ইডিওলজির রূপান্তর’, *বিশ্বায়ন ও ভারতবর্ষ: অর্থনীতির ইডিওলজি*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ, মে, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৪-১৫

৩২. https://en.wikipedia.org/wiki/Jyoti_Basu Accessed on 10.11.2019 at 8.51 pm

৩৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadeb_Bhattacharjee Accessed on 15.11.2019 at 9.14 pm

৩৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Pitroda Accessed on 15.11.2019 at 9.35 pm

৩৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Rajiv_Gandhi Accessed on 15.11.2019 at 10.02 pm

৩৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Pitroda Accessed on 15.11.2019 at 10.24 pm

৩৭. https://www.livemint.com/Opinion/biNfQImaeobXxOPV6pFxqI/The-story-of-Indias-telecom-revolution.html Accessed on 17.11.2019 at 8.34 pm

৩৮. Panagariya, Arvind. *India: The Emerging Giant.* New York: Oxford University Press.2008 pp. 371

৩৯. ভুক্ত, অনিন্দ্য, ‘উৎপাদনের বিশ্বায়ন’, *উদার অর্থনীতি অনুদার উন্নয়ন,* কলকাতা: একুশশতক, ২০১১, পৃষ্ঠা ২৭-৩৩

৪০. https://www.investopedia.com/terms/o/outsourcing.asp Accessed on 25.11.2019 at 9.45 pm

৪১. ভুক্ত, অনিন্দ্য, ‘উৎপাদনের বিশ্বায়ন’, *উদার অর্থনীতি অনুদার উন্নয়ন,* কলকাতা: একুশশতক, ২০১১, পৃষ্ঠা ২৭

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০-৩২

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩

৪৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Atal_Bihari_Vajpayee Accessed on 25.11.2019 at 8.37 pm

৪৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Quadrilateral Accessed on 27.11.2019 at 9.32 pm

৪৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Pradhan_Mantri_Gram_Sadak_Yojana Accessed on 27.11.2019 at 9.45 pm

৪৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Bharatmala Accessed on 27.11.2019 at 9.57 pm

৪৯. https://www.news18.com/news/tech/on-this-day-20-years-ago-the-first-mobile-phone-call-was-made-in-india-1028471.html Accessed on 28/11/2019 at 9.12 pm

৫০. https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_India Accessed on 29/11/2019 at 8.52 pm

৫১. https://www.livemint.com/Consumer/sRChazyrh4GcIwCsDuGquO/70-years-of-Indian-advertising.html Accessed on 01/12/2019 at 9.15 pm

৫২. Naidu, Y. Gurappa. 'GLOBALISATION AND ITS IMPACT ON INDIAN SOCIETY', *The Indian Journal of Political Science,* Vol. 67, No. 1 (JAN. –MAR., 2006), pp. 65-76 https://www.jstor.org/stable/41856193 Accessed on 01/12/2019 at 10.34 pm

৫৩. গুপ্ত, শ্যামলী, 'নারীদের জীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব', *নারী ও বিশ্বায়ন*, শ্যামলী গুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পা.), কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, অক্টোবর ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৫-১৬

৫৪. Naidu, Y. Gurappa. 'GLOBALISATION AND ITS IMPACT ON INDIAN SOCIETY', *The Indian Journal of Political Science,* Vol. 67, No. 1 (JAN.

–MAR., 2006), pp. 65-76 https://www.jstor.org/stable/41856193 Accessed on 01/12/2019 at 11.45 pm

৫৫. পূর্বোক্ত

৫৬. Anand, Dr. Meenu. 'GLOBALISATION AND INDIAN SCHOOL EDUCATION: IMPACT AND CHALLENGES', *European Scientific Journal*, June 2015 /SPECIAL/ edition ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857-7431

৫৭. Mishra, Anil Dutta. "Globalization: Concept and Nature." *GLOBALIZATION: MYTH AND REALITY*, edited by Govind Prasad, Anil Dutta Mishra, Concept Publishing, 2004, pp. 12

৫৮. ভুক্ত, অনিন্দ্য, 'উৎপাদনের বিশ্বায়ন', *উদার অর্থনীতি অনুদার উন্নয়ন*, কলকাতা: একুশশতক, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৩

৫৯. Stiglitz, Joseph E, 'The Way Ahead', *Globalization And Its Discontents*, Haryana: Penguin. 2012, pp. 248

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্বায়ন ও পুঁজি প্রসারের বৈচিত্র্য (নির্বাচিত)

বিশ্বায়নের যে পর্বটি নিয়ে আমরা কথা বলছি, তার সূত্রপাত ১৯৭০-এর দশকে। মধ্য-প্রাচ্যের OPEC-ভুক্ত দেশগুলির তেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া কেমনভাবে আজকের বিশ্বায়নের পটভূমিটি তৈরি করেছিল, তা প্রথম অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক নীতি কীভাবে মুক্ত অর্থনীতি তথা বিশ্বায়নকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল, সেই বিষয়টিও ইতোমধ্যে আলোচনার পরিসরভুক্ত। প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও-এর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ যে ধরনের সাহসী নীতিসমূহ গ্রহণ করেন, তা ভারতকে মুক্ত অর্থনীতির পরিবেশ রচনায় উপনীত করে। তিনি লাইসেন্স, কোটা, পারমিট ব্যবস্থা তুলে দেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে বেসরকারি কিংবা বিদেশি উদ্যোগকে স্বাগত জানানোর জন্য অনেকক্ষেত্রেই এক জানালা নীতি গৃহীত হয়। বিদেশি পণ্যের উপর থেকে আমদানি শুল্ক প্রভূত পরিমাণে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এতদিন ধরে সরকার কর্তৃক রক্ষিত কিংবা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত দেশীয় কোম্পানিগুলিকে এইসব সুবিধা থেকে সরিয়ে নিয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাজারে নামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে প্রতিযোগিতামূলক এই পরিবেশে ভোগ্যপণ্যের মূল্য কমতে কমতে মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় আসতে থাকে। এইভাবে মুক্ত অর্থনীতির কারণে ত্বরান্বিত হয় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি।

২.১॥

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত ১৯৪৭ সালে সম্পাদিত GATT চুক্তির আওতাভুক্ত দেশ হলেও সদ্য স্বাধীন দেশ হিসাবে তা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পোষণ করছিল। যার অন্যতম মূল মন্ত্র ছিল

দেশীয় কোম্পানি কিংবা উদ্যোগগুলিকে বাইরের দেশের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে ক্রমবর্ধমান ঋণ ধীরে ধীরে ভারতের অর্থনীতির উপর চাপ তৈরি করছিল, যাতে তা মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেয়। এই চাপ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জমানায় সর্বাধিক পরিমাণে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। যার প্রভাবে ঠিক পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমহা রাও একরকম বাধ্য হয়েই ড. মনমোহন সিংহের সাহচর্যে মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার মরীয়া সাহস দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর ফলে দেশীয় বাজারে দ্রুত ঢুকতে থাকে বিদেশি পণ্য। অনেকাংশে বদলে যায় দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রা। তবে একথা বলাই যায় যে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি নগর অঞ্চলে যতখানি দ্রুত বদল ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল, গ্রাম ভারতে তার গতি ছিল তুলনায় অনেক মন্দ। যদিও তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গতির সঞ্চার লাভ করেছে, কারণ বিশ্বায়নের ফলে যে শ্রমের পরিযাণ ঘটেছিল, তার উৎস ছিল মূলত গ্রাম-ভারত।

বিশ্বায়নের ফলে দেশীয় পুঁজি খানিকটা সংকুচিত হয়ে পড়লেও মূলত বিদেশি পুঁজি ভারতে পূর্বের তুলনায় অনেক সহজে প্রবেশ করে। বিশ্বায়ন পরবর্তী তিন দশকে এই পুঁজি প্রসারের বহুতর ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই তিন দশকের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে প্রথম অবস্থায় খানিকটা সংকুচিত হয়ে পড়া দেশি কোম্পানিগুলিও অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সময়ের নিরিখে দেখা যায় ভারতের দেশীয় কোম্পানিগুলির একটি বড়ো অংশ বহুজাতিক হয়ে উঠেছে। এগুলির মালিকরা অনেকেই বিশ্বের ধনীদের তালিকায় শীর্ষে কিংবা শীর্ষের কাছাকাছি প্রায়ই অবস্থান করছেন। যাইহোক, বিশ্বায়নের হাত ধরে অগ্রসর হওয়া পুঁজি অসংখ্য ক্ষেত্রে তার প্রভাব যে বিস্তার করেছে, তা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। সেই ক্ষেত্রসমূহের কয়েকটিকে, যেগুলি প্রভূত পরিমাণে

সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে, সেগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পুঁজি প্রসারের স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। একটু নজর করলে দেখা যায় যে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলি ছিল মূলত কর্পোরেট সেক্টর, খুচরো পণ্য এবং সায়েন্টিফিক সেক্টর। এগুলি ছাড়াও ছিল মোবাইল ফোন, পরিবহন সংক্রান্ত পণ্য, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পণ্য, নরম পানীয়, ফাস্ট ফুড আর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। মোটের উপর দেখা যায় পরিবহণ ব্যবস্থার গতিবৃদ্ধি এবং তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার ভারতে বিশ্বায়নের অন্যতম দুই চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। বিশ্বায়নের ফলে সারা পৃথিবীর মধ্যে একধরনের অর্থনৈতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এর ফলে বেশ কিছু সুবিধা মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন কাজের সুযোগ অনেক বেড়ে গিয়েছিল, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, মানুষের জীবনযাত্রার মান বহুলাংশে উন্নত হয়ে উঠেছিল। এর বিপরীতে উঠে এসেছিল বিশ্বায়নের বেশ কিছু ক্ষতিকর দিকও। যেমন বৃহৎ পুঁজির আগমনের ফলে ক্ষুদ্র পুঁজি প্রতিযোগিতায় বেশ পিছিয়ে পড়ছিল, অনেকসময় হেরে যাচ্ছিল। ক্ষুদ্র পুঁজিসংলগ্ন মানুষগুলি তাঁদের জীবিকা কিংবা জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। চাকরির নিরাপত্তা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ হ্রাস পাচ্ছিল। কর্মচারীদের স্থায়ী পদে বহাল করার পরিবর্তে বছরের পর বছর অস্থায়ী পদে কাজ করানো কিংবা ইচ্ছামতো ছাঁটাই করে দেওয়ার অধিকার পাচ্ছিল মালিকপক্ষ। স্থানীয় ছোটো কোম্পানিগুলি প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পারায় ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হচ্ছিল। ফলে গৃহসংলগ্ন থেকে শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের সুযোগ হারিয়ে শ্রমিকরা পরিযাণে বাধ্য হয়ে পড়ছিল। এর পাশাপাশি দেখা যায় সরকার দ্বারা পোষিত কোম্পানি কিংবা প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠে ধুঁকছে। কখনো বা ভীষণ ক্ষতিতে চলছে। ফলে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ছে সমাজে কিংবা মানুষের

মনোজগতে। এই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে অনুসন্ধান করে দেখতে গেলে বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়াটি ভারতের নিরিখে কীভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজির প্রসার ঘটিয়েছিল এবং তা জনজীবনে কী কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে পুঁজি প্রসারের বহুতর ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রকে নমুনা হিসাবে তুলে ধরে এই অধ্যায়ে সেগুলির বিস্তার এবং প্রভাবের দিকগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.২॥ **ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা**

ভারতে যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে পুঁজি তার প্রভাব বিস্তার করেছিল, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সেগুলির অন্যতম। কিংবা বলা যেতে পারে যে, পুঁজির প্রসারের ফলে ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু বদল ঘটেছিল। ভারতের আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এর সূত্রপাত ঘটেছিল ঔপনিবেশিক ভারতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৮২৯-৩২-এর মধ্যে দেউলিয়া হয়ে পড়ে।[১] কিংবা ১৭৮৬-তে প্রতিষ্ঠিত জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, যা উঠে গিয়েছিল ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে। ভারতে এ পর্যন্ত টিকে থাকা সর্বপ্রাচীন এবং বৃহৎ ব্যাঙ্ক হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, যা ১৮০৬ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা নামে গড়ে উঠেছিল। ১৮০৯ সালে এটি ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল নামে পরিচিত হয়। এটি ছিল ব্রিটিশ প্রাদেশিক সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তিনটি ব্যাঙ্কের একটি। অন্য দুটি ছিল ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে (১৮৪০) এবং ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ (১৮৪৩)। পরে এই তিনটি ব্যাঙ্ক একত্রিত হয়ে ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত হয়।[২] ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে এটি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নামে

পরিচিতি লাভ করে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ভারতে সব ব্যাঙ্কের নিয়ামক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে ১৯৩৫ সালে।[৩]

বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ[৪] হওয়ার আগে পর্যন্ত বেসরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। এরপর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জমানায় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার পরে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ জারি হয়। ব্যাঙ্কগুলির উপর নিয়ন্ত্রক হিসাবে ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং অর্থমন্ত্রক। এরপরেও বেশ কিছু বেসরকারি ব্যাঙ্ক তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেও সেগুলিকে সরকারি আইন মেনে কাজ করতে হতো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে একাধিক বিদেশি ব্যাঙ্ক ভারতে তাদের শাখা খোলে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে দেওয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী ভারতে বিদেশি ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৪৬টি।[৫] এর সঙ্গে পরিযাণ ব্যাপারটি অনেকাংশে জড়িত । ভারতের বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিও পূর্বের তুলনায় লেনদেনে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে কারণে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রসরণ ঘটেছিল, তা ছিল তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। ১৯৮০-র দশকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কম্পিউটার ব্যবহারের পক্ষে নীতি গ্রহণ করা হয়। আর ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থার প্রসারের ফলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আরও বেশি করে সাধারণের নাগালে আসে।[৬] একটু লক্ষ করলে দেখা যায়, মুক্ত অর্থনীতিকে গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে বহুদূরে অবস্থান করত। এমনকি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরাও সহজে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ পেতেন না। এইসময়ে দাঁড়িয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খোলাই ছিল অনেক দুরূহ ব্যাপার। তা ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার বদল হয়। ইতিমধ্যে বিদেশি ব্যাঙ্কের আগমনের ফলে এবং তার পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার ভয়ে সরকারি ব্যাঙ্কগুলিও

মধ্যবিত্ত সাধারণ চাকরিজীবী মানুষকে ঋণদানের শর্তাবলি সহজ এবং উদার করে। এরও পরবর্তীকালে ঋণদানের ক্ষেত্রটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের সাধারণ মানুষের জন্য অনেকাংশে উন্মুক্ত করা হয়। আগের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় আসে। এক্ষেত্রে বলাই যায় যে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রসারের ফলে এই ঘটনা সম্ভব হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৯৯ সাল পরবর্তী সময়ে এ.টি.এম. ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে মানুষের অন্তর্ভুক্তি কিংবা অর্থনৈতিক লেনদেন অনেক বেড়ে যায়। যদিও ভারতে এ.টি.এম. ব্যবস্থার সূত্রপাত ১৯৮৭ সালে HSBC ব্যাঙ্কের মুম্বাই শাখায়, তবু তা সর্বজনীনতা লাভ করেছিল আরও বারো বছর পরে।[৭] ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে মুক্ত অর্থনীতি এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রযুক্তি ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধির ফলে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের সঙ্গে দেশি বিদেশি পুঁজির ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতা কীভাবে পরিষেবার উন্নতি ঘটিয়েছিল, তা একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> In view of the changing business scenario at the global level and revamping the Indian economy, Government of India introduced New Economic Policy followed by structural adjustment programme in 1991. The economic liberalization, policies adopted by India in the context of globalization followed by structural adjustment programme has widely affected the all sectors of economy. The liberalization of trade policies allowed the banks to cross their national arena and inter into a sphere of whole world. Information technology and electronic funds transfer have been the pillars of modern banking technology. The policies of globalization and economic liberalization also encouraged entry of foreign banks in India for their business operation while the trade liberalization

facilitated easy flow of funds and foreign investment in banking services which also resulted drastic changes in the system of banking in India. Indian banking system is still pre-dominated by public sector banks while State Bank of India and its associates hold a significant share in banking business in India. In view of the global business changes, State Bank of India has also introduced revolutionary financial and credit instruments in the context of globalization and economic liberalization. The drastic improvement in technology in delivery of services such as wider use of credit-cum-debit card, credit card, smart card, virtual banking, e-banking, ATM, electronic payment system, etc. were introduced by SBI to face the competition in banking sector in India. The globalization and particularly entry of private and foreign banks has drastically improved the outreach, accessibility and quality of banking services in India. SBI and its associates are no longer far behind as compared to the private and foreign banks as far as delivery of banking services is concerned. [৮]

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী (জন্ম-১৯৫০)-র সময়কালে সূত্রপাত হয় 'প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা'-র। এই যোজনার দ্বারা সারা দেশের ১০ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত মানুষকে অ্যাকাউন্টের অধিকারী করে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় আনবার রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করার ফলে দেশের প্রান্তিকতম মানুষটিরও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হওয়ার জায়গাটি আরও সুদৃঢ় হয়।[৯] যদিও এই নীতির পক্ষে বিপক্ষে বহু মত আছে, তবু ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় একেবারে প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণের রাষ্ট্রীয় নীতিটি যে এর আগে গৃহীত হয়নি, তা বলাই বাহুল্য।

ভারতে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসারের ফলে ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে ঋণদান এবং ঋণ গ্রহণের হার অনেক বেড়ে যায়। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ভোগ্যপণ্যের ক্রয়বিক্রয়। ইতোমধ্যে সেই বিপুল ক্রেতার চাপ এবং চাহিদা সামাল দেওয়ার জন্য মূলত নগরাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বিরাট বিরাট শপিং মল, যেখানে পাওয়া যেত সারা পৃথিবীর পণ্য। এই শপিং মলগুলি গড়ে ওঠার কারণে বহু মানুষের কর্মসংস্থান যে হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে সহজে ঋণ পাওয়ার ফলে মধ্যবিত্ত শহরকেন্দ্রিক চাকরিজীবী মানুষের নিজস্ব গৃহ পরিসর নির্মাণের ব্যাপারটিও ত্বরান্বিত হচ্ছিল। এইসময়ের একটি বিজ্ঞাপন খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যার ক্যাচলাইনটি ছিল—'আপনার বাড়ি হোক আপনার পরিচয়'। জীবিকার কারণে শহরকেন্দ্রিক ভিড় যত বাড়ছিল, আবাসন শিল্প তত বেশি সম্প্রসারিত হচ্ছিল। 'আপনার বাড়ি হোক আপনার পরিচয়' ক্যাচলাইনটি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করলেও আসলে ফ্ল্যাটবাসী মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল। কারণ নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটলেও একটা গোটা বাড়ি করার মতো আর্থিক সচ্ছলতা অনেকেরই ছিল না, অথবা আবাসনের মধ্যে তুলনায় নিরাপদ, সহজলভ্য এবং যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির কারণে বাড়ির তুলনায় ফ্ল্যাটই হয়ে পড়ছিল অনেক বেশি সহজ পছন্দ। এই সমগ্র পরিস্থিতিটির ফল হিসাবে 'পরিবার' নামক ধারণাটির ক্ষেত্রেও যে অনেক পরিবর্তন আসছিল তা বলাই বাহুল্য। সমগ্র ব্যবস্থাটির পশ্চাতে গড়ে উঠছিল একটি ঋণনির্ভর জনসমষ্টি, যারা ভোগবাদী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে আগামীর উপার্জনটিকে বর্তমানের ভোগের খাতিরে টেনে আনছিল ঋণের মাধ্যমে, যা আসলে ছিল মার্কিনী নাগরিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এইভাবে বিশ্বায়নের কারণে সামগ্রিকভাবে ধ্বস্ত হয়ে পড়ছিল *মহাভারত*-এর অন্তর্গত 'সুখ' সম্পর্কিত ভারতীয় দর্শনটি, যেখানে অপ্রবাসী, অঋণী মানুষ দিনান্তে নিজের কুটিরে বসে দুটি শাকান্ন খেতে পাওয়াকেই সুখ বলে মনে করত। এর

পাশাপাশি দ্রুত মানুষের শ্রেণিচরিত্র পালটে যাচ্ছিল। সাধারণ মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত হওয়ার দিকে যাত্রা করছিল, কিংবা নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ লেখাপড়া শিখে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার দিকে যাত্রা করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়িত ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার নতুন পরিবর্তনগুলি যে বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছিল তা বলাই যায়।

২.৩॥ **তথ্য-প্রযুক্তি**

একথা ঠিক যে, ভারতে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমহা রাও-এর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে এবং ড. মনমোহন সিংহের অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে (১৯৯১)। তবে বলাই যায় যে, এই ব্যবস্থার পরিগ্রহণে ভিত্তিটি রচনা করেছিলেন পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি। মূলত তাঁর কার্যকালেই ভারতে মুক্ত অর্থনীতির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। তিনিই সেই প্রধানমন্ত্রী যিনি ভারতে আধুনিক কম্পিউটার, টেলিফোন ও তথ্যপ্রযুক্তির জনক।[১০] এজন্য তিনি পাশে পেয়েছিলেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ তথা উদ্যোগপতি স্যাম পিত্রোদাকে। রাজীব গান্ধি তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ভারতকে আধুনিক করে তোলার কাজে কম্পিউটারকে করে তুলেছিলেন অন্যতম চিহ্ন, যা দারিদ্র্যপীড়িত দেশকে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির দ্বারা একবিংশ শতকে উন্নীত করে তুলতে চেয়েছিল। মুক্ত অর্থনীতি আগমনের পর পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীর সেই স্বপ্নই অনেকাংশে সত্যি হয়েছিল। এরফলে কম্পিউটার তৈরি কিংবা আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছিল। **১৯৮৯** সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে কারখানা, অফিস, স্কুল এবং বাড়িতে থাকা কম্পিউটারের সংখ্যা মিলিয়ে সংখ্যাটি দাঁড়াচ্ছে প্রায় একলক্ষ, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অন্তত তিনগুণ।[১১]

কম্পিউটার ব্যবস্থা প্রথমদিকে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা উচ্চমানের গবেষণাকেন্দ্র ছাড়া কম্পিউটার ব্যবহারের কথা ভাবাই যেতো না। সেই কম্পিউটার আকারে যেমন বড়ো ছিল, তেমনি তা স্থাপনের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের প্রয়োজন হতো। সমগ্র ব্যবস্থাটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এর পরবর্তীকালে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়বাহুল্য যখন আরও বেশ কিছুটা কমে এল, বা প্রযুক্তির কারণে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার চাহিদাও যখন শিথিল হয়ে এল, তখন উচ্চবিত্তের বাড়িতে ধীরে ধীরে কম্পিউটার প্রবেশ করে। যদিও জনসংখ্যার নিরিখে তা ছিল খুবই সামান্য। এরপর দু'হাজার সাল পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ভারতে মুক্ত অর্থনীতির বয়স যখন বছর দশেক, সেইসময় থেকে লক্ষ করা যায় যে, প্রযুক্তি কিংবা যন্ত্রাংশের বহুল আমদানির ফলে যন্ত্রাংশের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে মধ্যবিত্তের নাগালে আসে। এর ফলে শুধুমাত্র ব্র্যাণ্ডেড কোম্পানিগুলিই শুধু নয়, স্থানীয় ছোটো উদ্যোগপতিরাও আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের সমন্বয় ঘটিয়ে (Assemble) তুলনায় অনেক কম দামে কম্পিউটারের যোগান দিতে শুরু করলেন। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের কাছে দ্রুত কম্পিউটার পৌঁছে যেতে শুরু করল। এই ক্ষেত্রটি তৈরি হওয়ার অনুকূলে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের নিরিখে ঘটেছিল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে এর কিছুটা চিত্র পাওয়া যায়। ২০০৫ সাল নাগাদ খবরের কাগজে, রাস্তার হোর্ডিং-এ কিংবা টিভিতে একটি বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যেত—'আমার PC'[১২]—যা ছিল সুলভ মূল্যে মধ্যবিত্তের কাছে কম্পিউটার কেনার হাতছানি। ততদিনে তলায় তলায় একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সমকালীন বাম সরকারের সহায়তায় ভারতের নিরিখে তথ্য-প্রযুক্তির বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। নতুন কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ অঞ্চলটি হয়ে উঠেছিল এরই সমার্থক। যেখানে 'বিপিও' ব্যবস্থায় কিংবা কলসেন্টারে

হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা চাকরিরত ছিল। এই চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে নব্বইয়ের দশক পরবর্তীকালে সীমিত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামেগঞ্জেও গড়ে উঠছিল প্রচুর পরিমাণে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাগ্রহণের দৌড়ে এগিয়ে থাকার চাহিদায় দ্রুত বেড়ে চলেছিল এর পূর্ববর্তী ধাপের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা।

যে বাম সরকার সত্তর ও আশির দশকে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার ভয়ে কম্পিউটার ব্যবস্থাকে স্বীকার করতে চায়নি[১৩], কিংবা পরে সরাসরি মুক্ত অর্থনীতির বিরোধিতা করেছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির কারণে আর খানিকটা কালের চাহিদায় তারাও এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় নব্বইয়ের দশকের শেষদিক থেকে সরকারপোষিত বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে কম্পিউটার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকপদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় সরকারি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হয়। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একাধিক স্থানে যুব দপ্তরের উদ্যোগে যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও বিভিন্ন স্তরের উপযোগী কম্পিউটার শিক্ষা সহজলভ্য হয়ে ওঠে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে মাধ্যমিক পরীক্ষা পরবর্তী সময়ের অবকাশে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করে তোলার প্রচেষ্টাও এই সময়ের নিরিখে খুবই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ে যাবে, একসময় টাইপ কিংবা শর্টহ্যাণ্ড শেখবার জন্য যে প্রবণতা দেখা যেত, তা প্রতিস্থাপিত হয় কম্পিউটার শেখবার প্রবণতায়। বিদ্যালয়স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে ‘মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন’। ছাপাখানার

জগতটিরও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এই সময়পর্বে, যখন লেটার প্রেসের দিন শেষ হয়ে জাঁকিয়ে বসে কম্পিউটারনির্ভর ডেস্কটপ পাবলিশিং। এর সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের জগতটিও সাদাকালো কিংবা একবর্ণের দিন ছাড়িয়ে প্রবেশ করে ফোরকালার প্রিন্টিং-এর যুগে।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল। দু'হাজার সাল পরবর্তী সময়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবস্থার সহযোগিতায় তা আরও আধুনিক হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্কে যাওয়ার প্রবণতা অনেক কমে আসে এ.টি.এম. ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে। এর সঙ্গে দ্রুত আসে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং। আরও পরবর্তী সময়ে ইউ.পি.আই. নির্ভর লেনদেন-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটতে দেখা যায়। সর্বার্থেই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ডিজিট্যাল হয়ে ওঠে। তবে এর বিপরীত বাস্তবতাও বর্তমান ছিল। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের অন্যতম প্রধান সহায় যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, তা স্বাধীনতার বহু বছর পরেও সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কাছে ছিল অধরা। শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামে কিংবা নদীবেষ্টিত দ্বীপাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে অনেক পরে। ফলে সেখানে থমকে থাকা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আধুনিক সুযোগ সুবিধা অনেক পরে পৌঁছাতে পেরেছে। এছাড়াও দেখা যায় দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবস্থা গ্রামগুলিতে একবিংশ শতাব্দীর দুই দশক পরেও অধরা। কিছুটা হলেও এইসব নানা কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ মানুষের নির্ভরতার জায়গাগুলি বারে বারে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই জায়গা থেকে তাদের ভরসাস্থল হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল বেসরকারি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কিংবা বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাসমূহকে। পরবর্তীকালে যারা চিটফাণ্ড নামে পরিচিতি লাভ করে। একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকটিতে পশ্চিমবঙ্গসহ সারা ভারতের রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির অবৈধ কার্যকলাপ এবং আর্থিক তছরুপ নিয়ে। এতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের লক্ষ লক্ষ মানুষ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি

সময়ে বা কিছু আগে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারের সুযোগে অনলাইন লটারির রমরমাতেও বহু মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যা তাদের জীবন-জীবিকাতেও প্রভাব ফেলেছিল।

দু'হাজার সালের পরবর্তী এক দশকে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে যে পরিবর্তন এসেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রসার, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অথবা মোবাইল ব্যবস্থার প্রসার। এই দশকের শেষে বা এর পরবর্তী দশকে ডেস্কটপ কম্পিউটারের যুগকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল ল্যাপটপের যুগ। প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত বা টেক স্যাভি প্রজন্মের কাছে সংক্ষেপে যা হয়ে উঠল 'ল্যাপি'। বাজার ছেয়ে গেল অ্যাপল, এইচপি, কম্প্যাক, ডেল, সোনি, লেনোভো ইত্যাদি বিদেশি কোম্পানির ল্যাপটপে। কম্পিউটার জগতের এই বদলের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের কাজের ক্ষেত্রটিকে আর নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট অফিসের সীমানায় বেঁধে রাখতে চাইছিল না। বরং তারা চাইছিল কাজের সময় ছড়িয়ে থাকুক চব্বিশ ঘন্টার যেকোনো সময়েই। কর্মীদের তারা বাঁধতে চেয়েছিল ২৪X৭-এ। তাই ডেস্কটপ কম্পিটারের পরিবর্তে সঙ্গে করে বহনযোগ্য ল্যাপটপের যুগ শুরু হল। শুধু অফিসে নয়, চলার পথেও একটু বসার সুযোগ পেলেই মানুষ কোলে ল্যাপটপ রেখে কাজ করতে শুরু করল। এরসঙ্গে দ্রুতগতির ইন্টারনেটকে জুড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজকে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া কিংবা দ্রুত মিটিং করে নেওয়ার সুযোগও তৈরি হয়ে গেল। কাজের সময়ের শেষে বাড়ি ফিরেও ল্যাপটপ উঠে এল বিছানায়। জৈব ঘড়িকে অতিক্রম করে ব্যবসার টার্গেট পূরণে ছুটে চলা মানব-মানবীর দল হারাতে বসল মানবিক সম্পর্কসমূহকে। বিছানায় পাশাপাশি থাকা দম্পতির মধ্যেও তৈরি হল দূরত্ব। কাজের ফাঁকে অন্তর্জাল মাধ্যমে উঁকি দিতে থাকল অবৈধ সম্পর্কের হাতছানি। পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কবিযুক্ত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকল অতি দ্রুত। ব্যক্তি মানুষের জীবনেও এল অনেক

বদল। অসুখী দাম্পত্য, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদির সংখ্যাগতভাবে বাড়তে লাগল। সন্তানগ্রহণের ক্ষেত্রেও দম্পতিদের অনীহা বৃদ্ধি পেতে থাকল। সর্বতোভাবে মানুষের জীবন হয়ে পড়ল যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত। অর্থাৎ কর্ম 'প্রবল আকার' ধারণ করে 'চারিধার'-কে ঢেকে ফেলল। নতুন অর্থনীতি শ্রমজীবী মানুষের আটঘণ্টা কাজ, আটঘণ্টা বিশ্রাম আর আটঘণ্টা বিনোদনের দাবিকে নস্যাৎ করে নতুন ব্যবস্থায় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল এইভাবে। এর পাশাপাশি ছিল পরিযাণ, যা পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে নতুন আকার দিয়েছিল।

বুর্জোয়া ব্যবস্থা যে বাজার দখলের লক্ষ্যে দ্রুত তার উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে, তা বহু বছর আগেই *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* (১৮৪৮) গ্রন্থে কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) এবং ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) জানিয়েছেন। দেখা গেল ডেস্কটপ থেকে ল্যাপটপে এসেও তাই শেষ হল না, এরপর বাজার দখল করল ট্যাবলেট, বা সংক্ষেপে ট্যাব। ল্যাপটপের থেকে আকারে অনেক ছোটো, হালকা এবং সহজে বহনযোগ্য এই ট্যাব কাজের পাশাপাশি নির্দিষ্ট শ্রেণির স্ট্যাটাস সিম্বলও হয়ে উঠল অনেকক্ষেত্রেই। এর মাধ্যমেও বিনোদনের পাশাপাশি বহুমুখীভাবে কাজের ব্যবস্থাই সম্প্রসারিত হয়েছিল। এর সঙ্গে মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি জুড়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থাকেও ব্যবহার করে বৃহৎ কর্মপরিসরে যুক্ত করে নেওয়ার উদ্দেশ্যটি বর্তমান ছিল। বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন স্তরের মানুষকে ইন্টারনেট ব্যবস্থার সঙ্গে যেন তেন প্রকারেণ যুক্ত করে রাখতে পারলেই নানা উপায়ে সেই জনসমষ্টিকে ব্যবহার করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার মুনাফা অর্জনের পথ তৈরি করে ফেলে। এর পরবর্তী ধাপে তৈরি হওয়া স্মার্টফোন যখন একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাজার দখল করে ফেলল, তখন দেখা গেল বৃহৎ টেলিকম কোম্পানিগুলির মধ্যে বাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা।[১৪] এই লড়াইয়ে প্রথম থেকে এগিয়ে গেল রিলায়েন্স কোম্পানি, প্রথমদিকে খানিকটা লড়াই দিলেও ভারতী এয়ারটেল কিংবা

ভোডাফোন কোম্পানি ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ছোটো ছোটো টেলিকম কোম্পানিগুলি তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।[১৫] ইত্যবসরে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষণায় চলা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বা বিএসএনএল নামক টেলিকম সংস্থা দ্রুত ক্ষতির মুখে পড়ে এবং দেশ জুড়ে এর পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়ে। মাত্র দুই দশকের মধ্যে উন্নতির শীর্ষে ওঠা বি.এস.এন.এল. বেসরকারি পুঁজির সঙ্গে বাজার দখলের লড়াইতে পেরে না উঠে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।[১৬] অবশ্য এই ঘটনার পশ্চাতে সরকারের অবস্থান যথাযথ বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ভারতে টেলিকম কোম্পানিগুলির মধ্যে 'ডাটা'-র লড়াইয়ের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল স্মার্টফোনের জগতে বিপ্লব আসার পর, মূলত ২০১০ বা অধিকতর সংগতভাবে বলতে গেলে ২০১৪ সালের পর থেকে। ২০১৬ সালের রিলায়েন্স জিয়ো কোম্পানি বাজারে নামার পর টেলিকম কোম্পানিগুলির মধ্যে 'ডাটা' (প্রদানের)-র লড়াই মারাত্মক আকার নেয়।[১৭] প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে ১১টি টেলিকম সংস্থার মধ্যে মাত্র চারটি টিকে থাকতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে রিলায়েন্স জিয়ো ছাড়া বাকি তিনটি কোম্পানির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।[১৮] এর আগে দেখা যায় মূলত ২০০৮ সাল নাগাদ ভারতীয় বাজার ছেয়ে যায় বিভিন্ন কোম্পানির সস্তা চিনা মোবাইলে।[১৯] একদিকে যেমন এই ঘটনার ফলে দেশি বিদেশি অন্যান্য মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে যায়, তেমনি এর বিপরীত একটি প্রভাব হিসাবে দেখা যায় সমাজের একেবারে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের হাতে স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তি পৌঁছে গেল। এই ঘটনা তাদের উপার্জন ব্যবস্থা কিংবা সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুতর পরিবর্তন সূচিত করে। বদল ঘটায় তাদের বিনোদন জগতের ক্ষেত্রটিতেও।

ইন্টারনেট ব্যবস্থার প্রসারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম সংস্থা বি.এস.এন.এল. এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৯৫ সালে VSNL কর্তৃক তারযুক্ত ইন্টারনেট ব্যবস্থায় প্রথমে ডায়াল আপ কানেকশনের মাধ্যমে কম গতির ইন্টারনেট ব্যবস্থার প্রসার ঘটে।[২০] এরপর ২০০৪ সালে বি.এস.এন.এল.-এর দ্বারা প্রসার লাভ করে দ্রুত গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা।[২১] এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং থেকে শিক্ষা, চিকিৎসা কিংবা অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। ইতোমধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবস্থারও দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথম থেকে 2G পেরিয়ে 3G প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে থাকে। এর ফলে একদিকে যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটে, অন্যদিকে বিনোদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন ইউটিউবের মতো ওয়েবসাইটগুলি মানুষের বিনোদনের বৃহত্তম যোগানদার হয়ে উঠেছিল, তেমনি 3G পরিষেবার মাধ্যমে ভিডিও কলিং বা অনলাইন ব্যাঙ্কিং সহ বহু কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতি লাভ করে। তবে 2G থেকে 3G-তে পরিবর্তনের অন্তরালে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি খুব সুস্থিত ছিল না। 2G স্পেকট্রাম বন্টন নিয়েও দেশের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। দেখা গিয়েছিল যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা মন্ত্রীরাও এই অভিযোগের আওতাভুক্ত হন। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁদের কাউকে কাউকে আবার কারাগারে নিক্ষিপ্তও হতে হয়েছিল এজন্য।[২২] যাইহোক, 2G, 3G পেরিয়ে যখন 4G ইন্টারনেট ব্যবস্থার পত্তন হল, তখন এক বিপরীত চিত্রের উদ্ভব ঘটল। রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম সংস্থা বি.এস.এন.এল.-এর পরিকাঠামোকে বহুলাংশে ব্যবহার করে বেসরকারি মোবাইল সংস্থাগুলি অগ্রসর হতে থাকলেও 4G নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহক ধরার প্রতিযোগিতায় তারা অনেক এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সবথেকে বেশি বা প্রায় একচেটিয়াভাবে বাজার দখল করে নেয় মুকেশ আম্বানির অধীনস্থ

রিলায়েন্স জিয়ো নামক টেলিকম সংস্থাটি। এর পরের স্থানে ছিল ভোডাফোন এবং তারপরে ভারতী মিত্তল গোষ্ঠীর এয়ারটেল। সেই নিরিখে রাষ্ট্রায়ত্ত বি.এস.এন.এল. ছিল একেবারে পিছিয়ে। তারা বহুকাল পর্যন্ত 3G থেকে 4G পরিষেবায় উন্নীত হতেই পারেনি। অপরদিকে রিলায়েন্স জিয়ো'র একচেটিয়া বাজার দখলের আগ্রাসী পদক্ষেপে ছোটো টেলিকম সংস্থাগুলি পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়। একাধিক ছোটো বা মাঝারি সংস্থা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করে। যেমন ভোডাফোন এবং আইডিয়া সেলুলার মিশে গিয়ে তৈরি হয় ভোডাফোন-আইডিয়া বা ভি-আই।[২৩] তা সত্ত্বেও এই কোম্পানিগুলির উপর চাপে বিশাল ঋণের বোঝা। অন্যদিকে রিলায়েন্স জিয়ো বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত বি.এস.এন.এল. প্রতিযোগিতায় সাংঘাতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে এবং কর্মীদের বেতন দেওয়াটাও তাদের কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সারা দেশ জুড়ে তাদের পরিষেবা বন্ধ হতে শুরু করে। আর এই ফাঁকা জায়গাটি সমুদ্রের জলের মতো এসে দখল করে নেয় শিল্পপতি মুকেশ আম্বানীর পরিচালনাধীন রিলায়েন্স জিয়ো।

তথ্য-প্রযুক্তি, বিশেষ করে মোবাইল তথা টেলিকম ব্যবস্থার প্রসারের ফলে অনেক উপকার সাধিত হলেও শহর তো বটেই, এমনকি গ্রামের আকাশপটেরও পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। বিশাল বিশাল মোবাইল টাওয়ার দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়িয়েছিল গ্রাম-প্রকৃতির মধ্যে আধুনিকতার চিহ্ন হয়ে। যদিও এর আগে পরে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ফলে আকাশপটের পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তবু মোবাইল টাওয়ারের উপস্থিতি এক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন। শুধু আকাশপটের পরিবর্তন নয়, মোবাইল টাওয়ারের সর্বব্যাপী উপস্থিতি পরিবেশবিদদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, কারণ এর রেডিয়েশন উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের উপর বিভিন্ন মাত্রায়

নানান ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল। তবু অর্থনৈতিক কারণে মানুষের মধ্যে মোবাইল টাওয়ার বসানোর প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল ক্রমবর্ধমান।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৯৫ সালে যখন কলকাতায় মোবাইল ফোন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়, তখন তা সীমাবদ্ধ ছিল উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে। পরে তা উচ্চ মধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তের নাগালে আসে। আর এই ব্যবস্থার প্রসারের দুই দশকের মধ্যে একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের হাতেও মোবাইল ফোন পৌঁছে যায়। তা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের রুজি রোজগারের সহায়ক হয়ে ওঠে। পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রগুলিতে তাদের উপস্থিতি আরও দ্রুততা লাভ করে। এর পাশাপাশি মোবাইল ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষির উন্নতির সহায়ক নানা পরিষেবা সরকারি উদ্যোগে প্রদান করা হতে থাকে। এককথায় বলতে গেলে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার এবং তাকে হাতিয়ার করে পুঁজি প্রান্তিকতম মানুষটির ঘরেও পৌঁছে গিয়েছিল মোবাইল ব্যবস্থার দৌলতে। অন্যদিকে মোবাইল এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের প্রান্তিকতম মানুষটিও একটি আধিপত্য সৃষ্টিকারী সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হয়ে উঠছিল, যা নাগরিক কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ প্রান্তের দিকে কেন্দ্রাতিগ বলে ছড়িয়ে পড়ছিল। অর্থাৎ নাগরিক সমাজের সংস্কৃতি কিংবা বিদেশি সংস্কৃতি বা পণ্যদুনিয়ার বিজ্ঞাপন ইন্টারনেটের মাধ্যমে আগ্রাসী ভূমিকায় ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত। এর বিপরীতে গ্রামীণ ভারতের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল। তার কারণ গ্রামীণ ভারতের সংস্কৃতি অনেকখানি সমষ্টিভিত্তিক ছিল। নতুন প্রযুক্তি সেই সমষ্টিকে ভেঙে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হচ্ছিল। কারণ মানুষ বিনোদনকে পেয়ে যাচ্ছিল হাতের মুঠোয়, তার জন্য আর আসরকেন্দ্রিক বিনোদনের দরকার ছিল না। তবে একথা বলাই যায় উপরিউক্ত প্রবণতা বেশি করে দেখা গিয়েছিল বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। যার অন্যতম অনুঘটক ছিল মুক্ত অর্থনীতির বাজারে সস্তা চিনা কিংবা অন্য

ভিনদেশী মোবাইলের দ্রুত অগ্রসরণ। দামে সস্তা হওয়ায় তা দ্রুত সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে যাচ্ছিল। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও ঘটেছে নানাভাবে। দূরদূরান্ত থেকে কাজের বরাত এসেছে মানুষের কাছে মোবাইল ব্যবস্থার মাধ্যমে। ধরা যাক একজন ভ্যানওয়ালা কিংবা একজন কৃষিমজুর—উভয়ের কাছেই কাজের সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে মোবাইল প্রযুক্তি।

প্রত্যেক ভালো ব্যবস্থার কোনো না কোনো নেতিবাচক দিক থাকে, মোবাইল ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। মোবাইল এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির প্রসার অপরাধের নিত্যনতুন উপায় কিংবা মাত্রাগুলিকে বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে যে দিয়েছে, তা নতুন করে উল্লেখের দাবি রাখে না। ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি, পর্ন দুনিয়ার প্রসার, চোরাচালান, নারীপাচার ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ঘটে মোবাইল ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে। তবে এর পাশাপাশি অপরাধ দমনেও যে মোবাইল প্রযুক্তি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছিল তা একটি আশাব্যঞ্জক দিকের সৃষ্টি করে।

বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে ভারতে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পুঁজির প্রসার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির অনেক উন্নতিসাধন করেছিল ঠিকই, তবে সেই উন্নতিসমূহের উপভোক্তার অধিকাংশই ছিল নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণির মানুষ। দরিদ্র মানুষের কাছে তথ্য-প্রযুক্তির সুফল অনেকাংশেই ছিল অধরা। একথা ঠিকই যে, সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে মোবাইল ব্যবস্থার সুফল অনেকখানি পৌঁছেছিল, তবুও বলা যায় এ সত্য নগরকেন্দ্রিক। প্রত্যন্ত গ্রাম-ভারতের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বহুদিন পর্যন্ত তথ্য- প্রযুক্তির সুবিধা বঞ্চিত। প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক রতন খাসনবিশ এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—

> একটা ধারণা আছে যে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব জ্ঞানের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অবসান ঘটাবে, সাধারণ মানুষের কাছে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এই তথ্যপ্রযুক্তি তথ্যের রাষ্ট্রিক সীমা লঙ্ঘন করতে পারে, তথ্যকে মুহূর্তে এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে পারে, কোথাও তাকে কেউ আটকাতে পারে না। কোথাও তার উপর কেউ সেন্সর আরোপ করতে পারে না। একারণেই বহু মানুষ মনে করেন এই বিপ্লব জ্ঞানকে সর্বত্রগামী করে তুলে সাধারণ মানুষকে ক্ষমতাবান করে তুলবে। এ দাবী কতটা ঠিক, তা নিয়ে সংশয় আছে।
>
> কম্পিউটার, টেলিফোন কিংবা মোডেম—এর কোনটাই বিনি পয়সায় পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে গেলে এগুলির যা দাম, সাধারণ নিম্নবিত্ত কিংবা গরীব মানুষের পক্ষে তা বহন করা কঠিন। পাড়ার ক্লাব কিংবা স্কুল অথবা ইন্টারনেট সেন্টারে গিয়ে অনেকে এক সাথে এই প্রযুক্তির সুফল অর্জনের চেষ্টা করতে পারেন। তাতে খরচ অবশ্যই কম। কিন্তু তাহলেও এই সার্ভিসের যা দাম পড়বে, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পক্ষে তার সংস্থান করা কঠিন কাজ।[২৪]

এই উদ্ধৃতি থেকেই আন্দাজ করে নেওয়া যায়, তথ্য-প্রযুক্তির অধিকার কিংবা সুফল কাদের জন্য বরাদ্দ ছিল।

২.৪॥ বিনোদনের জগৎ

ভারতের বিনোদনের জগতটিকে অনেকাংশে রূপ দিয়েছিল বেতার ব্যবস্থা বা রেডিও সম্প্রচার। যদিও তা ছিল ব্যয়বহুল, কিংবা মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই কারণেই বৃহত্তর ভারতের কোণে কোণে বেঁচে ছিল আঞ্চলিক বিভিন্নতাসমৃদ্ধ নিজস্ব বিনোদনের জগৎ। মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে যে বিশ্বায়ন ঘটে, তার ফলে দ্রুত বদলে যায় বিনোদনের জগৎটি। এই ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল কেবল টিভির

প্রসার। ভারতে দূরদর্শনের সূত্রপাতে কয়েকটি মাত্র টেলিভিশন নিয়ে যে বিনোদনের জগতটি গড়ে উঠেছিল, তা বিশ্বায়নের ফলে অবিশ্বাস্য হারে বাড়তে শুরু করে। কেবল টিভির মাধ্যমে দেশি বিদেশি শতাধিক চ্যানেল পৌঁছে যায় মানুষের ঘরে ঘরে। যদিও এই ঘটনা নব্বইয়ের দশকের প্রথমেই ঘটে নি, বরং তার বিস্তৃতিতে লেগে গিয়েছিল আরও একটি দশক। ততদিনে সাদা কালো টিভির যুগ পেরিয়ে গিয়ে বাজার ছেয়ে ফেলেছে রঙিন টিভি বা 'কালার টিভি' আর শহর কিংবা শহরতলি পেরিয়ে গ্রামের দিকেও গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে কেবল চ্যানেলের হাতছানি। প্রথমদিকে পাড়ায় একটি দুটি বাড়িতে টিভি থাকলে মানুষের ভিড় লেগে থাকত সেই বাড়িটিকে ঘিরে। পরে ধীরে ধীরে সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে প্রত্যেকটি বাড়ির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল টিভি। তা বিভিন্ন সিনেমা, সিরিয়াল বা খবরের মাধ্যমে রূপ দিতে থাকল মানুষের চিন্তা চেতনাকে। সংসার কিংবা সমাজ—সব ক্ষেত্রেই এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়তে থাকল। সাধারণ মানুষ টেলিভিশনের দৌলতে অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন বা অধিকার সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। এর পাশাপাশি দেশি-বিদেশি টিভি চ্যানেলের দৌলতে পুঁজিসংলগ্ন সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ঘটল খুব দ্রুত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রেডিও ভারতীয় বিনোদন ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে উপস্থিত ছিল। ভারতে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯২৩ সালে।[২৫] যার জায়গা পরবর্তী সময়ে দখল করে নেয় টেলিভিশন ব্যবস্থা। তবে এর পাশাপাশি বিনোদনের জগতে আরও কিছু যন্ত্রপাতি এসে হাজির হয়েছিল, যেগুলির কথা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। যেমন রেডিওর পরিবর্ত হিসাবে জায়গা করে নিয়েছিল টেপ রেকর্ডার। এতে করে গান ইত্যাদি শোনার পাশাপাশি রেকর্ডিংও করা যেত। ফলে ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব চাহিদা অনুসারে এই যন্ত্রটিকে ব্যবহার করতে পারত। রেডিওর মতো সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠানপ্রবাহের দায় এতে করে এড়ানো

যেত এবং মানুষ তার পছন্দের শিল্পীদের গান সহজেই শুনে নিতে পারত। এই ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বাজারে ছেয়ে যায় সেলুলয়েডের ফিতের ক্যাসেট, যার দুপিঠে পনেরো কুড়িটি করে গান থাকত। ফলে এই অডিও ক্যাসেটের বিপণনও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে মানুষ যখন বিনোদনকে আরও ব্যক্তিসাপেক্ষ কিংবা বহনযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিল, তখন বাজারে এসে গিয়েছিল টেপরেকর্ডারের ক্ষুদ্র সংস্করণ 'ওয়াকম্যান'। নামটি শুনেই যন্ত্রটির তাৎপর্য অনেকাংশে অনুভব করা যায়। এক্ষেত্রে টেপরেকর্ডার হয়ে উঠল পকেটে বহনযোগ্য, যা শোনার জন্য হেডফোন ছিল, যা চলার পথে, যানবাহনে পার্শ্ববর্তী মানুষকে বিরক্ত না করেও শোনা যায়, এবং এর মাধ্যমে একরকম স্টাইল স্টেটমেন্টও গড়ে তোলা যায়। এই যন্ত্রটিতে টেপ রেকর্ডারের মতোই অডিও ক্যাসেট ব্যবহৃত হতো।ওয়াকম্যান প্রথম বাজারে নিয়ে আসে জাপানি কোম্পানি সোনি। ১৯৭৯ সালের ১লা জুলাই থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে ৪০ কোটি ওয়াকম্যান বিক্রি করে এই কোম্পানি।[২৬] এছাড়াও দেশি বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানির ওয়াকম্যান দ্রুত বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। যদিও খুব বেশিদিন যে এই যন্ত্রটি বাজারে জনপ্রিয় ছিল তা বলা যায় না। দ্রুত পরবর্তী উন্নত প্রযুক্তি এসে এর জায়গাটি দখল করে নেয়। ওয়াকম্যানের পাঁচবছর পর সোনি কোম্পানি বাজারে আনে 'ডিস্কম্যান', যা আসলে ছিল বহনযোগ্য সিডি প্লেয়ার, কিন্তু এই যন্ত্রটির চাহিদা সেভাবে তৈরি হয় নি।[২৭] এরপর বাজারে এসেছিল দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্ভাবন (১৯৯৭) এমপি থ্রি প্লেয়ার[২৮]। কিন্তু প্রযুক্তির ঝড়ে তাও জনপ্রিয় হওয়ার বেশিদিন সময় পায় নি।

এমপি থ্রি প্লেয়ার-এর পরবর্তী ধাপে গান শোনার জন্য এসেছিল আইপড, অ্যাপেল কোম্পানি ২০০১ সালে বাজারে নিয়ে আসে এই আইপড। পরবর্তী ১৪ মাসে ছয় লক্ষ আইপড বিক্রি হয়। ২০০৪ সালে শুধু অ্যাপেল কোম্পানি ৮২ লক্ষ আইপড বিক্রি করেছিল। অন্যান্য

কোম্পানিগুলিও ততদিনে আইপড এনে ফেলেছে। আইপড হয়ে উঠেছিল এক ধরনের স্ট্যাটাস সিম্বল।[২৯] ২০০৭ সালে অ্যাপেল হাজির করে আইফোন, যাতে ফোন এবং আইপড উভয়ের কাজই পাওয়া সম্ভব ছিল। এইভাবে বিশ্বের বাজারে স্মার্টফোনের যুগ শুরু হয়। প্রায় সমসময়ে সোনি কিংবা স্যামসাং কোম্পানিও স্মার্টফোন নিয়ে উপস্থিত হয়।[৩০] স্মার্টফোনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনের দুনিয়ায় অভূতপূর্ব সব বদল ঘটে। এরপর অসম্ভব দ্রুততায় স্মার্টফোন হয়ে উঠতে থাকে একাধারে মিউজিক, সিনেমা, গেমস এবং ক্যামেরার সমন্বয়। পাশাপাশি নিত্যনতুন অ্যাপ হাজির হয়ে স্মার্টফোনকে করে তোলে কল্পতরুর সমার্থক।

ওয়াকম্যান থেকে স্মার্টফোন আসার প্রায় সমসময়ে বিনোদনের জগতের আর একদিকে প্রযুক্তির বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই পরিবর্তন ঘটেছিল অপটিক্যাল কমপ্যাক্ট ডিস্ক-এর আগমনের ফলে। এর সূত্রপাত ঘটেছিল **১৯৭৭** সালে সোনি নামক বহুজাতিক কোম্পানির হাত ধরে। পরবর্তীকালে ফিলিপস **১৯৭৯** সালের ৮ই মার্চ ইউরোপের বাজারে সিডি নিয়ে আসে।[৩১] এরপর বাজারে আসে বহনযোগ্য সিডি প্লেয়ার। পরবর্তীকালে কম্পিউটারের সঙ্গে সিডি প্লেয়ার জুড়ে দেওয়া হয়। বিপুল পরিমাণ গান বা অনেকখানি ভিডিও একসঙ্গে ধারণ করতে পারার ক্ষমতা থাকায় সিডি প্লেয়ার খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দ্রুত গতির ইন্টারনেট মিউজিক ডাউনলোড করার সুযোগ নিয়ে হাজির হওয়ার আগে পর্যন্ত সিডি প্লেয়ার জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে ২০০৩ সাল নাগাদ এই জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।[৩২] যার অন্যতম কারণ ছিল বাজারে স্মার্টফোনের আগমন।

ওজনে খুবই হালকা, আকারে গোল চাকতির মতো কমপ্যাক্ট ডিস্কে সহজেই ধরে যেত কয়েকশো গান, বা একটি তিনঘন্টার সিনেমার অর্ধেক অংশ। উপরন্তু টেপরেকর্ডারের

ক্যাসেটের মতো এতে সেলুলয়েডের ফিতে জড়িয়ে যাওয়ার সমস্যা নেই। এর ফলে এই প্রযুক্তি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয় বাজারে সিডি প্লেয়ার এবং সিডি বিক্রির রমরমা দেখা যায়। এর মাধ্যমে আর একধরনের নতুন বিনোদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। শহর কিংবা শহরতলি ছাড়িয়ে গ্রামে গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে এই প্রযুক্তি। আর যাদের এই প্রযুক্তি সরাসরি কিনবার সামর্থ্য নেই, তারা ভাড়া নিয়েও এই বিনোদনকে গ্রহণ করবার রাস্তা তৈরি হয়। এজন্য শহর কিংবা শহরতলিতে তৈরি হয় প্রচুর পরিমাণে সিডি লাইব্রেরি বা সিডি পার্লার, যেখান থেকে পছন্দের সিনেমা কিংবা গানের সিডি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নিয়ে মানুষ বাড়িতে দেখবার জন্য নিয়ে যেতে পারত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণত শ্রেণিগত ভাবে বিনোদনের উপাদান চিরকালের মতোই এই ক্ষেত্রেও ছিল পৃথক পৃথক। গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের বিনোদনের উপাদান আর শহরের অভিজাত বর্গের বিনোদনের উপাদানের তফাতসমূহও দুই ভিন্নক্ষেত্রে উপস্থিত সিডি পার্লারের উপাদানগুলি লক্ষ করলেই বেশ বোঝা যেত। দেখা যেত যে এই সিডি পার্লারগুলি আরও একটু পরে কম্পিউটারের সাহায্যে মোবাইলে গান ভরা কিংবা চাহিদামাফিক মেমরি কার্ডে ভিডিও ভরে দেওয়ার কাজ করত। এইভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গান ডাউনলোড করে বহুল ব্যবহারের কারণে কপিরাইট আইন বা শিল্পীর ন্যায্য পারিশ্রমিকের দিকটি ভীষণভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছিল। এর পাশাপাশি গ্রামের ক্ষেত্রে আর একধরনের চিত্র উঠে আসে। কয়েক বছর আগে যেখানে পুজো পার্বণে সেলুলয়েডের ফিতের ভিডিও ক্যাসেট ভাড়া করে সমষ্টিগত ভাবে ভিডিও দেখার চল ছিল, এই সময়ে সেই প্রবণতা স্থায়ী রূপ পায় গ্রামে গ্রামে ভিডিও হল তৈরি হওয়ার মাধ্যমে। সাধারণত বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে ব্যাটারি বা জেনারেটরের সাহায্যে ভিসিডি প্লেয়ারের মাধ্যমে একধরনের ভিডিও চালানো হত, যেগুলি সদ্য কিশোর কিংবা যুবকদের মানসিক প্রবণতাকে উসকে দিয়ে

অর্থোপার্জন করত। গ্রামের কোনো একটি দিকে চাঁচের বেড়ার হলঘর বানিয়ে এই ভিডিও হল তৈরি হত এবং নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কৌতূহলী দর্শক এই হলগুলিতে প্রবেশের অনুমতি পেত। তবে প্রায়ই সমাজের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষদের তরফ থেকে এই হলগুলিতে নীল ছবি দেখানোর অভিযোগ উঠে আসত। এই হলগুলি গ্রামের পূর্বপ্রচলিত লোকবিনোদনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে কোণঠাসা করে ফেলে এবং একধরনের উত্তেজক যৌন-বিনোদনমূলক সংস্কৃতির প্রসার ঘটায়, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের মাত্রাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, স্মার্টফোন বাজারে সুলভ হওয়ার ফলে প্রত্যেক মানুষের হাতে যখন তা পৌঁছে যায় এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট গ্রামেও সহজলভ্য হয়, তখন থেকে ভিডিও হলগুলির দর্শক দ্রুত কমে যেতে থাকে।

ভারতে বিনোদনের সামগ্রিক যে জগতটি মূলত তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তার পশ্চাতে ছিল বিদেশি প্রযুক্তির বহুল আগমন, যার ফলে মোবাইল বা স্মার্টফোনের যন্ত্রাংশের দাম দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। অনেক সস্তায় তা মানুষের হাতে পৌঁছে যাচ্ছিল। তবে স্মার্টফোনের যুগ আসার আগে আরও কয়েকটি ধাপ লক্ষ করা যায়। সিডি (ভিডিও সিডি কিংবা অডিও সিডি) প্লেয়ার আসবার কিছু পরে দ্রুত বাজার দখল করেছিল তুলনায় অনেক বেশি মেমরি সম্পন্ন ডিভিডি। এক্ষেত্রে দেখা যায় এই প্রযুক্তিকে জায়গা করে দিতে গিয়ে দ্রুত পূর্বের প্রযুক্তিগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কারণ সেগুলিতে আর নতুন এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। এর ফলে ভিসিডি প্লেয়ারের জায়গায় এল ডিভিডি প্লেয়ার। এতে আরও অনেক বেশি সংখ্যায় গান কিংবা গোটা একটি বা একাধিক সিনেমা ধরে যায়। শব্দ কিংবা ছবির গুণমানও এক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। তবে এখানেই শেষ হয়নি প্রযুক্তির অগ্রসরণ। মূলত দুই ধরনের পরিবর্তন যাত্রা এখান থেকে লক্ষ করা যায়। একদিকে ডিভিডির

পরে আরও বেশি মেমরি সম্পন্ন পেনড্রাইভ কিংবা মেমরি কার্ড দ্রুত বাজার দখল করে, অন্যদিকে ডিভিডির জায়গা নেয় ব্লু রে ডিস্ক, যা ডিভিডির তুলনায় অনেক বেশি মেমরি সম্পন্ন ছিল। তবে এই ব্লু রে ডিস্ক খুব জনপ্রিয় হয় নি এর উচ্চ মূল্যের কারণে, অথবা বলা যায় স্মার্টফোনের আগমন মেমরিকার্ডের উপযোগিতা এবং চাহিদাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। পেনড্রাইভের চাহিদার জায়গাটি বজায় থাকে ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের কারণে।

ডিভিডি প্লেয়ারের পরে বাজারে আসে হোম থিয়েটার সিস্টেম।[৩৩] একটি ডিভিডি প্লেয়ার কিংবা ব্লু রে ডিস্ক প্লেয়ার, টিভি স্ক্রিন এবং একাধিক উচ্চ মানের স্পিকারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই ব্যবস্থাপনা উচ্চ মূল্যের কারণে উচ্চ অর্থনৈতিক স্তরের মানুষদের জগতে আবদ্ধ ছিল। সর্বোপরি বলা যায় এই ব্যবস্থাপনাটি গৃহস্থিত হওয়ার কারণে এর বিকল্পের সন্ধান করছিল মানুষ, কারণ এই দ্রুতগতির যুগে বাড়িতে বসে বিনোদন উপভোগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর এই চাহিদা পূরণেই দ্রুত বাজার দখল করে আইপড নামক বিনোদন যন্ত্র, যা পূর্বের ওয়াকম্যানের সমতুল্য ছিল। এতে মূলত গান শোনা যেত। আর সুবিধার বিষয় ছিল যে এটি সর্বত্র বহনযোগ্য ছিল। পরবর্তীকালে স্মার্টফোন এসে এই সমস্ত সুবিধা একটিমাত্র আধারে প্রদান করার কারণে আইপডের দিন শেষ হয়। কারণ স্মার্টফোন একাধারে রেডিও, আইপড, ভিডিও প্লেয়ার, ক্যামেরা কিংবা ল্যাপটপের গুণাগুণকে ধারণ করেছিল।

প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার মানুষের আসরকেন্দ্রিক বিনোদনের জগতটিকে দ্রুত অপসৃত করছিল। যাত্রা-নাটকের দিন ফুরিয়েছিল আগেই। সেই জায়গা দখল করেছিল সিনেমা। তা দেখতেও অনেক মানুষ একত্রিত হত। মুক্ত অর্থনীতি আগমনের পর সিনেমাকে কেন্দ্র করে

গড়ে ওঠা বিনোদনের জগতটি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। এতদিনের শহর, গ্রাম কিংবা মফসসলের সিনেমা হলগুলি মুক্ত অর্থনীতির আশীর্বাদে নতুন গড়ে ওঠা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে না পেরে একে একে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। এগুলির সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত মানুষেরা কর্মহীন হয়ে পড়তে শুরু করে। সেইসব সিনেমাহলের পরিত্যক্ত বাড়িগুলি প্রোমোটারদের হাতে ভাঙা পড়ে তৈরি হতে থাকে বহুতল আবাসন। এর পাশাপাশি প্রযুক্তির উন্নয়নের দ্রুততা এবং সহজলভ্যতায় বিনোদনমাধ্যমকে ঘিরে জড়ো হওয়া মানুষের সংখ্যাও দ্রুত কমে আসে। ধীরে ধীরে প্রযুক্তিকে নির্ভর করে কিংবা কেন্দ্র করে বিনোদন ব্যবস্থা আসরকেন্দ্রিকতা থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে মানুষ একা হয়ে পড়তে থাকে। আর ঠিক এই সময়েই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সামাজিক মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার আগমন ঘটে, যে মাধ্যমটিও প্রকৃতপক্ষে ছিল পুঁজি প্রসারের ক্ষেত্র। একইভাবে তৈরি হয়ে যায় ‘ইউটিউব’-এর মতো ওয়েবসাইট, যেগুলিতে সারা পৃথিবীর বিনোদনের উপাদান ভরা থাকে। অফুরন্ত সেই বিনোদনের দুনিয়া দেখে একজীবনে শেষ করা যায় না। আর এইভাবে বিনোদনের দুনিয়ার এক বৈশ্বিক সাধারণীকরণ ঘটতে থাকে। ধীরে ধীরে এই মাধ্যমটি বিনোদন বিপণনেরও একটি ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। তবে এক্ষেত্রেও কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন কিংবা শিল্পীর পারিশ্রমিকের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সংগীতের জগতটিও অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। এইসময়ে ব্যক্তি শিল্পীর একক সংগীতের পরিবর্তে একাধিক শিল্পীর সমষ্টিগত গান বা ব্যান্ড মিউজিকের চাহিদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পাশ্চাত্য বিনোদন জগতের প্রভাব, যা মুক্ত অর্থনীতিকে ভর করে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল ভারতের মতো দেশের মাটিতে। এই সময়ে একের পর এক ব্যান্ডের আত্মপ্রকাশ, তাদের গানের বদলে যাওয়া ভাষা কিংবা বাদ্যযন্ত্র

ব্যবহারের বিশেষত্ব নির্দিষ্ট সময়টিকে চিনতে সাহায্য করে। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ব্যান্ড মিউজিকের হাত ধরে ভারতীয় লোক ঐতিহ্যের গান প্রসারলাভ করেছিল।

একদিকে যেমন ব্যান্ড মিউজিকের বৃদ্ধি মূলত নাগরিক সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলেছিল, অন্যদিকে বিশ্বায়নের ফলে গ্রামীণ বিনোদনের জগতটিরও দ্রুত বদল ঘটছিল। তবে সেক্ষেত্রে অন্তর্দেশীয় মানব-পরিযাণ অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছিল। তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রভাব সেক্ষেত্রে ছিল অনেক কম। কারণ হিসাবে বলা যায়, বিশ্বায়ন পরিযাণ বৃদ্ধি করেছিল। গ্রামগুলি থেকে শ্রমিকরা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। একটি অংশ সংখ্যায় কম হলেও ছড়িয়ে পড়েছিল বিদেশে। মূলত অন্তর্দেশীয় পরিযাণের ফলে একটি সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটে, যার ফলে সারা ভারতের সংস্কৃতির মিশ্ররূপ গ্রামীণ বিনোদনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ভোজপুরী গান বাংলার গ্রামে গঞ্জে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। যে কোনো ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠান অথবা বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই ভোজপুরী গানের রমরমা অন্তর্দেশীয় পরিযাণের ভূমিকাটিকে মনে করিয়ে দেয় অবধারিতভাবেই।

২.৫॥ **শিক্ষাব্যবস্থা**

মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার পর ভারত যে বিশ্বায়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাব্যবস্থাকেও বহুলাংশে প্রভাবিত করে। নব্বইয়ের দশক পূর্ববর্তী শিক্ষাব্যবস্থা এবং নব্বইয়ের দশক পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ করলে বিশ্বায়নের প্রভাবের স্বরূপটি অনেকখানি বোঝা যেতে পারে।

নব্বইয়ের দশকের আগে পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রধানত সরকারি পৃষ্ঠপোষণায় একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাটি নিয়ন্ত্রিত হত। সেখানে বেসরকারি বিদ্যালয় কিংবা মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল খুবই হাতে গোনা। বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয় তো ছিলই না। তা প্রথম গড়ে ওঠে ভারত সরকার মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার পর—১৯৯৫ সালে (সিকিম মণিপাল বিশ্ববিদ্যালয়)।[৩৪] ইউজিসি প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী ১৮ই জুন, ২০২১ তারিখে ভারতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮০টি।[৩৫] একটি বাদে বাকি ৩৭৯ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই গড়ে উঠেছে একুশ শতকে। অন্যদিকে একই তারিখের হিসাব অনুযায়ী ভারতে সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬০৮ টি (এর মধ্যে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত)।[৩৬] অর্থাৎ বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতি সর্বমোট বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যার ৩৮.৪৬ শতাংশ। এই হিসাব থেকে বোঝা যায় মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলাফল শিক্ষাব্যবস্থায় কীভাবে পড়েছে।

স্বাধীন ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল, তাতে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণ থাকলেও সেখানে দেশীয় পদ্ধতি কিংবা বিষয় বা ভারতকেন্দ্রিক শিক্ষা অনেকাংশে গুরুত্ব পায়। এর পাশাপাশি দেখা যায় স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মাতৃভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের যে দাবি দেখা গিয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে রাজ্যগুলি মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক কিংবা তার পরবর্তী ক্ষেত্রেও শিক্ষা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিল। তবে যে ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি, সেখানে ইংরেজি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়। যেহেতু স্বাধীন ভারতের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বুনিয়াদী শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটানো, তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে এই প্রবণতার মধ্যেও একশ্রেণির মানুষ ইংরেজি ভাষার

মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী ছিলেন। খুব প্রসারিত না হলেও তাঁরা স্বল্প প্রসারিত বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় কিংবা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে সন্তান সন্ততিদের শিক্ষাদানে উৎসাহী ছিলেন। উনিশশো নব্বইয়ের দশকের কিছু আগে থেকে ইংরেজি মাধ্যমে সন্তানকে পড়ানোর প্রচেষ্টা অনেক বৃদ্ধি পায়। কারণ হিসাবে বিশ্ব অর্থনীতির ওঠাপড়াকে চিহ্নিত করা যায়। যার নিরিখে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ দেশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ না থেকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী ছড়িয়ে পড়তে চাইছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। তারা বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হয়ে উঠতে চাইছিল । তাই এইসময় থেকে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রচলিত মূল ধারার ডিগ্রি কোর্সে পড়ার পাশাপাশি কারিগরি বিদ্যা পড়বার চাহিদাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এই শিক্ষাগ্রহণের পরবর্তীকালে বেসরকারি চাকরিক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ার প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষায় সড়োগড়ো হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়তো, যে কারণে ইতিমধ্যে বাংলা মাধ্যম থেকে আগত শিক্ষার্থীরা তুলনায় পিছিয়ে পড়তে থাকল। বরং তুলনায় কম মেধার অনেক শিক্ষার্থী ভাষাগত দক্ষতার কারণে উচ্চতর বেতনের চাকরি পাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। এই ধরনের বাস্তব অবস্থায় ভাষা যেখানে যোগ্যতার অন্যতম নির্ণায়ক হয়ে উঠেছিল, সেক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ের অভিভাবকরা বাধ্যতামূলকভাবে সন্তানকে শৈশব থেকে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ানোয় প্রয়াসী হন। ফলস্বরূপ নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। এর পশ্চাতে অন্য একটি কারণও ছিল। ১৯৮২ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে ইংরেজি ভাষাশিক্ষাকে তুলে দেয়। কারণ হিসাবে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা রোখা, উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করা কিংবা মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করার দিকগুলিকে তুলে ধরা হয়। তবে এই পদক্ষেপে অনেক ধরনের সুবিধা

হলেও বিশ্ব অর্থনীতির নিরিখে বাঙালি জাতির পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হিসাবে এই পদক্ষেপকে তুলে ধরা হয়। প্রায় সিকি শতাব্দী পরে ২০০৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আবার প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষাশিক্ষাকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ১৯৮২ সালে গৃহীত সেই সিদ্ধান্ত নাগরিক কিংবা গ্রামীণ জনসমষ্টিকে খুশি করতে পারেনি। ফল হিসাবে টিউশন পড়ার হার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।[৩৭] এই সময়টির কথা অধ্যাপিকা শমিতা সেন তাঁর 'Abolishing English in schools: implications for higher education in West Bengal' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন—

> In 1982, the then ruling Left Front government in West Bengal (India) abolished the teaching of English from its primary schools. The move led to a high-pitched controversy over the social importance of teaching English, and when and how it should be taught. The main arguments in favour of the decision were to confront the elitism inherent in giving primacy to a "foreign" language and to promote higher enrolment and reduce drop-out rates. Those opposed to the decision spoke of redrawing class maps and the difficulties of negotiating a nation of many languages with fluency in only one regional language. Over the years, there were more complex arguments; moreover, demand for English among the rural poor led to a greater demand for private schools or private tuition. The abolition of English was accompanied by major interventions in Bangla language-teaching, which were also hotly debated within the academy. Twenty-five years later, in 2007, a new-look Left Front government sought to reverse the decision and re-introduce English into primary schools. There was

opposition within the government from those who had been votaries of the previous decision. The reversal was endorsed by government, however, despite vocal protests.[৩৮]

এইরকম একটি অবস্থায়, যখন প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে ইংরেজি ভাষাশিক্ষাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তার কাছাকাছি সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চবিত্তদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত—এমনকি একসময় নিম্নবিত্ত জনগণও বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতে থাকে। সেই সময়ের কিছু পরেই ভারত সরকার মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে এই প্রবণতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সরকারি নীতির বদল ঘটবার কারণে ভারতে বিদেশি পুঁজির আগমন পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ হয়। একইসঙ্গে দেখা যায় সরকার যেসব ক্ষেত্রগুলিকে এতকাল সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে এসেছে, সেখানেও বিদেশি পুঁজির প্রবেশ ঘটায় সরকার সেই ক্ষেত্রগুলি থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রগুলি সংকুচিত হতে থাকে। নতুন যুগে বহুতর যে সব ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছিল সেই ক্ষেত্রগুলিতে বিভিন্ন ধরনের চাকরির সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু সেগুলি পাওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা এবং কম্পিউটার শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে। পূর্ববর্তী আলোচনায় এই দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

বহুজাতিক পুঁজির বিনিয়োগে ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটিতে চাকরিবিষয়ক প্রচলিত ধারণার বদল ঘটে। বদল ঘটে দশটা-পাঁচটার চাকরির সময়গত ধারণারও। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের প্রসারের ফলে চাকরির সময়েরও বদল ঘটে। এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় বিপিও কিংবা কল সেন্টারের চাকরির ক্ষেত্রে। কারণ পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে তাদের

কর্মক্ষেত্রের সংযোগ ছিল। তাদের দেশে যখন দিন, ভারতে তখন রাত। কিন্তু ব্যবসার কারণে সারারাত জেগে পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সারা ভারতেই বিপিও-কেন্দ্রিক কলসেন্টারে চাকরি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এগুলিকে সংক্ষেপে বলা হয় পরিষেবা ক্ষেত্র। যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা, হোটেল পরিষেবা, ভ্রমণ ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিষেবা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বা ম্যানেজমেন্ট এডুকেশনের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। একইসঙ্গে সবরকম পরিষেবার জগতে ম্যানেজমেন্ট শিক্ষায় শিক্ষিত প্রার্থীদের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। সেজন্য দেখা যায় যে স্বাধীন ভারতে ষাটের দশকে আইআইএম প্রতিষ্ঠা হওয়া শুরু হলেও মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার আগে পর্যন্ত তার সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা নব্বইয়ের দশকের পর থেকে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।[৩৯] দেখা যায় যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করার পর ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি নেওয়ার প্রচলন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট এর ডিগ্রিগুলিও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করছিল। যেমন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, হসপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট, হসপিট্যালিটি ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।

ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থার গঠনটি অনুসরণ করলে দেখা যায় তার গঠনটি প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত ১০+২+৩+২—এইরকম। সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেই মুক্ত অর্থনীতি-পূর্ববর্তী সময়ে শিক্ষা সম্পন্ন করার চেষ্টা করতো শিক্ষার্থীরা। কিন্তু মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তী সময়ে প্রথাগত এই স্তর বিভাজনকে অতিক্রম করে ১০+২ স্তরের পর পেশাভিত্তিক শিক্ষা অর্জন করার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা কিংবা আইন পেশায় যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে বেশি প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল ডিগ্রি কিংবা

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ক্ষেত্রে। এছাড়াও মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে আইটিআই পড়বার চাহিদাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। কারণ এইসব ক্ষেত্রগুলি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে যোগদানের প্রভূত সুযোগ তৈরি হয়। তাই দেখা যায় বিশ্বায়নের এক দশক পরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের জোয়ার। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার স্বল্পতাকে এর পশ্চাতের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ঘটেছিল অনেক দ্রুত, তাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চাহিদায় দক্ষিণভারতমুখী স্রোত ক্রমবর্ধমান ছিল। দু'হাজার সাল পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এই স্রোত অনেকাংশে হ্রাস পায়, কারণ ততদিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে উঠেছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রবণতা প্রায় দুই দশক ধরে বজায় থাকলেও প্রথম এক দশক পরেই পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার উৎসাহে অনেকখানি ভাটা পড়ে যায়। এর পশ্চাতে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত দেখা যায় সারা পৃথিবী কিংবা ভারতের নিরিখে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা বাজারের চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ২০০৭-২০০৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বজোড়া যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা যায়, যার সূত্রপাত আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার[৪০] হাত ধরে, তার প্রভাবে ভারতীয় আইটি সেক্টরের বৃদ্ধি অনেক কমে যায়। যার সরাসরি প্রভাব এসে পড়ে নিয়োগক্ষেত্রে। এইকারণে এই সময়ে, বা বলা ভালো ২০১০ সাল পরবর্তী সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চাহিদা অনেকাংশে হ্রাস পায়, আর তার অনেকখানি ছিল আইটি শাখায়। আরও একদশক পরে ২০২০ সালে এসে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রথমসারির সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানে চল্লিশ শতাংশের বেশি আসন খালি থেকে যাচ্ছে।[৪১] এই সময়ে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা

আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। অনেক ছাড়ের প্রলোভন দেখিয়েও তারা ছাত্র জোটাতে পারছিল না। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার স্রোতে ভাটা পড়ার বিভিন্ন কারণসমূহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে কিছু প্রবণতা উল্লেখযোগ্য। আশি এবং নব্বইয়ের দশকে পুঁজিবাদের প্রবল বিরোধিতা করা এবং কলকারখানায় জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা বামফ্রন্টভুক্ত একাধিক দল যখন দেখেছিল যে এভাবে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প অর্থনীতি অগ্রসরণের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে, তখন পার্টিগুলির অভ্যন্তরে এ নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা শুরু হয়। শিল্প সহায়ক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু করে তারা।[৪২] ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করার পর শিল্পায়নে জোর দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে হুগলি জেলার সিঙ্গুরে বহুফসলি কৃষিজমি সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে টাটা কোম্পানির ন্যানো মোটর কারখানা গড়ার সহায়তার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে প্রবল বিতর্ক এবং রাজনৈতিক বিরোধের সূত্রপাত হয়। যার ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন এবং সিঙ্গুরে টাটার কারখানা স্থাপনের প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে তা চলে যায় গুজরাটের সানন্দে।[৪৩] এরপর এই আন্দোলনের সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গে কোথাও শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এর পরবর্তীকালে ২০১১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। ইতোমধ্যে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে শিল্পগোষ্ঠীগুলিও বিনিয়োগে সাহস দেখাতে সক্ষম হয়নি সেভাবে। ফলে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু শিল্প গড়ে ওঠা ছাড়া শিল্পক্ষেত্রে বৃহৎ বিনিয়োগ সেভাবে না হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়নি। তাই দেখা যায় যে কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া এর পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা গ্রহণ করা যুবক যুবতীর দল পেশাগত কারণে বেঙ্গালুরু কিংবা হায়দরাবাদ

কিংবা দিল্লিকেন্দ্রিক হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কারণ এই শহরগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা পরবর্তী কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রটিও মুক্ত অর্থনীতি কিংবা বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে দূরে ছিল না। উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে ব্রিটিশ ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি—বিশেষত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতির চর্চা এবং জনপ্রিয়তা—দুইই বৃদ্ধি পায়। তবে এই অগ্রগতির প্রথম দিকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতির যে খুব রমরমা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তা জনপ্রিয়তায় কখনো কখনো অ্যালোপ্যাথিকেও অতিক্রম করে যেত। এতৎসত্ত্বেও নিরন্তর গবেষণা এবং বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতি সারা বিশ্বে প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই চিকিৎসাপদ্ধতি যে বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন একের পর এক নতুন আবিষ্কারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তা ইতিহাস থেকে জানা যায়। যাইহোক, ভারতে এই চিকিৎসাপদ্ধতি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমানে এই গবেষণার পরিসরে সেই চিকিৎসাবিদ্যার চালিকাশক্তি এবং পরিচালনার বদলের দিকগুলি এক্ষেত্রে আলোচ্য।

দেখা যায়, ভারতের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তীকালে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতি হাতে গোনা কয়েকটি হাসপাতাল ছাড়া খুব একটা প্রয়োগ করার জায়গা ছিল না। অল্প কিছু শিক্ষিত চিকিৎসক মেডিক্যাল কলেজগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন কোণে কোণে ডিসপেনসারি খুলে এলাকাগতভাবে মানুষের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করতেন। তাঁদের ডিগ্রি বর্তমানের তুলনায় অনেক কম থাকলেও তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতি মূলত ছিল শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতানির্ভর। প্রযুক্তির ব্যবহার তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতিতে ছিল অনেক কম।

চিকিৎসার বিনিময়ে তাঁরা সম্মান এবং অর্থ—দুইয়েরই অধিকারী হতেন। স্বাধীন ভারতে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন স্তরের চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। বলা যায় যে মুক্ত অর্থনীতিকে গ্রহণ করার পূর্বে দেশের সিংহভাগ স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান সরকারি পরিচালনার অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে দেশি বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির বিনিয়োগে নতুন প্রতিষ্ঠিত নার্সিংহোম কিংবা হাসপাতালগুলি বেসরকারি পরিচালনাধীন হয়। এর ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থাতেও দুটি ধারা তৈরি হয়। সরকারি এবং বেসরকারি। বলাই বাহুল্য যে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিত্তবান মানুষদের ভিড় বাড়তে থাকে। অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার বিভাজন রেখা আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।[৪৪]

নতুন গড়ে ওঠা বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিচালনতন্ত্রের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বদল লক্ষ করা যায়। এতদিন পর্যন্ত সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় পরিচালনতন্ত্রে প্রাধান্য লাভ করতেন চিকিৎসকেরাই। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দিকটি বাদ দিলে চিকিৎসাব্যবস্থার দিকটি ছিল তাঁদের পরিচালনাধীন। কিন্তু বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনব্যবস্থার শীর্ষে হাজির হলেন ব্যবসায়ী শ্রেণি। চিকিৎসকদের কেউ কেউ সেখানে থাকলেও একদিকে তাঁদের মতামত ছিল গৌণ এবং সীমাবদ্ধ, অন্যদিকে এই ক্ষেত্রের পরিচালনব্যবস্থা নির্ভর করতে শুরু করে ম্যানেজমেন্টের পাঠ গ্রহণ করে আসা একদল পদাধিকারীর উপর। যাদের প্রধানতম লক্ষ্যই ছিল প্রতিষ্ঠানকে বিপুল মুনাফা লাভ করানো। এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করার ক্ষেত্র ছাড়া সম্পূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থার নিরিখে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তাঁদেরকে হয়ে পড়তে হয় নিছক বেতনভোগী কর্মচারী। তাঁরা নির্দিষ্ট চুক্তির অর্থ পেয়ে চিকিৎসা করতে থাকেন আর বিপুল মুনাফা হস্তগত হতে শুরু করে ব্যবসায়ী শ্রেণির। ইতোমধ্যে চিকিৎসাপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটে গিয়েছিল। প্যাথোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি কিংবা সামগ্রিকভাবে ল্যাবরেটরির ব্যবহার

বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এরফলে চিকিৎসা প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের জন্য আরও সহযোগী বহু পেশার সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন ল্যাব টেকনিশিয়ান। চিকিৎসকরাও এই সময় থেকে রোগ নির্ণয় কিংবা নিরাময়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েন। ফলে রোগী কিংবা তার পরিবারের চিকিৎসাব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তা যারা নির্বাহ করতে পারত না, তারা চিকিৎসাব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের উপরেই নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হতো। অন্যদিকে চিকিৎসাব্যবস্থার এককালীন বিপুল ব্যয় নির্বাহ করতে সব মানুষের ক্ষমতা না থাকায় চিকিৎসাবিমার রমরমা দেখা যায়। উচ্চবিত্তরা তো বটেই, মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্তরাও চিকিৎসাবিমা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণে এগিয়ে আসে।[৪৫] পরবর্তীকালে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় জনগণকে বিনামূল্যে বিমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কিছু তাৎক্ষণিক সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করলেও সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রে তা স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বেসরকারিকরণের হাতকেই শক্ত করে তোলে। সামগ্রিকভাবে অন্যান্য বহুতর ক্ষেত্রের মতো স্বাস্থ্যক্ষেত্রও বিমাব্যবসার চারণভূমি হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি দেখা যায় বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলিও মুনাফা অর্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র করে তোলে চিকিৎসাব্যবস্থাকে। চিকিৎসকদের একটি বড়ো অংশকে তারা বিভিন্ন লোভনীয় সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশেষ বিশেষ ব্র্যান্ডের ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখতে উৎসাহিত করে তোলে। যদিও এই সমস্ত প্রকল্পের লক্ষ ছিল রোগী কিংবা তার পরিবার থেকে অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন। সামগ্রিকভাবে এই চিকিৎসাক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে ওষুধ কোম্পানিগুলির মধ্যেও দেখা যায় একরকম অসাধু প্রতিযোগিতা। তা দমনে সরকার কখনো কখনো বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন প্রেসক্রিপশনে ব্র্যান্ড নেম-এর পরিবর্তে ওষুধের জেনেরিক নেম ব্যবহার করতে চিকিৎসকদের

বাধ্য করা ইত্যাদি গ্রহণ করলেও তা কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে তা এ বিষয়ে যথাযথ গবেষণাই বলতে পারবে।

চিকিৎসকের পেশা বর্তমান সময় থেকে দুই শতাব্দী পিছিয়ে গেলে দেখা যায় তা এতখানি প্রার্থিত ছিল না। বরং বৈদ্য জাতি ব্রাহ্মণের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে স্থিত ছিল। শব ব্যবচ্ছেদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত কিংবা ঘৃণ্য। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৩৬ সালে মধুসূদন গুপ্ত যখন এই কাজে প্রথম এগিয়ে আসেন, তা নিয়ে সমাজে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল।[৪৬] তবে প্রায় দুই শতাব্দী পরে যে চিকিৎসকের পেশা সারা পৃথিবীর মতো ভারতেও এত সমাদৃত, তার অন্যতম কারণ এই পেশার আর্থিক সচ্ছলতা। ভারতের ক্ষেত্রে যার অনেকখানি বৃদ্ধি ঘটেছিল মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তী ক্ষেত্রে। হয়তো সেই কারণেই দেখা যায় ভারতীয় সিনেমা কিংবা সিরিয়ালের দুনিয়াতেও চিকিৎসক চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে বিভিন্ন পৃথক পৃথক শাখায় শিক্ষা গ্রহণের সামগ্রিক হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে শিক্ষার ক্ষেত্রটি পরিবর্তিত কিংবা নতুন রূপ প্রাপ্ত হচ্ছিল বাজারের চাহিদাকে মাথায় রেখে। শিল্পসংস্থাগুলি চাইছিল তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন এবং সেই উৎপাদন অভিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। এজন্য দেখা যাচ্ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের পাঠ্যসূচি বাজারকে মাথায় রেখে নির্মাণ করার দিকে ঝুঁকছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে পড়ার শেষে চাকরি বা প্লেসমেন্টের সুবন্দোবস্তে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি নির্ভর করে। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিও নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ-এর আয়োজন করে। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আইআইটি গুলিতে কর্মী নিয়োগের জন্য গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজন, মাইক্রোসফট, উইপ্রো, ইনফোসিস, কগনিজ্যান্ট প্রভৃতির মতো

সংস্থাগুলি ভিড় করতে থাকে। এইসব প্রবণতার পাশাপাশি দেখা গিয়েছিল যে মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তীকালে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০-৯১ বর্ষে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল (কেন্দ্রীয়, রাজ্য, প্রস্তাবিত এবং বেসরকারি সহ) ১৮৪টি । ২০০৪-০৫ বর্ষে তা দাঁড়ায় ৩৪৮-এ।[৪৭] সেই সংখ্যাটি ২০২১ সালে পৌঁছায় ৯৮৮ টিতে।[৪৮] ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণের হার বেড়ে যায়। কারণ নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। যদিও উল্টোদিকে একথাও সত্য যে বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে পরোক্ষে বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় এবং তারা গ্রামগুলি থেকে শ্রমিক হিসাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বায়ন পর্বে প্রয়োজনীয় প্রচুর অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদার ক্ষেত্রটিতে শ্রমিক হিসাবে চটজলদি রোজগারের হাতছানি পরোক্ষে তাদেরকে শিক্ষাঙ্গনের বৌদ্ধিক পরিশ্রমসাপেক্ষ সাফল্যের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ বিশ্বায়ন একপ্রকার বৈপরীত্য কিংবা বৈষম্য তৈরি করেছিল। তারই প্রভাবে দেখা গিয়েছিল একদিকে যখন শহরের বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্র ‘ট্যাব’ ব্যবহার করছে, ঠিক তখনই হয়তো গ্রামের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মিড-ডে মিল-এর থালা ধুইছে। এতৎসত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই কারণেই ধ্রুপদী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি নতুন যুগের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। আর একটি তথ্য এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পূর্বের তুলনায় উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরফলে নারীর সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রেও অনেক বদল ঘটে।

২.৬॥ **নির্মাণ ক্ষেত্র**

ভারত সরকার মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার পর যে বিশ্বায়নব্যবস্থার অংশ হয়ে পড়ে তার অন্যতম মাত্রা ছিল নগরায়ণ। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে গ্রামসমাজের বৈচিত্র্যকে অপসারণ করে একমুখী নগরায়ণ ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নগরায়ণ মানেই নির্মাণক্ষেত্রের প্রসার ঘটা। বিশ্বায়নের হাত ধরে কলকারখানার সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি দ্রুত গড়ে উঠেছিল প্রচুর শপিং মল, ব্রিজ, দ্রুতগতির রাস্তা ইত্যাদি। আর এইসব ক্ষেত্রে প্রসার ঘটেছিল নির্মাণশিল্পের। প্রচুর শ্রমিকের দরকার হয়ে পড়েছিল এই ক্ষেত্রগুলিতে। এরা মূলত অদক্ষ শ্রমিক হলেও এদের উপরে থাকত শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার শ্রেণি। যাদের নির্দেশমতো ঠিকাদারের অধীনে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলি শ্রমিকরা সম্পাদন করত। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল রাস্তা, ব্রিজ, বহুতল ব্যবসাকেন্দ্র কিংবা অন্যান্য নির্মাণগুলি।

বিশ্বায়নের ফলে দেশি বিদেশি পুঁজি বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। এক্ষেত্রে বলা যায় এই 'বাজার'-এর সংজ্ঞা বহুবিধ। একদিকে তা যেমন ক্রেতাগোষ্ঠীকে বোঝায়, তেমনি ভৌত বাজার ব্যবস্থা, অর্থাৎ যেখানে দৈনন্দিন কেনা বেচা হয়, সেইরকম স্থানগুলিকেও বোঝায়। এই আলোচনায় আমাদের মনে পড়ে যাবে বহুদিন পর্যন্ত গ্রামীণ অর্থনীতিতে 'হাট' নামক যে বেচাকেনার আসর বসত, তার স্থিতিকাল ছিল সাপ্তাহিক কিংবা সপ্তাহে দিন দুয়েকের জন্য। সেখানেই ক্রেতা-বিক্রেতারা সমবেত হয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আদানপ্রদান করত। সেই নিরিখে বলা যায় যে মানুষের চাহিদা ছিল একান্তই ন্যূনতম প্রয়োজন নির্ভর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস কেনার সামর্থ্য মানুষের বেড়ে গিয়েছিল নাগরিক জীবনে, বিশেষত মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তী ভোগবাদের জোয়ারে। যে কারণে বাজারের সময়গত বিস্তার

গ্রামীণ হাটের সেই সাপ্তাহিক ব্যবস্থা অতিক্রম করে প্রাত্যহিক তো বটেই, এমনকি প্রতিদিনের সর্বক্ষণের হয়ে ওঠে। আজকের দিনের নিরিখে বলা যায় মানুষ সর্বদাই এক বাজার ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়ে বাস করছে, যেখানে অনলাইন শপিং-এর উপস্থিতিতে সপ্তাহে সব দিন এবং চব্বিশ ঘণ্টাই বাজার করার সময়। তীব্র প্রতিযোগিতার জগতে মানসিক চাপগ্রস্ত মানুষ এখন মন ভালো রাখবার জন্য বাজার করে। এই নতুন বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রথম দিকে আবির্ভাব হয়েছিল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে কয়েক লক্ষ বর্গফুট এলাকাযুক্ত বিশাল বিশাল সব শপিং মল। তা গড়ে উঠতে থাকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। আস্তে আস্তে তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে শহর ছাড়িয়ে শহরতলির দিকে এবং আরও পরে তা পৌঁছে যায় গ্রামীণ এলাকার কাছাকাছি। বাজারের এই বিপুল সম্প্রসারণ স্বাভাবিকভাবেই প্রসারিত করেছিল নির্মাণক্ষেত্রকে। এই শিল্পে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আর সেই সময়ে অন্যদিকে দেখা দিয়েছিল কৃষিক্ষেত্রের অবনমন। কৃষিতে পূর্বের তুলনায় লাভ কমে আসছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ব্যক্তিপিছু জমির পরিমাণ কমে আসছিল। কৃষি উৎপাদন থেকে যখন গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জনের সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, তখন নির্মাণশিল্পে অংশগ্রহণ বহু মানুষের রুটি রুজি যোগায়। ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকরাও উপার্জনের নতুন দিশা পায়। লক্ষ করা যায় যে কৃষিশ্রমিক পূর্বপ্রজন্মের পেশা ত্যাগ করে শিল্পশ্রমিকে পরিণত হচ্ছে এক বৃহৎ জনসংখ্যা, যার একটি বড় অংশ নির্মাণশ্রমিক।

দেশের অভ্যন্তরে পুঁজির প্রসারের জন্য যে সমস্ত হাতিয়ার প্রয়োজন ছিল, তার অন্যতম হল রাস্তাঘাট। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন বাণিজ্যের অন্যতম শর্ত। তাই দেখা যায় মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার এক দশকের মধ্যে ভারতে দু'হাজার সালের পনেরোই আগস্ট ঘোষিত হয় 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'-র মতো প্রকল্প।[৪৯] পরবর্তী দুই দশকে যা

গ্রামীণ ভারতের রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নয়ন ঘটায়। দেশের অভ্যন্তর থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা এবং উৎপাদিত পণ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাস্তা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই নির্মাণের জায়গাটিতেও প্রচুর অদক্ষ নির্মাণশ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছিল এবং এই ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগে অনেক কোম্পানি এগিয়ে আসে। রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজনে দরকার হয় নতুন নতুন ব্রিজ নির্মাণের। এই ক্ষেত্রগুলিতেও অংশগ্রহণ করে বিদেশি নির্মাণ কোম্পানিসমূহ। বর্তমানে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রাস্তা নির্মাণে একশো শতাংশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)-কে স্বাগত জানানো হয়েছে।[৫০] এছাড়াও দেশের বিভিন্ন শহরে পরিবহণের উন্নতির কারণে এবং রাস্তার ধারণক্ষমতা এবং গতি বাড়ানোর জন্য ফ্লাই ওভার বা উড়ালপুল নির্মিত হয় দ্রুতগতিতে। এর অন্যতম লক্ষ্যই ছিল একদিকে বিপুল জনসংখ্যার গতি অব্যাহত রাখা, অন্যদিকে পুঁজির বিকাশে সহায়তা করা। তাই শহরের ভূগোল ছাড়িয়েও দেখা যায় দেশের বিভিন্নপ্রান্তে দ্রুতগতির রাস্তাগুলিতেও উড়ালপুল নির্মাণের আধিক্য দেখা যায়। বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে পুঁজির অবাধ বিস্তারের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংযোগকারী 'এক্সপ্রেসওয়ে' সমূহ নির্মিত হতে থাকে। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পণ্য এবং পুঁজির বিস্তার ঘটাতে সক্ষম। দ্রুতগতির রাস্তাঘাট নির্মাণে দেশের বাজেটে বড়ো মাপের বরাদ্দ ছাড়াও বিদেশি অনুদান এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল।

শুধুমাত্র রাস্তাঘাট কিংবা বড়ো বড়ো ইমারত নয়, গণপরিবহণ ব্যবস্থারও দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে। কলকাতার ক্ষেত্রে এককালে মাটির তলায় সীমাবদ্ধ মেট্রো রেল বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে শহর ছাড়িয়ে আরও সম্প্রসারিত হয়। যাত্রীবহনক্ষমতা কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ভূগর্ভ ছাড়িয়ে তা উড়াল দেয় শহর ছাড়িয়ে শহরতলিতে বিস্তৃত উড়ালপুলের উপর দিয়ে। এক্ষেত্রে উড়ালপুলের নিচের গাড়ি চলাচলের রাস্তাগুলিও

বজায় থাকে। মোটের উপর দেখতে গেলে প্রকৃত প্রস্তাবে রাস্তাগুলিও হয়ে ওঠে দ্বিতল কিংবা ত্রিতল। আর এই মেট্রোরেলের মতো ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গিয়ে দ্বারস্থ হতে হয় বিদেশি প্রযুক্তি কিংবা পুঁজির। যেমন কলকাতা মেট্রো-র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর নির্মাণে জাপানের Pacific Consultant International Group ২০০৪ সালে এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নিরূপণ করে। এরপর Japan Bank for International Cooperation প্রকল্পটির ৪৫ শতাংশ ব্যয় নির্বাহে সম্মতি প্রদান করে এবং ২০০৭ সালে ব্যাঙ্কটি ৮৫৬.৪০ মিলিয়ন ডলার অগ্রিম ঋণ প্রদান করে।[৫১] যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রেও আর এক ধরনের পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। ইতোপূর্বে শহরে সীমাবদ্ধ মেট্রো রেলে মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাত্রীর যে পরিমাণ আধিক্য ছিল, তা মেট্রো সম্প্রসারণের পরে দ্রুত হ্রাস পায় নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির যাত্রী সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে। এছাড়াও দেখা যায় শহরতলির রেলপথ ব্যবস্থারও দ্রুত প্রসার ঘটে। পুঁজিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান কর্মীসংখ্যার শহরমুখী অভিগমন সরকারকে বাধ্য করেছিল রেলপথের প্রসার ঘটাতে। তাই বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে ভারতে সার্বিক ভাবে রেলপথের বিস্তার ঘটে এবং যাত্রী পরিবহন ক্ষমতাও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। শুধুমাত্র শহরতলির রেলব্যবস্থাই নয়, দূরপাল্লার রেলব্যবস্থাতেও এই ধরনের অনেক বদল আসে, যার অন্যতম কারণ ছিল পর্যটন শিল্পের বিকাশ।

পুঁজি প্রসারের ক্ষেত্র হিসাবে বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে নির্মাণশিল্প যে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা নিয়েছে তা ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। তবে শুধুই যে শপিং মল, মেট্রো স্টেশন, রাস্তাঘাট কিংবা রেলপথ ব্যবস্থার প্রসারের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল, সেকথা বলা যায় না। মানুষের ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রটিও এর অন্যতম অংশ হয়ে ওঠে। যেহেতু বিশ্বায়ন নামক ঘটনাপ্রবাহটি মূলত ছিল শহরকেন্দ্রিক, তাই শহরকে কেন্দ্র করে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে

থাকে। তবে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে মানুষের দ্রুতহারে জন্মলাভ দায়ী ছিল না, বরং শহরমুখী পরিযাণ এক্ষেত্রে দায়ী ছিল। গ্রাম কিংবা শহরতলি থেকে দ্রুত উপার্জনমুখী জনসমষ্টি শহরে কিংবা শহরের উপকণ্ঠে এসে বসবাস শুরু করে। এর ফলে শহরে যেমন জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি শহরের নিকটবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলে দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহরের সীমানা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। এর অন্যতম কারণ হিসাবে আবাসন শিল্পের বিস্তারকে চিহ্নিত করা যায়। অধ্যাপক রতন খাসনবিশ তাঁর 'উন্নয়ন ও দুই ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরেছেন—

> কারখানাজাত শিল্পপণ্য ছাড়া অন্যত্র যে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল নির্মাণ শিল্প আর নির্মাণ শিল্প চাঙ্গা থাকায় বাড়ছে বুনিয়াদি শিল্পপণ্য (ইস্পাত, সিমেন্ট)-র উৎপাদন। এর সঙ্গে বাড়ছে মূলধনি পণ্যের (capital goods) বাজার। কারণ নির্মাণকে কেন্দ্র করে আসছে মূলধনি যন্ত্রপাতির চাহিদা। (২০০৩-০৭ সালের মধ্যে মূলধনি পণ্যের উৎপাদন বেড়েছে বছরে ১৪.৩ শতাংশ হারে) নির্মাণ শিল্পের এই বোলবোলাও-এর কারণ কী? যাঁরা মনে করেন নির্মাণের মূল কাজটা হচ্ছে পরিকাঠামো নির্মাণকে কেন্দ্র করে তাঁরা বোধহয় এটা খেয়াল করছেন না যে পরিকাঠামোতে বিনিয়োগে বেসরকারি পুঁজির উৎসাহ নেই কারণ এখানে ঠিক নগদানগদি লাভ করা যায় না। নির্মাণের মূল কাজটা হচ্ছে বাড়িঘর বানানো যার পোশাকি নাম বাস্তু শিল্প। ২০০২ থেকে ২০০৬-এর মধ্যে কৃষিতে যা বিনিয়োগ হয়েছে তার দু গুণেরও বেশি বিনিয়োগ হয়েছে বাস্তুশিল্পে। মেট্রো শহর থেকে আঞ্চলিক বড়ো শহর—সর্বত্র গড়ে উঠছে এই বাস্তুশিল্পের বাজার এবং এ বাজারে নামছে দেশি ও বিদেশি বড়ো পুঁজি। ... এ বাজারের মূল টার্গেট মধ্যবিত্ত (১৯.৩ শতাংশ পরিবার) । এরা কি এত টাকা জোটাতে পারে? অবশ্যই পারে না, তবে এদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া ব্যাংক-লোন এর কাগজ। বাড়ির দাম এরা দেবে কিস্তিতে কিস্তিতে। কিস্তি না দিলে ফাইন দেবে। দিতে না পারলে বাড়ি নিয়ে নেবে ব্যাংক এবং আবার তা বিক্রি হবে। কেমন চলছে এই ব্যবসা? ২০০৫-০৬ সালে ব্যাংক যা ঋণ দেবার ব্যবসা করেছে তার ৫১ শতাংশ গেছে এই বাড়ি ঘরের বাজারে (কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য

> উৎপাদনে দেওয়া হয়েছে মোট ঋণের ৩২ শতাংশ) ।... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কায়দায় এখানে গড়ে তোলা হচ্ছে বাস্তুশিল্পের বাজার, যে বাজারে তেজি ভাব থাকলে নির্মাণ শিল্প এবং তাকে কেন্দ্র করে বুনিয়াদি শিল্প ও মূলধনি শিল্পের চাহিদা বাড়ে। বাস্তুশিল্পের বাজার গড়ে তুলতে টার্গেট করা হয়েছে মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ আয়কে, তারা ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট কিনবে এবং ভবিষ্যৎ আয় থেকে তা শোধ করবে।[৫২]

এখানে প্রাবন্ধিক নিপুণভাবে বাস্তুশিল্পের প্রসার, উপভোক্তার প্রকৃতি এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যবর্তী সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন, যা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে বিস্তার লাভ করেছিল।

স্বল্প পরিমাণ জায়গায় প্রচুর মানুষ বসবাস করতে হলে আনুভূমিকভাবে আবাসন নির্মাণের যখন সুযোগ থাকে না, তখন আকাশচুম্বী উল্লম্ব বৃদ্ধি ছাড়া গৃহনির্মাণ সম্ভব নয়। এই কারণে দ্রুত ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে পরিবহণের সুবিধাযুক্ত একটি জায়গাকে কেন্দ্র করে বহু আকাশচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়ির একত্র নির্মাণ ঘটতে থাকে। এইভাবে এক একটি আবাসনের সৃষ্টি হয়। পূর্বের পাড়াগুলি যেন আকাশের দিকে বাড়তে থাকে। তবে আধুনিক ব্যক্তি মানুষের এই পাড়াগুলি আবাসন নামে চিহ্নিত হলেও পূর্বের পাড়া-সংস্কৃতি থেকে এর চালচলন হয়ে পড়ে অনেকখানি আলাদা। নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষেরাই এইসব পাড়ার বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এরফলে অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদে যেন এক নতুন অঞ্চলের জন্ম হয়, যেখানে নিম্নতর অর্থনৈতিক স্তর থেকে মানুষজনেরা পরিষেবা প্রদানের জন্য আগত হলেও একসঙ্গে বসবাসের অধিকার তাদের থাকে না। অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা প্রদানের পর তারা আবার নিজ এলাকায় ফিরে যায়। তাদের এলাকাগুলি অনেকাংশেই পরিষেবাবর্জিত। অন্যদিকে এই ফ্ল্যাটবাড়িগুলি গড়ে ওঠার সময় মূলত গ্রাম

এলাকা থেকে ঠিকাদারের অধীনে যে সব নির্মাণ শ্রমিকরা হাজির হয়, তারা নির্মাণকাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এলাকায় থেকে কাজ করে, আবার নির্মাণ শেষে নতুন নির্মাণের এলাকায় চলে যায়। তবে একথা বলাই যায় যে গ্রামে কিংবা শহরের প্রান্তে তাদের নিজস্ব বসবাসের বাসস্থানগুলি তাদের দ্বারা নির্মিত বাসস্থানগুলির তুলনায় অনেক দুর্বল এবং ন্যূনতম নাগরিক সুবিধাবিযুক্ত। এর পাশাপাশি লক্ষ করা যায় যে এই ফ্ল্যাটবাসী মানুষের যে নতুন শ্রেণি গড়ে উঠেছিল তা শ্রেণিবিভক্ত সমাজকে নতুন বিভাজন উপহার দেয়। এর সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী নির্মাণ শিল্পের কারণে শ্রমিকদের পরিযাণ যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। এর ফলে পূর্বতন কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামসমাজের ভাঙন দেখা দিয়েছিল, পাশাপাশি অনেকক্ষেত্রেই গ্রামীণ সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটেছিল।

২.৭॥ **পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্প**

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারত বিভিন্ন কারণে বিদেশি পর্যটকদের একটি প্রার্থিত গন্তব্য হয়ে উঠেছিল। উদাহরণ হিসাবে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসে মেগাস্থিনিস, ফা হিয়েন কিংবা হিউয়েন সাং প্রমুখ বিখ্যাত পর্যটকদের কথা। এঁদের মতো অনেকেরই ভারতে আসার কারণ হিসাবে শিক্ষালাভ করার প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করা যায়। তবে শুধু শিক্ষালাভ করাই নয়, নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যেও যে অনেকে আগত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তবে এই অংশে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ভারত মুক্ত অর্থনীতিকে গ্রহণ করার পর কীভাবে পর্যটন শিল্প প্রসারলাভ করেছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, তা দেখাই মূল লক্ষ্য।

ভারত সরকার মুক্ত অর্থনীতিকে গ্রহণ করার পর পর্যটন শিল্পের অন্তর্দেশীয় এবং আন্তঃদেশীয়—উভয়প্রকার পর্যটনই বৃদ্ধি পায়। এর অন্যতম কারণ হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকে চিহ্নিত করা হলেও আরও বেশ কিছু কারণে পর্যটন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখান থেকে পর্যটনের বৈচিত্র্যময় বিভাজনগুলি সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। এর মধ্যে যেমন চিকিৎসাব্যবস্থায় ভারতের উন্নতি ঘটায় একাধিক দেশ থেকে ভারতে মানুষ আসতে থাকে চিকিৎসালাভের প্রয়োজনে। একে বলা হয় মেডিক্যাল ট্যুরিজম বা চিকিৎসা-পর্যটন। এছাড়াও সুপ্রাচীন কাল থেকে ধর্মীয় পর্যটনের অন্যতম গন্তব্য ছিল ভারত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রগুলি বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করেছে বহুকাল থেকেই। এছাড়া প্রকৃতি পর্যটনের ক্ষেত্র হিসাবে ভারতীয় উপমহাদেশের বিশালতা কিংবা বৈচিত্র্য—উভয় বৈশিষ্ট্যই দেশ বিদেশের প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে তার আবেদন রেখেছে। এগুলির পাশাপাশি বিস্তার লাভ করেছে ঐতিহাসিক পর্যটন। ভারতীয় সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম হওয়ার কারণে ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ এই দেশ দেখার উৎসাহে দেশ বিদেশের মানুষের অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহাসিক গুরুত্বসমৃদ্ধ এই স্থানগুলি। এইসমস্ত কারণে পর্যটন শিল্পের উন্নতি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যটন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বেশ কতগুলি সুফল লক্ষ করা যায়। কিংবা বলা যেতে পারে যে পর্যটন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অনুসারী আরও কয়েকটি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটেছিল। এগুলির মধ্যে ছিল বিমান চলাচলের ব্যবসা, হোটেল ব্যবসা, কখনো বা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিজনেস ট্রিপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিদেশিদের ভারত ভ্রমণে আরও বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত এলাকাটিতে দৃষ্টিপাত করলে 'ভ্রমণ সাহিত্য' নামক আলাদা একটি বিভাগ লক্ষ করা যায়। খেয়াল রাখতে হবে সেই বিভাগটিকে 'পর্যটন সাহিত্য' নামে কিন্তু চিহ্নিত করা হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে ভ্রমণ এবং পর্যটনকে সমার্থক হিসাবে অভিধানে পাওয়া গেলেও দুটি শব্দ সম্পূর্ণত এক নয়। আর এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের জায়গাটি থেকেই বাংলা 'ভ্রমণ সাহিত্য' গড়ে উঠেছে। যদিও সেই বিষয়ক ব্যাখ্যা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়, বরং আমরা 'ভ্রমণ' এবং 'পর্যটন' শব্দদুটিকে নিয়ে এই পরিসরে ব্যবহার করব। ভ্রমণ শব্দটির মধ্যে একধরনের উদ্দেশ্যহীনতা আছে। ভ্রমণের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছাবার তাড়া নেই, বরং রয়েছে যাত্রাপথটিকে দেখার মুগ্ধতা কিংবা অনাবিল আনন্দ। ভ্রমণ অনেক বেশি পরিমাণে উপলব্ধিনির্ভর। অন্যদিকে পর্যটনের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছানোর তাগিদ প্রাধান্য লাভ করে, কত দ্রুত যাওয়ার পথটিকে অতিক্রম করা যায়, তাই হয়ে ওঠে এর লক্ষ্য। পাশাপাশি বলা যায় পর্যটন অনেক বেশি উপভোগ নির্ভর। বেশিরভাগ সময়েই উদ্দেশ্যমূলক। রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থের 'ছুটির আয়োজন' কবিতা কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি ভ্রমণ কাহিনী' নামক ছোটোগল্পের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সেই নিরিখে বলা যেতে পারে যে বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেয়েছে পর্যটন।

ভারতীয় প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে পর্যটন শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র বিদেশি পর্যটকের আগমন নয়, ভারতীয় পর্যটকের বিদেশাভিগমনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর পশ্চাতে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। এছাড়াও বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে উপার্জনবৃদ্ধিকে অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা যায়। অন্যদিকে বিশ্বায়নকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে ভারতের নাগরিকদের জন্য অন্যান্য দেশের ভিসা নীতিও অনেক সহজ হয়ে এসেছিল। বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে প্রায়

প্রতিটি দেশই চাইছিল পর্যটন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে। বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে বেসরকারি কিংবা বিদেশি পুঁজি দ্বারা পরিচালিত কোম্পানিগুলি চাইছিল কর্মীদেরকে আরও বেশি উৎপাদনশীল করে তুলতে। এর অঙ্গ হিসাবে তারা বাধ্যতামূলক ছুটির পাশাপাশি কর্মীদেরকে উৎসাহপ্রদানের জন্য ভ্রমণে খানিকটা হলেও বাধ্য করে। সেইকারণেও বিশ্বজোড়া পর্যটন অনেকটা হলেও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও পর্যটন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে প্রচুর ভ্রমণসংস্থা, যেগুলি কিনা সারাবছরে সহজ কিস্তির মাধ্যমে বেড়াতে যাওয়ার বিভিন্ন লোভনীয় সুযোগের হাতছানি সৃষ্টি করে। এছাড়াও বেসরকারি ব্যাঙ্ক কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বেড়াতে যাওয়ার জন্য টাকা জমাতে উৎসাহিত করে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে। বিশ্বায়নের আগে ভারতীয়দের ভ্রমণ অনেকখানি তীর্থস্থান কেন্দ্রিক ছিল। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে তা প্রকৃত অর্থেই পর্যটনে পরিণত হয়। সহজ গন্তব্য হিসাবে ব্যাঙ্কক, পাটায়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, দুবাই প্রভৃতি নামগুলি উঠে আসতে থাকে। আরও বিত্তশালীদের কাছে ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি কিংবা ফ্রান্সে যাতায়াত হয়ে ওঠে জীবনযাপনের অঙ্গ। এভাবেই ভারতীয়দের পর্যটন বিশ্বায়িত হয়ে ওঠে।

নিছক অনাবিল আনন্দ, চিকিৎসার প্রয়োজন, ঐতিহাসিক কিংবা নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার মাধ্যম হিসাবে নয়, বরং এসবের বাইরেও আর একধরনের পর্যটন সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করে। তা হল যৌন পর্যটন। কোনো কোনো দেশ এই তথ্য স্বীকার করতে না চাইলেও আড়ালে প্রায় সব দেশই এই ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 'দেহোপজীবিনী ও দেহ-বিপণনের বিশ্বায়ন' নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক শুভাশীষ গুপ্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি তুলে ধরেছেন—

কম পুঁজি বিনিয়োগ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুনাফা ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ট্যুরিজম বা ভ্রমণ, হোটেল-মোটেল-রিসর্ট-স্যানেটোরিয়াম-ক্লাব-বার-রেস্তোরাঁ, ট্যুরিস্ট গাইড, ইন্টারপ্রিটার প্রভৃতির ব্যবসা ও পরিষেবা। জল-আবহাওয়া-নৈসর্গিক পরিবেশ প্রভৃতির চেয়েও ট্যুরিজম ব্যবসাতে বিদেশী আকর্ষণের প্রধান বিষয় হলো 'হসপিটালিটি গার্লস' বা ভ্রমণ-পিপাসুদের তথাকথিত সেবাপরায়ণ রমণীর সঙ্গ। এই ব্যবসাতে তৃতীয় দুনিয়ায় অগ্রগণ্য হিসাবে, বিশেষত দ্বীপময় দেশগুলির মধ্যে ফিলিপাইন্স, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, হাইতি, শ্রীলঙ্কা, মাল্টা, সাইপ্রাস, মালদ্বীপ প্রভৃতির নাম করা যায়। এই ব্যবসায় রয়েছে আরও বহু দেশ যার অন্তর্গত ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, ইক্যুয়েডর, গুয়াতেমালা প্রভৃতি ছাড়াও প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পোল্যান্ড, রোমানিয়া, স্লোভাক রিপাব্লিক ইত্যাদি। প্রকাশ্যে ঘোষিত নয় কিন্তু অনুন্নত আরও বহু দেশে এই ব্যবসা এখন বাড়বাড়ন্ত। দেশভিত্তিক আংশিক তথ্য যেটুকু পাওয়া যায় তা প্রধানত লাইসেন্স-প্রাপ্ত বা আইনী পথে বিদেশাগত নারীর সংখ্যা। আসল সংখ্যা তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। জাপান, তাইওয়ান, ফিলিপাইন্স ও দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রাভেল এজেন্সী, প্যাকেজ ট্যুর ও হোটেল ব্যবসায়ে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও মালটিন্যাশনাল ব্যাংক ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী হসপিট্যালিটি ব্যবসার সাহায্যে সারা পৃথিবীতে মোট লাভের পরিমাণ ২-৫ বিলিয়ন ডলার (১৯৯২ সালের হিসাবে)।[৫৩]

এইভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে যৌন পর্যটন বৃদ্ধি পেয়েছিল। বহু দেশ এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেয়। পুঁজির প্রসার এই ক্ষেত্রটিকে আরও প্রশস্ত করে। সমগ্র পৃথিবীতে নারী পাচার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে এই দিকটি। অন্যদিকে পুঁজি ও প্রযুক্তির প্রসার নারীকে আরও পণ্যায়িত এবং বিপদগ্রস্ত করে তোলে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লেখক এই দিকটিকে সংগতভাবেই তুলে ধরেছেন—

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক প্রচার-মাধ্যমে সরাসরি রমণীয় নারীর সর্বক্ষণের সান্নিধ্য দেবার বিজ্ঞাপন দিয়ে ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করে। ইন্টারনেটে এই ধরনের বহু ওয়েবসাইট রয়েছে। পছন্দমতো নারীর

সাথে ইন্টারনেটে ‘চ্যাট’-এর ব্যবস্থা এবং এইভাবে অর্থ উপার্জনের প্রণালী গড়ে উঠেছে। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে যৌন-শ্রমিকাদের নগ্ন দেহ প্রদর্শনের বাণিজ্য ছাড়াও যৌন ব্যবসার অন্য বিজ্ঞাপনও এখন ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। শেষোক্ত দিকগুলি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রণালীতে সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। হোটেলে ছাড়াও ট্যুরিস্ট গাইড বা ইন্টারপ্রিটার হিসাবে রমণী সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ব্যবসায়ে যুক্ত মেয়েদের বলা হয় ‘কিসায়েঙ্গ’। তার ভিত্তিতে কিসায়েঙ্গ ট্যুরিজম, কিসায়েঙ্গ পার্টি, কিসায়েঙ্গ রেস্তোরাঁ, কিসায়েঙ্গ হাউস প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলাতে অনুরূপ কাজে যুক্ত নারীর সংখ্যা লক্ষাধিক। কার্যত দেহদানের এই বৃত্তিতে বিদেশ থেকে নারী সংগ্রহ করা ছাড়াও এই ধরনের শ্রমে যুক্ত আছে ফ্যাক্টরির শ্রমিকা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, গৃহস্থ মহিলারা পর্যন্ত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সর্বক্ষণ বা আংশিক সময়ের জন্য হোটেল ট্যুরিস্ট এজেন্সি প্রভৃতিকে সরবরাহ করে এইসব নারীদের। তথ্য থেকে দেখা যায় যে ১৩ বছরের কিশোরী থেকে শুরু করে ৫০ বছরের মহিলা পর্যন্ত এই বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। এই জাতীয় বৃত্তিতে দৈনন্দিন মজুরির হার অন্য যেকোন বৃত্তি থেকে যথেষ্ট উন্নত হওয়া সত্ত্বেও, নিয়োগকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কমিশন বাদ দেবার পর, মজুরির ২০-২৫ শতাংশের বেশি এই নারীদের ভাগ্যে জোটে না।[৫৪]

এই তথ্য আমাদের সামনে হাজির করে পুঁজির প্রসার ঘটা বিশ্বায়িত দুনিয়ায় ভোগবাদী সমাজের এক অন্ধকার দিক, যা অর্থের খাতিরে সারা পৃথিবীতে গোপন সমাদর পেলেও নারীর পৃথিবীটিকে করে তোলে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বিষহ এবং অসম্মানের। অন্যদিকে এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে মারণ সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়।

পর্যটন ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান এবং তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। The World Travel and Tourism Council-এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালে ভারতে ১৬.৯১ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন হয়েছে যা ছিল ২০১৮ সালে GDP-এর ৯.২

শতাংশ। এরফলে ৪২.৬৭৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থান হয়েছে, যা ছিল ভারতের মোট কর্মসংস্থানের ৮.১ শতাংশ।[৫৫] এই ক্ষেত্রটি বছরে ৬.৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৫৬] অক্টোবর ২০১৫-এ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী ভারতে মেডিক্যাল ট্যুরিজম ক্ষেত্রটির আনুমানিক মূল্য ৩ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার, ২০২০ সালে যা গিয়ে পৌঁছানোর কথা ৭-৮ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারে।[৫৭] ২০১৪ সালে ভারতের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর দেওয়া একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে ভারতে ঐ বছর ১,৮৪,২৯৮ জন বিদেশি রোগী ভারতে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন।[৫৮] ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, ২০০১ সালে ভারতে আগত বিদেশি ট্যুরিস্টের সংখ্যা ছিল ২.৫৪ মিলিয়ন, ২০১১ সালে তা পৌঁছায় ৬.৩১ মিলিয়নে এবং ২০১৯ সালে তা দাঁড়ায় ১০.৯৩ মিলিয়নে।[৫৯] এ থেকে ভারতে পর্যটক আগমনের বৃদ্ধিটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও দেখা যায় ভারতে বিদেশি পর্যটকদের শতাংশের হিসাবে সবচেয়ে বেশি পর্যটক এসেছে বাংলাদেশ থেকে (২৩.৫৮%), তারপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইউ.এস.এ. (১৩.৮৩%) এবং তৃতীয় স্থানে ব্রিটেন (৯.১৫%)।[৬০] অন্যদিকে ভারতীয়দের বিদেশ গমনের তথ্য থেকেও দেশের বাইরে পর্যটনের গতিপ্রকৃতি কিছুটা হলেও বোঝা যায়। ২০০১ সালে ভারতীদের বিদেশ গমনের পরিমাণ ছিল ৪.৫৬ মিলিয়ন, ২০১১-তে তা দাঁড়ায় ১৩.৯৯ মিলিয়ন এবং ২০১৯-এ সংখ্যাটি পরিণত হয় ২৬.৯২ মিলিয়নে।[৬১] এবারে আসা যায় দেশীয় পর্যটকদের দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণের তথ্যে। ২০০১ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৩৬.৪৭ মিলিয়ন, ২০১১ সালে তা ছিল ৮৬৪.৫৩ মিলিয়ন, ২০১৯ সালে তা পৌঁছায় ২৩২১.৯৮ মিলিয়নে।[৬২] এই তথ্য থেকে বোঝা যায় বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে পর্যটন কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে ভারতে ইন্টারন্যাশনাল হোটেল চেন তাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করছে, যা ২০২০ সালে ভারতের পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পের ৪৭ শতাংশে পৌঁছেছে। এছাড়াও জানা

যায় যে, ২০০০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (FDI) পরিমাণ ১৫.৬১ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার। পুঁজির প্রসার পর্যটন ক্ষেত্রে কী পরিমাণে ঘটেছিল তা উপরিউক্ত হিসাবসমূহ থেকে কিছুটা হলেও ধারণা করা যেতে পারে।[৬৩] এর বাইরেও ছিল সরকারি তরফে বিনিয়োগ।

বিশ্বায়ন পরবর্তীকালের পর্যটনের বৃদ্ধি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল একথা যেমন ঠিক, ততোধিক সত্য এটাও যে, বিশ্বায়ন প্রসার ঘটিয়েছিল পুঁজির নিয়ন্ত্রক সংস্কৃতির। যার ফল হিসাবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বিশাল ভূখণ্ডের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকেও অনেকাংশে লুপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। দেশজুড়ে বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল মূল্যবোধের বহুবিধ বদল। পর্যটনের সঙ্গে জ্ঞান আহরণের যোগসূত্রটি অনেকাংশে ছিন্ন হয়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল বিনোদন। বিশ্বায়নের পরে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন পেশার দ্রুত এবং চটজলদি উপার্জন ভোগবাদী সংস্কৃতি কিংবা ক্রেতা হয়ে ওঠার মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয়। যা পূর্বের মূল্যবোধের জগত থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। এসময় মানুষের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে আত্মকেন্দ্রিকতা আরও বেশি করে শিকড় চারিয়ে দেয়। বৃহত্তর পরিবার কিংবা সমাজ নয়, মানুষের বাঁচার অর্থ হয়ে ওঠে নিজের ভালো থাকা। পর্যটনেও যে তার ছাপ পড়েছিল তা বলাই বাহুল্য। পরিবার ব্যবস্থার বদল ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কিছু বদল লক্ষ করা যায়। পারিবারিক ভ্রমণের তুলনায় ক্ষুদ্র পরিবার কিংবা বিবাহিত দম্পতিদের বিবাহ পরবর্তী ভ্রমণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ক্ষুদ্র পরিবারের ধারণা কিংবা দাম্পত্যের বন্ধনটিও শিথিল হয়ে পড়ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে একাকী ভ্রমণ বা সোলো ট্রিপ-এর প্রবণতা এবং ভ্রমণকারীর সংখ্যা। ইতিমধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে নিত্যনতুন

যন্ত্রাদি। পর্যটনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে গিয়েছে ক্যামেরা, ইন্টারনেট কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া। আর তাই পর্যটন অনেকাংশে হয়ে উঠেছে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক স্তরের মানুষের স্ট্যাটাস সিম্বল। লক্ষণীয়ভাবে ক্যামেরার জগতে এসে গিয়েছে উল্লেখযোগ্য একটি পরিবর্তন। ক্যামেরার লেন্স ঘুরে গিয়েছে চিত্রগ্রাহকের দিকে। প্রসার ঘটেছে 'সেলফি' সংস্কৃতির। পূর্বতন সময়ের তুলনায় গ্রুপ ছবির তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের সেলফি তোলার প্রবণতা। একটি পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ছবিতে বেড়ে গিয়েছে ব্যক্তিসাপেক্ষ ছবির সংখ্যা। অন্যদিকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ছবির উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সমস্ত বিনোদনের মতো পর্যটনের মধ্যেও মানুষ স্থাপন করতে চেয়েছে 'আমি'-কে।

২.৮॥ **সামাজিক মাধ্যম**

বিশ্বায়নের ফলে তথ্য-প্রযুক্তির জগতে উল্লেখযোগ্য এবং দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যার ফলে সাদা-কালো দূরদর্শনের জগৎ থেকে কেবল টিভির রঙিন দুনিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। টিভি চ্যানেলের সংখ্যাতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। টেলিফোন ব্যবস্থার প্রসার থেকে মোবাইল ফোনের জগতেও ভারত প্রবেশ করেছিল দ্রুত পদে। এর পাশাপাশি স্বল্পগতির ইন্টারনেট থেকে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা দ্রুত সাধারণ মানুষের নাগালে আসে । এরপর স্বল্প বৈচিত্র্যের শুধুমাত্র ফোন করা কিংবা এসএমএস পাঠানোর উপযোগী মোবাইল ফোন থেকে বহু বৈচিত্র্যের সমাহারবিশিষ্ট একাধারে ক্যামেরা, বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ তথা কম্পিউটারের বেশ কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী স্মার্টফোনের জগৎটি খুব দ্রুত ফুলে ফেঁপে ওঠে। যদিও স্মার্টফোনের আগমন সামাজিক মাধ্যম কিংবা Social Media

ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করেছিল, তবুও একথা সত্যি যে ডেস্কটপ বা তার পরবর্তী কালে ল্যাপটপ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের মধ্য দিয়েই এর সূত্রপাত ঘটেছিল। পরবর্তীকালে একদিকে যেমন স্মার্টফোনের প্রসার ঘটে চলেছিল দ্রুত গতিতে, অন্যদিকে তারবিহীন ইন্টারনেটের গতি 2G, 3G পেরিয়ে 4G বা আরও পরবর্তীকালে 5G-র দিকে অগ্রসর হয়। এই দুইয়ের মেলবন্ধনে সারা পৃথিবীর পাশাপাশি ভারতেও সামাজিক মাধ্যম বা Social Media-র অতি দ্রুত বিস্তার লক্ষ করা যায়।

মূলত দুটি সামাজিক মাধ্যম ভারতের ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনগণের (যাঁরা সাধারণত নেটিজেন বা নেটাগরিক নামে অভিহিত হন) কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একটি হল আমেরিকা-উদ্ভূত Google কোম্পানির Orkut, অন্যটিও আমেরিকা-উদ্ভূত Facebook । ২০০৪ সালের ২২ শে জানুয়ারি সৃষ্টি হওয়া অরকুট[৬৪] নামক সামাজিক মাধ্যমটি সারা পৃথিবীর মতো ভারতেও, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ২০১৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সামাজিক মাধ্যমটির জনপ্রিয় অস্তিত্ব থাকলেও ততদিনে ভারতে সামাজিক মাধ্যমের জায়গাটি দ্রুত দখল করে ফেলেছিল ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ফেসবুক[৬৫]। পরে অরকুটের অনুপস্থিতিতে সামাজিক মাধ্যম হিসাবে খানিকটা একাধিপত্যের জায়গায় পৌঁছে যায় ফেসবুক। যদিও বার্তা প্রেরণের সামাজিক মাধ্যম হিসাবে Whatsapp ততদিনে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তবু ফেসবুকের জনপ্রিয়তার কাছে তা পিছিয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে ফেসবুক Whatsapp-কে অধিগ্রহণ করে (১৯ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)। মূলত এই তিনটি মাধ্যমের গুরুত্ব ভারতীয় জনসংখ্যার নিরিখে ছিল অপরিসীম। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৭৪ কোটি। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০ কোটি এবং ইউটিউব

ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২২৯ কোটি। এছাড়াও ইন্সটাগ্রাম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২২ কোটি এবং চিনা অ্যাপ টিকটক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬৮ কোটির বেশি।[৬৬] ২০২১ সালের একটি হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিশ্বের নিরিখে সবচেয়ে বেশি, ২৯ কোটি[৬৭]। এই সংখ্যাটি ২০২২ সালের শেষে গিয়ে ৪০ কোটিতে পৌঁছাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভারতে ২০২১ সালে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৯ কোটি।[৬৮] একই বছরে ইউটিউব ব্যবহারকারীর সংখ্যাও পৌঁছিয়ে গিয়েছে সাড়ে ২৬ কোটিতে[৬৯]। বলাই বাহুল্য যে, উপরিউক্ত প্রতিনিধিস্থানীয় সামাজিক মাধ্যম কিংবা বার্তা প্রেরণকারী মাধ্যমগুলি ছাড়াও ইন্টারনেট নির্ভর আরও বহু সামাজিক মাধ্যম বর্তমান, যেগুলির জনপ্রিয়তা থেকে জনসংখ্যার প্রবণতাগুলিকে অনেকাংশে বোঝবার চেষ্টা করা যায়।

বিশ্বায়িত ভারতে পুঁজি প্রসারের অন্যতম হাতিয়ার সামাজিক মাধ্যম। আমেরিকা উদ্ভূত সামাজিক মাধ্যমের সিংহভাগ ব্যবহারকারী ভারতে বসবাসকারী জনগণ। সামাজিক মাধ্যম শুধু পারস্পরিক বার্তা কিংবা অনুভূতির প্রেরকমাত্র নয়, বরং বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপনের ধারক এবং বাহক। এছাড়াও তা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর 'ডিজিট্যাল ফুটপ্রিন্ট'-কে অনুসরণ করে এবং মানুষের চাহিদার জিনিসগুলিকে বারবার বিজ্ঞাপনের দ্বারা সামনে তুলে ধরে। ফলে মানুষ প্রভাবিত হতে হতে একসময় না একসময় ক্রেতার ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক মাধ্যম শুধুই যে বিজ্ঞাপনকে ধারণ করে কিংবা ব্যবহারকারীকে তা ক্রয় করতে প্রলুব্ধ করে তাই নয়, বরং তা মানুষকে ভোগবাদী সমাজের দিকে হাতছানি দেয় বহুল পরিমাণেই। সামাজিক মাধ্যম ব্যক্তি মানুষের নিজেকে প্রকাশ করার অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। এর ফলে যাপিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে স্মার্টফোনের ক্যামেরা, ইন্টারনেট এবং

সামাজিক মাধ্যমের সহায়তায় মানুষ মেলে ধরছে সামাজিক মাধ্যমের দেওয়ালে। ভার্চুয়াল রিয়ালিটির জগতের উপর মানুষের বিশ্বাস ক্রমবর্ধমান। মানুষ প্রাণপণে তুলে ধরছে ব্যক্তিগত ভালো থাকার মুহূর্তগুলিকে। প্রাণপণে লুকাতে চাইছে চোখের জল কিংবা দুঃখের অনুভূতি সমূহকে। এরফলে দর্শকের মনে কখনো তৈরি হচ্ছে প্রতিযোগিতার মনোভাব, আবার কখনো অন্যের জীবনের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে মানসিক হতাশা। এই হতাশার তীব্রতায় মানুষের মনে তৈরি হচ্ছে আত্মহত্যার মতো প্রবণতাও। সামাজিক মাধ্যমের ভার্চুয়াল জগতে মানুষের ভার্চুয়াল বন্ধুত্ব ভৌগোলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে মহাদেশ পেরিয়ে সারা পৃথিবীর কোণে কোণে—গ্রাম থেকে শহরে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের সময়খণ্ডে। এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সংস্কৃতিতে একধরনের সাধারণীকরণও কিছুটা হলেও সৃষ্টি হয়েছে। তবে সেই সাধারণীকরণের চালিকাশক্তি হিসাবে যে পুঁজি নিয়ন্ত্রক দেশগুলির জীবনযাত্রাই অনুসৃত হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। খাবার থেকে পোশাক, সামাজিকতা, অনুষ্ঠানাদি, অনুভূতির প্রকাশ, কথা বলার ধরন—সবই ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একই রূপ পেয়ে চলেছে। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহৃত স্থির ছবির জগতকে পিছনে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে ভিডিয়োর সংখ্যা। মানুষ সরাসরি নিজস্ব যাপনকে তুলে ধরছে এর মাধ্যমে। কখনো আবার ইউটিউবের মতো ওয়েবসাইটের সহায়তায় নিজস্ব চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরছে ভালো লাগা-খারাপ লাগা কিংবা উদযাপনের অনুভূতিসমূহকে। এইভাবে ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব জগতে বা জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য সমষ্টিতে ডিজিট্যাল দুনিয়ার অবিচ্ছেদ্য প্রভাব দেখা যাচ্ছে, যাকে কাজে লাগিয়েই পুঁজি আরও বেশি করে প্রসারিত হচ্ছে। খাবার থেকে পোশাক, জীবনযাত্রা, আধুনিক জীবনের সহায়তাকারী প্রযুক্তির যন্ত্রাদি বা গ্যাজেটস, বিনোদন কিংবা ভাবনা-চিন্তা—সবকিছুকেই প্রভাবিত করে চলেছে সামাজিক মাধ্যম। অন্যদিকে

সামাজিক মাধ্যম মূল ধারার সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সংবাদের অন্যতম উৎস হয়ে উঠছে তা বলাই যায়। অনেক ঋণাত্মক দিকের সমাহার এখানে ঘটা সত্ত্বেও দেখা যায় ব্যক্তি মানুষের নিজেকে প্রকাশ করবার যে স্বাধীনতা সামাজিক মাধ্যম দিয়েছে তা পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেশি করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরে। যদিও তা ‘স্বাতন্ত্র্য’ কিনা তা আরও বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

সামাজিক মাধ্যম পুঁজি প্রসারের অন্যতম হাতিয়ার এবং এর মাধ্যমে জনমানসের পরিবর্তন ঘটে চলেছে একথা সত্য হলেও সেই সত্যের অন্য একটি দিকও রয়েছে। ভারতের জনসংখ্যার নিরিখে বলা যায় যে দেশের সিংহভাগ মানুষই ইন্টারনেট-স্মার্টফোননির্ভর সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার থেকে অনেক দূরে। যদিও ইন্টারনেট-স্মার্টফোন ব্যবহারকারী গ্রামীণ মানুষের সংখ্যাও নিছক কম নয়, তবু নাগরিক জনসংখ্যার তুলনায় তা এখনও অনেক কমই। এর অন্যতম কারণ হিসাবে গ্রামীণ ভারতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা কিংবা দ্রুত গতির ইন্টারনেট না পৌঁছানোকে দায়ী করা যায়। ২০২১ সালে পৌঁছেও উল্লেখ করা যায় যে ভারত সরকারের দাবি করা ‘ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া’-তেও অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় আসার জন্য মোবাইল সিগন্যালবিহীন এলাকা থেকে সিগন্যাল পেতে শিক্ষার্থীকে হয় বহুদূর হেঁটে যেতে হয় অথবা উঁচু গাছের উপরে চড়তে হয় কিংবা পাহাড়ের উপরে পৌঁছাতে হয়। এইরকম বাস্তব পরিস্থিতিতে যে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা মূলত নাগরিক জনসমষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। তবে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে গ্রামীণ ভারতকেও যেভাবে বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থার আওতায় আনার চেষ্টা চলছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব থেকে সিংহভাগ মানুষ যে দূরে থাকবে না, তা আশা করা যায়।

২.৯॥ স্বাস্থ্য/ চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র

স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রটি সব দিক থেকেই ভারতের অন্যতম বৃহৎ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। উৎপাদিত রাজস্ব কিংবা কর্মনিযুক্তির নিরিখে একথা প্রমাণিত। স্বাস্থ্যপরিষেবার মধ্যে পড়ে হাসপাতাল, চিকিৎসা-যন্ত্রাদি, পরীক্ষামূলক প্রয়োগ, বহির্বিনিয়োগ, টেলিমেডিসিন, চিকিৎসা/স্বাস্থ্য-পর্যটন, স্বাস্থ্য বিমা এবং চিকিৎসা-সরঞ্জাম ইত্যাদি।[৭০]

ভারতীয় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রটিকে পরিষেবা প্রদানের নিরিখে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়— সরকারি এবং বেসরকারি। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় নির্দিষ্ট শহরসমূহে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ধাপের স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে একেবারে গ্রামীণ অঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ ধাপের চিকিৎসা-পরিষেবা প্রদান করা হয় এবং ভারতের বৃহৎ শহরগুলির পাশাপাশি প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির শহরগুলিতে তা বর্তমান।[৭১]

স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রের প্রতিযোগী হিসাবে ভারত অনেক এগিয়ে, কারণ ভারতে বিপুল সংখ্যক সুপ্রশিক্ষিত চিকিৎসাকর্মী রয়েছে। শল্য চিকিৎসার খরচের স্বল্পতার নিরিখেও ভারত ইউরোপ কিংবা আমেরিকার দেশগুলির থেকে অনেক এগিয়ে। পূর্বোক্ত দেশগুলির তুলনায় ভারতে শল্য চিকিৎসার খরচ এক দশমাংশ।[৭২] এইপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রটির ৮০ শতাংশই বেসরকারি উদ্যোগনির্ভর।[৭৩] অর্থাৎ মাত্র ২০ শতাংশ সরকারি ব্যবস্থাপনা নির্ভর।

১৯৯০-এর দশকে ভারতীয় স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রটি ১৬ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে উঠছিল। ২০১২ সালের মধ্যে তা ৪০ বিলিয়ন ইউ.এস ডলারের কাছে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।[৭৪] ২০২২ সালের মধ্যে এই বৃদ্ধি ৮.৬ ট্রিলিয়ন ইউ.এস ডলারে পৌঁছাবে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। ২০২১ সালের ভারতীয় বাজেটে জিডিপি-র ১.২ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য। অন্যদিকে লক্ষ করা যায় যে, স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রটিও ভারতে ক্রমবর্ধমান। স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়াম প্রদানের হার বার্ষিক ১৭.১৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ অর্থবর্ষে ৭.৩৯ বিলিয়ন ইউ.এস ডলারে পৌঁছিয়েছে।[৭৫]

বিশ্বায়ন যে যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, তার অন্যতম ছিল স্বাস্থ্যক্ষেত্র। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের ক্ষেত্রেও এই কথাটি প্রযোজ্য। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থার নব্বই শতাংশই ছিল সরকারি। ১৯৮০-র দশক থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বেসরকারি অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। পূর্বের মতো বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসা পাওয়ার পরিবর্তে কিছুটা হলেও মূল্যপ্রদান প্রণয়ন করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল তুচ্ছ কারণে মানুষ যাতে চিকিৎসাব্যবস্থার দ্বারস্থ না হয় তা দেখা। কিন্তু এই কারণে যে একেবারে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের কাছে চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও উনিশশো আশির দশকের শেষভাগ থেকে নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে দেওয়া কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ কমতে থাকে। তার প্রভাব স্বভাবতই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এসে পড়েছিল।[৭৬]

বিশ্বায়নের যাঁরা সমালোচক, তাঁরা বিভিন্ন কারণে একে অসাম্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছিলেন। তবে ভারতের প্রেক্ষিতে তাঁদের করা এই অভিযোগ মান্যতা পায় ভারতীয়

স্বাস্থ্যক্ষেত্রটির প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করলে। ২০০৭ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করলেও সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে চিকিৎসাব্যবস্থার মোট শয্যার মাত্র ২০ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় বর্তমান। তুলনামূলকভাবে গ্রামাঞ্চলে সরকারির তুলনায় বেসরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবা অনেক বেশি পরিমাণে উপস্থিত। ২০১৪ সালে *The Lancet* জার্নালে প্রকাশিত স্বাস্থ্যপরিষেবার সুযোগপ্রাপ্তি সংক্রান্ত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে ২০০৪ সালে ভারতের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যপরিষেবার সুযোগ গ্রহণে অক্ষম। ২০১০ সালে ভারতের ৬ কোটি মানুষ সাধ্যের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা-ব্যয় করার কারণে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যায়। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময়ের তুলনায় সাধ্যের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা-ব্যয় করার পরিমাণ ৮০ শতাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এইকারণেই মানুষের ঋণ এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। গ্রাম ও শহরের ৪০ শতাংশ রোগী, যাদের চিকিৎসা বিমা নেই, তাদেরকে উচ্চ চিকিৎসা–ব্যয় সামলাতে ঋণ তো বটেই, জমিজমা বিক্রি পর্যন্ত করে দিতে হয়।[৭৭]

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ভারত সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও ভারত সরকার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WTO)-র সঙ্গে Trade ও Service বিষয়ে তাদের চুক্তির অঙ্গীকার হিসাবে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য এবং উৎসাহপ্রদানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এগুলির মধ্যে ছিল বিভিন্ন বরাদ্দ বৃদ্ধি, অনুকূল কর ব্যবস্থা, আমদানিশুল্ক হ্রাস করা এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার খরচ কমানো। এইসব সাহায্যের শর্ত হিসাবে ভারত সরকার বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে দরিদ্র মানুষদের বিনাখরচে চিকিৎসার জন্য কিছু শয্যা বরাদ্দ রাখতে বললেও দারিদ্র্য নির্ণয়ের দিকটি ছেড়ে রেখেছিল তাদের বিবেচনার উপর। যারফলে ব্যবস্থাটি ফলপ্রসূ হয় নি। এছাড়াও

২০১১ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ জারি করে যে সরকার থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত বেসরকারি হাসপাতালগুলি তাদের বহির্বিভাগের ২৫ শতাংশ এবং অন্তর্বিভাগের ১০ শতাংশ দরিদ্র মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য রাখবে। তবে সেই নির্দেশ খুব কঠোর ছিল না এবং ২০১৪ সালের একটি রায়-এর মাধ্যমে পুরোটাই বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলে যায় ব্যাপারটি। বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার যথাযথ ব্যবস্থা ভারতে না থাকায় এগুলি দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসায় যথাযথ ভূমিকা নেয় নি বরং এগুলি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আনতে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে এগুলি চিকিৎসকদের দেশে ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং দেশের নতুন প্রসার্যমাণ শিল্প মেডিক্যাল ট্যুরিজম বা চিকিৎসা পর্যটনের ভিতকে মজবুত করে তোলে।[৭৮]

বিশ্বায়ন ভারতের চিকিৎসাব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেলেও এর কিছু ভালো দিকও ছিল। যার অন্যতম হল মেডিক্যাল ট্যুরিজমের প্রসার। ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রটি দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১.৯ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার থেকে ৩.৯ বিলিয়ন ইউ.এস ডলারে পৌঁছেছে। ভারত এই দ্রুত বৃদ্ধির ক্ষেত্রটিকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাতে পেরেছে। মেডিক্যাল ট্যুরিজমের ক্ষেত্রটিকে আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত সরকার বিদেশিদের জন্য এই ব্যাপারে ভিসানীতিতে অনুকূল পরিবর্তন আনে। অনুমান করা হয় মেডিক্যাল ট্যুরিজম ভারতের GDP-র ২৫ শতাংশ উৎপাদনের সম্ভাবনা রাখে। এজন্য তা উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ করতে পারে। বিশেষ করে অনাবাসী ভারতীয়দের থেকে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় FDI হিসাবে দশ কোটি ইউ.এস ডলার বিনিয়োগ হয়। এইকারণে ভারত স্বাস্থ্যক্ষেত্র থেকে মেধার বহির্গমন অনেকখানি আটকাতে পেরেছিল। বরং দেশের অভ্যন্তরে মেধার বহির্গমন দেখা

গিয়েছিল, যখন স্বল্প বরাদ্দের সরকারি ব্যবস্থা ছেড়ে চিকিৎসকরা বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চলে যায়, যেখানে প্রচুর পরিমাণে মেডিক্যাল ট্যুরিস্টের আগমন ঘটে। এইসব জায়গায় বেশি বেতন দেওয়া হত এবং এইধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি শহরাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার জন্য চিকিৎসকরা উপার্জনের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার সুযোগও বেশি পেতেন। এইভাবে মেডিক্যাল ট্যুরিজম বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিষেবার অসমবন্টন সৃষ্টি হয়, যেখানে একদিকে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধাকে লাভ করে মেডিক্যাল ট্যুরিস্টরা সুফল পেতে থাকে, অন্যদিকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা কখনোই দরিদ্রদের সহায়তার জায়গা তৈরি করেনি। এইভাবে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠা স্বাস্থ্যব্যবস্থা দুটি স্তর তৈরি করে—যেখানে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ধনীদের জন্য গড়ে ওঠে, অন্যদিকে দরিদ্রদের স্বাস্থ্যপরিষেবা পাওয়ার কোনও জায়গাই থাকে না।[৭৯]

২.১০॥ **পোশাক ও ফ্যাশন**

বিশ্বায়ন মানবসমাজে যে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন সূচিত করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল পোশাক এবং ফ্যাশন। সময়ের নিরিখে পোশাকের বিবর্তন নিশ্চয়ই ভারতে ১৯৯১ সালের পূর্ববর্তী সময়েও লক্ষণীয় ছিল, তবে মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সেই বিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ভারতীয় পোশাকের রীতি কিংবা ফ্যাশন প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কখনই একরকম ছিল না। আবার অঞ্চলভেদেও তা ছিল পৃথক। মৌর্য, গুপ্ত, সুলতানি কিংবা মুঘল শাসনের সময়কে অতিক্রম করে ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত ভারতের পোশাক রীতিতে পড়েছে নানা যুগের প্রলেপ। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পরিচালিত অগ্রণী মনীষীদের চেতনায় লিঙ্গ নির্বিশেষে পোশাক নিয়ে ভাবনাটি ছিল

সদাজাগ্রত। দীর্ঘ সময় ধরে চলা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির পোশাক রীতির প্রভাবও জনসমাজ অনেকখানি গ্রহণ করে নিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে স্বদেশী পোশাককে গ্রহণ করার রাজনৈতিক প্রণোদনা থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে তা নিয়ে সংশয় ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ১৯৪৭ সালের পর থেকে আশির দশক পর্যন্ত সময়কালেও পোশাকরীতির বিবর্তন বজায় ছিল। প্রয়োজনমুখিতা যেমন পোশাকরীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তেমনি ধর্মীয় অনুশাসন মেনেও মানুষ তার পোশাক এবং ফ্যাশনকে যে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা বলাই যায়। তবু এসবের বাইরেও যদি পোশাকরীতির কোনো নিয়ন্ত্রক থাকে, তা অবশ্যই গণমাধ্যম এবং বিনোদনের জগৎ। ভারতীয় পোশাকরীতিতে পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে সিনেমার দুনিয়া। তবে একথা বলাই যায় যে, সিনেমাজগতের প্রভাবে প্রভাবিত হতেন মূলত অল্পবয়সী জনগোষ্ঠী। তুলনামূলকভাবে বয়স্ক জনসংখ্যার উপরে নতুন ফ্যাশন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতো না।

ভারতীয় পোশাকের রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রতি দশকের নিরিখে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী ১৯৫০-এর দশকে ভারতীয় পোশাকের প্রাচীন এবং ধ্রুপদী রীতিকে অনুসরণ করার প্রয়াস দেখা গেলেও ১৯৬০-এর দশক, ১৯৭০-এর দশক কিংবা ১৯৮০-র দশকের পোশাকরীতিকে চালিত করেছিল বলিউড সিনেমার জগৎ। এইসব দশকের বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনাররাও তাঁদের পোশাক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন বিভিন্ন সিনেমায়। এরই অনুসৃতিতে ভারত সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক ১৯৮৬ সালে দিল্লিতে স্থাপন করেন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি (NIFT) ।[৮০]

১৯৯০-এর দশকে ভারতে অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরে ফ্যাশন শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ করা যায়। পরবর্তী দশকগুলিতেও তার প্রভাব এবং বৃদ্ধি চলতে থাকে। সারা বিশ্বের পোশাকরীতির প্রভাবকে আত্মীকরণ করে ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনাররা নতুন নতুন সব পোশাক তৈরি করতে থাকেন। নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় দেশীয় পোশাকের খুচরো বাজারে বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। বিদেশ থেকে, মূলত পশ্চিমের দেশগুলি থেকে পোশাক তৈরির বরাত বেশি করে আসতে থাকে। উৎপাদনের বিপুল হার এবং উন্নত গুণমান এইরকম বাজার তৈরির সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে বহু ভারতীয় ডিজাইনার তাঁদের উৎপাদনে আরও বেশি জোর দেন। এইসব নানাবিধ উপায়ে ২০০৯ সালে মন্দা সত্ত্বেও ভারতীয় ফ্যাশন শিল্প ২.৯ বিলিয়ন ভারতীয় টাকায় পৌঁছে যায়। এর পাশাপাশি ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনিং-এর কেন্দ্র হয়ে ওঠে দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু কিংবা হায়দ্রাবাদের মতো শহরসমূহ।[৮১]

বিশ্বায়নের ফলে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমী দুনিয়ার অনেক বেশি মুনাফা হলেও বস্ত্রবয়নশিল্পের ক্ষেত্রে তাদের কিছুটা হলেও পিছু হটতে হয়েছিল। এর কারণ হিসাবে বলা যায় উন্নত দেশগুলি তাদের পোশাক উৎপাদনের বরাত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আউটসোর্সিং করে দিচ্ছিল। এর ফলে প্রথম বিশ্বের দেশগুলির বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। বস্ত্রবয়ন, পোশাক এবং পাদুকা উৎপাদন শিল্পে (Textile, Clothing and Footwear; TCF) বিগত পঁচিশ বছরে মূলত এই প্রভাব দেখা যায়। ১৯৭০-১৯৯০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়ায় বস্ত্রবয়ন, পোশাক এবং পাদুকা উৎপাদন শিল্পে কর্মী বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯৭ শতাংশ, বাংলাদেশে ৪১৬ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ৩৮৫ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ায় ৩৩৪ শতাংশ, ফিলিপাইন্সে ২৭১ শতাংশ এবং কোরিয়ায় ১৩৭ শতাংশ। অপরদিকে উন্নত দেশগুলির মধ্যে কর্মী সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে জার্মানিতে ৫৮ শতাংশ, ব্রিটেনে ৫৫ শতাংশ, ফ্রান্স ৪৯ শতাংশ এবং আমেরিকা ৩১ শতাংশ।

দেখা যায় বর্তমানে পৃথিবীর ৬০ শতাংশ পোশাক তৈরি এবং রপ্তানি হয় উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে। সারা বিশ্বের পোশাক রপ্তানির ৩২ শতাংশ এশিয়ার দেশগুলি থেকে রপ্তানি হয়।[৮২] ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৮৯-১৯৯০ সময়পর্বে পোশাক রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ১৫৯৮ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার, তা ১৯৯৫-১৯৯৬ সময়পর্বে দাঁড়ায় ৩৬৭৫ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার।[৮৩] অর্থাৎ মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে বাণিজ্যবৃদ্ধির পরিমাণ অনেকটাই বেশি। এইসব তথ্য থেকে মনে হতেই পারে যে, যেহেতু বাইরের দেশ থেকে প্রথম বিশ্বের দেশগুলি পোশাক আমদানি করছে, তাই বাইরের দেশের পোশাকরীতি দ্বারা হয়তো তারা প্রভাবিত হচ্ছে। বাস্তবিক অর্থে তা ঘটেনি। বরং দেখা যায় যে পাশ্চাত্যের দেশগুলি অনেক কম মূল্যে বস্ত্র উৎপাদন করতে পারবে বলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এ ব্যাপারে বিনিয়োগ করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল, বস্ত্রের নকশা প্রথম বিশ্বের দেশের, প্রযুক্তিও তাদের, বিনিয়োগও তাদের, অন্যদিকে কাঁচামাল এবং শ্রম তৃতীয় বিশ্বের। ফলে তৃতীয় বিশ্ব থেকে পোশাক প্রথম বিশ্বে রপ্তানির অন্দরমহলটি ঘুরে দেখলে তা অনেকটা এইরকম।

এবার সরাসরি আসা যাক ভারতীয় পোশাক রীতির দিকটিতে। দেখা যায় বিশ্বায়নের পূর্বে ভারতীয়দের ঘরের পোশাক আর বাইরের পোশাকের ক্ষেত্রে মোটামুটি কয়েকটি নিয়ম প্রচলিত ছিল। ঘরে পুরুষের পোশাক ছিল নিম্নাঙ্গে ধুতি অথবা লুঙ্গি, ঊর্ধ্বাঙ্গ সাধারণত অনাবৃত, ক্ষেত্রবিশেষে গেঞ্জি কিংবা ফতুয়া। শীতে চাদর অথবা সোয়েটার। বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ জামা অথবা পাঞ্জাবী, ইউরোপীয় রীতির ফুলপ্যান্ট অথবা ভারতীয় রীতির ধুতি। পায়ে চামড়ার জুতো কিংবা পা ঢাকা বুট। খুবই আধুনিক পুরুষের জামার উপরে কখনো কখনো ওভারকোট লক্ষ করা যেত। ভারতীয় নারীর ক্ষেত্রে ঘরের পোশাক হিসাবে শাড়ি ছিল প্রায় একচেটিয়াভাবে ব্যবহৃত। তবে ধর্ম বা অঞ্চলভেদে চুড়িদার বা সালোয়ার পরতে দেখা

যেত। দীর্ঘকাল পর্যন্ত গ্রামীণ ভারতে নারীদের অন্তর্বাস পরার রীতি ছিল না। পরের দিকে সেই রীতি প্রচলিত হয়। বাইরে চাকুরিরতা নারীরা সাধারণত শাড়ি, ব্লাউজ এবং হালকা প্রসাধনে অভ্যস্ত ছিলেন। শীতে এই পোশাকের উপর তাঁরা উলের সোয়েটার অথবা চাদর ব্যবহার করতেন। উৎসবে অনুষ্ঠানে চাদরের পরিবর্তে তাঁরা দামি শাল গায়ে দিতেন। বিশ্বায়নের পরে এই পোশাকরীতি নারীপুরুষ—উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয়। তরুণ প্রজন্ম দ্রুত বেছে নেয় পাশ্চাত্য পোশাককে। বাইরে যাওয়ার পোশাক হিসাবে দ্রুত জায়গা করে নেয় জিনস এবং টি শার্ট। কখনো বা ডেনিম জিনসের জামাও ঊর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বিভিন্ন ধরনের কোট বা ব্লেজারও অফিসিয়াল ড্রেস হিসাবে উঠে আসে। বাড়ির পোশাক হিসাবে লুঙ্গি অথবা ধুতির পরিবর্তে জায়গা করে নেয় ঢিলাঢালা বারমুডা এবং স্যান্ডো গেঞ্জির মতো পোশাক। নারীর পোশাকের ক্ষেত্রেও দ্রুত পরিবর্তন এনেছিল বিশ্বায়ন। ঘরের পোশাকে শাড়ির জায়গায় দ্রুত প্রবেশ করে ম্যাক্সি অথবা নাইটির মতো পোশাক। অপেক্ষাকৃত তরুণী নারীরা হটপ্যান্ট, টি-শার্ট ইত্যাদি বাড়ির পোশাক হিসাবেও ব্যবহার করতে থাকেন। বারমুডা প্যান্টের ব্যবহারও তাঁদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধি পায়। বাইরের কর্মজগতে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেশি পরিমাণে এসময় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রের দূরত্ববৃদ্ধিও তাঁদের পোশাকরীতিতে বদল আনে। শাড়ি পরার চল দ্রুত কমতে থাকে। নব্বইয়ের দশকের শেষদিক থেকে শাড়ির জায়গা করে নিতে থাকে সালোয়ার কামিজ। তা নিয়ে রক্ষণশীল সমাজে বিতর্কও তৈরি হয়েছে অনেক। তবে প্রয়োজনের তাগিদ রক্ষণশীলতার দেওয়ালকে ভেঙে দিয়েছে বারবারই। পরের দশকগুলিতে বেসরকারি চাকরিক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের পোশাকের জায়গা নিয়েছে কোট, প্যান্ট, টাই ইত্যাদি। লক্ষ করা যায় যে, নারীদের শিক্ষা কিংবা কর্মজগতে প্রবেশের সমানুপাতে নারীপুরুষের পোশাকের তফাতও অনেক কমে এসেছে।

বাণিজ্য অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পোশাক রীতিতে দুইধরনের প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমত পশ্চিমী দুনিয়ার প্রভাব। দ্বিতীয়ত বিশ্বায়ন ভারতীয় প্রাদেশিক পোশাকরীতিতে ফিরে যাওয়ার একধরনের টান তৈরি করেছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল বিশ্বায়নজাত অন্তর্দেশীয় পরিযাণ বৃদ্ধি।এই উভয় প্রবণতার প্রভাবে মিশ্র রীতির পোশাকও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

২.১১॥ বাজার-বিগবাজার-ই কমার্স

বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়াটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার মূল চালিকাশক্তিটি ছিল অর্থনৈতিক, যে কারণে নিয়ন্ত্রক অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত ভাষা কিংবা সংস্কৃতিরও বিশ্বায়ন ঘটে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটির মূল চাহিদা ছিল বাজার দখল, তাই পূর্বতন বাজার ব্যবস্থার রূপগুলিকে ধ্বস্ত করে বাজারের নতুন নতুন রূপ-কে সে হাজির করেছিল। বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মতো ভারতের বাজারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু বদল লক্ষ করা যায়। পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বদল তো ছিলই, বাজারের বহিরাঙ্গিক রূপের ক্ষেত্রেও বহুধরনের বদল পরিলক্ষিত হয়। নির্দিষ্ট এলাকাকে কেন্দ্র করে একই সমতলে বিভিন্ন দ্রব্যের পণ্যবীথির যে প্রাত্যহিক রূপটিকে বাজার নামে অভিহিত করা হতো, উদার অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে দেখা গেল তা আকার এবং আয়তনে বহুগুণ বিবর্ধিত হয়েছে। মার্কেট থেকে সুপারমার্কেটের যুগ পেরিয়ে এসে গিয়েছিল শপিং মল। দেখা যায় উৎপত্তিগতভাবে এই ‘শপিং মল’ শব্দটি আসলে আমেরিকান শব্দ, যা গৃহীত হয়েছিল ভারতীয় বাজার সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে। ব্রিটেনে এই শব্দটির রূপ ছিল ‘শপিং সেন্টার’। ‘শপিং মল’ বলতে আমেরিকায় যতখানি জায়গা

জুড়ে অবস্থিত দোকানপাট ইত্যাদিকে বোঝাত, 'শপিং সেন্টার' শব্দবন্ধের মাধ্যমে বোঝানো হতো তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত বহুধরনের বিপণিসমূহকে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে 'শপিং মল'-এর ধারণাটিকেই বেশি পরিমাণে গৃহীত হতে দেখা গিয়েছিল।[৮৪]

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্যসমূহকে পারস্পরিক প্রায়োজনিক নৈকট্যে নিয়ে আসবার তাগিদে পুরানো বাজার ব্যবস্থাকে ভেঙে 'শপিং মল'-এর বাজার সংস্কৃতিকে অভ্যর্থনা জানানো জরুরি হয়ে পড়েছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার জগতে। এতে মানুষকে পণ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্যের সামনে হাজির করে প্রয়োজনের বাইরে গিয়েও কিনতে উৎসাহিত করার গোপন কর্মসূচিও যে হাজির ছিল, তা বলাই বাহুল্য। একদিকে টিভি কিংবা খবরের কাগজের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের হাতছানি, অন্যদিকে বৃহৎ এই নতুন বাজারে সেইসব পণ্যদ্রব্যের অফুরন্ত যোগান মানুষের মধ্যে ক্রেতা হওয়ার প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ। এরফলে জিনিস কিনবার জন্য মানুষ বেশ কিছুটা পরিমাণে 'ব্র্যাণ্ড' নির্ভর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে দেশীয় জিনিসপত্রের জায়গায় চলে আসে আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ডের বিভিন্ন ধরনের পণ্য। পোশাক, জুতো, ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস, কসমেটিক্স—এই সমস্তকিছুতেই লাগে আন্তর্জাতিক ছোঁয়া।

মুক্ত অর্থনীতি বাজার ব্যবস্থার বহিরাঙ্গিক বদল ঘটিয়েছিল। সারা দেশের ছোটো বড়ো শহর এবং শহরতলির কিছু অংশে তৈরি হয়েছিল বহু শপিং মল। বিভিন্ন ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে পোশাক পরিচ্ছদ, বিনোদনকেন্দ্রিক দ্রব্যাদি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, ওষুধ—সমস্তই সেখানে পাওয়া যায়। ক্রেতাদের জন্য এই শপিং মলগুলি হয়ে ওঠে সব পেয়েছির দেশ। দানবাকৃতি এই মলগুলিতে বহুধরনের কাজে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও যে

হয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। একইসঙ্গে বদলে গিয়েছিল মানুষের বাজার করবার ধরনধারণও। মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার আগের যুগে মানুষের বাজার করবার অভ্যাসের প্রায় পুরোটাই ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। নিতান্ত দরকার না হলে মানুষ কোনও কিছু কেনার জন্য ব্যয় করার কথা ভাবত না। গ্রামাঞ্চলে সপ্তাহে একবার কিংবা দু'বার হাট বসত, যেখানে অনেকগুলি গ্রামের মানুষ একত্রে কেনাবেচা করত, আবার সেই হাট শেষ হলে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য পরবর্তী হাট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। শহরতলি কিংবা একেবারে শহরে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং জনসংখ্যা বেশি থাকার কারণে প্রতিদিন নির্দিষ্ট জায়গায় বাজার বসত (বা এখনও বসে)। শপিং মলের যুগে এই ধারণা পাল্টে যায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বহুতল শপিং মলগুলিতে পণ্যদ্রব্যের পাশাপাশি রেস্তোরাঁ কিংবা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমাহলের উপস্থিতি বিনোদনপ্রেমী মানুষকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় এগুলির আরামদায়ক পরিসরে। সিনেমা দেখার অবসরকে ভরিয়ে তোলে রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া কিংবা আপাত প্রয়োজনহীন শখের কেনাকাটা। এর পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের মানুষের দল বেঁধে ঘোরার একটি অন্যতম গন্তব্য হয়ে ওঠে শপিং মল। আর এভাবেই খুব দ্রুতগতিতে মানুষ পণ্যসংস্কৃতিকে বরণ করে নেয়। হয়ে ওঠে স্বপ্নের গন্তব্য। যা ছিল প্রয়োজনের বাজার, মুক্ত অর্থনীতির মোড়কে তা হয়ে ওঠে মানুষের নতুন বেড়ানোর জায়গা, কিংবা অবসর বিনোদনের স্থল। এই সংস্কৃতিকে অগ্রসর করার লক্ষ্যে টিভি, ইন্টারনেট, পত্রপত্রিকা—সবগুলি মাধ্যমই অনবরত প্রচার করতে থাকে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন। সামগ্রিকভাবে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় পণ্যসংস্কৃতিকেন্দ্রিক নতুন একধরনের জীবনবোধ।

ভারতে বিশ্বায়নের ফলে সামগ্রিকভাবে 'বাজার'-এর ধারণাটি পরিবর্তিত হয়। 'বাজার' ব্যবস্থার পুরানো রূপটি অনেকক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত থাকলেও বহুগুণে তা যে পরিবর্তিত

হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বড়ো বড়ো শপিং মলগুলিতে দোকানের সংখ্যা ছিল প্রচুর, তার সঙ্গে হাজির হয় কোট-প্যান্ট-টাই পরা মার্জিত রুচির সেলসপার্সন, যারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারার পাশাপাশি খুব সহজেই ক্রেতার চাহিদার ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করে নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিপরীত দিকটি লক্ষ করলে দেখা যায়, একেবারে গ্রাম কিংবা শহরতলির শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের অনেকে এই ধরনের পরিষেবা ক্ষেত্রে উপার্জনের তাগিদে যোগ দেয়। যাইহোক, সামগ্রিকভাবে নতুন এই ব্যবস্থাপনা ক্রেতার ক্ষেত্রে খুবই সুবিধাজনক হয়ে ওঠে, যেখানে বিপুল পরিমাণ পণ্যের মধ্যে থেকে ক্রেতা নিজস্ব পছন্দের জিনিসগুলি নিজে হাতে বেছে নিতে পারে। মোটের উপর এই নতুন বাজার-ব্যবস্থায় ক্রেতা অনেক বেশি স্বাধীন। দোকান মালিক কিংবা তার কর্মচারীর হস্তক্ষেপ বা উপস্থিতি প্রায় না থাকার ফলে ক্রেতা নিঃসংকোচে যে কোনও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজেই হস্তগত করতে সক্ষম। তবে ক্রেতাকে নজর রাখার যান্ত্রিক ব্যবস্থাটিও যে উপস্থিত তা সিসিটিভি ক্যামেরার প্রাচুর্যই প্রমাণ করে দেয়। তবু ক্রেতার স্বাধীনতা গুরুত্ব পাওয়ার কারণে এই ধরনের বেচাকেনার জগতটি মানুষের প্রিয় হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন খাদ্যসম্পর্কিত বাজারের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত ক্রেতার দল, যাঁরা একসঙ্গে অনেকখানি কিনতে পারেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক এবং লাভজনক হয়ে ওঠে। মাছ, মাংস, সব্জি কিংবা ফলের বাজারকেও দখল করে নেয় নতুন বাজার ব্যবস্থা।[৮৫] সবজির যোগান বাড়ানোর জন্য পুঁজিপতিরা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে এইসব বাজারগুলির জন্য সবজি কিনতে শুরু করেন। কখনো আবার কৃষকদেরকে চুক্তিবদ্ধ করে নেওয়া হতে থাকে, যাতে তাঁরা বাইরের খোলাবাজারে তাঁদের উৎপাদিত ফসল বিক্রয় না করে শুধুমাত্র শপিং মলগুলিতেই তা বিক্রি করেন। এইভাবে একসময় বৃহৎ পুঁজিদ্বারা পরিচালিত বাজার এবং স্বল্পপুঁজির বাজারের মধ্যে

অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তের দল যখন চিরাচরিত বাজার ব্যবস্থা ছেড়ে নতুন বাজারে ভিড় জমাল, তখন এতদিনের ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করল, তার কারণ, শুধুমাত্র নিম্নবিত্ত ক্রেতাদের নিয়ে পুরানো বাজারব্যবস্থার আয়ু খুব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। ইতোমধ্যে নিম্নবিত্ত ক্রেতার দলকেও নতুন বাজার ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হতে দেখা যায়।

বিশ্বায়ন পরবর্তী নতুন বাজার ব্যবস্থার দাপটে যখন ইতোপূর্বে উপস্থিত ক্ষুদ্র পুঁজির মালিকদের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে, তখন তাঁদের কফিনের শেষতম পেরেক নিয়ে হাজির হয় ই-কমার্স সংস্থাগুলি। বাজার ব্যবস্থাতেও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য ভাবে ই-কমার্সের আত্মপ্রকাশের যুগে ইন্টারনেট ব্যবস্থাটিও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এর উপস্থিতি ছাড়া কোনোমতেই নতুন যুগের নতুনতর ভার্চুয়াল বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারত না—

> eCommerce is India’s fastest growing and most exciting channel for commercial transactions. The Indian e-commerce market is expected to grow to US$200 billion by 2026 from US$ 48.5billion as of 2018. This growth has been triggered by increasing internet and smartphone penetration. The ongoing digital transformation in the country is expected to increase India’s total internet user base to 829 million by 2021 from 560.01 million as of September 2018. India’s internet economy is expected to double from US$125 billion as of April 2017 to US$ 250 billion by 2020, majorly backed by ecommerce. India’s E-commerce revenue is expected to jump from US$ 39 billion in 2017 to US$ 120 billion in 2020, growing at an annual rate of 51 per cent, the highest in the world.[৮৬]

ভারতের ক্ষেত্রে ই-কমার্সের প্রবেশের সময়টি লক্ষ করলেও দেখা যায় যে, আমেরিকা-উদ্ভূত অ্যামাজন-এর মতো কোম্পানি (স্থাপিত ১৯৯৪, আমেরিকা) ২০১৩ সালের ৫ই জুন ভারতে প্রবেশ করছে।[৮৭] এই সময়েই ভারতের ইন্টারনেট ব্যবস্থা এবং স্মার্টফোনের বাজারটিও অত্যন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠা শুরু করেছে। সাধারণ মোবাইল ফোন প্রতিস্থাপিত হয়ে যাচ্ছে স্মার্টফোনের মাধ্যমে। আর হাতের মুঠোয় স্মার্টফোনের উপস্থিতি যে ই-কমার্সের সোনার কাঠি হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য কি! সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি বৃহৎ কোম্পানির (গুগল, অ্যাপেল, মাইক্রোসফট, ফেসবুক, অ্যামাজন) অন্যতম কোম্পানি হিসাবে অ্যামাজন দ্রুত ভারতে তার পক্ষ বিস্তার করল এবং অনতিবিলম্বে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদে গড়ে উঠল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর এই কোম্পানির বৃহত্তম ক্যাম্পাস।[৮৮]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভূত অ্যামাজন ভারতে আসার আগেই দিল্লি আইআইটির দুই প্রাক্তন ছাত্র তথা অ্যামাজনের দুই প্রাক্তন কর্মী সচিন বনসল এবং বিন্নি বনসল ২০০৭ সালের অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় ই-কমার্স কোম্পানি ফ্লিপকার্ট তৈরি করেন, পরবর্তীকালে যার মূল অফিস তৈরি হয় বেঙ্গালুরুতে। প্রথমত এটি অনলাইনে বই বিক্রির সংস্থা হিসাবে কাজ করলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য জিনিসের ব্যবসাও শুরু করে। অ্যামাজন কোম্পানি ভারতে আসার পর তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে এই সংস্থা। এছাড়াও ফ্লিপকার্ট কোম্পানি তার নিজস্ব অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে মিন্ত্রা, জাবং-এর মতো আরও কয়েকটি অনলাইন ব্যবসা-সংস্থাকে কিনে নেয়। পরবর্তীকালে ফ্লিপকার্ট তৈরি করে মোবাইল নির্ভর অর্থ আদানপ্রদানের অ্যাপ 'ফোনপে'। এইব্যবস্থার মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর থেকেও সহজে অর্থ আদানপ্রদান করা সম্ভব হয় ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে। মার্চ, ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতের ই-কমার্স ক্ষেত্রের ৩৯ শতাংশের বেশি ছিল ফ্লিপকার্টের দখলে। যাইহোক এরপর ২০১৮ সালের মে

মাসে মার্কিন কোম্পানি ওয়ালমার্ট ফ্লিপকার্ট কোম্পানির ৭৭ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়ে নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়।[৮৯]

ই-কমার্সের প্রসঙ্গে ভারতীয় কোম্পানি 'স্ন্যাপডিল'-এর কথা উল্লেখ করতেই হয়। ২০১০ সালে দিল্লিতে এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন দিল্লি আইআইটির দুই প্রাক্তন ছাত্র কুণাল বাহল এবং রোহিত বনসল। ক্রমে অন্য ই-কমার্স সংস্থাগুলির মতো এটিও ভারতের বাজারের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে নেয়।[৯০]

ই-কমার্সের দ্রুত বৃদ্ধি ভারতীয় ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের আরও দ্রুত বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে আনছে। ২০২০ সালে পৃথিবীজোড়া করোনা অতিমারীর আবহে সাধারণ ব্যবসা যখন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তখন এই বছরের শেষ চতুর্থাংশে অনলাইন ব্যবসায় অর্ডারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬ শতাংশ।[৯১] দেখা যায় করোনা আবহে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যখন লকডাউন ঘোষণা করে প্রায় নিয়মিত বাজার বন্ধ রাখা হচ্ছে, তখনো দেশের সর্বত্র অনলাইন ব্যবসা এবং পরিবহনকে লকডাউনের আওতা থেকে বাইরে রাখা হচ্ছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র পুঁজির মালিকদের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হলেও অনলাইন ব্যবসা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে।

আগেই বলা হয়েছে যে ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্মার্টফোনের প্রসার ভারতে ই-কমার্সকে ত্বরান্বিত করেছিল। ভবিষ্যতে 5G প্রযুক্তির প্রসার এই ব্যবসাকে আরও বাড়িয়ে দেবে বলে অনুমান করা যায়। এজন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সারা দেশে ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে 5G প্রযুক্তিকে দ্রুত বিস্তার করার কাজ চলছে। অন্যদিকে ই-কমার্সের ক্ষেত্রে বিদেশি

সংস্থাগুলিকে আরও বেশি অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে বিজনেস টু বিজনেস প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে (FDI) ১০০ শতাংশ ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে।[৯২]

একদিকে যেমন ই-কমার্সের উপস্থিতি ক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্র ব্যবসাগুলির ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়ে উঠছে, অন্যদিকে সারা দেশের এই ধরনের ব্যবসায়ীরা দ্রুত ই-কমার্সের চাহিদার যোগানদার হয়ে বৃহৎ পুঁজির বিরাট গ্রাসের মধ্যে খাদ্য হিসাবে ঢুকে পড়ছে। এতে একদিকে যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সারা দেশের কিংবা পৃথিবীর বাজার ব্যবস্থার আওতায় চলে আসছে, অন্যদিকে হারিয়ে ফেলছে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কিংবা বৈচিত্র্যের মাত্রাসমূহকে। এইভাবেই ভারতে ই-কমার্সের ঊর্ধ্বগতির কারণে ২০৩৪ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ই-কমার্সের ক্ষেত্র হয়ে উঠবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে ই-কমার্সের বৃদ্ধির ফলে তা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র কিংবা মাঝারি উদ্যোগগুলিকে পুঁজি, প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রভাবিত করছে একথা বলাই যায়, অন্যান্য ব্যবসাক্ষেত্রসমূহে যার একাধিক সুদূরপ্রসারী ফলাফল ঘটবে বলে মনে করা যায়।[৯৩]

ই-কমার্সের মাধ্যমে প্রায় সমস্ত ধরনের পণ্যই বর্তমানে পাওয়া যায়। তবে ২০২০ সালে অনলাইনে ক্রয়ের প্রবণতা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় মোট ১০০ শতাংশ ক্রয়ের ৪০ শতাংশ ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি, ৪০ শতাংশ পোশাকপত্র, ৭ শতাংশ খাদ্য এবং মুদি দ্রব্য, ৭ শতাংশ জুয়েলারি দ্রব্য, ৪ শতাংশ আসবাবপত্র এবং অন্যান্য নানা ধরনের দ্রব্য ২ শতাংশ। এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, কীভাবে ই-কমার্স কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৯৪]

ভারতে বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে বাজার ব্যবস্থায় যেভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে, তাতে করে গত ত্রিশ বছরে এই ক্ষেত্রটিতে বিপুল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। লক্ষ করলে

দেখা যায় নতুন বাজার ব্যবস্থায় চিরাচরিত 'Bricks and Mortar'[৯৫] (যে ব্যবস্থায় সরাসরি ক্রেতাকে দোকানে গিয়ে জিনিস কিনতে হয়)-এর ধারণাটি দ্রুত পরিত্যক্ত হয়ে পড়ছে। খুব প্রয়োজনে অল্প কিছু ক্ষেত্র ছাড়া ক্রেতারা দোকানে গিয়ে জিনিস কেনার বদলে অনলাইনে জিনিস কিনতে পছন্দ করছেন। এতে করে ব্যবসাকেন্দ্রিক ব্যক্তিসম্পর্কের ক্ষেত্রেও দ্রুত বদল আসছে। দোকানদার-খরিদ্দারের প্রাত্যহিক সম্পর্কটুকুও উঠে যাচ্ছে। এতে করে মানুষ আরও খানিকটা নিঃসঙ্গতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একথা বলাই যায়। অপরদিকে ই-কমার্সের যুগের ক্রেতা আর বিক্রেতার মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে অপরিচয়ের ব্যবধান। মানুষ আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে অন্য মানুষ থেকে। তবে বিশ্বজোড়া করোনা অতিমারীর নিরিখে পণ্যের পৃথিবীতে ব্যক্তি মানুষের বিচ্ছিন্নতা যে আরও ক্রমবর্ধমান হবে সেকথা অনুমান করে নেওয়া খুব কষ্টসাধ্য নয়।

২.১২॥

ভারত সরকার ১৯৯১ সালে মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে বিশ্বায়ন নামক যে প্রক্রিয়াটি বাঁধ ভেঙে সমুদ্রের জলের মতো দেশে ঢুকে পড়ে তার দ্বারা বাকি বিশ্বের সঙ্গে দেশের একধরনের সামগ্রিক যোগাযোগ তৈরি হলেও মূলত তার প্রকৃতি ছিল অর্থনৈতিক। তবে তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকেনি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জগতকেও প্রভাবিত করেছিল এই প্রক্রিয়া। দেশের বহুতর ক্ষেত্রে পুঁজি তার প্রভাব এবং বৈচিত্র্যসমূহকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাব্যবস্থা, বিনোদনক্ষেত্র, চিকিৎসাব্যবস্থা, পর্যটন কিংবা বাজারব্যবস্থা—সব কিছুই বিশ্বায়ন আগমনের পূর্বের তুলনায় দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং তার সুদূরপ্রসারী ফলাফলসমূহ জনজীবন

ও তার চিন্তাচেতনার ধারাকে বহুগুণ পরিবর্তিত করে। এর ফলে কিছুটা সুবিধা সৃষ্টি হলেও একদিকে ভোগবাদী জীবন এবং ক্রেতাসংস্কৃতি ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলি আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের শিকড় নগর ছাড়িয়ে গ্রাম ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। নগরায়ণ এবং বাজারায়ণ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্বের সীমাগুলিকে অতিক্রম করে এবং তার নিদর্শন হিসাবে প্রত্যন্ত শহরতলিতেও গড়ে ওঠে শপিং মল, কৃষিজমির পাশেই গড়ে ওঠে আকাশচুম্বী আবাসন। পরিযাণ বহুলভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্তর্দেশীয়ভাবে শ্রমের পরিযাণের কারণে কোনো কোনো রাজ্যের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, আবার কোনো রাজ্যের গ্রামসমাজ যুবকশূন্যতায় ভোগে। অন্যদিকে আন্তঃদেশীয় পরিযাণও বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এভাবে মূলত মেধা এবং শ্রমের পরিযাণ ঘটে। এর ফলাফল হিসাবে একদিকে যেমন ভারতের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে পরিবারসম্পর্ক কিংবা ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্তর্বর্তী শূন্যতাকে প্রযুক্তির মাধ্যমে ভরানোর চেষ্টা করা হলেও তা মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ বৃদ্ধি করে। বেড়ে চলে যান্ত্রিকতা। তাই পুঁজির সর্বত্রগামিতা বাহ্যিক জগতে প্রচুরতম সুখের প্রভূততম পসরা সাজালেও তার অন্তরালের যান্ত্রিকতা কোনোভাবে সমাজে ঘনীভূত হচ্ছিল কিনা বা অর্থনৈতিক স্তরায়ণ আরও স্পষ্ট হয়ে পড়ছিল কিনা অথবা পুঁজির প্রসারের ফলাফলই বা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ঠিক কী ধরনের তা এই অধ্যায়ে অনুসন্ধান করতে চাওয়া হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. https://www.rbi.org.in/scripts/pm_earlyissues.aspx Accessed on 27.02.2021 7.25 pm

২. https://www.businessmanagementideas.com/banking/evolution-of-banking/list-of-4-banks-in-india-before-independence/5336 Accessed on 27.02.2021 7.37 pm

৩. https://groww.in/blog/the-evolution-of-banking-in-india/ Accessed on 28.02.2021 7.15 pm

৪. https://www.rbi.org.in/scripts/chro_1968.aspx Accessed on 01.03.2021 7.09 pm

৫. https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/pdfs/71207.pdf Accessed on 01.03.2021 7.19 pm

৬. https://www.forbesindia.com/article/weschool/digital-revolution-in-the-indian-banking-sector/47811/1 Accessed on 01.03.2021 7.27 pm

৭. https://www.researchgate.net/publication/322428014_Growth_and_Development_of_ATM_in_India Accessed on 05.03.2021 2.35 pm

৮. https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd14180.pdf < Impact of Globalization on Retail Banking Services> Ms. Gagandeep Chadha et al. Accessed on 05.03.2021 2.55 pm

৯. https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana-pmjdy#tab=tab-1 Accessed on 06.03.2021 3.27 pm

১০. https://www.indiatoday.in/india/story/5-ways-how-rajiv-gandhi-changed-india-forever-1318979-2018-08-20 Accessed on 07.03.2021 7.17 pm

১১. https://www.csmonitor.com/1989/0817/fcomp.html Accessed on 07.03.2021 7.32 pm

১২. https://www.zaubacorp.com/company/AAMAR-PC-PRIVATE-LIMITED/U72900WB2005PTC101801 Accessed on 07.03.2021 7.49 pm

১৩. https://www.sirfnews.com/coronavirus-forced-cpim-party-that-once-protested-against-computers/ Accessed on 10.03.2021 8.25 pm

১৪. https://www.mondaq.com/india/antitrust-eu-competition-/1037960/ccis-market-study-on-the-telecom-sector-an-overview Accessed on 10.03.2021 8.55 pm

১৫. https://www.nextbigbrand.in/telecom-sector-in-india-from-monopolistic-to-duopoly/ Accessed on 10.03.2021 9.25 pm

১৬. https://www.indiatoday.in/technology/features/story/bsnl-may-shut-down-it-has-no-money-to-pay-employees-all-you-need-to-know-about-bsnl-crisis-1556217-2019-06-26 Accessed on 15.03.2021 7.39 pm

১৭. https://restofworld.org/2020/how-india-mobile-data-became-worlds-cheapest/ Accessed on 15.03.2021 7.57 pm

১৮. https://taxguru.in/corporate-law/reliance-jio-proved-free-services-anti-competitive.html Accessed on 21.03.2021 7.29 pm

১৯. https://www.fonearena.com/blog/2285/china-mobiles-movement-in-india.html Accessed on 21.03.2021 7.37 pm

২০. https://www.foundingfuel.com/article/a-brief-history-of-the-internet-in-india/ Accessed on 25.03.2021 10.23 pm

২১. https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/the-internet-turns-25-in-india-a-timeline/the-1980s/slideshow/77589569.cms Accessed on 25.03.2021 10.52 pm

২২. https://www.indiatoday.in/fyi/story/what-is-2g-scam-in-india-2g-scam-verdict-upa-a-raja-cbi-judge-op-saini-verdict-things-to-know-1113444-2017-12-21 Accessed on 27.03.2021 9.11 pm

২৩. https://taxguru.in/corporate-law/reliance-jio-proved-free-services-anti-competitive.html Accessed on 27.03.2021 9.31 pm

২৪. খাসনবিশ, রতন, 'তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব ও আধুনিক বিশ্ব'. *তথ্যপ্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন.* সৌমিত্র লাহিড়ী, মানসপ্রতিম দাস (সম্পা.) কলকাতা: একুশ শতক. আগস্ট ২০০২, পৃষ্ঠা ১৪৬

২৫. https://prasarbharati.gov.in/all-india-radio-2/#1588508332867-217ff0f1-f4fe Accessed on 11.04.2021 5.57 pm

২৬. https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/from-walkman-to-smartphones-how-portable-music-has-evolved/articleshow/79791151.cms f4fe Accessed on 11.04.2021 6.18 pm

২৭. পূর্বোক্ত

২৮. পূর্বোক্ত

২৯. পূর্বোক্ত

৩০. পূর্বোক্ত

৩১. https://www.philips.com/a-w/research/technologies/cd/beginning.html Accessed on 15.04.2021 8.11 pm

৩২. https://lowendmac.com/2014/history-of-the-compact-disc/ Accessed on 15.04.2021 8.25 pm

৩৩. https://www.crutchfield.com/S-9rOa7IhXQ2B/learn/home-theater-history.html Accessed on 15.04.2021 8.56 pm

৩৪. https://web.archive.org/web/20110214191909/http://www. smu.edu.in/ viewpage.php?c=SMU_WELCOME&t=h Accessed on 19.04.2021 7.05 pm

৩৫. https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated%20list%20of%20All%20 Universities.pdf Accessed on 29.06.2021 10.15 pm

৩৬. পূর্বোক্ত

৩৭. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14649373.2015.10370 84? scroll=top&needAccess=true Accessed on 30.06.2021 7.35 pm

৩৮. পূর্বোক্ত

৩৯. https://link.springer.com/article/10.1007/s41959-019-00010-7 < Management education in India: the challenges of changing scenario > Accessed on 25.04.2021 9.45 pm

৪০. https://www.britannica.com/topic/great-recession Accessed on 25.04.2021 10.25 pm

৪১. https://www.news18.com/news/india/nearly-40-engineering-seats-in-jadavpur-university-remain-vacant-even-after-three-rounds-of-counselling-3177197.html Accessed on 02.05.2021 8.12 pm

৪২. https://www.researchgate.net/publication/297702921_The_'New_Left'_globalisation_and_trade_unions_in_West_Bengal_What_is_to_be_done Accessed on 02.05.2021 8.37 pm

৪৩. https://journals.openedition.org/samaj/4103 Accessed on 02.05.2021 9.06 pm

৪৪. https://www.joghr.org/article/11915-globalisation-and-health-a-blessing-or-a-curse-case-review-of-the-indian-health-system Accessed on 06.05.2021 8.55 pm

৪৫. পূর্বোক্ত

৪৬. ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর. 'ভারতে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ তাঁর হাতে', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, রবিবাসরীয়, ২৯শে এপ্রিল, ২০১৮ (https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo /madhusudan-gupta-first-indian-trained-in-western-medicine-to-dissect-a-human-corpse-1.811168) Accessed on 06.05.2021 11.27 pm

৪৭. http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-1%20Issue-1/H0114649.pdf Accessed on 08.05.2021 9.56 pm

৪৮. https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated%20list%20of%20All%20 Universities.pdf Accessed on 29.06.2021 10.15 pm

৪৯. https://tnrd.gov.in/schemes/cen_pmgsy_13.html Accessed on 14.05.2021 9.35 pm

৫০. https://www.ibef.org/industry/roads-presentation Accessed on 14.05.2021 10.06 pm

৫১. https://www.railway-technology.com/projects/kolkatametro/ Accessed on 14.05.2021 11.23 pm

৫২. খাসনবিশ, রতন. 'উন্নয়ন ও দুই ভারতবর্ষ'. *বিশ্বায়ন উন্নয়ন ও বিশ্বমন্দা.* কলকাতা: প্রমা. ২০০৯. পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬

৫৩. গুপ্ত, শুভাশীষ. 'দেহোপজীবিনী ও দেহ-বিপণনের বিশ্বায়ন'. *বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা-২.* অমিয়কুমার বাগচী (সম্পা.), কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি. নভেম্বর ২০০২. পৃষ্ঠা ২৫৪

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫

৫৫. https://web.archive.org/web/20191230065707/https://www.wttc.org /-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2019/india2019.pdf Accessed on 17.05.2021 8.45 pm

৫৬. https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/india2018.pdf Accessed on 17.05.2021 9.15 pm

৫৭. https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/indian-medical-tourism-industry-to-touch-8-billion-by-2020-grant-thornton/articleshow/49615898.cms Accessed on 19.05.2021 7.16 pm

৫৮. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=144633 Accessed on 19.05.2021 8.29 pm

৫৯. https://tourism.gov.in/sites/default/files/2020-09/ITS%20at%20a%20glance_Book%20%282%29.pdf Accessed on 25.05.2021 9.31 pm

৬০. পূর্বোক্ত

৬১. পূর্বোক্ত

৬২. পূর্বোক্ত

৬৩. https://www.ibef.org/industry/tourism-hospitality-india.aspx Accessed on 25.05.2021 10.02 pm

৬৪. https://www.cbsnews.com/pictures/then-and-now-a-history-of-social-networking-sites/ Accessed on 09.06.2021 5.09 pm

৬৫. পূর্বোক্ত

৬৬. https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ Accessed on 09.06.2021 5.09 pm

৬৭. https://backlinko.com/facebook-users Accessed on 09.06.2021 5.21 pm

৬৮. https://backlinko.com/whatsapp-users Accessed on 09.06.2021 5.27 pm

৬৯. https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/ Accessed on 09.06.2021 5.29 pm

৭০. https://www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx Accessed on 11.06.2021 6.53 pm

৭১. পূর্বোক্ত

৭২. পূর্বোক্ত

৭৩. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3549840/ Accessed on 11.06.2021 7.30 pm

৭৪. পূর্বোক্ত

৭৫. https://www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx Accessed on 14.06.2021 8.05 pm

৭৬. https://www.joghr.org/article/11915-globalisation-and-health-a-blessing-or-a-curse-case-review-of-the-indian-health-system Accessed on 14.06.2021 8.43 pm

৭৭. পূর্বোক্ত

৭৮. পূর্বোক্ত

৭৯. পূর্বোক্ত

৮০. https://nift.ac.in/theinstitute Accessed on 17.06.2021 7pm

৮১. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2009-07-25/news/27640843_1_fashion-designer-indian-fashion-industry-international-fashion-arena Accessed on 17.06.2021 7.15 pm

৮২. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008075/lang--en/index.htm Accessed on 17.06.2021 7.23 pm

৮৩. https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Periodicals/De/pdf/00_02_03.pdf Accessed on 17.06.2021 7.43 pm

৮৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Shopping_mall Accessed on 20.06.2021 9.07 pm

৮৫. https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/retail/jiomart-currently-serviced-by-reliance-smart-reliance-fresh-no-links-yet-with-kiranas-whatsapp-analysts/articleshow/75999944.cms Accessed on 20.06.2021 10.11 pm

৮৬. https://www.ibef.org/ Accessed on 24.06.2021 9.15 pm

৮৭. https://www.forbesindia.com/article/big-bet/amazons-perfect-timing-for-india/35517/1 Accessed on 24.06.2021 9.34 pm

৮৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company) Accessed on 27.06.2021 7.09 pm

৮৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Flipkart Accessed on 27.06.2021 7.39 pm

৯০. https://en.wikipedia.org/wiki/Snapdeal Accessed on 28.06.2021 9.23 pm

৯১. https://www.ibef.org/industry/ecommerce/infographic Accessed on 01.07.2021 9.45 pm

৯২. পূর্বোক্ত

৯৩. পূর্বোক্ত

৯৪. পূর্বোক্ত

৯৫. https://yourstory.com/2021/05/snapdeal-indias-value-e-commerce-journey/amp Accessed on 03.07.2021 9.24 pm

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি ও বাংলা ছোটোগল্প

বিংশ শতাব্দীতে ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। ১৯৯৫ সালে যখন ডাঙ্কেল প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে GATT চুক্তির অবসান ঘটল, ততদিনে ভারত মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নিয়েছে (২৪ শে জুলাই, ১৯৯১)। প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও (১৯২১-২০০৪)-এর জমানায় (১৯৯১-৯৬) প্রথম নেওয়া হয়েছে সেই সাহসী পদক্ষেপ, যিনি নিয়েছেন, তিনি তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ (জন্ম-১৯৩২)। এর ফলে ভারতে দেশীয় কোম্পানিগুলির পাশাপাশি বিদেশি কোম্পানিগুলিও অবাধে প্রবেশ করতে থাকে ভারতীয় বাজারে এবং ফলশ্রুতি হিসাবে মহার্ঘ ভোগ্যপণ্য ও প্রযুক্তিগুলি দ্রুত মধ্যবিত্তের নাগালে আসতে থাকে। নিম্নবিত্তরাও এর সুফল ধীরে ধীরে পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে পথ চলতে শুরু করা ভারতের সরকারি দূরদর্শনের মুষ্টিমেয় চ্যানেলের পাশাপাশি ১৯৯৩ সাল থেকে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বেসরকারি চ্যানেলের প্রবেশ ঘটে। আর এই ব্যবস্থার হাত ধরে দ্রুত বিদেশি চ্যানেলসমূহও এসে হাজির হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৬২ সালে যে ভারতে মাত্র ৪১টি টেলিভিশন সেট ছিল, ১৯৯৫ সালে গিয়ে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ কোটি, দর্শক সংখ্যা পৌঁছায় ৪০ কোটিতে আর চ্যানেলের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করে যায়।[১] ১৯৯৫ সালের ৩১ শে জুলাই ভারতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সূত্রপাত হয়, আর তার সাক্ষী থাকে কলকাতা। মোদী-টেলস্ট্রা নামক প্রথম মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাটি ছিল ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মোদী ও টেলস্ট্রা কোম্পানির যৌথ উদ্যোগ।[২] ২০১৫ সালের একটি হিসাব অনুযায়ী ভারতে টেলিফোন

ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে, যার নব্বই শতাংশের উপরে মোবাইল ফোন। ১৯৯৫ সালেই প্রথম দেশের সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য চালু হয় ইন্টারনেট পরিষেবা। কম্পিউটার প্রবেশ করে ব্যক্তি মানুষের কর্মহীন হয়ে পড়ার ভয়কে উপেক্ষা করে। দ্রুত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই কম্পিউটার ব্যবহৃত হতে থাকে। ২০১৯ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় দেশের ৪১ শতাংশ মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করেন। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে ১২১ কোটিতে।[৩]

৩.১॥

শুধুমাত্র পরিসংখ্যান হিসাবে নয়, বিনোদন, সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তি এবং বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রের এই দ্রুত বিবর্ধন কিংবা বিস্ফোরণ, যাই বলি না কেন, তা বদলিয়ে দিতে শুরু করেছিল ভারতীয় সমাজকে। ভারতীয় সমাজের অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সমাজও এই চিহ্নগুলিকে ধারণ করতে শুরু করেছিল অচিরেই। বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে বদলাতে শুরু করেছিল উৎপাদনব্যবস্থা, আর তারই প্রভাব পড়েছে সাহিত্য কিংবা শিল্পে। শুধুমাত্র মেধাই দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশের মাটিতে সোনা ফলিয়েছিল এমনটা নয়, ভারত থেকে বহুল পরিমাণে দক্ষ এবং তার চেয়েও বেশি পরিমাণে অদক্ষ শ্রমিকের পরিযাণ ঘটেছিল সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অক্ষ-দ্রাঘিমায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের রক্ষাকবচের নিরাপত্তা তারা পায় নি, তা উল্লেখ করা শব্দবৃদ্ধির নামান্তর। তবে শুধুমাত্র নেতিবাচকতাই নয়, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার এই বিশ্বায়ন পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারগুলির গ্রাসাচ্ছাদনকেও সচ্ছলতার দিকে নিয়ে গিয়েছে। শুধুই দেশের বাইরে এইধরনের পরিযাণ ঘটেছে তাই নয়, বেড়ে গিয়েছে অন্তর্দেশীয় পরিযাণের প্রবাহও। তা

নিয়ন্ত্রিত হয়েছে লগ্নিপুঁজিকে কেন্দ্র করে। সুফল হিসাবে দেখা গিয়েছে যে শ্রমিকরা নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ না থেকে অন্তত বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে মজুরী নিয়ে সামান্য হলেও দর কষাকষির সুযোগ পেয়েছে।

বিশ্বায়নের প্রভাবে উৎপাদনব্যবস্থা ও পদ্ধতির যে পরিবর্তন এসেছে, তা প্রভাবিত করেছে উপরিকাঠামোকেও। সাহিত্য উপরিকাঠামোর অংশ। এই অবসরে সেই ক্ষেত্রটিতেও যে পরিবর্তনের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। স্বভাবতই বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিও বিশ্বায়নের নানান চিহ্ন কিংবা প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটাতে শুরু করে দিয়েছিল বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই। এই নতুন যুগের ছোটোগল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠল বিশ্বায়ন, বিনোদন কিংবা দ্রুত সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে যাওয়া বিভিন্ন প্রযুক্তি তথা তথ্যপ্রযুক্তি ও তার ব্যবহার। শুধুমাত্র এই বিষয়গুলিতেই যে বাংলা ছোটোগল্পের জগৎ সীমাবদ্ধ থাকল তা নয়, বরং বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পুঁজির প্রভাবে পরিযাণ কিংবা মেধা ও শ্রমের দেশান্তরগমন—এ সবই হয়ে উঠতে লাগল ছোটোগল্পের বিষয় আশয়। পাশাপাশি ছোটোগল্পের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করতে থাকল বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিভাষাসমূহ। চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহার হওয়া শব্দগুলি অনায়াসে জায়গা করে নিতে থাকল লেখকের বাকভঙ্গীর অংশ হিসাবে। বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পেশারও বৈচিত্র্য বহুগুণ বেড়ে গেল। এইসব বৈচিত্র্যময় পেশাসমূহের সঙ্গে যুক্ত লেখককুলের অভিজ্ঞতা বাংলা ছোটোগল্পের ধারাটিকে পরিচালনা করল বিভিন্ন গন্তব্যে। প্রচলিত রূপকথা কিংবা ছড়ার সঙ্গে মিশে যেতে থাকল আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অনুপুঙ্খ। সেখানে যন্ত্রসভ্যতা পরিচালিত জটিল মননই রাক্ষসের রূপে প্রকাশিত হতে থাকল। মানুষের জীবনে যান্ত্রিক স্বাচ্ছন্দ্য এলেও তার মনের দিকটি ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে থাকল। দেখা দিল নতুন নতুন মানসিক বিকার। আর সেইসব

জটিলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার রাস্তাও অন্ধগলির অভিমুখেই মানুষকে ঠেলে দিতে থাকল। নতুন ধরনের এই সংকটকেই তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং মননের রসে জারিত করে বাংলা ছোটোগল্পে প্রবেশ করালেন এইসময়ের ছোটোগল্পকাররা। বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্বায়ন পর্বে তাঁদেরই কয়েকজনের লেখা নির্বাচিত কিছু ছোটোগল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এই সময়পর্বে প্রযুক্তি কীভাবে ব্যক্তি কিংবা সমাজমানসকে প্রভাবিত করেছিল, তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। অন্যদিকে কীভাবে প্রযুক্তির সম্প্রসারণের ফলে ছোটোগল্পে ব্যবহৃত শব্দাবলি কিংবা অন্তর্নিহিত ভাব বদলে গিয়েছে পূর্বের তুলনায়, সেই দিকগুলিকেও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

৩.১.২॥

প্রযুক্তির ঢেউ বিশ্বায়ন পরবর্তী ত্রিশ বছরে ভারতের নিরিখে যেভাবে আছড়ে পড়েছে, তাতে দ্রুত বদল ঘটেছে উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো কিংবা ব্যক্তিমানুষের মননের ক্ষেত্রে। প্রযুক্তির বিকাশের হাত ধরে বদলে গিয়েছে বিনোদন ব্যবস্থা। আসরকেন্দ্রিক বিনোদন ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে দ্রুত। এর পরিবর্তে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত যে কেন্দ্রীয় বিনোদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে, তা মানুষকে করে তুলেছে আরো একাকী। আবার প্রযুক্তির প্রসার মানুষের মনে তৈরি করেছে কর্মচ্যুতির ভয়। অন্যদিকে একথা ঠিক, যে প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ অনেকক্ষেত্রেই মানুষকে সরাসরি কর্মহীন করেছিল, অথবা কর্মসৃষ্টির সম্ভাবনাকে সংকুচিত করে ফেলেছিল। *তথ্যপ্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন* (একুশশতক, ২০০২) গ্রন্থের সূত্রপাতে সম্পাদক সৌমিত্র লাহিড়ী প্রযুক্তি প্রসারের এই সময়টি সম্পর্কে লিখছেন—

> দ্রুত ধাবমান সময়, যেন রণপায়ে হাঁটছে। প্রতিদিন বদলে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। দুই-তিন দশক আগে যাঁরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি ছেড়ে চলে এসেছেন, আজ তাঁদের আবার নতুন করে অনেক কিছুই শিখতে হচ্ছে। যাঁরা শিখতে অনাগ্রহী, তাঁদের সরে যেতে হবে বাতিল ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে।
>
> ইদানীং ব্যবহারিক জীবনের ভাষা বদলে যাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় রোল-চাউমিন আর ফাস্ট ফুড সেন্টারই শুধু গজিয়ে ওঠেনি, গলির মোড়ে মোড়ে সাইবার কাফে-ই-ক্লাব, এসটিডি-আইএসডি-ই-মেল-ইন্টারনেট সেন্টার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই চালু হয়ে গেল। এখনকার যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রীর জীবনযাপন দু-তিন দশক আগের যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রীর জীবনধারার সঙ্গে এতটাই আলাদা যে, মনে হবে কেউ কারও ভাষা বুঝতে পারছি না।[৪]

বলাই বাহুল্য যে, প্রাবন্ধিকের পর্যবেক্ষণে উঠে আসা এই সময় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ অভ্রান্ত ছিল। দ্রুত ধাবমান এই সময়টি প্রভাব রেখে গিয়েছে বাংলা ছোটোগল্পের জগতটিতে। এইসময়ের তেমনই কয়েকজন ছোটোগল্পকারের গল্পে দেখে নিতে চেষ্টা করা হয়েছে পূর্বে আলোচিত এই সময়পর্বে প্রযুক্তির প্রভাবসমূহকে।

৩.২॥ সাধন চট্টোপাধ্যায়

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৪, অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ও শিক্ষকতায় যোগদান। লেখালিখি শুরু সত্তরের দশকে। উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ : *মহারাজা দীর্ঘজীবী হোক, কোলাজ, গল্প ৫০, শ্রেষ্ঠ গল্প, বাছাই ৪৯* ইত্যাদি। উপন্যাস: *জলতিমির, পক্ষবিপক্ষ, মাটির অ্যান্টেনা, গুল্মলতার ইলেকট্রন, সাতপুরুষ ডটকম, ধরিত্রী, তেঁতুলপাতার ঝোল, গহীন গাঙ* ইত্যাদি। প্রবন্ধগ্রন্থ : *কথাপট, অক্ষরে বদ্ধ জীবন, সময়ের সাতপাঁচ*। সম্পাদনা : পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের লেখকদের গল্প সংকলন

অসীমান্তিক, *ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প*, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, *দিবারাত্রির কাব্য* ও বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যা *নীললোহিত*। পুরস্কার : 'বঙ্কিম পুরস্কার' (২০০৫), 'সোমেন চন্দ পুরস্কার' (১৯৯৫) এবং 'বি.এফ.জে.এ. পুরস্কার' (১৯৮৯) প্রভৃতি।[৫] তিনি এযাবৎ চব্বিশ-পঁচিশটির মতো উপন্যাস, পাঁচ শতাধিক ছোটোগল্প এবং সাড়ে পাঁচশতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন।[৬]

যে সময়ের মধ্য দিয়ে লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে অন্যতম ১৯৯১ পরবর্তী মুক্ত অর্থনীতি এবং তার ফলে আগত বিশ্বায়নপ্রভাবিত সময়। লেখালিখি শুরুর দুই দশক পরে লেখক হিসাবে তিনি প্রবেশ করেছিলেন নির্দিষ্ট এই সময়টিতে, যে সময়ের প্রভাব এখনো ক্রিয়াশীল এবং তা নিজেকে বদলে নিয়ে এগিয়ে চলেছে নিত্য নতুন প্রকৌশলে। ফলে বিশ্বায়নের বিভিন্ন চিহ্ন যে তাঁর গল্পে ছাপ রেখে যাবে তা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। আর তাই তাঁর গল্পের অন্যতম বিষয় হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে প্রযুক্তি কিংবা তথ্য-প্রযুক্তি জগতের নানা অনুপুঙ্খ। এর পাশাপাশি ছোটোগল্পের আঙ্গিক নিয়েও চলেছে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 'কাহিনির মরীচিকা'-কে অতিক্রম করে তিনি পৌঁছাতে চান কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলার বাইরে। তাঁর অন্যতম ছোটোগল্প সংকলন *গল্প ৫০*-এর 'কাহিনির মরীচিকায় পাঠকের চৈতন্য' অংশে মেলে সেই ভাবনারই প্রতিফলন—

> ছোটগল্প বলতে জম্পেস একটি গল্প, আয়তনে ছোট—এমন ভাবনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই প্রশ্রয় দেননি। তবু দশকে-দশকে ঘুরে ঘুরে সংস্কারের মতো কমলি ছাড়ছেনা। কখনো ঘটনা ঘনঘটা হয়ে হাজির হয়, কখনো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে কাহিনি জুড়ে যেতে থাকে। এখনতো দূরদর্শন এবং সিরিয়াল রমরমা হতে, গল্পে কাহিনির আড়ম্বর না থাকলে চলে না। আসলে মানুষের উপজ্ঞায় গল্পের রস গভীর কৌতূহলের মোক্ষণ ঘটায়। উভয় বিষয়টি মাথায় রেখেই লেখক আখ্যানের আধারে জন্ম দেন কাঠামোময় একটি কাহিনির মরীচিকা। লোভে লোভে, গন্ধে-গন্ধে পাঠক-পাঠিকারা গতিময় থাকবে; পাকা লেখক

টেরই পেতে দেবেন না তাঁর আখ্যানকাঠামোটি প্রপঞ্চময়। নইলে শুরুতেই পাঠক-পাঠিকা মুখ ফিরিয়ে নেবে। হাই তুলবে, এগুতে ক্লান্তি বোধ করবে। একবার গেঁথে, কাঠামোময় মরীচিকায় টেনে নিয়ে গিয়ে লেখক তো পাঠকের চৈতন্যে জন্ম দেন দ্বিতীয় কোনো ভূবনের—যা দেশ-কালকে ঘিরে ব্যক্তিসত্তা বা সমাজসত্যের নতুন কোনো বোধকল্পে বলয়িত। আসলে পরিবেশ ও চারপাশের বস্তুজগতের সদা-প্রতিক্রিয়ায় মানুষের চৈতন্যে ক্রম উন্মীলন চলছে, যেন সভ্যতার সূত্রপাত থেকে সমষ্টিচৈতন্যের একটি মস্ত ফুল পাপড়ি মেলেই চলেছে। শেষ নেই। ঘটনাগুলো বড়ো হয়ে উঠলে, চৈতন্যের পাপড়িমেলাটুকু চোখে ভেসে ওঠে না। পাঠক কাহিনির ঘরের মধ্যেই আটকা পড়ে থাকে। একেই লেখকরা বলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলায় কাহিনি-বিন্যাস ঘটালে চলবে কী করে? সময় তো স্থির নেই, দেশও ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। চৈতন্য নতুন নতুন ভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে, নিজেকে বদলাচ্ছে, জগৎকে দেখছে নতুন নতুন ভাবে। মানুষের চেতনার মধ্য দিয়েই তো বস্তুজগৎ বারে বারে নতুন সাজে বেঁচে ওঠে। মানুষ যে পৃথিবীর সত্তাকে বার বার বাঁচিয়ে তুলতে অপরিহার্য, শিল্পই তা বারে বারে ঘোষণা করে। আঙ্গিক তাই বদলায়। আঙ্গিক তো কোনো বাইরের সাজানো পোষাক নয়।[৭]

১৮ই জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে কলকাতায় বসে লেখা উপরিউক্ত অংশটি থেকে পাঠক যেমন ছোটোগল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে লেখকের ভাবনার সন্ধান পান, তেমনি চোখ এড়িয়ে যায় না কাহিনি বিষয়ে আলোচনার সূত্রে তাঁর 'এখনতো দূরদর্শন এবং সিরিয়াল রমরমা'—এই বক্তব্যটি। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তির প্রসার এবং তার হাত ধরে বিনোদনব্যবস্থার বদল কীভাবে ছোটোগল্পের আঙ্গিকের চেহারায় চাহিদাগত বদল ঘটাতে সক্ষম। যদিও লেখক এইসব প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত এবং সচেতনভাবেই তিনি যে সেই গন্তব্যে গতিশীল নন তা পাঠককে জানিয়ে দেন। যদিও গল্পপাঠের অভিজ্ঞতায় বলা যায়, তিনি যে একেবারেই কাহিনিকে অস্বীকার করেছেন এমনটি নয়। তবে সময়ের ছাপ এসে তাঁর গল্পের অনুপুঙ্খে যে বদল ঘটিয়েছে তা খুঁজে নেওয়া যায়।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের ভাষায় তিনি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন বিজ্ঞাপনী ভাষার প্রয়োগ। এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল খুব সংগতভাবেই লিখেছেন যে—

> বহুজাতিক সংস্থা-পণ্য-বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী বাজার-অর্থনীতি, বদলে দিয়েছে আমাদের মধ্যবিত্ততা, আমাদের স্বপ্ন-সাধের সীমা। টিভি তখনো তার সহস্রাধিক বিনোদনের ফাঁকে আটকে ফেলেনি আমাদের ড্রয়িং রুম। সিংহের মতো একটা মেঘ দ্রুত তখন মিশে যেত গহন মেঘের অরণ্যে। ছায়ার ঘোমটা মুখে টেনে দিকচক্রবালে ঘুমিয়ে থাকতো মেঘেদের পাড়া। আমাদের জানলা থেকে এখন আর আকাশ দেখা যায় না। সে অবসরও নেই আর। ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা সেই চেনা আকাশটাকে ফুট বাই ফুট কিনে নিয়েছে—তারই প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনের জন্য। বহুজাতিক পণ্য-প্রযুক্তি-মিডিয়ার সমারোহে বিজ্ঞাপন এজেন্সির উত্থান যদিও ভিন্ন আলোচনার দাবি রাখে। বিজ্ঞাপনের ভাষাও সম্প্রতি ভাষাতাত্ত্বিকদের চিন্তাচর্চার পরিধিকে বিস্তৃত করে দিয়েছে। কর্পোরেট কালচার, পুলিশি সংস্কৃতি ও ক্ষমতার ভাষার সমান্তরাল বয়ানও আছে পাশাপাশি। বিজ্ঞাপনের ভাষা—সে ভাষার রূপকধর্মীতা, প্রত্যক্ষতা, সূক্ষ্মতা, যতই শৈল্পিক হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা আসলে আরও বেশি পণ্য বেচার কৌশল, আরও বেশি খদ্দের ধরার ছল। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্টিং মিডিয়ার বিজ্ঞাপন বা হোর্ডিং-এর বিজ্ঞাপনকে একসঙ্গে আসলে এই দুটি কাজই করতে হয়। তবেই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা পণ্যায়নের আধিপত্য তৈরি করতে পারে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে তাই বিজ্ঞাপন এজেন্সির গুরুত্ব অবিসংবাদী।[৮]

বিশ্বায়ন পরবর্তী যে যে বিষয় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে স্থান করে নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এইসময়ের মানুষের প্রযুক্তিনির্ভর জীবন। প্রযুক্তি ব্যবহারের একাধিক ক্ষেত্র উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। তাঁর এইধরনের একটি ছোটোগল্প হল 'মাংসখেকো ঘোড়া' (*অনীক*, ২০০১)। এ গল্পে উঠে আসে বিজু, পঞ্চা, যাদব, নীলু প্রমুখ কয়েকজন শ্রমিকের কথা, যারা সকলে মিলে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু একটি লোহার খাঁচায় হোর্ডিং টাঙাচ্ছিল। একটি ঘোড়া এবং একটি রমণীর ছবি দেওয়া 'জীবন মানেই গতি' লেখা বিশাল সেই হোর্ডিংটি টাঙাতে গিয়ে একটি লোহার খাম্বা

খসে বিজলিপদ বা বিজুর রেঞ্জসহ ডানহাতটা কনুইয়ের নিচ থেকে কেটে নিয়ে চলে যায়। এ গল্পের হোর্ডিংটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রতীক হয়ে ওঠে, প্রকৃতপক্ষে তা খেটে খাওয়া শ্রমিকের শ্রমের অবলম্বন তার হাতগুলির একটি কেটে নিয়ে চলে যায়। আর এই যান্ত্রিকতা সেই শ্রমিকদেরকেও সংবেদন ভুলিয়ে কতখানি যান্ত্রিক করে তুলেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অঙ্গ হারানো শ্রমিকের সংলাপে—

—বি-জু-দা ! পঞ্চা হাঁকে।

—ঠিক আছি !

—হাতটা ?

—রেঞ্জটা চলে গেল ![৯]

অর্থাৎ ‘হাতটা’র থেকেও এখানে বড় হয়ে উঠেছে ‘রেঞ্জটা’। চিরকাল শোষিত হয়ে আসা শ্রমিক তার নিজ অঙ্গ হারাবার যন্ত্রণা অনুভব করার আগেই তার হস্তধৃত যন্ত্রটি হারানোর আক্ষেপ উঠে আসে তার গলায়। এ গল্পে লেখকের কলমে চমৎকার ভাবে উঠে আসে হোর্ডিং-এর বিষয়বস্তু—

> কাজ চলছিল সকাল থেকেই। এখন বিকাল ঢলো-ঢলো। রাত নামলেই চারপাশের আলোর রোশনাই জেগে উঠবে অক্ষর ও ছবিতে। ফ্লাইওভারে, বাসে বসেই জানালার যাত্রীটি চোখ ফেললেই দেখতে পাবে লাল ঘোড়াটাকে। চোখের ড্যালা, ঘাড়ের চুল, পেছনের দাবনার পেলব পেশিমগুলের চকিত শিহরণে একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ভঙ্গি। সুকুমার উরুর মেয়েটিকে রমণের আকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত। ‘জীবন মানেই গতি’—অক্ষরগুলো ইংরেজি বর্ণমালার এবং তফাতে---ফ্রেমের কোণ ঘেঁষে---ক্লাচ ও এক্সিলেটর এবং শিংজোড়ায় আয়নার চিহ্ন। পশ্চিমের টুকরোটা ঠিকঠাক স্ক্রু-বল্টু নিয়ে খাম্বায় কামড়ে গেঁথে গেলে, এখন হারানো বিকেলের মধ্যেও ঘোড়াটার শরীরে গোধূলির কিছু মোহময় আশীর্বাদ যাবে লেগে। ঠিক তখনই দুর্ঘটনাটি।[১০]

হোর্ডিং-এর ঘোড়াটি সাধারণ ঘোড়া নয়, এ যেন হয়ে ওঠে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্বায়ন নামক অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। এ ঘোড়া তৃণভোজী নয়, মাংসখেকো। তার খাদ্য হয়ে ওঠে শ্রমিকের অঙ্গ। কিছুটা হলেও লেখকের উপলব্ধি মহাকাব্যিক, কারণ মহাভারতে দ্রোণাচার্যের কূটকৌশল একলব্যের ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে নেয়, আর এই গল্পে শ্রমিকের ডান হাত কাটা পড়ে পুঁজির প্রসার ঘটাতে গিয়ে। শ্রমিকের মাংসই প্রকৃতপক্ষে হয়ে ওঠে পুঁজির খাদ্য—

> নিঃশব্দে, নিরিবিলিতে, ফ্রেমের ঘোড়াটা লাফিয়ে নেমে এসে ঘুমন্ত নীলুর ডানহাতটি চিবিয়ে খাচ্ছে। আঙ্গুল, কব্জি,বল্টুর ঘষা জং, শিরা, ত্বক—কনুই অবধি ওঠার আগেই তিনজন ছাদে পা দিয়েছে। হলদে দাঁতে সামান্য চিঁহি ভাব দেখিয়ে ঘোড়াটা সামান্য লাফ দিয়ে ফের ছবি হয়ে গেল। ঘোড়ার শরীর থেকে সুন্দর গন্ধ ছিটকে এখন বাতাস মাতিয়ে রেখেছে।
>
> পরদিন সংবাদপত্রে সারা শহরে ঘরে ঘরে একটি লাল ঘোড়ার কাহিনি বেরোল কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না প্রাণীটি মনুষ্যহাত গিলে ফেলতে পারে কিনা। ঘোড়া কেবল ঘাস ও ছোলা খায়। মনুষ্য-হাত তো গলাধঃকরণ করে না?[১১]

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে পুঁজি এবং তার হাত ধরে প্রযুক্তির যে ধরনের প্রসার ঘটেছিল, তা গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শ্রেণিগুলির মধ্যে প্রভেদ তৈরি হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রযুক্তিকে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিল, নিম্নবিত্ত গ্রহণ করেছিল সেই তুলনায় অনেক কম। তবে উভয় ক্ষেত্রেই অনেকসময় নিঃসঙ্গতা কাটাবার উপকরণ হয়ে উঠেছিল প্রযুক্তি—

> সুদীপ আমাকে সহানুভূতির পরামর্শে বলেছিল, 'বাবাকে একটা ভালো কালার টিভি প্রেজেন্ট করা দরকার। ... একা একা... নিঃসঙ্গ...খানিকটা চাঙ্গা থাকবে।'
>
> হঠাৎ এখন, দমহারা খাঁচায় ঘরটা যেন গিলতে চাইছে প্রদোষকে। সে উঠে মোবাইল হাতে তোলে আতঙ্কে, কথা বলে মণির সঙ্গে।

...এ-জন্যেই বিয়ে করে মণি বাপকে একটা মোবাইল উপহার দিয়েছে। নকিয়ার দামি একটি সেট। দরকারে ছবিও তোলা যায়। কিন্তু প্রদোষ তার ব্যবহার জানে না, রপ্তও করেনি বলে, সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এতে কোনও আপশোষ নেই। একা একা, বড় বিচ্ছিন্ন বোধ হলেই পরিচিতদের বোতাম টেপে।[১২]

হাতের মুঠোয় মোবাইলে কথা বলতে বলতে, প্রদোষ কুণ্ডু এখন জোড়াতালি দেয়া একটা অখণ্ড মানুষে বদলে গেল। এতক্ষণ, নিঃসঙ্গ-একাকীত্বের করাত তাকে টুকরো টুকরো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তুলতে, সে ফ্রিজ খুলে খানিক বেঁচে থাকা প্রমাণ করল এবং মোবাইলে মণির গলা শুনে পুরো জীবন্ত মানুষ।

বৃদ্ধকে প্রাণের মোড়কে বাঁচিয়ে তোলে মোবাইলটা, ফ্রিজ কিংবা টিভি। নইলে রাত ভারি হতেই, ঘাস-জঙ্গল-ঢাকা বাড়িটিতে সে বিকল কিম্ভূতকিমাকার মানসিক রোগী হতে থাকে।

দাঁত হারিয়ে গেলে যেমন বাঁধানো পাটি, কান গেলে হিয়ারিং এইডস্, দৃষ্টিতে চশমা, দুর্ঘটনায় কৃত্রিম হাত-পা—মানুষকে যেমন জোড়া দিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক বানাতে চায়, টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল দিয়ে দুমেয়ে বাবার নিঃসঙ্গতা মেরামতে সচেষ্ট।

দিনের আলোয় বোধই হয় না নিঃসঙ্গ বাড়িটা দেখে—এরই খোলশে ঢাকা দীর্ঘ রাত যখন দুস্তর, দেয়াল-ছাদ-দরজা-জানলা কেবলই যখন স্মৃতি ও আতঙ্ক, টিভি, মোবাইলটা ত্রাতা। বেঁচে থাকার স্পন্দন যোগায়।[১৩]

‘পটভূমি বদলে যায়’ (*উদার আকাশ*, শারদ ২০০৬) গল্পে নিম্নবিত্ত জীবনের কথা উঠে আসে। এ গল্পের চরিত্র চায়নাবিবি ক্যানিং লাইনের বেতবেড়িয়া স্টেশন থেকে আরও তিনমাইল ভিতরে বাস করে। তার দিন গুজরান হয় কলকাতায় লোকের বাড়িতে কাজ করে। তারই সহযাত্রী রহিমার সংলাপে উঠে আসে নিম্নবিত্তের জীবনে প্রযুক্তির প্রভাবের দিকটি—

চায়নাবিবি রহিমাকে বলে ‘শুনলুন এ-মাসে তুই টি.পি. কিনিছিস?’ রহিমা ছেলের উদ্দেশে গজগজ করে জানায় আলাদা হয়ে তারা নাকি পুরনো টি.ভি.-টার দখল নিয়েছে। রহিমার আবার কয়েকটা সিরিয়াল না দেখলে নয়। অভ্যাসের যত জ্বালা ! কাজের একটা বাড়ির মালকিনের কাছ থেকে তিন হাজার ধার

নিয়ে কিনেছে একটা। ঘুটিয়ারিতে আজ-কাল দোকান থেকে টি.ভি. কেনা যায়। গঞ্জে এখন কানফোনের খুবই চল। মাসে মাসে কিস্তির টাকা কাটলে গায়ে লাগে না কিছু।[১৪]

এ গল্প থেকে গ্রামীণ জীবনে প্রযুক্তির প্রসার কিছুটা আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

'মরুদ্যানের মূল্যতালিকা' গল্পটিতে বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞাপনের ভাষার একাধিক নমুনা উঠে এসেছে—

একটা প্রডাকট বাজারে চালু করতে গিয়ে কী কী শব্দকুশলতা ব্যবহার করতে হয়,তার ক্লায়েণ্টদের শ্রেণীভাগ, মনো-বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতি, রুচি, শিক্ষাদীক্ষা, তাদের বয়স-সীমা—সব ফর্মুলার মতো জেনে নিতে হয়। এ দিল মাঙে মোর—এ-বিজ্ঞাপনটির ভাষা ঠাণ্ডাপানিয়ের সঙ্গেই মানায়। পেপসি বা কোকাকোলা। হালফ্যাশনের তরুণ-তরুণী, হৈ-হুলোরে, রুচি-নীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, প্রযুক্তির সমুদ্রে ভেসে হৈ হৈ তরী চালানো যাদের স্বভাব, ট্যাঁকের জোর খুব বেশি থাকবার দরকার নেই, জনতা বলতে যা বোঝায়—'মন খুলে ফটাফট পেপসি-কোলা' গলায় ঢালবার ফূর্তিতে এই ভাষাই যথাযথ। কিন্তু গহনার দোকানের বিজ্ঞাপনে চন্দ্রহারের ছবি দিয়ে 'এ দিল মাঙে মোর' লিখলে গুরুচণ্ডালি দোষ হবে। যাঁরা বড় বড় সোনার দোকানে গিয়ে মূল্যবান সোনা বা জরোয়ার গহনা কিনবেন, তাঁদের নির্দিষ্ট আভিজাত্য আছে। ভাষার গতিবেগটা কাজে লাগবেনা সেখানে। কাব্য, ছন্দ, সোনালী ইশারা ও ব্যাঞ্জনার ভাষা দরকার। 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন/ কে কার অলঙ্কার'—গোছের।

আবার সর্বশেষ-প্রযুক্তি বাজারে এলে, তার বিজ্ঞাপনী-আবাহনের ভাষার মধ্যে চারপাশের চলতিঘটনার কিছু ছোঁয়া দরকার।[১৫]

এ গল্পে একজন বিজ্ঞাপন লেখকের জবানিতে উঠে আসে প্রযুক্তির অনুপুঙ্খ—

আই-ফোন তো এখন আমাদের সমাজ জীবনে স্ট্যাটাস্। এক-সময়ে পেজার হয়ে উঠেছিল স্ট্যাটাসসিম্বল। চটজলদি টের পাওয়া গেছল ওটা কুকুরের চেন। প্রভু টান দিলেই চলে আসতে হবে। পেজার তাই বাজারে জমল না। পরে ফ্রিজ-টিভির যুগ পেছনে ফেলে মোবাইল এসেছিল স্ট্যাটাস নিয়ে। কিন্তু ক্রমে মজুর-মাছকাটনি, শব্জিওয়ালা থেকে ভবঘুরে-ভিখারিও যখন মোবাইল হাতে-ঝুলিতে ভরল,

> তখন মোবাইলের ক্রমবিবর্তন হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো রমরমা হয়ে ওঠে। নিত্য নতুন কায়দায় বিজ্ঞাপনের জগৎ স্টারদের ধামাকা ও সুললিত রিংটোনের বৈচিত্র্য, এ ওকে টেক্কা দিতে দিতে, বাজারে আই-ফোন। প্রথম ক্রেতাটি হবার জন্য নানা মেট্রোশহরে নাকি রাতজাগার হিড়িক।...
>
> তরুণ-তরুণী বা ভোগ যাদের শ্রেণীগত অধিকার, তারাই মহামূল্যবান প্রযুক্তি-বিপ্লবটিকে প্রথম ক্রেতা হিসাবে গর্বিত করবে। যেমন নতুন-নতুন মডেলের চার চাকার গাড়ি বা দ্রুতগতির মটোর সাইকেল। এইসব বস্তুর রেশছাড়া আধুনিক জীবন ভাবা যায় না।[১৬]

সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে শুধু বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ের বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরেন নি, তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে একধরনের জীবনদর্শন, যা কিছুটা হলেও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছে নির্দিষ্ট এই সময়টিকে, কিংবা তাঁর গল্পে এই সময় সম্পর্কে উঠে এসেছে একাধিক গভীর পর্যবেক্ষণ।

৩.৩॥ **ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়**

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৮ সালে ২৬শে নভেম্বর, ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে স্নাতক। লেখকের উপন্যাস *স্বজনভূমি* 'তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার'-এ সম্মানিত ১৯৯৬ তে। 'ওল্ডব্লক নিউব্লক' গল্পটি 'কথা' পুরস্কার ২০০৩-২০০৪ এ মর্যাদা পায়। 'সোপান', 'শিলালিপি', 'রামমোহন লাইব্রেরি পুরস্কার', 'লোককৃতি পুরস্কার' পান। লেখকের *সহিস* উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হয় ২০০৭-এ। তাঁর বেশ কিছু গল্প ইংরেজি, হিন্দি, তামিল ও মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত।[১৭]

২০২১ সালের কালপর্বে দাঁড়িয়ে দেখা যায় পাঁচ দশক ধরে লিখে চলেছেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তিনি মূলত লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক হিসাবে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে একাধিক প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক পত্রিকাতেও লিখেছেন। তবে একথা বলাই যায় যে, বাণিজ্যিক

গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে তাঁর কলম আপস করেনি। পেশায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মী হিসাবে লেখক দেখেছেন একেবারে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ ও তার সমাজবাস্তবতাকে। ১৯৭৩ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘ব্যাং’-এ তিনি যে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আরও পরিণতি লাভ করেছে পরবর্তী প্রায় পাঁচ দশকের তাঁর লেখা ছোটোগল্পের দুনিয়াটিতে। এই পাঁচ দশকের সাহিত্যযাত্রায় যে যে পরিবর্তনের ঢেউ এসে প্রভাবিত করেছে, সেগুলির একটি অবশ্যই ভারত সরকার কর্তৃক মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়া এবং তার পরিণাম হিসাবে বিশ্বায়নের অভিঘাতকে মেনে নেওয়া। এর অন্যতম একটি ক্ষেত্র ছিল প্রযুক্তির প্রসার। লেখক নিজেই একজায়গায় এ বিষয়ে জানিয়েছেন—

> “সাম্প্রতিককালে অতি দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে এক দশকের মতো অতখানি সময়সীমায় মানুষকে আর বেশিক্ষণ আটকানো যায় না”...[১৮]

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী নামক জনৈক প্রাবন্ধিক কোরক পত্রিকার ১৯৯৫ সালের একটি সংখ্যায় গ্রামজীবনের মানসিকতায় যে ভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন, তা সুপ্রযুক্ত হয় ঝড়েশ্বরের লেখা ছোটোগল্প সম্পর্কে—

> ‘অগ্রগতির সঙ্গে কুসংস্কার মুক্তির যোগাযোগ আছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ধারণা আজ অনেকাংশে বাতিল। প্রযুক্তির অকল্পনীয় উন্নতি, বিজ্ঞানের আশাতীত প্রসারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে মৌলবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অলৌকিকের পায়ে মাথাবিকোনো বাড়ছে। গ্রাম বাংলায় টিভি ভিডিও পার্লার ট্রাকটর ইত্যাদির পাশে যে মানসিকতা বিরাজ করছে, তার সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদপোড়া’ বেমানান হবে না।’[১৯]

উপরিউল্লিখিত উদ্ধৃতির যাথার্থ্য ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক ছোটোগল্পে প্রমাণিত হয়েছে।

মুক্ত অর্থনীতি তথা বিশ্বায়নকে ভারত সরকার স্বীকার করে নেওয়ার পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সামাজিক ক্ষেত্রসমূহ কিংবা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে যে বদল ঘটেছিল, তারই অভিঘাত সাহিত্যে এসে পড়ছিল। প্রযুক্তির প্রসারের মধ্যে দিয়ে পুঁজি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে পূর্বতন ব্যবস্থাসমূহের বদল ঘটাচ্ছিল। আর শুধু প্রযুক্তির যন্ত্রদেহী আবির্ভাবই নয়, বরং তার ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি হয়ে ওঠার পূর্বাভাস উপলব্ধি করতে পারছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে এই ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। উচ্চবিত্ত শ্রেণি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছিল। আর এই দুই শ্রেণির মধ্যে অবস্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বুঝতে পারছিল যে, মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রটি সংকুচিত হয়ে আসবে, বেসরকারি ক্ষেত্র অনেক বেশি প্রসারিত হবে। প্রযুক্তিনির্ভর চাকরির ক্ষেত্রটিতে নিজেদের সন্তানকে উপযুক্ত করে তোলার প্রতিযোগিতা তাই এইসময় বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে ভারত সরকারের সন্তানসংখ্যা কমানোর নীতিতে নব্বই পরবর্তী দম্পতিদের পরিবারগুলিতে একসন্তান গ্রহণের প্রবণতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী দশকে প্রযুক্তির বিপুল বিস্তার যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার উৎসাহকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে তোলে, তখনো পশ্চিমবঙ্গে সেই চাহিদা সামাল দেওয়ার মতো উপযুক্ত সংখ্যায় সরকারি কিংবা বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত ছিল না। এর ফলে দলে দলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী তাদের অভিভাবকদের সহায়তায় দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে পড়ার জন্য পরিযায়ী হয়ে পড়ে। আরও একদশক পরে দেখা যায় এই শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীরা ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে কর্মসূত্রে। এর ফলাফল হিসাবে পরিবার ব্যবস্থার পূর্বতন ধারণাটিতেও বহু বদল ঘটে যায়। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে এই সময় এবং বদলের জায়গাগুলিকে তুলে ধরেছেন অনায়াস দক্ষতায়। তাঁর এই ধরনের কয়েকটি

ছোটোগল্প হল—'ওল্ড ব্লক নিউ ব্লক' (*শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ, ২০০৪), 'কনকস্বরম' (ঐ), 'আত্মগোপনের আপনজন' (*সেরা ৫০টি গল্প*, দে'জ, ২০১১) ইত্যাদি।

'কথা' পুরস্কারে সম্মানিত 'ওল্ড ব্লক নিউ ব্লক' গল্পটি সম্পর্কে ঝড়েশ্বরের *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর ভূমিকায় সাহিত্যিক দেবেশ রায় লিখছেন—

> এই কথা বলা ঘোরাঘুরি ঘটছে তাদের একমাত্র ছেলেকে প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করতে আসা নেহাতই মধ্যবিত্ত বাঙালি দম্পতির মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে। বাঙালি মধ্যবিত্তের সামাজিক জীবনের এই এমন সঙ্কট নিয়ে আর কেউ কি কোনো গল্প লিখেছেন? ঝড়েশ্বর ঠিক পৌঁছে যান, যেখানে গল্প ঘটছে, নতুন গল্প—একশ-দেড়শ বছর আগে বাঙালির ছেলেকে হাইস্কুলে পড়ানো, কলেজে পড়ানো, আরো উঁচু ও আলাদা কিছু পড়ানো নিয়ে যে সামাজিক সঙ্কট ঘনিয়ে উঠত, এই এখনকার এই সঙ্কট গুরুত্বে ও আয়তনে তার চাইতে এত আলাদা যে ভদ্রাসন একেবারে চুলোয় যাচ্ছে। কত সহজ একটা টান ছিল এই ঘটনায় যেন ঝড়েশ্বর বিশ্বায়ন ও বাজার ও উন্নয়ন এ-সবের ভিতর দিয়ে এক উত্তর-আধুনিকে ঢুকে যেতে পারতেন।...
>
> মানুষকে যখন যুক্তি খুঁজে বাঁচতে হয় সে কী কঠিন সময়। যুক্তি মেনেই তো সন্তান একমাত্র। যুক্তি মেনেই তো প্রযুক্তিবিদ্যা। যুক্তি মেনেই তো ব্যাঙ্গালোরের প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আর, যুক্তির এই শ্বাসরোধী বেষ্টনে অযুক্তির নোনা জল বাঁধ ভেঙে, পাড় ভেঙে, ঢুকে ভাসিয়ে নিতে টান দেয়। সতের-আঠার বছর পর মনে হয়। আর একটি সন্তান যদি থাকত, সাবালক ছেলেকে হাত ধরে পথ পার করে দিতে ইচ্ছে হয়...[২০]

বিশ্বায়নব্যবস্থা কিংবা তার ফলপ্রসূত প্রযুক্তিনির্ভর সময়কে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন কেমনভাবে আবর্তিত হয়, তা যে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে সার্থকভাবে উঠে এসেছে, সেকথা বলাই যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য ছোটোগল্পটির ('ওল্ড ব্লক নিউ ব্লক', ২০০২) কিছুটা অংশ উদ্ধৃত

করলে দেখা যাবে যান্ত্রিকতার স্বরূপকে তুলে ধরতে লেখকের শব্দের ব্যবহার কতখানি অব্যর্থ এবং বিষয়ের পাশাপাশি সময়োপযোগী হয়ে উঠেছে—

> দেড়-দু কিলোমিটার দূরে সুমনের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কলেজের উল্টো দিকে এক ফুট বাই দেড়ফুট আয়তনে পাথরের ইট বা কল্লুর গায়ে সিমেন্ট মশলায় গাঁথা মস্ত হোস্টেল বিল্ডিং। হোস্টেল চত্বরের মাঠটায় লাল ফুলের গুচ্ছ নিয়ে বড় গাছ। এই হালকা শীতের রাতে সে গাছও পাতা নেতিয়ে ঘুমাচ্ছে। ঘুমোচ্ছে তো ওল্ড ব্লক নিউ ব্লকে ছ'সাত শো ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার...ফোর্থ ইয়ার। এক রুমেই মেকানিক্যাল, ইনফরমেশন টেকনোলজি। অন্য রুমে কম্পিউটার সায়েন্স, মেটালারজি, টেক্সটাইল কিংবা ম্যানেজমেন্ট। হোস্টেল গেট-এর দু'ধারে হ্যালোজেন লাইট শিশিরে ভিজছে। ভিজছে তো নির্মলার দু-চোখের পাতা।...
>
> বাসটা শহরমুখো এগোয়। মোটা গাছের গায়ে কাপড়ের ফেস্টুন 'সাইবার স্টপ'। কম্পিউটারের নতুন ভাষা তো গাছটার পুরোনো ছাল-বাকলে ! এখান থেকে লোহার গেট। ডাইনে-বাঁয়ে ফেন্সিং দিয়ে ঘেরা বাগান মাঠ পিচ ঢালাই রাস্তা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাস। তে-তালা বিল্ডিং এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। পিছনে সাদা বাড়িটা ওয়ার্কশপ। সেগুলো শেষবারের মতো দেখতে দেখতে পরমেশের মনে হল,...ছেলেটার ভাগ্যে এত দূর...মা-বাবা ছেড়ে...খাদ্য খাবারের অভ্যাস ছেড়ে...ভিন্ন ভাষার প্রদেশে লেখাপড়া শিখতে আসার ভবিতব্য কে যে ঠিক করে রেখেছিল...?[২১]

লক্ষ করা যায়, রক্তমাংসের শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তির ভাষায় হয়ে ওঠে কেউ 'মেকানিক্যাল', কেউ বা 'ইনফরমেশন টেকনোলজি'। তারা আর কেউ মানুষ থাকে না, প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়দ্বারা নামাঙ্কিত হয়ে পড়ে। আর এতেই মূর্ত হয়ে ওঠে সমকালীন সময়ের যান্ত্রিকতার ভয়াবহ রূপটি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ভবিতব্যের নিয়ন্তা সম্পর্কে যে অনুভূতিময় প্রশ্ন গল্পকার জাগিয়ে তোলেন, তার একটিই উত্তর পাঠকের মনে জাগরূক হয়, এই ভবিতব্য আর কোনো ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করেন না। তার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে পুঁজিনির্ভর অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা।

২০০২ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের ‘কনকস্বরম্’ নামক ছোটোগল্পের বিষয় হিসাবেও উঠে আসে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে দক্ষিণ ভারতে পরিযাণ। এখানে অভিভাবকদের মধ্যে সন্তানদেরকে নিয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দিকটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রযুক্তির রমরমা, প্রযুক্তিশিক্ষাকে কেন্দ্র করে পরিযাণ এবং তার ফলে পরিবারব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন—এ সমস্তই হয়ে ওঠে গল্পের বিষয়। এরই ফাঁকে লেখক গল্পের মধ্যে জানান দিয়ে যান বিশ্বায়নের ঋণাত্মক প্রভাবের ফলে আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরি ছাঁটাইয়ের খবর, যার অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের জঙ্গি হামলা। এর ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বেশ কিছু শাখায় যে পড়ার আগ্রহ কমে এসেছিল, সেই বাস্তবতাকেও লেখক তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি আর একটি সত্য গল্পটি থেকে উঠে আসে, তা হল যে বিশ্বায়ন ব্যবস্থাকে নিয়ে নব্বই-এর দশক থেকে এত উৎসাহ উদ্দীপনা, তার বেশিটাই মার্কিন দেশ নিয়ন্ত্রিত এবং মার্কিন অর্থনীতি নির্ভর। যে অর্থনীতিতে প্রভাব পড়লে সারা পৃথিবীই তার ফল ভোগ করে। ফলে এই নতুন অর্থব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন, নাকি আমেরিকায়ন, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

২০০২ সালে প্রকাশিত ‘ওল্ড ব্লক নিউ ব্লক’ কিংবা ‘কনকস্বরম্’ গল্পে লেখক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাপ্রবাহ দেখিয়েছেন, তার পরিণতি দেখা যায় ২০০৮ সালে প্রকাশিত তাঁর আর একটি ছোটোগল্প ‘আত্মগোপনের আপনজন’ (*সৃষ্টির একুশশতক*, উৎসব সংখ্যা ২০০৮)-এ। এই গল্পের মূল অন্বিষ্ট আলাদা হলেও পাঠক খেয়াল করেন, পূর্বোক্ত দুই গল্পে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের যে স্রোত দেখা গিয়েছিল, তার পরিণতির দিকটিকে লেখক এই গল্পে তুলে ধরেছেন। আগের গল্পদুটিতে পড়ুয়ার স্রোত রাজ্যের গণ্ডি অতিক্রম করে জাতীয়তাকে স্পর্শ করেছিল। আর এই গল্পটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় শিক্ষিত যুবককে কাজের

প্রয়োজনে পরিবার ব্যতিরেকে দেশের গণ্ডিকে অতিক্রম করে প্রকৃত অর্থেই ‘গ্লোবাল’ হয়ে উঠতে হয়। বাবা-মায়ের মনে অস্বাচ্ছন্দ্যের কাঁটা বিঁধতে থাকলেও তাকে চাপা দেয় ডলার থেকে টাকার রূপান্তরণ। তবে কন্যাসন্তানের বেলায় ‘গ্লোবাল’ হয়ে ওঠা সীমাবদ্ধ থাকে বিদেশি ব্যাঙ্কে চাকরি করার মধ্যে দিয়েই। তার জন্য বাবা-মা যে পুত্রসন্তানের মতো বিনিয়োগ করেননি, সে তথ্য গল্প থেকেই উঠে আসে—

> “—তাহলে অত দূরে চাকরিতে পাঠালে কেন ভাইকে?
>
> —না পাঠালে এত টাকা বেতনের চাকরি এখানে হত?
>
> —কম টাকায় তো বহু মানুষ ভালো আছে গো মা?
>
> —উম। প্রতি সেমিস্টারে গোছা গোছা টাকা গেছে ওই ভাইয়ের পেছনে। তুই তার জানবি কী?
>
> সিলভার ডেকচিতে মাংস ফোটে। বুট বুট শব্দ হয়। মায়ের কথায় তো লিপির বুকের মধ্যে ফোটে,...সেজন্যে কি ভাইকে দূরে সোনার ডিম পাড়িয়ে আমাকে এমন...
>
> মা মেয়ের চোখ-মুখ থেকে বুকের ভেতর দেখতে পায়, লিপি—তুমি এমনি এমনি ওই এমএনসি ব্যাঙ্কের যোগ্য হওনি। স্কুল থেকেই চার-পাঁচটা সাবজেক্ট টিচার। আমাদের দিনরাত ছোটাছুটি। তদারকি—অনার্সের প্রফেসার—আরও কতরকম কী যে...
>
> —সেজন্যে তো ব্যাঙ্ক থেকে বেতনের অর্ধেক...তার বেশিও তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিই...” [২২]

গল্পকার সার্থকভাবেই অনায়াস দক্ষতায় তাঁর গল্পে তুলে আনেন বহুমাত্রিক সত্যকে। যা পাঠকের সামনে হাজির করে নতুন অর্থনীতির পরিবর্তিত মূল্যবোধের একাধিক বহিঃপ্রকাশকে।

আলোচিত তিনটি গল্প যদি বিভিন্ন মাত্রায় প্রযুক্তিনির্ভর কিংবা প্রযুক্তিকেন্দ্রিক জীবনকে তুলে ধরে থাকে, তবে গল্পকারের বেশ কিছু গল্পে সরাসরি উঠে আসতে দেখা যায় সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রযুক্তি কিংবা সরাসরি বললে তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাব। লেখক যে সময়ের

মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময়ের প্রযুক্তির বিবরণ গল্পের অন্দরে উঠে আসার মাধ্যমে পাঠককে চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে অতিবাহিত সময়টিকে। এসটিডি, আইএসডি, পিসিও বুথ, সদ্য আসা মোবাইল ফোন, ক্যাশকার্ড, লাইফটাইম রিচার্জ, নিম্নমধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্তের হাতে মোবাইল ফোন পৌঁছে যাওয়া—এই সমস্ত কিছু পরম স্বাভাবিকতায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের ছোটোগল্পের অনুপুঙ্খ হয়ে উঠছে। আর এই অনুপুঙ্খগুলি ছাড়া পাঠক যে নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট নির্দেশতন্ত্রের নিরিখে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না, সেই অনুভবও লেখককে সজাগ রাখে। তাই একাধিক গল্পের অন্দরে ঢুকে পড়ে তথ্য-প্রযুক্তি, তার অবশ্যম্ভাবিতায়—

> ক্লাস এইটের ঝাপু হোম টাস্কের খাতায় শরীরের খানিক ভর রেখে মুখটা বাড়ায়, স্যার—আপনি মোবাইল কিনেছেন?
>
> —খুব ভালো হল। এবার আমরা ফোন করে পড়ার ডেট, টাইম ঠিক করে নেব, ক্লাস নাইনের সুরমা বুকের দোপাট্টা গোছাতে গোছাতে বলে।...
>
> সবে নতুন কেনা মোবাইলটা পকেটে বেঢপ লাগে। একবারও ডিজিট টিপে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ির টেলিফোন নাম্বারগুলো নোটবুক থেকে মেমোরিতে স্টোর করা হয়নি। কিংবা যন্ত্রটির সঙ্গে তেমন অভ্যস্ত হওয়ার কৌশলচর্চার সুযোগও হল না।...
>
> তখন তো তেমাথানি মোড়ে লোহার বরফিকাটা তিনখানা আকাশ ছোঁয়া উঁচু খুঁটির ডবল্যু এল এল লাইন থেকে নতুন এসটিডি বুথ।...[২৩]

একই ধরনের অনুপুঙ্খ ফুটে ওঠে 'সহবাসী' গল্পে—

> ক'খানা দোকানপাট নিয়ে ছোট্ট বাজার। মুদিখানা, ওষুধ দোকানটার ঝাঁপ বন্ধ হতে আলো নিভে আঁধার বাড়ল। টর্চ জ্বালতেই বন্ধ এস,টি,ডি বুথ দোকানটার সামনে ঝোলানো বরফি আকারে ফাইবার ডিসপ্লের গায়ে আলোর আভা। ফুটে ওঠে METASCAN.....PCO....। মোটা বাঁশ-খুঁটির মাথায় মাথায় একটা মাইক বেঁধে তার ক' খানা এস.টি.ডি বুথ দোকানের ভিতর। সেটুকু পার হয়ে আবার পাড়ার রাস্তা।[২৪]

শুধুমাত্র উপরিউল্লিখিত কয়েকটি ছোটোগল্পেই নয়, *সেরা ৫০টি গল্প*-এর অন্তর্গত ‘স্নানঘর’, ‘মেমদি’, ‘বসন্তসখী’ প্রভৃতি গল্পেও তথ্যপ্রযুক্তির সমধর্মী একাধিক অনুপুঙ্খ উঠে আসে। এর মাধ্যমে এইধরনের গল্পগুলিকে পূর্বের এবং পরবর্তী সময়ে লিখিত গল্পের তুলনায় পৃথকভাবে চিনে নেওয়া যায়। এছাড়াও সমকালীন সমাজ কিংবা অর্থনীতির দিকচিহ্ন হিসাবেও এগুলিকে ভাবা যেতে পারে। যা প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনযাত্রা কিংবা ভাবনার ধরনের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৩.৪॥ **বিপুল দাস**

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে যে ছোটোগল্পকারদের গল্পে প্রযুক্তি বিভিন্ন প্রসঙ্গে কিংবা অনুপুঙ্খে উঠে এসেছে, তাঁদেরই একজন হলেন বিপুল দাস। কথাকার বিপুল দাসের জন্ম ১৯৫০-এ। জন্ম, শিক্ষা, জীবনযাপন—সবই শিলিগুড়িতে। বিজ্ঞানে স্নাতক প্রাক্তন শিক্ষক বিপুল দাসের লেখার ধারাটি একেবারেই স্বতন্ত্র। বেড়ে ওঠার ভেতরে রয়ে গেছে চা-বাগানের মখমল সবুজ, বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের টিয়াপাখির ঝাঁক, মহানন্দা অভয়ারণ্যের বিপন্ন হাতি, তিস্তা-তোর্ষা-জলঢাকা-লিস-ঘিস-চেল-করতোয়ার বয়ে চলা। রয়েছে উত্তরের জনজাতির জীবনযাপনের সুখদুঃখের কথা। বাথানের গল্প, হাটের থেকে কুড়িয়ে আনা লোককথা, উত্তরের আলপথে দোতারায় ডোল ডোং বোল তুলে গান গায় পরেশ বর্মন—কুন দিন আসিবেন বন্ধু কয়্যা যান...। বিপুল দাসের লেখায় এসবই আসে।[২৫]

লেখক তাঁর *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর শুরুতে জানান—

> সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমার লেখালিখির চর্চা শুরু হয়, গল্প লেখা শুরু হয় আরও পরে। প্রথম গল্প 'অ্যান্টিবায়োটিক' বেরিয়েছিল অধুনালুপ্ত 'পাহাড়তলি' পত্রিকায়।...বেঁচে থাকার ভিতরে যে পীড়ন বা স্ট্রেস থাকে, সেখান থেকে মুক্তিবেগ পাওয়ার ক্ষমতাই গল্প লিখিয়ে নেয়।[২৬]

কথাকার বিপুল দাসের এপর্যন্ত লেখা ছোটোগল্পের সংখ্যা চারশতের বেশি। তাঁর লেখা ছোটোগল্প বিভিন্ন বাণিজ্যিক পত্রিকা ছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে *কৃত্তিবাস, কবিসম্মেলন, অনুষ্টুপ, বিভাব, ভাষাবন্ধন, তীব্র কুঠার, অমৃতলোক, মধুপর্ণী, মল্লার, একুশ শতক, অন্তঃসার* ইত্যাদি পত্রিকায়। এছাড়াও তিনি নিয়মিত লিখেছেন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার রবিবারের পাতায়।[২৭] তাঁর লেখা গল্পগুলিতে অনেক বেশি করে উঠে আসে তাঁর সমকাল এবং সংলগ্ন ভূগোল। অন্যদিকে বেশ কিছু গল্প অতীত সময়কে তুলে ধরে, যে অতীত দূরবর্তী। যা কখনো ধরে রাখে লেখকের শৈশবের স্মৃতিসমূহকে।

সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লেখকের লেখালিখির সূত্রপাত ঘটলেও তিনি সক্রিয়ভাবে সেই জগতে প্রবেশ করেন আটের দশক থেকে। তাঁর বহুমাত্রিক গল্পভুবনের মূল সুরটি অনুরণিত হয় উত্তরবঙ্গের জনজীবনসংলগ্ন সময়কালকে কেন্দ্র করে। নব্বইয়ের দশক কিংবা তার পরবর্তী সময়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর ছোটোগল্প সৃষ্টির ধারাটি চালিত হলেও বিশ্বায়নের নগরকেন্দ্রিকতার ফলেই হয়তো তাঁর খুব বেশি সংখ্যক গল্পে এই প্রক্রিয়ার তীব্রতা প্রবলভাবে উঠে আসেনি। বিশ্বায়নের প্রযুক্তিনির্ভর অগ্রসরণ এবং তার ফলে ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তনের দিকগুলি তাঁর কিছু গল্পে উঠে এসেছে। হয়তো এজন্য ক্রিয়াশীল তাঁর ভৌগোলিক অবস্থান, যা তাঁকে দূরে রেখেছিল নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং তাকে কেন্দ্র করে পুঁজির বিপুল আয়োজন থেকে। অন্যদিকে তাঁর ছোটোগল্পে বিজ্ঞান বিষয় এবং শিক্ষকতার পেশা—এই দুইয়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের অনুপুঙ্খ। কিছু গল্পের ক্ষেত্রে

দাম্পত্য সম্পর্ক ও তার বহুকৌণিকতা অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে। উঠে এসেছে তৃতীয় লিঙ্গ বা রূপান্তরকামীদের কথাও। কোনো কোনো গল্পে উঠে এসেছে ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রভাব। অন্যদিকে দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষ, উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ প্রভৃতি হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের বিষয়। সেইসব নিরিখগুলির তুলনায় বলা যেতে পারে প্রযুক্তি কিংবা আরও বিশেষার্থে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব তাঁর গল্পের সংখ্যার নিরিখে কমই। লেখক কি সচেতনভাবে 'বিশ্বায়ন'-কে এড়াতে চেয়েছেন, নাকি বিশ্বায়নের ঢেউ তাঁর নগর থেকে দূরে অবস্থানের ক্ষেত্রটিতে দুর্বল অভিঘাত হেনেছে? এপ্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনে হয় লেখক খানিকটা সচেতনভাবেই দূরে রেখেছেন বিশ্বায়নের পণ্যভুবনকে। তবে তা যে একেবারেই তাঁর ছোটোগল্পে ছাপ রেখে যায়নি, এমনটা দাবি করা যায় না। দেখা যায় তাঁর কিছু গল্পে উঠে এসেছে তথ্যপ্রযুক্তির জগৎ অথবা এই ক্ষেত্রটির আগমনের ফলে সমাজ ও ব্যক্তিমানসে তার প্রভাবের বিভিন্ন দিকসমূহ। এইধরনের একটি ছোটোগল্প 'তাপ একপ্রকার শক্তি' (২০০৭) (*পঞ্চাশটি গল্প*, বিপুল দাস, আনন্দ)। এই গল্পের মুখ্য প্রবাহটি অভীক ও অবন্তীর দাম্পত্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও গল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে বিশ্বায়ন পরবর্তী মানুষের প্রযুক্তিনির্ভর জীবন। গল্পে উঠে আসে একটি মেলা, আধুনিক প্রযুক্তি-পণ্য অধ্যুষিত একাধিক দোকান, সেগুলিকে বিপণনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত থাকা সেলসগার্ল এবং ক্রেতা হিসাবে উপস্থিত থাকে পূর্বে উল্লিখিত দম্পতি। পাঠক লক্ষ করেন নারীর সঙ্গে জ্ঞানের তারতম্যে পুরুষের মনোজগতে যে সূক্ষ্ম ঈর্ষার সূত্রপাত হয় তা নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তটিকেও প্রভাবিত করে তোলে। এই গল্পের নির্মাণে লেখক সুচারুরূপে ব্যবহার করেন আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে। তাই গল্পের অঙ্গীভূত হয় মাইক্রোআভেন, মিক্সারগ্রাইন্ডার, গ্রিল, রাইসকুকার, ওয়াশিং মেশিন, কালার টিভি, কম্পিউটার ইত্যাদি শব্দাবলি। আর এইসমস্ত শব্দের ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট সময়কে চিহ্নিত করে তোলে—

এল-টাইপের কাউন্টার। একদিকে দুটো মেয়ে। একজনের সামনে বিলিং-এর জন্য কম্পিউটার এবং বিলিং মেশিন। অন্য মেয়েটি মাইক্রো আভেনের পেছনে কিছু পড়ার চেষ্টা করছিল। অভীকের কথা শুনে সে মেশিনটা সমকোণে ঘোরাল।...

এই দোকান, দেওয়াল জোড়া ক্যাবিনেটে মাইক্রোআভেন, মিক্সারগ্রাইন্ডার, গ্রিল, রাইসকুকার ও টিভি সাজানো রয়েছে। উলটোদিকের দেওয়ালে একটু বড় র‍্যাক। সেখানে চিমনি। নীচে ওয়াশিং মেশিন। প্রত্যেকটা আইটেমের ওপর আলাদা ভাবে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে। কলেজে আসা যাওয়ার পথে অবন্তী কতদিন কাচের ভেতর দিয়ে এসব দেখেছে। কাউন্টারের মেয়েদুটোও যেন এ দোকান ছাড়া অন্য কোথাও মানাত না। অসাধারণ স্মার্ট দেখায় ওদের। পোশাক, ফিগার এবং প্রসাধনে ওরাও যেন এই বিখ্যাত ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেট কোম্পানির ফিনিশড প্রোডাক্ট। ওদের ওপরেও আলো পড়েছে, কিন্তু আলাদা কোনও ফোকাস নেই।[২৮]

উদ্ধৃত অংশটি থেকে লক্ষ করা যেতে পারে, যান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন সময়ে মানুষও হয়ে উঠেছে ‘প্রোডাক্ট’।

মুক্ত অর্থনীতি তথা বিশ্বায়ন ভারতে বিদেশি পুঁজির প্রবাহকে যেভাবে অবাধ করে তুলেছিল, তা ছিল ভারত সরকারেরই সিদ্ধান্তের ফলাফল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা বাধ্য হয়ে ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে পৃথক মতাদর্শের রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত কোনো কোনো রাজ্য এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে কালের নিয়মে এবং যুগের প্রভাবে তারাও বাধ্য হয়েছিল পুঁজির প্রসারকে স্বীকার করে নিতে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে দু’হাজার সাল পরবর্তীকালে পুঁজির প্রসারকে সহায়তা করা তাদের পূর্বতন রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিপন্থী ছিল। তা সত্ত্বেও ২০০৬-০৭ সালে সরকারের অবস্থান যখন পুঁজির স্বপক্ষে এসে দাঁড়ায়, তখনি দ্বন্দ্ব তৈরি হয় কৃষি বনাম শিল্পের।

এই নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে রচিত (*দেশ*, ২রা জুন, ২০০৭) বিপুল দাসের 'বীজ' (*পঞ্চাশটি গল্প*, আনন্দ) নামক ছোটোগল্পটি তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। এ গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কৃষি বনাম শিল্পের দ্বন্দ্ব। 'ছবি' নামক কৃষক পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে যখন ঠিকাদার পরিবারের 'অর্জুন' নামক যুবকটির বিবাহ হয়, তখনি এ গল্পের দ্বন্দ্বের জায়গাটি নির্মিত হয়ে যায়। গল্পের শেষে দেখা যায় ছবি বীজবপনের জন্য রান্নাঘরের পিছনে একচিলতে জমির খোঁজ করে, অন্যদিকে তার সেই প্রার্থনা পরিত্যক্ত হয় তার ঠিকাদার স্বামীর কাছে। সে জানায়, রান্নাঘরের পিছনের জমিতে গোডাউন হবে। সিমেন্ট, রড, বাঁশ, দড়ি, রঙের ড্রাম থাকবে সেখানে। অসামান্য দক্ষতায় লেখক নারীর সঙ্গে কৃষিকে সংযুক্ত করে দেন। প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে পুরুষ, পুঁজিবাদী পণ্যসংস্কৃতির ভগীরথ হয়ে। আর এইসবের মধ্যে দিয়ে গল্পে জায়গা করে নেয় প্রযুক্তিনির্ভরতার দিকটি—

> বিয়ের পর ছবি দেখল নগদ টাকার উপর এদের বেশি ভরসা। জমিজিরেত, ফসল, ঝাড়াইমাড়াই, বীজতলা, আবাদ—এসব শব্দ শুনলে এদের ভাবের কোনও তরবেতর হয় না। যেন এসব শব্দের বিশেষ কোনও মানে নেই। কিন্তু টেন্ডার, রোড রোলার, সিমেন্ট, বিটুমিন, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারশিয়ার শুনলেই এদের কান খাড়া হয়ে ওঠে। ছবি দেখল, এরা টাকাকড়ি বড় বেশি চেনে। সেই উপার্জনের জন্য কোনওরকম মিথ্যাচার এদের কাছে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।...
>
> তখন বৃষ্টি নামল। টিপটিপ নয়, একেবারে ঝমঝমিয়ে নামল। বাতাস বইল এলোমেলো। চম্পাগ্রামের আকাশজুড়ে যত মেঘ ছিল, সবাই এসে জুটেছে ছবিরানির মাথার ওপর। অঝোর ধারায় ছবি ভিজে যাচ্ছে। কাঙাল মাটির দিকে ঝরে পড়ছে মা গঙ্গা। চম্পাগ্রামের সমস্ত মাটি ভিজে যাচ্ছে। ছবিকে কেন্দ্র করে বিশাল ব্যাসার্ধ নিয়ে চক্রবৎ মেঘ চম্পাগ্রামের ওপর ভেঙে পড়ছে। কালো মেঘ ছিঁড়েখুঁড়ে জল নেমে আসছে শুকনো ডাঙার দিকে। ভিজে যাচ্ছে কংক্রিটের কাঠামো, চার লেনের সড়ক, রোডরোলার, কংক্রিট মিক্সার, ড্রিলিং মেশিন, ওভারহেড ক্রেন, পুলি, হাতুড়ি, দুরমুশ। ভিজে যাচ্ছে ঠিকাদারি, দালালি, নোটিশ, ইনজাংশন, পুলিশ, উচ্ছেদ।[২৯]

বিশ্বায়ন, পণ্যায়ন এবং প্রযুক্তির দুনিয়াকে লেখক সচেতনভাবে কিছুটা উপেক্ষা করতে চাইলেও তাঁর কয়েকটি ছোটোগল্পে প্রবিষ্ট হয়েছে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিকটি অথবা তৎকেন্দ্রিক শব্দাবলি। এইরকম কিছু উদাহরণ উঠে এসেছে তাঁর 'সর্পদংশন' (২০০৮) গল্পটিতে—

কীসের টাওয়ার?

কেন, তুই খবর জানিস না ? মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার বসানোর কথা শুনিসনি? সেনপাড়ার ছিনন্দ মণ্ডলের পকেটে কেমন বাজনা বাজে। শুনিসনি—হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন, হ্যালো, ঢুকছে না বোধহয়। কে জানে, কী ঢুকছে না।

সত্যি মাইরি, তার ফার নেই, কথাগুলো কেমন করে বাতাসে ভেসে ভেসে কোথায় চলে যাচ্ছে। সেদিন কানকাটা রবির দোকানে শুনলাম এক বাবুর পকেটে গান বাজছে—তোমার দেখা নাই রে...

ভগীরথ এ কথার মানে বোঝার চেষ্টা করে না। সে তার বউয়ের হাতের সলিড সোনার চুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। সোনা গলে যাচ্ছে। গলে গলে একটা মোবাইলের সাইজ হয়ে যাচ্ছে। সোনালি মোবাইল। সামনে রঙিন পরদা। বোতাম টিপলে সেখানে ঊর্বশীর ছবি। গোলোক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্যাশ-কাউন্টারে ভগীরথ বসে আছে। মোবাইল বেজে উঠল—কোকিলের ডাক। পালটে হয়ে গেল—তোমার দেখা নাই রে। লোকজন হাঁ করে তাকিয়ে আছে। হ্যালো, হ্যালো, আমি ভগীরথবাবু বলছি। জোরে বলুন, জোরে। আরও জোরে। হ্যালো, ঢুকছে না বোধহয়।...

সুধন্য বুকপকেট থেকে মোবাইল বের করে অকারণে নাড়াচাড়া করছিল। শীতলামন্দিরের মাথায় কালীপুজোর পরে টাওয়ার বসেছে। এদিকে নদীর পশ্চিমপারের একশো সত্তর একর জমি সরকার অধিগ্রহণ করবে—নোটিশ হয়ে গেছে। তিন কিলোমিটার দক্ষিণে কারখানা, কোয়ার্টার, মাল্টিপ্লেক্স-এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে বিএসএফ-এর ব্যারাকের জন্য আরও জমি চলে যাবে। ক্ষতিপূরণের টাকায় মোবাইল, কালার টিভি, স্কুটারবাইক বেশি এসেছে। বড়কাঁঠালির মোড় থেকে হাইওয়ে পর্যন্ত পিচের কাজ কমপ্লিট।[৩০]

উদ্ধৃত গল্পটি শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত কিছু শব্দাবলিকেই তুলে ধরেনি, বরং প্রযুক্তির হাত ধরে পুঁজির প্রসার, তাকে কেন্দ্র করে জমি অধিগ্রহণ, মানুষের বদলে যাওয়া জীবনধারা কিংবা আশা-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা—এই সব কিছুকেই ধারণ করেছে গল্পটি। এই ধরনের উদাহরণ হিসাবে 'পাগলানিমের ক্লিভেজদর্শন' (২০১০) গল্পটির কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এখানেও স্থান করে নিয়েছে প্রযুক্তি—

> হারু পকেট থেকে মোবাইল বের করে অকারণেই অন অফ করছিল। শেষে দেবাকে ডেকে মোবাইল অন করে ওয়ালপেপারের ছবিটা সামনে ধরল।
>
> কবে তুলেছিস? দারুণ এসেছে। দে, আমার হাতে দে। সবাইকে দেখাব।
>
> হারুর হাত থেকে মোবাইল নিয়ে দেবা সবার চোখের সামনে দিয়ে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে এল। উৎপল বলল, দে তো, ভাল করে দেখি। প্রকাশ ঝা উৎপলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চোখের সামনে ধরল। যে দৃশ্য ওরা পাগলানিমের মতো দ্বিধাহীন চোখে সরাসরি দেখতে পারে না, টকটকে লাল ব্রা পরা একটা তীক্ষ্ণ দৃশ্য ওরা নির্লজ্জ লোভের দৃষ্টি নিয়ে দেখছিল।[৩১]

প্রযুক্তি শুধুমাত্র যন্ত্রের আগমন ঘটায় নি, তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের অবসরযাপন, আড্ডা দেওয়ার রীতি, শখ, বিনোদন—এমনকি যৌনভাবনার উপাদানের ক্ষেত্রেও। বিপুল দাসের ছোটোগল্পে এইভাবেই ধরা পড়েছে বিশ্বায়নকাল কিংবা প্রযুক্তির প্রসারসমূহ।

৩.৫॥ **স্বপ্নময় চক্রবর্তী**

স্বপ্নময় চক্রবর্তী (জন্ম-১৯৫২) বর্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যের জগতে একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ব্যতিক্রমী নাম। শিক্ষাজীবনে রসায়নের ছাত্র। পেইন্ট ভার্নিশ টেকনোলজির পাঠ অসমাপ্ত রেখে চাকরির জগতে প্রবেশ। পরে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বৈচিত্র্যপূর্ণ তাঁর কর্মজীবন এবং অভিজ্ঞতার পরিসর। দেশলাইয়ের সেলসম্যান থেকে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ল্যান্ড

রিফর্ম অফিসার, আবহাওয়া দপ্তরের রাডার চালক, দূরদর্শনের ফ্লোর ম্যানেজার কিংবা পরে বেতার প্রযোজকের দায়িত্ব। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় পুষ্ট তাঁর লেখনীও বাংলা গদ্যকে প্রবাহিত করে চলেছে নতুন নতুন খাতে। প্রথম ছোটোগল্প প্রকাশ ১৯৭৫ সালে।[৩২] পরবর্তী দশকগুলিতে বদলে যাওয়া অর্থনীতি কিংবা সমাজ-রাজনীতির তিনি দ্রষ্টা। বিশ্বায়ন কিংবা তার প্রভাবে যে তথ্য-প্রযুক্তির বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল উদার অর্থনীতির হাত ধরে, স্বপ্নময় সেই সময়টিকে ধরেছেন তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে। অত্যাধুনিক যন্ত্রসভ্যতার জয়যাত্রা যদি বিশ্বায়নের হাত ধরে ঘটে থাকে, তবে তার পরিণতির দিকটি কেমন হতে পারে, তা স্বপ্নময় দেখিয়েছেন তাঁর ছোটোগল্প 'একটি সতর্কতামূলক রূপকথা'-য় (১৯৯৭/৯৮)। কিছুটা কল্পবিজ্ঞান আর কিছুটা রূপকথার ঢঙে লেখক দেখিয়েছেন প্রযুক্তির প্রাবল্য মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিকে আশ্রয় দিতে পারে না। তা আরাম কিংবা বিনোদনের পরিসরটিকে বৃহৎ করে তুললেও সভ্যতার ক্লান্তিকে অপনোদিত করতে পারে না। যেমন স্বাভাবিক বাৎসল্যের অনুভূতিকে সরিয়ে বাঁচতে পারে না মানুষ—

> এক যে আছে লোক। ওর একটা ফ্ল্যাট আছে। টিভি-ভিসিআর-ভিসিপি আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে, কর্ডলেস ফোন আছে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আছে, একটা স্কুটার আছে, গাড়ি নেই বলে দুঃখ আছে, আর আছে একটা বউ। বউ বড় দুঃখী। সবার কত গাড়ি আছে ওর একটাও নেই। সবাই কেমন ফরেন যায়, ও একবারও যায়নি। সবার ছেলে টাই ঝুলিয়ে ঘাড় দুলিয়ে টা-টা করে স্কুলে যায়, ওর কোনো বাচ্চা নেই।...[৩৩]
>
> ওরা একদিন ভেবেছিল একটা ফ্ল্যাট হোক। তখন বউটা একটা চাকরি খুঁজে পেল। ফ্ল্যাট হল। তারপর ভেবেছিল কালার টিভি, ভিসিপি হোক। লোকটা চাকরির সঙ্গে পার্টটাইম, বউটা টিউশনি করতে থাকল। ওরা ভাবল চাকরি-টিউশনি-কনসালটেনসিতে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। তাই সময়ের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতির জন্য অনেক সময় বয়ে গেল। ওরা ভাবল এবার আহা, একটা বাচ্চা আসুক। তখন আরও বেশি রোজগারের জন্য লোকটা দুবছর আবুধাবি কাটিয়ে এল। এখন লোকটা কুঁজো-

কুঁজো।চুলটা সাদা সাদা। বউটা মুখের বলিরেখায় অনেক দামের মলম ঘষে। ইতিমধ্যে আবার কি মুশকিল, নতুন যন্ত্র বেরিয়ে গেছে। যান্ত্রিক তা।[৩৪]

বিশ্বায়ন বদল ঘটাতে সক্ষম হয়েছে মানবিক মূল্যবোধেরও। মহাভারতের বনপর্বে যক্ষরূপী ধর্মের 'সুখী কে' এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যার ঋণ নেই আর নিজের ঘরে থেকে দিনের শেষে চারটি শাকভাত খেতে পায়, সেই সুখী। বিশ্বায়নের অর্থনীতি সুখের এই ধারণাকে বদলে দিয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় মেধা (অন্যান্য দেশেরও বটে) সর্বাধিক সুখী হয় মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের নাগরিকত্বলাভে। তাঁরা ডলারে রোজগার করেন, সেই ডলার যখন দেশে পাঠান, তা বহুগুণ টাকায় পরিণত হয়। সব পেয়েছির দেশের ক্রেতা হয়ে উঠতে পারেন তাঁরা। তবে এর আড়ালে ধীরে ধীরে আলগা হতে থাকে দেশের শিকড়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে থাকে অনুভূতির সূত্রগুলি। সেইরকমই একটি ছোটোগল্প 'আর্সেনিকভূমি' (শারদ *পরিচয়,* ২০০১)। হাসপাতালের শয্যায় রোগগ্রস্ত বাবা আর তাঁর পাশে প্রবাসী ছেলের একটি চিত্র কয়েকটি আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন স্বপ্নময়—

বাবা যখন অসুস্থ ছিলেন, এসেছিলাম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কলকাতার নাম্বার ওয়ান নার্সিংহোমে বাইপাস সার্জারি করিয়ে দিলাম। ভালই ছিলেন, এরপর আবার নানা উপসর্গ। তিন মাস পরে এলাম আবার। কিডনি, লিভার, লাং, কিছুরই ফাংশন ভাল নয়। ডেটোরিয়েট করছেন, ডাক্তাররা বলেই দিয়েছেন রিভাইব করার চান্স নেই। কিন্তু আমি কতদিন থাকব? আমার তো কাজকর্ম আছে। কিন্তু মুশকিলটা এমনই, যাব, হয়তো গিয়েই খবর পাব এক্সপায়ার্ড।তখন আবার আসতে হবে। যাতায়াতের খরচার জন্য বলছি না, জেটল্যাগও তো আছে। তা ছাড়া স্কিডিউল র‍্যাপচার হয়ে যায়। বিছানার পাশে বসে থাকলে বাবা যখন বলতেন—এটাই আমার শেষ শয্যা, আমি বলতাম, না বাবা, ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু বলতে লজ্জা করছে, আমি মনে মনে বলতাম, যা হবার হয়ে গেলেই তো হয়। বাবার মৃত্যু কামনাই তো ওটা! বাবার পাশে বসলে বাবা মাঝে মাঝে বলতেন, দেশের জন্য কিছু করিস।[৩৫]

বিশ্বায়নের ফলে ভারতের মেধা ও শ্রমের ক্ষেত্রগুলিতে যে বহির্মুখী পরিযান ঘটেছিল বা ঘটে চলেছে, ব্যক্তি ও সমাজমনে তার যে প্রভাব, তা উঠে এসেছে স্বপ্নময়ের একাধিক ছোটোগল্পে। সেরকমই একটি ছোটোগল্পের নাম 'ঝড়ের পাতা'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শারদ বর্তমান ২০০৫ সংখ্যায়। ২০০৩ সালে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের প্রেক্ষাপটে গল্পটি লিখিত হয়। আমেরিকার বাহিনী ২০০৩-২০১১ পর্যন্ত ইরাকে সেনা মোতায়েন রেখেছিল। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মুর্শিদাবাদের একটি গ্রাম থেকে ইরাকের কিরকুক অঞ্চলে খেজুর বাগানে কাজ করতে যাওয়া যুবক সোলেমান কীভাবে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের ফলে বোমার আঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আর বহুদূরে দেশে থাকা তার স্ত্রী-পরিজনদের কী পরিমাণ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটে তার বাস্তবধর্মী বিবরণ হয়ে উঠেছে গল্পটি—

> বসরা, বাগদাদের পর কিরকুক। জব্বর খয়রুল আর সোলেমানদের ঘরে টিভি আছে। ওরা সব কাফিস্তায় কাজ করে। এ ছাড়া আরও তিন-চার ঘরে টিভি আছে। ওদের বাড়িতে ভিড়। সন্ধ্যায় খবরের সময় অনেক লোকজন চলে আসে। টিভির পর্দায় ভেঙে পড়া ঘর বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে। ব্যস্ত অ্যাম্বুলেন্স, স্ট্রেচারে শোয়ানো মানুষগুলির দিকে ওদের খরদৃষ্টি। ইট পাথরে চাপা পড়া একটা মানুষের হাত বেরিয়ে আছে। কে যেন বলে উটা খয়রুলের হাত না তো? কাফন ঢাকা দেহ থেকে একটা পা বেরিয়ে আছে। কার পা গো? যে মানুষটি ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল, তাকে দেখে কে যেন বলল আমাদের ছালুর মতন না? ধ্বংসস্তূপের সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে এক বৃদ্ধা। একটু আগেই যেখানে ওর নিজের সংসার ছিল।[৩৬]

১৯৪৩-১৯৪৭ এর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'রানার' কবিতাটি লিখেছিলেন। রানারের সব রাত্রিকে অল্পদামে কিনে নিয়েছিল এই পুঁজিবাদী সভ্যতা। আর স্বপ্নময়ের এই গল্পটিতে দেখা যায় সেই সভ্যতাই আরো বেশি ভয়াল ভয়ঙ্কর থাবায় শুধু রাত্রিই নয়, সমস্ত জীবন-যৌবনকেই কিনে নিয়েছে অল্প দামে। তাই সোলেমান আর ফিরতে পারে না

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাক থেকে মুর্শিদাবাদের গ্রামে। স্ত্রীর সঙ্গে গড়ে তুলতে পারেনা স্বাভাবিক সম্পর্ক। পুত্রের কাছেও সে ক্রমে হয়ে ওঠে অপরিচিত। তার কাছে সুদূর ইরাকের দাম্পত্যবিহীন প্রবাসজীবনে একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে দেশ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া দাম্পত্যসুখ অতিবাহনের সময়ের অনুভূতির শব্দাবলিকে রেকর্ড করে রাখা কিছু ক্যাসেট। কিন্তু তাদের কারখানার উপরে নিক্ষিপ্ত আমেরিকার বিমানবাহিনীর বোমা তার সেই স্বল্প সুখের জগৎটিকেও ছিনিয়ে নেয়। কোনোক্রমে বেঁচে যাওয়া সোলেমান এর পরেও দেশে ফিরতে পারে না। বহুদিন নিখোঁজ থাকার পরে আবার একদিন সোলেমানের চিঠি আসে তার স্ত্রীর কাছে, যার শেষে থাকে সেইরকম একটি ক্যাসেট তাকে আবার পাঠানোর অনুরোধ।

মানবিক সম্পর্ক যত ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে পারিবারিক বন্ধন, ততই মানুষ বেশি বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে প্রযুক্তিকে। বিশ্বায়নের হাত ধরে বিস্ফারিত প্রযুক্তি প্রতিস্থাপিত করেছে মানুষকে। মনে পড়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পংক্তি—'আমরা ক্রমশই চিঠি পাবার লোভে সরে যাচ্ছি দূরে'।[৩৭] উদার অর্থনীতির মূল্যবোধের অনুদারতা যখন সন্তান থেকে মায়ের সঙ্গে তৈরি করেছে বৃদ্ধাশ্রমের দূরত্ব, তখনই ভার্চুয়াল নৈকট্যের জন্য দরকার হয়ে পড়েছে মোবাইল ফোনের। যে ফোনে ছেলের কথা ভেসে আসে, একসময় বৃদ্ধা মা সেই ফোনটিকেই ছেলের প্রতিরূপ হিসাবে আঁকড়ে ধরেন পরম মমতায়। তাকে আদর করেন, আগলে রাখেন, ঠিক যেভাবে পরম আদরের শিশুপুত্রটিকে আগলে রাখতেন তাঁর যৌবনকালে। স্বপ্নময়ের 'মোবাইল সোনা' (শারদ *আজকাল*, ২০০৭) ছোটোগল্পটিতে ফুটে ওঠে তারই অনুপুঙ্খ—

> বাবলু কোটের পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বার করল। বলল, মা, এটা তোমার জন্য এনেছি। আর নিচে নেমে আমার ফোন ধরতে হবে না, ফোনটা তোমার কাছেই থাকবে। মানে তোমার কাছেই থাকব আমি।...

> আজ কেমন পাগল পাগল লাগছে। আনন্দ। ঘুম আসছে না। আজ কতবার বাবলু এল। এখন বাবলু পাশে। বালিশের পাশে। বাবলুটা। বাবলু সোনা। ঘুমু কর। ঘুমু ঘুমু কর। মোবাইল ফোনটার গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে থাকেন কমলিনী।[৩৮]

পর্যটনের ধারণা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে বিশ্বায়নের হাত ধরে। রাজ্য কিংবা দেশের সীমানা পেরিয়ে তা হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক। পর্যটন শব্দটি আর এককভাবে ব্যবহৃত না হয়ে বিষয় অনুযায়ী যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন চিকিৎসা পর্যটন, অভিযানমূলক পর্যটন, প্রকৃতি পর্যটন প্রভৃতি। সারা বিশ্বে এর সঙ্গে নতুন করে উঠে এসেছে আর একটি শব্দ-- 'যৌন পর্যটন'। 'ব্লু সি. ডি. নিয়ে একটি গল্প' (স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *কৃত্তিবাস*, ২০০৭) থাইল্যান্ডের পাটায়া অঞ্চলে এই ধরনের পর্যটনের দিকটিকে ছোটোগল্পে প্রতিফলিত করেছে। কিন্তু গল্পটি শুধুমাত্র এই বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিয়েছে তা নয়, বরং তা তুলে ধরেছে পশ্চিমবঙ্গের চন্দনপিঁড়ি নামের একটি গ্রামের অস্বাভাবিক একটি শিশুকে নিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্ককের ব্যবসায়ীরা কীভাবে যৌন বিনোদনের মঞ্চে তাকে ব্যবহার করে এবং তাকে দেখিয়ে উপার্জন করে, সেই অমানবিকতার দিকটিকেও। মায়ের কাছে ফিরতে চাইলেও সেই অপরিণতবুদ্ধি অস্বাভাবিক মানুষটিকে সেখানে বন্দী করে রাখা হয় শুধুমাত্র ব্যবসার খাতিরেই। তার কোনো ছবি তুলতে দেওয়া হয়না তার মাকে দেখানোর জন্য। বদলে তাকে নিয়ে তৈরি অশ্লীল ভিডিওর সি.ডি. বিক্রি করা হয়, সেই সি.ডি.-ই নিয়ে যাওয়া হয় তার মাকে দেখানোর জন্য, যাতে এইভাবে হলেও ছেলেকে তিনি দেখতে পান।

> ওই সিডি এখন চলছে। এখানে, আমার গ্রাম চন্দনপিঁড়িতে। এ একেবারে অন্যরকমের জিনিস। এ জিনিস চন্দনপিঁড়ি আগে দেখেনি। গ্রামের উন্নতি হচ্ছে। হরিসভায় মার্বেল বসেছে, পার্টি অফিস দোতলা হয়েছে, কাঁচা রাস্তায় মোরাম পড়েছে। বটার চায়ের দোকানে এখন চাউমিন পাওয়া যায়। নসুর ভাটিখানায় ব্ল্যাক হুইস্কির নিপ মেলে। গাঁয়ের লোকজন জেনে গেছে—এ গাঁয়ের ছেলে থাইল্যান্ড গিয়ে কামাচ্ছে। কেউ কেউ বলছে কোনো কাজই খারাপ না। গাঁয়ের লোকজনের মত কত পালটে গেছে। যাকে বলে

প্রোগোতিশীল। নমোপাড়ার দুটি মেয়ে কলকাতায় বডি বেচে, সবাই জানে। ওরা মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসে হাতে ছানাবড়ার হাঁড়ি নিয়ে। বাপ মাকে নতুন জামা কাপড় দিয়ে যায়। খাসির মাংস কেনে। ভোটের সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে যায়।[৩৯]

উদ্ধৃতির শেষ লাইনটি ভারতের কল্যাণমূলক অর্থনীতির সাপেক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেখানে ভোট দিয়ে সরকার গড়ার পরেও মানুষ কর্মনিরাপত্তা কিংবা সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও পায় না। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্পে এভাবেই বহুমাত্রিকভাবে বিশ্বায়ন তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গিয়েছে। শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তিই নয়, সমাজ-রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের সরণগুলিকেও লেখক অনায়াস দক্ষতায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর ছোটোগল্পে।

৩.৬॥ **অমর মিত্র**

বর্তমান সময়ের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কথাকার অমর মিত্রের জন্ম ৩০ শে আগস্ট, **১৯৫১**, বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা শহরের সন্নিকটে ধূলিহর গ্রামে। গল্প ও উপন্যাসের নিপুণ শিল্পী। প্রথম ছোটোগল্প প্রকাশিত হয় **১৯৭৪** সালে, তারপর দীর্ঘ এত বছর ধরে অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের ক্রমাগত মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর গল্পে। তিরিশ বছর আগে লেখা ‘দানপত্র’ পাঠের পর মনে হয় একবিংশ শতাব্দীতে এসে আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর অরণ্য নদী পাহাড় মাটি হস্তান্তরের যে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা বুঝি আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। সময় থেকে সময়ান্তরে প্রবাহিত হয়েছে এই গ্রন্থের গল্পগুলির রেশ। গ্রাম ও শহর, জমি মাটি আর নিরুপায়, নিরালম্ব মানুষ তাঁর লেখার বিষয় হয়ে উঠে আসে। লেখার পটভূমি হয়ে আসে বিশাল এই ভারত

নামের দেশটির নানা কোণ, গ্রাম ও নগর। মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস তাঁর গল্পে ছায়া ফেলে ক্রমাগত।

‘স্বদেশযাত্রা’ গল্পের জন্য ১৯৯৮ সালে সর্বভারতীয় ‘কথা’ পুরস্কার পেয়েছেন। এ ব্যতীত ছোটোগল্পের জন্য ২০০২ সালে ‘আনন্দ স্নো-সেম’ পুরস্কার। ‘কথা’র বেস্ট অফ নাইনটিজ, গত শতাব্দীর নয়ের দশকে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভাষায় গল্প সংকলনে একমাত্র বাংলা গল্প তাঁর ‘স্বদেশযাত্রা’। পেয়েছেন ‘সমরেশ বসু পুরস্কার’, ‘অমৃতলোক পুরস্কার’। ‘সন্তান সন্ততি’ গল্পের জন্য ১৯৯০ সালে পেয়েছিলেন ‘সমতট পুরস্কার’। ২০১১-য় প্রকাশিত ‘মানুষী মাহাতোর জীবন মরণ’ গল্পটি ‘বর্ণপরিচয়-প্রতিদিন শারদ সম্মান’-এ ভূষিত। লেখক ২০০১ সালে *অশ্বচরিত* উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন ‘বঙ্কিম পুরস্কার’, ২০০৪ সালে ভাগলপুরের ‘শরৎ পুরস্কার’ এবং ২০০৬ সালে *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসের জন্য ‘সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার’। ২০১০ সালে পেয়েছেন ‘গজেন্দ্রকুমার মিত্র-সুমথনাথ ঘোষ সম্মান’। তাঁর বিভিন্ন গল্প হিন্দি, ইংরেজি, মালয়ালাম, তামিল, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৪০]

অমর মিত্রের গল্প লেখার সূত্রপাত ১৯৭৪ সালে। গল্পের নাম ‘মেলার দিকে ঘর’, প্রকাশিত হয় ‘একাল’ পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন আমি যখন লিখতে আরম্ভ করি, আমাদের সামনে ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে রাষ্ট্রযন্ত্র ভাঙার ডাক, শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের গল্পের ফর্ম ভাঙার আন্দোলন, *ক্ষুধার্ত* পত্রিকার লেখকদের সব ঐতিহ্য অস্বীকারের অঙ্গীকার—আমাকে সব কিছুই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু মনে হয়েছিল নিজের মতো করে নিজেকে তৈরি করতে হবে।[৪১]

বলা বাহুল্য যে যে প্রভাবের কথা লেখক এখানে তুলে ধরেছেন, সেগুলি ছাড়াও তার পরবর্তীকালে তাঁর ছোটোগল্পে একাধিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব এসে পড়েছে, যার একটি অবশ্যই মুক্ত অর্থনীতি কিংবা তার হাত ধরে আগত বিশ্বায়ন।

অন্যান্য লেখকদের মতোই বিশ্বায়নজনিত একাধিক পরিবর্তন ছাপ রেখে গিয়েছে অমর মিত্রের ছোটোগল্পে। তাই তাঁর বেশ কিছু ছোটোগল্পের অনুপুঙ্খে জায়গা করে নিয়েছে প্রযুক্তির একাধিক দিক। যার একটি অবশ্যই তথ্য-প্রযুক্তি। তাঁর *সেরা পঞ্চাশটি গল্প* (দে'জ, ২০১২)-এর একাধিক গল্পের বিষয় কিংবা আলম্বন হয়ে উঠেছে বিশ্বায়নজাত এই দিকটি। এইরকম কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'চাঁচর', 'শোকগাথা', 'সার্কাস', 'অন্ন', 'পতিগৃহে যাত্রা', 'না খেয়ে বাঁচা', 'বোরহানপুর কথা' ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর *২১টি গল্প* (সৃষ্টিসুখ, ২০১৯)-এর অন্তর্গত 'লোকটা আর মেয়েটা', 'ভারতবর্ষ থেকে ভারতবর্ষে' ইত্যাদি গল্পেও উঠে এসেছে প্রযুক্তির বিকাশ কিংবা নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তিকেন্দ্রিক জীবনযাপনের একাধিক অভিমুখ। 'চাঁচর' গল্পটিতে উঠে আসে একটি চা-দোকানের অনুপুঙ্খ, সেখানে উপস্থিত কিছু যুবক 'ফরেন' যাওয়া নিয়ে আলোচনা করে। সেই সূত্রে উঠে আসে কল সেন্টারে চাকরি করা সুগত নামক জনৈক যুবকের কথা, যে কিনা প্রেমে পড়েছে বিদেশের এক সোনালি চুলের কন্যার সঙ্গে, যার সঙ্গে রাতভর তার কথা হয়। সেই কন্যা জাদুবিদ্যা শিখতে চায় ভারতীয় সেই যুবকের কাছে। সান দিয়েগোতে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় সুগতর, সব ভার নেবে সেই মেয়ে, শুধু ম্যাজিকটা জেনে যেতে হবে। এজন্য ম্যাজিক শিখতে গিয়ে সে এক জাদুকরের পাল্লায় পড়ে। এ গল্পের অনেকখানি ইন্দ্রজাল বাস্তবতায় নির্মিত হলেও তার নির্মাণের অনুপুঙ্খে উঠে আসে তথ্য-প্রযুক্তির একাধিক ব্যবহার, যা ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করেছিল—

সুগত পাল চাকরি পেয়েছিল সল্টলেক সেক্টর ফাইভে। কল সেন্টারে রাত জাগার ডিউটি। ইংলিশটা ভালো বলে কিনা। আর কম্পিউটার শিখেছে বড় জায়গা থেকে। বিজয়ের এখন আফশোস হয়, কেন ইংলিশটা ভালো করে জানল না। জানলে তারও ফরেন যাওয়া হত। কোনও এক সোনালি চুলের কন্যার সঙ্গে তারও কথা হত রাত ভর। জাদুর কথা হত। ম্যাজিক ভালোবাসে সেই বিদেশিনি।...

সুগত অর্কুটে কতরকম ফোটোই না পেয়েছে সেই মেয়ের...

পার্কের গায়ের অন্ধকারে অখিল একা দাঁড়িয়ে মোবাইল খুট খুট করছে, বিজয় যেতেই বলল, ঘয়লাকে খিদিরপুরে পাঠিয়েছি কামরান জাদুকরের খোঁজ নিতে, দশ হাজার অ্যাডভান্স নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে লোকটা, নেটেও লিজ আর নেই। অর্কুটও খুলছে না। মেল সেন্ট হচ্ছে না।[৪২]

এভাবেই গল্পের অনুপুঙ্খে উঠে আসে প্রযুক্তি কিংবা প্রযুক্তিনির্ভর অনুভূতিমালা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবসমূহের নানাবিধ দিক যা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। অন্য একটি গল্প 'অন্ন' (২০১০) অন্তর্লীন করে রেখেছে রাজনীতিকে। গল্পের সময়কাল দেখে বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এক অস্থির রাজনৈতিক সময়কে ধরে রেখেছে এই গল্প। একদিকে মুক্ত অর্থনীতির শর্ত মেনে রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় ভারতে আগত পুঁজির হাতে দখল হয়ে যাচ্ছে একের পর এক বন-জঙ্গল, পাহাড়, জনবসতি, অন্যদিকে প্রতিরোধ করতে নেমে পড়েছে বেশ কিছু চরমপন্থী রাজনৈতিক শক্তি। আর এই দুইয়ের মাঝে পড়ে গিয়ে দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন। লেখক এই গল্পে তুলে আনেন নামহীন এক জঙ্গলমহলকে। তার ধারে একটি হাটের বর্ণনা দেন তিনি, যেখানে ইন্সটলমেন্টে বন্দুক কিনতে পাওয়া যায়। এই গল্পের সমাপ্তিতেও অংশগ্রহণ করে জাদু বাস্তবতা, যার আড়াল দিয়ে গল্পটি হয়ে ওঠে পুরোদস্তুর রাজনৈতিক। আর এই গল্পের অনুপুঙ্খেও উঠে আসে প্রযুক্তি, এবং তা ভুখা মানুষের দুনিয়ায়—

গণেশ চুপ করে থাকল। এখন বেলা দুপুর সকাল থেকেই হাট জমেছে। জমেছে যে তা ধরা যাচ্ছে মোবাইল ফোনে ফোনে। সবাই কানে হাত দিয়ে হয় ফোন ধরছে, না হয় ফোন করছে। ধরা করা চলছেই। লাঠি হাতে পাহারাওয়ালাও ফোন নিয়ে ব্যস্ত, ইয়েস স্যার নো স্যার বলতে বলতে ফকির মিসকিন ভিখিরি ভবঘুরের পিছনে গুঁতো মারছে, হাটে তোদের থাকা চলবে না।...

হাটে ধারে বন্দুক মিলছে। ইকোয়াল মানথলি ইনস্টলমেন্ট। যেমন জিনিস তেমনি দাম। গণেশকে নিয়ে লোকটা যেখানে এল সেখানে কী ভিড় ! মাইকে গান চলছে, এ নীলে গগন কি তলে...। ধারে বন্দুক আর রাইফেল, একটা গুলি এক টাকা, দশটা গুলি আট টাকা, বিশটা গুলি পনেরো টাকা...।

গণেশ বলল, বন্দুকে আমি করব কী?

লুট করবে, যার ঘরে চাল ডাল বন্দুক দেখিয়ে কেড়ে নেবে।

কী সব্বোনাশ ! সেও যদি বন্দুক তোলে?

তুলবেই তো ! বলে লোকটা হাসল, বলল, কোম্পানি চাইছে গোলাগুলি চলুক, মাইন ফাটুক, এ ওকে মারুক, কুরুক্ষেত্রর মহাসমর লেগে যাক।

তারপর?

তারপর বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, যে বেঁচে থাকবে সে সব পাবে, চাল, ডাল, জমিজমা, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, সাগর—সব।[৪৩]

‘পতিগৃহে যাত্রা’ গল্পটিতে উঠে আসে আসন্ন এক বিবাহের গল্প। তিস্তার সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর বিবাহের আয়োজন চলে। তিস্তার জন্ম জলপাইগুড়িতে। কৃষ্ণেন্দু জঙ্গলমহলের ছেলে, কর্মসূত্রে গুরগাঁও নিবাসী। বিবাহের পরপরই সে চলে যাবে সুইজারল্যান্ড। সেকথা ভেবে তিস্তার বাবা অচিনের মন বিষণ্ণ হয়ে আসে। এ গল্পের বিস্তারে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কথা উঠে আসে। শেষে দেশের ভূগোল অতিক্রম করে তা পৌঁছে যায় বিদেশে। আর এই বিবাহ কাহিনির অনুপুঙ্খে উঠে আসে বিশ্বায়িত প্রযুক্তির একাধিক উপস্থিতি—

অরকুটে কৃষ্ণেন্দুর ছবি দেখল কাকলি, নাইস নাইস। তোর পছন্দ আছে, এ তো সত্যিকারের শাল জঙ্গলের ছায়ার মানুষ, কী শান্ত স্নিগ্ধ মুখ, ব্ল্যাক ! আই লাইক ব্ল্যাক, আমার মা ব্ল্যাক, আমার মামারা ব্ল্যাক, মাসিরা ব্ল্যাক, আমার বাবা ফর্সা তাই আমি ফর্সা, কিন্তু আমি নিজে ব্ল্যাক হলে খুশি হতাম, কাকিমা।...

বিয়ের কার্ড একটু আগেই এসেছে। এখন নেমন্তন্নে বেরোলে লোকে ভুলে যাবে। কার্ড নেড়েচেড়ে দেখে মেয়ে। রঙিন কার্ড থেকে গোলাপি আলো গিয়ে লেগে যায় মেয়ের মুখের এখানে ওখানে। বলল, বাবা খুব সুন্দর ছেপেছে, লেখাটাও ভালো হয়েছে, এ বার তো হলুদ টিপ পরাতে হবে খামে, তারপর খামের ভিতর কার্ড ভরা হবে। তারপর নাম লেখা হবে।[৪৪]

লক্ষ করা যায়, এ গল্পে আধুনিক প্রযুক্তির অনুপুঙ্খ উঠে আসলেও তার পাশাপাশি উপস্থিত থাকে লোকাচারের একাধিক উদাহরণ। অন্যদিকে এ গল্পের কাহিনি কিছুটা হলেও আন্তর্জাতিকতা লাভ করে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকা মানুষজনের কথার উপস্থিতিতে। সেখানেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে প্রযুক্তি—

অচিন ফর্মটি স্পিড পোস্টে পাঠিয়ে সে-দিন সন্ধেয় ফোন করল কৃষ্ণেন্দুর মোবাইলে। ফোন বাজতে লাগল। একা একা এগারোশো বর্গফুট ফ্ল্যাটে থাকে। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। না হয় স্নানে ঢুকেছে। ফোন কেটে গেল বেজে বেজে।

বিয়ের কথা হতে হতে জামাইয়ের কথা হতে হতে জিতেন মণ্ডল এক দিন বলেছিল না, তার মেয়ে তখন এখানে এসেছে, চেতলায় তার বাসায়, টিভিতে সন্ধেবেলায় দেখলে পুড়শুড়ায় কতগুলো বাড়ি জ্বলছে, মেয়ে ভয় পেয়ে ফোন করল জামাইকে। ফোন নট রিচেবল হয়েই থাকল সমস্ত রাত। মেয়ে ভয়ে কেঁদে ফেলল। জিতেন করবে কী? আর তো কোনও উপায় নেই যোগাযোগের। কী ভয়ে যে রাত কেটেছিল তাদের। পর দিন জামাই-ই যোগাযোগ করে। অচিনের সে ভয় নেই। তার হবু জামাইও রিং ব্যাক করল একটু বাদে।[৪৫]

কিংবা—

> নেটে দেখবেন কাকু, ওকে লাইভ দেখতে পাবেন, এই তো আমার দাদা আছে ডেনভার, মাকে নেট সার্ফ করা শিখিয়ে দিয়েছি, ওখানে সন্ধে মানে এখানে পরের দিন সকাল, মা ভোরবেলা উঠে কম্পিউটারে বসে যায়।[৪৬]

এক বা একাধিক প্রজন্ম দেশের বাইরে থাকায় এভাবেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে প্রযুক্তি।

অমর মিত্রের 'ভারতবর্ষ থেকে ভারতবর্ষে' গল্পটি সাম্প্রতিককালে লেখা হলেও এ গল্প পাঠকের সামনে হাজির করে বর্তমান সময়ের প্রযুক্তিকেন্দ্রিক জীবনের কথা। এ গল্পে উঠে আসে সেই ভারতবর্ষের কথা, যেখানে তরুণ প্রজন্ম প্রথম বিশ্বের জন্য রাত জেগে কাজ করে যায়। বিনিময়ে পায় কিছু অর্থ, যা দিয়ে তাদের পরিবার চলে। আর সেজন্যই তারা দিল্লি কিংবা গুরগাঁও নিবাসী হয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। বাড়ি ফিরতে পারে খুব সামান্যই। তাদের রাত হয়ে যায় দিন, আর দিন হয়ে ওঠে রাত। তাদের জীবন-জীবিকা একান্তভাবেই নির্ভর করে প্রযুক্তির উপর—

> হাবলু কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছিল। মোটা টাকা দিয়ে কী সব কোর্স করেছিল। চমৎকার ইংরেজি বলে, লেখেও। বিএসসি পাশ করতে না করতে চাকরি পেয়ে গেল এক বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তির কোম্পানিতে। কলকাতার সল্টলেকে ছ-মাস ট্রেনিং দিয়ে হাবলুকে বদলি করে দিয়েছে গুরগাঁওয়ে। এসেছে ও প্রায় বছর দুই। এর ভিতরে তিনবার কলকাতা গেছে। ওর মা-বাবা এসেছে বার তিনেক। বোনের বিয়ে সামনের ফাল্গুনে, তখন যাবে হাবলু। ওর এখন টাকার দরকার। দুটি বোনের বিয়েতেই তো ভালোরকম খরচ করবে। ওর বাবার পেনশন নেই। সুদে খেতে হবে জমা টাকার ওপর। হাবলু তাই ছুটির দিনে, রবিবারেও ছুটি নেয় না। ছুটির দিনে কাজ করলে হাজার দেড় করে পেতে পারে। ছাড়বে কেন ?[৪৭]

আমার আচমকা মনে হল, হয়তো যা ভাবছি তা নয়। ও ঘুমোতে পারে। হ্যাঁ, তা-ই। ওদের কাজ তো সমস্ত রাত্রি ধরে। ওর কোম্পানি কানাডা, ইউএসএ-র সঙ্গে কাজ করে। এ দেশের সঙ্গে দশ-এগারো ঘণ্টার তফাত। এখন দিল্লিতে সাড়ে নটা, নিউইয়র্কে রাত এগারোটা, আগের দিন। হাবলু এখন দিল্লিতে থেকে নিউইয়র্কবাসীর মতো ঘুমোতে গেছে। হাবলুর চারদিকে নিউইয়র্ক, মন্ট্রিয়ল, বোস্টন, ডালাসের রাত ঘন হচ্ছে, অন্ধকার ওকে ঘিরে ধরছে। হাবলু পিছিয়ে গেছে একদিন। আমি হাবলুর বন্ধু শুভ্রজিৎকে ধরলাম ফোনে। আমাদের পাড়ারই ছেলে। দিল্লি আসছি শুনে ওর বাবা খোঁজ নিয়ে আসতে বলেছিল, জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছিস?

শেষে কিনা হাবলুই এল। সেই ন-টার বদলে সাড়ে বারোটায়। লজ্জিত মুখ। আমি রাগে ফুঁসছিলাম, যাব না, কিছুতেই যাব না। এমন আক্কেল ওর। নেমন্তন্ন করে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু হাবলুর মুখ দেখে রাগ জল হয়ে গেল। মুখের ভিতরে শৈশবের ছায়াটা যেন এখনও লেগে আছে। হাবলু বলল, স্যরি ছোটকা, ভোরে ফিরেছি তো, অ্যারাউণ্ড সিক্স থার্টি, এসে শুয়ে পড়া অভ্যাস, সারাদিন খুব পরিশ্রম যায় তো, শুধু কল রিসিভ করা আর অ্যাডভাইস করা, অর্ডার করা, অর্ডার ওদিকেই কমিউনিকেট করা।[৪৮]

সন্ধেবেলা মানে আমাদের ভোর। হাবলু সকাল আটটা-সাড়ে আটটার আগে শোয় না। ওটাই ওর আর্লি টু বেড। দুটো-আড়াইটেয় ওঠে, আর্লি রাইজার হাবলু। আজ হাবলু এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর উঠে আমাকে আনতে ছুটেছে। সব কথা বলতে লাগল শুভ্রজিৎ-বিজয়লক্ষ্মীরা। আমি শুনতে শুনতে হাবলুর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। তারা বলছে বটে, কিন্তু তারাও তো সব রাতজাগা কর্মী, শুধু এক-একজনের থাকে দিনের ডিউটি। দিনের বেলায় এশিয়ার দেশগুলি যোগাযোগ করে। কিন্তু সে কাজ তত বেশি নয়, যেমন রাতের বেলা হয়। রাতের বেলা পশ্চিম তার সমস্ত চাহিদা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতবর্ষে। গুরগাঁও, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, হায়দরাবাদ, হ্যাঁ, আমাদের কলকাতাতেও, সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক সিটিতে। হাবলু আমাকে বলেছিল, আমরা ওদের পরিত্রাতা হয়েছি ছোটকা, কী সব জিজ্ঞেস করে, খুব সাধারণ ব্যাপার, ধরো মনিটর সিগনাল দিচ্ছে না, এটা যে লুজ কানেকশনের জন্য হতে পারে তা না টেস্ট করেই টোল-ফ্রি নাম্বারে ফোন, লাইন পেতে ঘণ্টার ওপর, তাতে কী হয়েছে, সময় তো কাটাতে হবে।[৪৯]

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল, তবে এভাবেই অমর মিত্র সার্থকভাবে তাঁর ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তিনির্ভর পালটে যাওয়া জীবনচিত্র। একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি এ গল্পে তুলে ধরেছেন তরুণ প্রজন্মের কথা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিংবা পূর্ব প্রজন্মের তুলনায় তাদের বদলে যাওয়া কর্মপদ্ধতির কথা। আর এভাবেই একাধিক ছোটোগল্পে অমর মিত্র তুলে ধরেছেন বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তির জগতটিকে।

৩.৭॥ **কিন্নর রায়**

কিন্নর রায় (জন্ম-১৯৫৩)-এর লেখালিখির সূত্রপাত সাতের দশকের শেষ দিক থেকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কিংবা অর্থনৈতিক বহু ওঠাপড়ার সাক্ষী তিনি। সাতের দশকের উত্তাল আন্দোলনে জড়িয়েছিলেন তিনি। বহুবার জেল খাটতে হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে। কারাগারের কঠিন কঠোর জীবনও তাঁকে অনেক শিখিয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। একশোটির বেশি বই লিখেছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক ছোটোগল্প লিখেছেন। যে সময়কে তিনি অতিক্রম করে তাঁর লেখনীকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁর লেখায় এসে পড়েছে সেই সময়কালের অবশ্যম্ভাবী ছাপ। সত্তরের উত্তাল সময়, আশির দশকের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং মুক্ত অর্থনীতির পদধ্বনি এবং উনিশশো একানব্বই পরবর্তী বিশ্বায়নের নানা অনুপুঙ্খ হয়ে উঠেছে তাঁর একাধিক ছোটোগল্পের বিষয় আশয়। যার অন্যতম ছিল প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার এবং মানুষের জীবনে তার প্রভাব।

বিশ্বায়নের ফলে প্রযুক্তি মানুষের জীবনধারায় যেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল, তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছু আগে থেকেই। প্রযুক্তির ক্রমপরিণতির দিকটিও বাংলা

ছোটোগল্পের ধারায় তার ছাপ রেখে অগ্রসর হয়েছে। একাধিক ছোটোগল্পকারের গল্পে সেই ধারাবাহিকতা উঠে এসেছে। কিন্নর রায়ও তার ব্যতিক্রম নন। বিশ্বায়নপর্বের প্রাকলগ্নে যেভাবে তাঁর ছোটোগল্পে প্রযুক্তি যেভাবে উঠে এসেছে, পরবর্তী একদশক কিংবা দুই দশক পরে তার চরিত্র অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। বদলে গিয়েছে প্রযুক্তির ধরন, বেড়ে গিয়েছে প্রযুক্তিনির্ভর মানুষের সমষ্টিগত পরিমাণও। লেখকের *সেরা ৫০টি গল্প* (দে'জ, ২০১১)-এর একাধিক ছোটোগল্পে এই বদলের দিকটি খুঁজে নেওয়া যায়। ১৯৮৯ সালে, অর্থাৎ ভারতে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার প্রায় দু'বছর আগে *প্রমা* পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর লেখা ছোটোগল্প 'টেকনোলজি, টেকনোলজি'-তে প্রযুক্তি যে তাৎপর্যে উঠে এসেছিল, তার গুরুত্ব কিংবা অভিঘাত আরও বদলে যেতে দেখা যায় ২০০১ সালে শারদীয় *চতুষ্কোণ* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঞ্ছাকল্পতরু' নামক ছোটোগল্পে। এ গল্পের সূত্রপাত খানিকটা হলেও জীবনানন্দীয়। 'নাইলন মশারির নীলিমা' কিংবা 'ফ্যানের হাওয়ায় মশারি ফুলে ওঠা' ইত্যাদি মনে পড়ায় *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের 'হাওয়ার রাত' কবিতাকে। জীবিকার ক্লিন্নতা প্রিন্টিং অফিসে কাজ করা এ গল্পের চরিত্র দিলীপকে সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই অবসন্ন করে তোলে। গল্পের আবহ নির্মাণের প্রয়োজনে একাধিক বার উঠে আসে প্রযুক্তি—

> মনিকা সকালে উঠেই খুব জোরে জোরে রেডিও চালিয়ে দেয়।...গোটা তিনেক পুরনো গান শুনতে শুনতে মনিকা ঘড়ি মেলায়।
>
> দিলীপের এই আট বাই দশ ভাড়া ঘরে টেলিভিশন নেই কিন্তু তার প্রতিবেশী ভাড়াঘরের বাসিন্দা রবিবারে বেশ সকালেই তীব্র স্বরে টেলিভিশন ছেড়ে দিয়ে জানান দেয়—ভোর ভয়ি। ভোর ভয়ি। মনিকার বাঁধা ছিল 'ডিজনেল্যান্ড', 'মহাভারত', 'হমপঞ্ছী এক ডাল কে' এবং কখনও কখনও প্রেশার কুকারে মাংস চাপিয়ে 'ভারত এক খোঁজ', যেখানে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকায় রোশন শেঠ।

ইদানীং মনিকা আর তিন্নির রবিবারের টি ভি শুরু হয় মহাভারত দিয়ে। তারপর ‘সিগমা’ হয়ে তা কোনো কোনো দিন পৌঁছে যায় ‘ভারত এক খোঁজ’-এ। রিমোট কন্ট্রোলের রঙিন মায়া পাশের ঘরে। ব্যবধান মাত্র পাঁচ ইঞ্চি ইটের একটি দেওয়াল।

দিলীপ আলোচনায় আলোচনায় জানতে পারে বাজারে এখন সব চাইতে চালু কালার টি ভি ওনিডা। বি পি এল, বিনাটোন—তাও নাকি খুব চলে। তার বন্ধুরা প্রায় সকলেই এই চৌকো বোকা-বাক্সটির মালিক। তাদের চার দেওয়ালের ভেতর বহির্জগতের অজস্র মায়া।[৫০]

এভাবেই রেডিও, কালার টিভি, একাধিক ধারাবাহিক দেখার প্রবণতা কিংবা তার আড়ালে এই পুঁজিনির্ভর বিনোদনব্যবস্থাকে জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তরে গ্রহণের এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা যে সামাজিক জীবনপ্রবাহে ঢুকে পড়ছিল, তাকে তুলে ধরেছেন কিন্নর রায়। মনে রাখা দরকার, এ গল্প মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার আগে রচিত। তবু এ গল্প যে সেই অর্থনীতির পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। এ গল্পে রয়েছে পুঁজিকে জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবিতায় মেনে নেওয়ার কাহিনি। তাই কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলে পড়ানো মনিকার মেয়ে তিন্নি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ে। অন্যদিকে ‘ড্রিম প্রিন্টিং’-এ চাকরি করা দিলীপের জীবনটি ভরে থাকে দুঃস্বপ্নে। মালিকের মেজাজের উপরে নির্ভর করে তার চাকরি। এ গল্পে প্রিন্টিং অফিসের যে বিবরণ উঠে আসে তাতে বোঝা যায়, ডিটিপির যুগ তখনো আসেনি। তবু সমকালীন যান্ত্রিকতার পরিমণ্ডলে দিলীপের জীবনটি হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

শারদীয় *পরিচয়* পত্রিকার ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের ‘মণ্ডুককথা’ নামক ছোটোগল্পে উঠে আসে আর একধরনের অর্থনৈতিক পালাবদলের কথা। মুক্ত অর্থনীতির হাত ধরে বেসরকারিকরণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। প্রযুক্তি ঢুকে পড়ছে বাঁধভাঙা জলের মতো। আর এই সবের হাত ধরে টালমাটাল হয়ে পড়ছে মানুষের উপার্জনের ক্ষেত্র। অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে

কর্মনিরাপত্তার দিকটি। এইরকম পরিস্থিতিতে গল্পের চরিত্র অরূপ বাগচির নিজেকে ডিসেকটিং ট্রে'র উপরে আলপিন বিঁধিয়ে কেটে রাখা ব্যাঙের মতো অসহায় লাগে। ইএমআই কন্টকিত মধ্যবিত্ত ছাপোষা জীবনে চারিদিকটাই যেন তার কাছে হয়ে ওঠে ব্যাঙের জগৎ। গল্পের নাম তাই সার্থকভাবেই 'মণ্ডুককথা'—

> পঁয়তাল্লিশ প্লাস অরূপ বাগচির এতসব কথা পর পর মনে পড়ল না। কিন্তু তার মাথার খাদে ক্লোরোফর্মের ভারী গন্ধ। মোমমাখা ট্রের ওপর শোয়া তার হাতে পায়ে বেঁধা বোর্ড পিন।[৫১]

এ গল্প তুলে ধরে মধবিত্ত অর্থনৈতিক অবস্থার জনৈক চরিত্র অরূপ বাগচির কথা। সংসারের বহু খরচের দায়িত্ব সামলে ভারাক্রান্ত এই ব্যক্তিটির সামনে মূর্তিমান দৈত্যের বিভীষিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে খোলা বাজার অর্থনীতির বিষময় প্রভাবসমূহ। মানুষের পরিবর্তে প্রযুক্তির ব্যবহারের বৃদ্ধি নিচুতলার কর্মীদের মনে জাগিয়ে তোলে কর্মচ্যুতির ভয়—

> বিদেশি বিমা কোম্পানিকে তো বাজার ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ফিস ফিস করে বলে ওঠে অফিসের পুরনো দেয়াল। প্রাচীন দরজা-জানলা বলে ওঠে, সেই রকম বিল আসছে পার্লামেন্টে।
>
> আসছে কি, এসে গেছে। নেহাৎ বার বার সরকার বদলাচ্ছে, তাই—
>
> মালহোত্রা কমিটির রিপোর্ট—
>
> খুব খারাপ দিন আসছে সামনে। নতুন কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। যাকে তাকে, যেখানে সেখানে বদলি করে দেবে—তোমার চাকরির শর্তেই এটা আছে, এমন বলে জানলা-দরজা, দেয়াল, টেবিল-চেয়ার, পেপারওয়েট, জলের গ্লাস, ফাইল—সবাই ফিস ফিস করে এই সব কথা বলে।
>
> ফিরে আসবে সেই কোম্পানির আমল। ন্যাশনালাইজেশনের পর এল আই সি যে লাভ করে তার অনেকটাই এ দেশের উন্নয়নে খাটে। ব্রিজ তৈরি হয়, রাস্তাঘাট। কোটি কোটি টাকার লাইফ ফান্ড আমাদের—সেখানেও বিদেশি ইনসিওরেন্স কোম্পানি হামলা করবে। এসব শুনলে অরূপ হাতের তালু ও পায়ের পাতায় জং ধরা পিনের ব্যথা টের পায়। ক্লোরোফর্মের গন্ধ বসে যায় বুকের ভেতর।

ইউনিয়নও কিছু করতে পারবে না। করার কোনো ক্ষমতাই নেই। সব জায়গায় মেশিন বসে যাচ্ছে। কম্পিউটার, ফ্লপি, হার্ড ডিস্ক। ম্যানুয়ালি আর কিছু হবে না। লোকই লাগবে না অ্যাত। ক্লাস থ্রি, ক্লাস ফোর থাকবেই না বলতে গেলে। যা থাকবে—তা হলো কয়েকজন অফিসার আর কিছু মেশিন।

ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর না থাকলে ইউনিয়নের চাপও নেই।

মনমোহন সিং, চিদাম্বরম, যশবন্ত সিনহা—সবারই কথাবার্তা কাছাকাছি। বিমা বেসরকারিকরণ করতে হবে। বিদেশি কোম্পানিগুলোর সামনে খুলে দিতে হবে ব্যবসার দরজা।[৫২]

সুতরাং এ গল্প শুধু প্রযুক্তির প্রসার কিংবা তার ব্যবহারকেই তুলে ধরেনি, বরং তা যে মানুষকে কর্মহীন করে তোলার আশঙ্কা তৈরি করেছিল সেই সত্যটি এখানে উঠে এসেছে। বিশ্বায়ন পুঁজির পৃথিবীকে বৃহৎ করে তুলেছিল, মানুষের কর্মের সম্ভাবনাকে করেছিল সীমাবদ্ধ কিংবা বিপদগ্রস্ত। এ গল্প আমাদের সেই কথাই বলে।

ভারত মুক্ত অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে যে পুঁজির প্রসারকে স্বীকার করে নিয়েছিল, সেই পুঁজি দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল বহুতর সব ক্ষেত্রে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের ঘরবাড়ি, বিনোদন থেকে নিত্যপ্রয়োজন—সমস্ত ক্ষেত্রেই পুঁজির বিকাশ ঘটেছিল দ্রুত। লেখক কিন্নর রায় তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন এই দিকগুলি। এইরকমই একটি ছোটোগল্প ‘বরফের গায়ে আগুন’ (শারদীয় *গল্পগুচ্ছ* ১৯৯৯)। এই গল্পের প্রেক্ষাপটে জেগে থাকে ১৯৯৯ সালের ভারত পাকিস্তানের মধ্যবর্তী কারগিল যুদ্ধ। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এই গল্প তুলে ধরেছে কীভাবে নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থার এক মুসলমান যুবক সুরজ তার হৃদযন্ত্রের অপারেশনের জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য চেয়েও পায় না, কারণ যুদ্ধ হচ্ছে। অন্যদিকে এসময় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের প্রতি তৈরি হয় বিদ্বেষের চোরা স্রোত। খানিকটা সাংবাদিকতার বর্ণনাপদ্ধতিতে এ

গল্পে উঠে আসে এইসব ঘটনাপ্রবাহ। গল্পের মূল প্রবাহটি এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হলেও অন্যদিকে এ গল্পের শরীর জুড়ে থাকে বিশ্বায়ন—

> ব্রহ্মপুর ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, সমাজ কল্যাণ সমিতির ক্লাবঘর পাকা হয়েছে বছর চারেক হয়ে গেল। একবার ভোটও হয়ে গেল ক্লাবের পাকা ঘরে।
>
> একতলায় রাস্তার দিকে গোটা ছয়-সাত দোকানঘর। সব ভাড়া হয়ে গেছে। টিভি, লেডিজ টেলার্স, বালি-সিমেন্ট-লোহার রড, টেপ ক্যাসেট, রেডিমেড জামা-কাপড়—পাশাপাশি। মাস ভাড়া ছ'শো। অ্যাডভান্স হাজার পনেরো। একটা বড় ঘর আছে ক্লাবের। সেখানে দুটো টিভি। একটা রঙিন—একুশ ইঞ্চি। শাদা-কালো চোদ্দ ইঞ্চি।
>
> ক্লাবঘরের উল্টো দিকে পূর্ণিমা ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং। প্রোমোটার, ডেভেলপার।...
>
> পূর্ণিমা ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং-এর অফিসের চেয়ারে বসে আছি। টেবিলের ওপারে ইসলাম আলি মোল্লা, সোফিয়েল পুরকাইত, বাদল চট্টোপাধ্যায়। তিনজনে পার্টনারশিপে জমি কিনে—ঠিক কিনে নয়, কিছু টাকা বায়না দিয়ে মালিকের কাছ থেকে ধরে রেখে মাটি ফেলে উঁচু করে, ড্রেসিং করার পর বেচে দিচ্ছে। বিঘের পর বিঘে জমি। শালি জমি বাস্তু হয়ে যাচ্ছে। পুকুরে রাবিশ ফেলে বুজিয়ে দিয়ে দিব্যি, বাস্তু জমি। এসব খুব চলছে। এর নাম ডেভেলপিং।...
>
> এখানে—এই ব্রহ্মপুর বাদামতলায় এগারো বছর হলো বাড়ি করে এসেছে নিখিল সিদ্ধান্ত। চোখের সামনে দেখতে দেখতে কত কী বদলে গেল। রাস্তার ওপর এস টি ডি বুথ, রোলের দোকান, ঘড়ির দোকান, একটার পর একটা বড় স্টেশনারি, মুদিখানা, 'জলযোগ', বড়সড় মিষ্টির দোকান, শেয়ারের ফর্ম দেওয়ার ঠেক, বিউটি পার্লার, লেডিজ টেলারিং শপ। এস টি ডি বুথ হলো অনেকগুলো। মেয়েদের চুল কাটানো বিউটি পার্লারও বেশ কয়েকটা।[৫৩]

শুধুমাত্র উপরিউক্ত লক্ষণগুলিই নয়, বরং এ গল্পে উঠে এসেছে মফসসলকে গিলে ফেলে শহরের দ্রুত প্রসারের দিকটিও। তবু নাগরিক পরিষেবার মান যে সেইহারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল না, সেই দিকটিও এ গল্পে উঠে এসেছে।

‘প্রহেলিকা সিরিজ’ (*এবং মুশায়েরা,* অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯) গল্পটির অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে তথ্য-প্রযুক্তি। এ গল্পের চরিত্র দিবাকর বাগচী পেশায় বইয়ের দোকানের প্রোডাকশন ম্যানেজার। প্রেসে তাড়া লাগিয়ে প্রুফ, কারেকশান সময়মতো নেওয়া এঁদের কাজ। কখনও বা হিসাবপত্র রাখা। বেতন অতি সামান্য। বহুদিন ধরে এইধরনের কাজ করে বুড়িয়ে যাওয়া এই লোকটি আর হিসাবপত্র কিংবা দরকারি কাগজ সেভাবে গুছিয়ে রাখতে পারেন না। এদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ে প্রযুক্তির দাপট। সেলফোনের প্রযুক্তি এসে যায়। এসে যায় কম্পিউটার। আর তারই সঙ্গে অনিশ্চয়তার দিকে ঢলে পড়ে এইসব পুরানো পেশাগুলি—

> না, এবার একটা পি সি নিতেই হবে। পার্সোনাল কম্পিউটারের ফ্লপিতে রাখব সব। মেমোরিতে রাখা থাকবে। দরকার নেই আর হিউম্যান মেমোরির। বলতে বলতে ‘তলব’-এর প্যাকেট দাঁত দিয়ে ছিঁড়ল সাগর। তারপর মুখে অনেকটা গুঁড়ো এক সঙ্গে ঢেলে চিবোতে চিবোতে বলল, ভাবছি একটা ফ্যাক্সও বসিয়ে নেব।[৫৪]

এ গল্পে পুস্তক মুদ্রণের জগতটিকে তুলে ধরেন লেখক। প্রযুক্তির আগমনের সঙ্গে দ্রুত কেমনভাবে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কগুলি পালটে যায়, তা হয়ে ওঠে এ গল্পের অন্যতম উপজীব্য। ‘হিউম্যান মেমোরি’ পরিত্যক্ত হতে থাকে। চারিদিক থেকে কোণঠাসা হতে হতে বাগচিবাবুর মতো মানুষেরা আশ্রয় নেন একধরনের কল্প জগতে। এই গল্পের বেশ কিছু অংশে তাই জায়গা করে নেয় কুহকী বাস্তবতা। এই ধরনের বাস্তবতার প্রয়োগ আরও কয়েকটি গল্পে ঘটিয়েছেন লেখক। যেমন ‘বাঞ্ছাকল্পতরু’ (শারদীয়া *চতুষ্কোণ* ২০০১) গল্পটি। এ গল্পের বর্ণনাপদ্ধতিতে রূপকথা, কিংবদন্তির সঙ্গে মিশে যায় জাদু বাস্তবতা। গল্পের শুরু হয় আশ্চর্য এক খবর দিয়ে—

জলাশয়—তাহা পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা অথবা খরস্রোতা নদী, যাহাই হউক না কেন, সর্বত্রই চন্দ্রের খণ্ডিতাংশ মিলিতেছে। সেই খণ্ডিতাংশ দুই হস্ত ডুবাইয়া অঞ্জলিবদ্ধভাবে তুলিবার উপক্রম করিলেই গাত্র মার্জনার সাবান হইয়া যাইতেছে।[৫৫]

এইভাবে অগ্রসর হয়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে লেখক বিশ্বায়ন তথা পুঁজির প্রসারের বিভিন্ন অনুপুঙ্খকে যে তুলে ধরতে চান, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে গল্পের শেষে উপস্থিত কল্পবৃক্ষের বর্ণনায়। সারা গল্প জুড়ে গাছেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। কথা বলে ওঠে প্রকৃতির একাধিক উপাদান—

ইদানীং রসাল গাত্রে আর স্বর্ণলতিকার পেলব বন্ধন নাই।... রসাল এই লইয়া কয়েকদিন বেশ বিমর্ষ ছিল। এমন কি মাথার উপর নীল নভোমণ্ডলে শশীমুখ দেখিয়াও তাহার বিষাদ দূরীভূত হইতেছিল না। ইতোমধ্যে বহতা ফিচেল পবন একরাত্রে তাহার কর্ণে ফিস ফিস করিয়া বলিয়া গেল, দুঃখ করিও না। চতুর্দিকেই এখন বিশ্বায়নের সুপবন বহিতেছে। সেই মলয় বাতাসে বিশ্বায়নের সুগন্ধ। কেনটাকি চিকেন আসিতেছে। সস্তায়—প্রভূত সস্তায় পাইবে। আসিতেছে চীনা সাইকেল, জুতা, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ছত্র। কোরিয়া ও জাপানের নানা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। সবই জলের দরে। সস্তা, অথচ তাহার তিন অবস্থা হয় না।[৫৬]

বিশ্বায়নের প্রকৃতিকে গল্পের মাধ্যমে সম্যকভাবে তুলে ধরেন লেখক। তুলে ধরেন বিদেশি পুঁজির অগ্রসরণের কথা—

‘গ্যাময়’ ও ‘গ্লোরিফ্লেম’ নামের দুইটি বিদেশি কোম্পানি তাহাদের শ্যাম্পু, সাবান, লিপস্টিক লইয়া দ্বারে দ্বারে পঁহুছিয়া যাইতেছে। দ্রব্যের দাম অধিক। কিন্তু ইহাতে নাকি রূপ খোলে, সুতরাং রূপটান হিসাবে অনেকেই উক্ত প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় করিতেছে।

কেহ বা রাতারাতি ধনী হইবার নিমিত্ত উক্ত দুই কোম্পানির এজেন্ট হইয়া যাইতেছে। কিছু টাকা লাগাইয়া এজেন্ট হওয়া। তাহার পর অন্যদের পাকড়াইয়া এজেন্টকরণ। এইরূপে বৃত্ত সম্পূর্ণ হইতেছে।...

> সুতরাং যাহাদিগের হাতে নিয়মিত অর্থ আসিতেছে, তাহারা ঊর্ধ্ববাহু ও মুক্তকচ্ছ হইয়া বিদেশি সংস্থার জয়গান করিতেছে।[৫৭]

বলাই বাহুল্য লেখক এখানে কাল্পনিক নামের আড়ালে আমেরিকান বহুজাতিক কোম্পানি 'অ্যামওয়ে' এবং সুইডিশ বহুজাতিক কোম্পানি 'অরিফ্লেম'-এর মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-এর কথা তুলে ধরেছেন, যা এই পর্বে মানুষের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। আর এভাবেই বিশ্বায়ন যেন কল্পবৃক্ষ হয়ে দেখা দেয়—

> টিভি-র দৌলতে, সংবাদপত্রের কল্যাণে গ্রামে গ্রামে এখন বডি ফ্রেশনার, হেয়ার রিমুভার, শ্যাম্পু, বডি স্প্রে, পারফিউম, ময়েশ্চারাইজার, সান ক্রিম, বডি লোশন ইত্যাদি, প্রভৃতি, ইত্যাদিরা হু-হু শব্দে ঢুকিয়া পড়িবার প্রয়াস করিতেছে। মহল্লায় মহল্লায় এখন কল্পবৃক্ষ। সর্বত্রই বিশ্বায়নের সুপবন।...
>
> শূন্যপথে বায়ুবেগে কল্পবৃক্ষ গমন করিতেছিল। কি তাহার শোভা! আলোর কি বাহার! জ্যোতিঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছে বৃক্ষ শাখা, কাণ্ড হইতে। বৃক্ষ শাখায় থরে-বিথরে বিদেশি দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। পারফিউম, বডি লোশন, ময়েশ্চারাইজার, সাবান, শ্যাম্পু, টিনের মাছ-মাংস, ছত্র, ঘড়ি, পাদুকা, কম্পিউটার—কিছুই বাদ নাই।[৫৮]

প্রকৃত প্রস্তাবে 'কল্পবৃক্ষ' আসলে কল্পনাই। সংখ্যাগুরু মানুষের জীবনে আবহমান কাল ধরে রয়েছে অভাব, আর অভাব আছে বলেই রয়েছে কল্পবৃক্ষের কল্পনা। যার দ্বারা সে অন্তত অভাবপূরণের কাল্পনিক সুখ অনুভব করে ভুলে থাকতে পারে তার কঠিন, কঠোর, নিষ্পেষিত জীবনকে। পুঁজির আনুকূল্যকারী গোষ্ঠীসমূহ বিশ্বায়ন তথা পুঁজির অবাধ প্রসারের ফলে এইরকমভাবে সমস্ত অভাবের অবসান হবে বলে যে অলীক স্বপ্ন ছড়িয়ে দেন, তার প্রতি একরকম ব্যঙ্গ উঠে আসে লেখকের আলোচ্য গল্পটিতে—

তাহার পর এক রাতে প্রতি সরোবর, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও নদী মধ্যে কোন মন্ত্র বলে বুঝি বা জাগিয়া উঠিল মায়াদ্বীপ। তন্মধ্যে সেই বাঞ্ছিত বাঞ্ছাকল্পতরু। কল্পনাতরুর শাখা-প্রশাখায় পণ্যের সমাহার। সমস্ত পণ্যই আন্তর্জাতিক। কেনটাকি চিকেন, স্কচ হুইস্কি, ফরাসী সুগন্ধী, চীনা সাইকেল, পাদুকা, ব্যাটারি, কোরিয়ার ছাতা, জাপানি ক্যামেরা, টিভি, ওয়াশিং মেশিন—একেবারে ভোগ্যপণ্য সামগ্রীর হদ্দমুদ্দ। ইহা ছাড়াও কল্পতরুর শাখে শাখে বিদেশি বডি ফ্রেশনার, লিপস্টিক, লিপগ্লস, ময়েশ্চারাইজারসহ নানাবিধ রূপচর্চার সামগ্রী।

সবাই কল্পবৃক্ষে পঁহুছিবার নিমিত্ত পাড়ে জড় হইল ও কোলাহল করিতে লাগিল।[৫৯]

পুঁজি এবং প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণকারী মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে এই বিশ্বায়ন কিংবা পুঁজিব্যবস্থা কল্পবৃক্ষ হয়ে ওঠে, কিন্তু সমষ্টির জীবনে এগুলির অবাধ প্রসার ভেঙে ফেলে জীবিকা অর্জনের পুরানো ব্যবস্থাপনাকে, তৈরি হতে থাকে বিপুল পরিমাণ কর্মচ্যুতির আশঙ্কা। অল্প সময়ের ব্যবধানে পুঁজি এবং প্রযুক্তি চরিত্র পালটে ফেলতে সক্ষম বলেই তা কর্মের জগতটিকে যন্ত্রনির্ভর করে তোলে, ব্যক্তিমানুষ নিক্ষিপ্ত হয় পরিত্যক্তের খাতায়। আর এই সবকিছুর সামগ্রিক প্রভাব এসে পড়ে দেশের তথা পৃথিবীর জনসমষ্টির উপরে। বিশ্বায়নের প্রকৃত রূপকে লেখক কিন্নর রায় এভাবেই তাঁর একাধিক ছোটোগল্পের মাধ্যমে স্পষ্টতই তুলে ধরেছেন ।

৩.৮॥ **সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়**

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৬১) বর্তমান সময়ের বাংলা ছোটোগল্পের একটি পরিচিত নাম। ছাত্রজীবনে লেখালিখির সূত্রপাত হলেও পুরোদস্তুর গল্পকার হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ১৯৯৪ সালে দেশ পত্রিকায় গল্প প্রকাশের মাধ্যমে। দীর্ঘ সাতাশ বছরের লেখালিখির জীবনে অনেক গল্প লিখেছেন তিনি। বদলে গেছে সমাজ, মানুষের মূল্যবোধ, ঘটেছে ব্যবহারিক জীবনে প্রযুক্তির

প্রসার। এ সবের সঙ্গে নিজেকে বদলে নিয়েছেন সুকান্ত, তাঁর অবলোকন চির তরুণের। সেই কারণেই বয়স ভেদে সুকান্তর পাঠকগোষ্ঠী আজ সীমাহীন।

ব্যক্তি মানুষের সংকট, টুকরো হয়ে যাওয়া পরিবার, সমাজে দলীয় রাজনীতির অভিঘাত, টিন এজ প্রেমের স্বরূপ অন্বেষণে সুকান্তর কলম সদাই সন্ধানী। তাঁর লেখনীতে গ্রাম, নগর, মফসসলের প্রাকৃতিক আবহাওয়া হয়ে ওঠে বাঙ্ময়।[৬০]

লেখকের সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে তাঁর সময় কিংবা সমকাল। বর্তমান আলোচ্য লেখকও তাঁর ব্যতিক্রম নন। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের পুরোদস্তুর গল্পকার হয়ে ওঠার সময়টি লক্ষ করলে দেখা যায়, তা একেবারে ভারতে মুক্ত অর্থনীতি স্বীকৃত হওয়ার প্রায় কাছাকাছি সময়। খুব সঙ্গত কারণেই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে খোলা বাজার অর্থনীতির একাধিক দিক, যার একটি অবশ্যই ছিল প্রযুক্তিনির্ভর মানবজীবন। তাঁর একাধিক ছোটোগল্পের বিষয় কিংবা অনুপুঙ্খে মানুষের জীবনযাত্রায় উঠে এসেছে আধুনিক সময়ের একাধিক প্রযুক্তির ব্যবহার। তা এতটাই স্বাভাবিকতার সঙ্গে ঘটেছে, যে আলাদা করে সেই উপাদানগুলিকে আবিষ্কার করে নিতে হয়। যেমন, তাঁর লেখা 'স্পর্শ' (*গল্প ৫১*, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৭) গল্পটির সূত্রপাতেই উঠে আসে মোবাইল ফোন ব্যবহারে কথা। অবধারিত ভাবেই তা একটি নির্দিষ্ট কালের সময়চিহ্ন হয়ে উঠে আমাদেরকে জানান দেয় সেই নির্দিষ্ট সময়ের মানুষের প্রযুক্তি ব্যবহারে দিকটি—

> মৃদু ঝাঁকুনি আর প্ল্যাটফর্মের দৃশ্যপট ধীরে সরে যাওয়া, এসি কম্পার্টমেন্টে থাকলে ট্রেন চালু হওয়াটা এরকমই লাগে। যেন অভিজাত সহবত। আভাস মোবাইল বার করে বউকে ফোন করল, এইমাত্র ছাড়ল। রাইট টাইম-ই আছে।...

সাইড লোয়ার বার্থ নিয়েছে সে। লাগোয়া কুপে দলের বাকি পাঁচজন। চারজনের কানেই ফোন। ট্রেন ছাড়ার খবর যে যার বাড়িতে জানাচ্ছে। রঞ্জনাদির কানে ফোন নেই। কারণ, বর সঙ্গেই আছে। বর, অর্থাৎ প্রতাপ রায় ছেলেকে ফোন করে জানাচ্ছেন ট্রেন সময়মতো রওনা হওয়ার খবর।[৬১]

বাংলা সাহিত্যে 'রেল' নামক প্রযুক্তিটি উঠে এসেছে বহুকাল হয়ে গেছে। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তের বিবরণও নেহাত কম রচিত হয় নি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই মুহূর্তটি নির্মাণে অবধারিতভাবে যুক্ত হয় প্রযুক্তির উপস্থিতি। অসামান্য দক্ষতায় তাকে তুলে ধরেন লেখক।

'ভাবের ঘর' গল্পে উঠে আসে এক শিক্ষিত বেকার যুবকের কথা, জীবিকার তাড়নায় যে ফটোগ্রাফি শিখতে যুক্ত হয় স্টুডিওতে। এ গল্পে গড়ে ওঠে সেই যুবকের সঙ্গে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের প্রেমকাহিনি। আর গল্পের নির্মাণে উঠে আসে প্রযুক্তির ব্যবহার—

নিতাই ডার্করুমের কোনো কাজই আমায় শেখায় না। নামেই ডার্করুম, কোনো কাজই অন্ধকারে হয় না। সাদা-কালো আমলে হত। এখন সবই কম্পিউটার প্রিন্ট।[৬২]

ন্যান্সি এখন আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড। রোজ রাতে ওর সঙ্গে চ্যাট করতে হয়। না করলেই পরদিন স্টুডিয়োয় হানা।[৬৩]

ভিড় থেকে বেরিয়ে আমি দৌড়োচ্ছি। দোকানটা মোবাইল ফোনের। আমার জন্মদিনে স্মার্টফোন দেবে বলে ন্যান্সি হয়তো ওই দোকানে চুরি করতে ঢুকেছিল! সবসময় 'কিপ ইন টাচ' থাকতে চায়।[৬৪]

খোলা বাজার অর্থনীতিতে একদিকে জীবিকার সংকট, পুঁজির প্রসার, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রেমের সম্পর্কগুলি যে চিরন্তন উষ্ণতাকেই আবাহন করে আনে, সেই শাশ্বত সত্যকেই লেখক এ গল্পে মূর্ত করে তুলেছেন। প্রেমাস্পদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য প্রযুক্তিকে চুরি করতেও পিছপা হয় না প্রযুক্তিনির্ভর দিনের সাহসী প্রজন্ম। এ গল্পের শেষে প্রেমিক চরিত্রের পলায়ন কি নিজেকে এক চোর রমণীর থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়াস, নাকি

সেই সমাজনির্মিত নীতিবোধের আড়ালে প্রেম সম্পর্ককে অস্বীকার করতে চাওয়া? 'ভাবের ঘর' গল্পটি তাই সার্থকনামা হয়ে ওঠে।

প্রযুক্তি মানুষের জীবনে সুবিধা এনে দিয়েছে অনেক। সঞ্চার করেছে গতির। দূরের মানুষকে কাছের করে তুলেছে এক নিমেষে। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়, যে মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া পারস্পরিক মনোজাগতিক দূরত্বকে কি প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরীভূত করা গিয়েছে? মানুষকে প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরদারির আওতায় আনা গেলেও প্রযুক্তি কি তার হৃদয়ের গহনে নজরদারি চালাতে সক্ষম? এইরকমই কিছু চিরন্তন প্রশ্ন তৈরি হয় 'আলোর তরবারি' (*গল্প ৫১*) গল্পটি পাঠে। এ গল্পে উঠে আসে সমুদ্রতীরবর্তী একটি হোটেল, ম্যানেজার এবং তার বন্ধু এবং এক যুবতী নারী চরিত্রের কথা। একাকিনী যে নারী প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট তারিখে সেই হোটেলটিতে আসেন, একটি রাত থাকেন, সেই রাতে অজানা অনুপস্থিত কোনো পুরুষের সঙ্গে সংরাগময় স্বগতোক্তি করেন এবং চলে যান। স্বভাবতই তাঁকে নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয় ম্যানেজারের। সেই ঘরটিতে ভদ্রমহিলার অজান্তে লাগিয়ে দেওয়া হয় মাইক্রোফোনসহ সিসিটিভি। নির্দিষ্ট রাতে বন্ধুকে ডেকে সংলাপরত সেই নারীটির ঘরের লাইভ ক্যামেরা ফুটেজ দেখতে শুরু করে ম্যানেজার। এ পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে এ গল্প পর্নোগ্রাফির, কিন্তু না, লেখক এইখান থেকে গল্পটিকে নিয়ে যান অন্য এক উচ্চতায়। বন্ধুর প্রবল বাধায় ম্যানেজার বাধ্য হয় সিসিটিভি বন্ধ করে ফুটেজ মুছে ফেলতে। জানা যায় ভদ্রমহিলা তাঁর প্রেমাস্পদকে ওই ঘরে কয়েকবছর আগের ওই তারিখে পেয়েছিলেন। সেই প্রেমিক তাঁকে ভুলে বিবাহ করেছে অন্য কোন নারীকে। তবু সেই আসঙ্গ ভুলতে পারেন নি তিনি। তাঁর অনুভবে প্রতি বছর ওই তারিখে তিনি ফিরে পান তাঁর প্রেমিককে। সেই মুহূর্তগুলি ভরে ওঠে নারীটির একাকী সংরাগময় কাল্পনিক কথোপকথনে, যা থেকে হোটেল ম্যানেজার কল্পনা করেছিল কোনো দেহনির্ভর মিলনদৃশ্যের। বাস্তবিকপক্ষে সে মিলন দেহাতীত,

কল্পনাচারী। তাই ব্যর্থ হয় বহু খরচ করে লাগানো সিসিটিভি। একদিকে উঠে আসে এই প্রযুক্তিনির্ভর সময়ে দাঁড়িয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষের বিদীর্ণ হৃদয়ের চিরন্তন কাহিনি। অন্যদিকে লেখকের এই যাত্রাপথে ঢুকে পড়ে আধুনিক প্রযুক্তি—

> হোটেলের কমন স্পেসগুলোতে ক্যামেরা লাগানোর পর কুণাল টাকা মিটিয়ে দিয়েছিল ওই কোম্পানির। কদিন বাদে একজন টেকনিশিয়ানকে ডেকে পাঠায়। ইন-বিল্ট মাইক্রোফোন ক্যামেরা লাগায় দুশো দুই নম্বর রুমে। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য সেই টেকনিশিয়ানকে আলাদা করে টাকাও দেয়। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা। এখন নিজের ঘরে বসে দুশো দুইয়ের ভিতরে কি হচ্ছে দেখবে।
>
> এতদূর শুনে আমি বলেছিলাম, মানছি ব্যাপারটা অন্যরকম, কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য এত আয়োজন—ক্যামেরা কেনার, ফিট করার খরচ, খুব দরকার ছিল কি? ভদ্রমহিলা রুমের মধ্যে কি পাগলামি করছে তা জেনে তোর কি এমন লাভ?
>
> —লাভ লোকসানের কিছু নেই। জাস্ট ফান। মহিলা কি করছেন, বলছেন, স্পষ্টভাবে দেখব, শুনব। সেরকম ইন্টারেস্টিং লাগালে, ফুটেজটা তো রেকর্ডিং হবেই, শেয়ার করব ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপে। বলেছিল কুণাল।
>
> প্রমাদ গুনেছিলাম আমি। বললাম, সে কি রে! ফুটেজটা ভাইরাল হয়ে গেলে ভদ্রমহিলার তো ক্ষতি। হ্যাম্পার হবে পার্সোনাল লাইফ।[৬৫]

বর্তমান সময়ের পৃথিবী বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অনেক অগ্রসর হলেও সামাজিক রক্ষণশীলতার মূল জায়গাগুলিকে বহুক্ষেত্রেই অতিক্রম করতে পারেনি। প্রযুক্তি মানুষের মননের জগতের ঊর্ধ্বে নয়। তাই তার মাধ্যমে কিছু সুবিধা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত কোনো বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে না। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'ইহাদের কথা' (*গল্প ৫১*) গল্পে সেইরকমই কিছু দিক তুলে ধরেন। অবিবাহিতা পূরবী অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হলেও বিবাহ করা হয়ে ওঠেনি তাঁর।

আটচল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে তিনি বিপত্নীক রজতকে বিবাহ করার কথা ভাবেন। পূরবীর পরিজনরা তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে রজতের পুত্রবধূ আপাত দৃষ্টিতে আধুনিকমনস্ক। সে শ্বশুরের বিবাহ দিতে চেয়ে ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্রী পছন্দ করতে চায়। এ গল্পের অনেকখানি জুড়ে থাকে আধুনিক মনস্কতা। কিন্তু শেষপর্যন্ত রক্ষণশীল মূল্যবোধের উদাহরণ হয়ে থাকতে হয় রজতকে। তাদের বিবাহটি সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এ গল্প আর একবার প্রমাণ করে দেয় শুধুমাত্র পুঁজির বিশ্বায়ন কিংবা প্রযুক্তির প্রসার মানুষের মননকে বিশ্বায়িত করে তুলতে সক্ষম নয়। তবু এ গল্পের উপাদান হয়ে ওঠে প্রযুক্তি—

> ওর পুত্রবধূ শ্বশুরের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। মেয়েটি খুবই শিক্ষিত আর খোলামেলা সংস্কারহীন পরিবারে মানুষ। নেটে ম্যাট্রিমনি সাইটে রজতের বায়োডাটা পোস্ট করতে যাচ্ছিল শ্রাবণী, রজত অনেক বলে কয়ে নিরস্ত করেছে বউমাকে।
>
> ব্রেকফাস্টের সময় ল্যাপটপ সঙ্গে করে নিচের ফ্ল্যাটে এসেছিল শ্রাবণী। খাওয়াদাওয়ার পর ল্যাপটপ কোলে নিয়ে বসল ড্রয়িং-এর সোফায়। আমাকে বলল, বাবা, কি ধরনের পাত্রী চাও বলো? আমি ম্যাট্রিমনিতে তোমার বায়োডাটা দিচ্ছি।–ওকে কোনোমতে আটকালাম। বললাম, আমাকে একটু ভাবতে সময় দে, মেন্টাল প্রিপারেশনেরও একটা ব্যাপার আছে।[৬৬]

বিশ্বায়নের পরের পৃথিবী যেন এক বৃহৎ ভুবনগ্রামে পরিণত হয়েছে বলে মনে করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তেই মানুষের যাতায়াত। আর শুধু তা জীবিকার কারণেই নয়, চিকিৎসা, ভ্রমণ কিংবা শিক্ষাগ্রহণের জন্যেও। এভাবেই প্রবাসী হয়ে পড়ে একাধিক প্রজন্ম। বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগসূত্রটি বজায় থাকে প্রযুক্তি মারফৎ। কিন্তু সেই যোগ কি আর নাড়ির টানের মতো? হয়তো সেই টানকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে একমাত্র মানুষই। 'মায়েরা' (*গল্প ৫১*) গল্পে তাই দেখা যায় পিএইচ.ডি করতে গিয়ে বিদেশে থাকা সন্তান সায়নের

অনুপস্থিতিতে শিশুদের পড়ানোর ভার নেন মা মঞ্জুলা। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু অর্জুনের ভার নেন তিনি। সমাজ-সংসার, নিজ পুত্র কিংবা স্বামী এই ব্যাপারে তাঁর পাশে না দাঁড়ালেও তিনি এগিয়ে যান একাকী। আর এই ঘটনাপ্রবাহ চলাকালীন সায়ন নামক তাঁর নিজ গর্ভজাত সন্তানটি গোটা গল্প জুড়ে উপস্থিত থাকে ভার্চুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে—

> দুপুরের পর থেকেই আজ একটা বাড়তি উত্তেজনায় ফুটছে মঞ্জুলা। ছেলেকে একটা সুখবর দিতে পারবে। সায়ন থাকে বিদেশে। খবর দেবে ওয়েবক্যামের মাধ্যমে, কম্পিউটার স্ক্রিনে ছেলের মুখোমুখি বসে। খবরটা জেনে সায়ন স্বস্তি পাবে।...
>
> ছেলের সঙ্গে বাবার সাধারণত ফোনে কথা হয়। লসএঞ্জেলসে যখন সকাল এখানে রাত। সায়ন সকালে স্কাইপে কথা বলে নিয়ে ইউনিভার্সিটি বেরিয়ে যায়।...
>
> কথাটা একেবারে বুকের মাঝখানে গিয়ে বিঁধেছিল। নিজেকে কোনোক্রমে সামলে মঞ্জুলা মিনমিন করে ছেলেকে বলেছিল, ইন্টারনেটে সার্চ করে সেরিব্রাল পালসি সম্বন্ধে জানলাম। অর্জুনের ক্ষেত্রে সব কটা সিমটম মিলছে না।
>
> বাচ্চাগুলো চলে যাওয়ার পর ডেস্কটপে স্কাইপে বসল মঞ্জুলা। স্ক্রিনে এসে সায়নের প্রথম প্রশ্ন, আজ তো স্কুল খুলল, কেমন দেখলে তোমার সেই স্পেশাল স্টুডেন্টকে। ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে কাউন্সেলিং ট্রেনিং-এ?[৬৭]

এভাবেই লেখক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর একাধিক গল্পের বিষয় কিংবা অনুপুঙ্খে ব্যবহার করেছেন বিশ্বায়ন কিংবা তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদানকে। এইরকম আরও কয়েকটি ছোটোগল্প হল—‘গোলাপি রুমাল’, ‘না লেখা গল্পগুলো’, ‘তুমি’ ইত্যাদি।

৩.৯॥ **প্রচেত গুপ্ত**

প্রচেত গুপ্ত বর্তমান সময়ের একজন অত্যন্ত পরিচিত লেখক। তাঁর জন্ম ১৯৬২ সালের ১৪ই অক্টোবর কলকাতায়।[৬৮] প্রচেত গুপ্ত-র *পঞ্চাশটি গল্প* (আনন্দ, ২০১৭) গ্রন্থের একাধিক ছোটোগল্পে উঠে এসেছে বর্তমান সময়ের কথা। অবধারিতভাবেই তাঁর ছোটোগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তির নানা দিক। বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযান কিংবা বদলে যাওয়া সংস্কৃতির বিভিন্ন মাত্রা ধরা পড়েছে তাঁর গল্পে। শুধুমাত্র তাই নয়, তাঁর ছোটোগল্পের নামকরণেও লেগেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি জগতের ছোঁয়া। এমনই কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'মোবাইল' (২০০৫) কিংবা 'ইমেল বিছানো পথে' (২০০৭)। তবে শুধুমাত্র এই দুটি গল্পেই নয়, তাঁর একাধিক গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে সমকালীন প্রযুক্তির দুনিয়া। এইরকমই কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'কথা' (২০০৮), 'নীল' (২০০৮), 'আজ কি শুভ্র আসবে' (২০০৮), 'কৃষ্ণচূড়া' (২০০৯), 'রক ফেস্টিভ্যাল' (২০০৯) ইত্যাদি।

যে সময়ে প্রচেত গুপ্ত তাঁর উল্লেখিত ছোটোগল্পগুলি লিখছেন, ততদিনে বিশ্বায়নের হাত ধরে দ্রুত গতিশীল প্রযুক্তির বাজার ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল টিভির জগতটির বহুগুণ প্রসার ঘটেছে। বলা ভালো, সেই জগতকে অতিক্রম করে এসে গিয়েছে হাই ডেফিনিশন স্যাটেলাইট টিভির জগৎ। শুধুমাত্র তাই নয়, এই সময়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানির হাত ধরে এসে গিয়েছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট। দ্রুতগতির সেই ইন্টারনেট ব্যবস্থার দ্বারা বিভিন্ন ওয়েবসাইটকে ব্যবহার করে ক্রম প্রসার্যমাণ বিনোদনের জগৎ। এসে গিয়েছে অর্কুট, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক মাধ্যম। নাগরিক তরুণ প্রজন্মের একটি বড়ো অংশ সেগুলির ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে বিজ্ঞাপনের দুনিয়া। চিত্রতারকা কিংবা

ক্রীড়াতারকাদের দ্বারা অভিনীত বিজ্ঞাপন ব্র্যান্ডগুলিকে আরও জনপ্রিয়তায় নিয়ে যাচ্ছিল। খুব স্বভাবতই প্রচেত গুপ্তের একাধিক ছোটোগল্পে এই বিষয়গুলি সার্থকভাবে উঠে এসেছিল। তরুণ প্রজন্মের প্রবণতাসমূহ কিংবা মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকে তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক।

'মোবাইল' গল্পটি প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তির গল্প নয়। এ গল্প প্রেমের। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভৌতিক আবহ। প্রযুক্তি সেখানে অনুঘটকের কাজ করেছে। এ গল্পে দেখা যায় তন্দ্রা এবং সুপর্ণর মধ্যেকার প্রেমের মাধ্যমটি হল আধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল ফোন। চাকুরিরত তন্দ্রাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় বেকার সুপর্ণ। এ প্রস্তাবে রাজি হয় না তন্দ্রা। এরপর হঠাৎ তন্দ্রার ফোনটি উধাও হয়ে যায়। গল্পের দ্বিতীয় অংশে জানা যায়, সে যন্ত্র হাতিয়ে নিয়েছে এক প্রেতিনী। ইতিমধ্যে পরদিন সেই ফোনে তন্দ্রার রাগ ভাঙাতে ফোন করে সুপর্ণ। তার একতরফা প্রেমালাপে প্রেতিনী কানন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। পরে সুপর্ণর ভুল ভাঙে যখন তন্দ্রা অন্য একটি ল্যান্ডফোন থেকে তাকে ফোন করে। ততক্ষণে প্রেতিনী কাননের মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোবাইলের কানেকশন। তবু কানন সেজে গুজে সেই মোবাইলটি নিয়ে অপেক্ষা করে, যদি তা বেজে ওঠে আবার। যদি ফের বয়ে আনে প্রেমের বার্তা। এ গল্পে বাস্তবকে অতিক্রম করে এক অন্য জগতে পৌঁছে যান লেখক। প্রেমের স্পর্শ মৃত্যুর পরপারে উপস্থিত কোনো সত্তাকে যেন জীবিত মানুষের মতোই আচরণ করায় তাঁর লেখনি। আর এ সবের আলম্বন হয়ে থাকে প্রযুক্তি—

> তন্দ্রা মোবাইলটা এবার ডান কান থেকে বাঁ কানে নিল। জিনিসটা এতক্ষণ ডান হাতে ধরা ছিল, এবার ধরল বাঁ হাতে। কান ও হাত বদল এই নিয়ে হল মোট সতেরো বার। তাও কথা ফুরোয়নি। চট করে

ফুরোবে বলে মনেও হচ্ছে না। গভীর রাতে প্রেমিক-প্রেমিকার ভাব-ভালবাসার কথাও একসময় ফুরিয়ে যায়। ঝগড়া বোধহয় ফুরোয় না।...

তন্দ্রা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কানে লাগলে, তুলো দিয়ে নাও। ফোন ছাড়ছি। ইস, রাত দেড়টা বাজে।'

সুপর্ণ ও ধার থেকে 'ফুঃ' ধরনের একটা আওয়াজ করল। বলল, 'দেড়টা বাজল তো কী হল? আমেরিকায় রাত দেড়টা মানে কী জানো? রাত দেড়টা মানে হল বিকেল। প্রেম করতে যাবে বলে ছেলেমেয়েরা তখন সাজতে বসে। বুঝলে?'...[৬৯]

অন্য দিন হলে এই সময়টায় কানন জোরে জোরে পা দোলাত। আজ একেবারে চুপ। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে নিজের কঙ্কাল হাতের দিকে। সেই হাতে ধরা রয়েছে ছোট্ট একটা মোবাইল ফোন! মানুষের মোবাইল ফোন।

এই জিনিস কানন আজ প্রথম দেখছে এমন না। আগেও আড়াল-আবডাল থেকে দেখেছে। লোভ হত। বড় অদ্ভুত জিনিসটা! মাথার কাছের ছোট্ট কাচটুকু যেন এক চিলতে জানলা! বাজনা বেজে, যন্ত্র চালু হলে সেই জানলায় চাপা আলো জ্বলে ওঠে। মনে হয়, জানলা খুলে কেউ ডাকছে, আয় আয়...! কানন দেখেছে, মানুষ তখন কান পেতে কথা শোনে। ফিসফিস করে কথা কয়। কাননের হিংসেও হয়েছে। আহা! মানুষের জীবন কী আনন্দের![৭০]

এ গল্পে প্রযুক্তিকে বিপরিচিতকরণ করে অন্য জগতের দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন লেখক। মোবাইল ফোনের বর্ণনাটি জানিয়ে দেয়, তখনো স্মার্টফোনের বিপুল বিস্তার ঘটেনি। হাতের মুঠোয় এসে যায়নি বিপুল ডাটা কিংবা একাধিক সোশ্যাল মিডিয়ার লোভনীয় হাতছানি। তা ঘটেছিল আরও পরে।

'ইমেল বিছানো পথে' গল্পের অন্বিষ্ট অন্যরকম। এ গল্পে উঠে আসে বৃদ্ধ দম্পতি স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিবনাথবাবু এবং তাঁর বর্ষীয়সী স্ত্রী বাসবীর কথা। তাঁদের মেধাবী

পুত্র সূর্য আমেরিকার একটি কলেজে জেনেটিক্স পড়ায়। সেই সূত্রে তার আলাপ হয় ছাত্রী তথা বেজিং এর মেয়ে সুচিয়ং-এর সঙ্গে। সে আলাপ বিবাহে পরিণত হয়। এ গল্পে উঠে আসে পৃথিবীর দুই প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এক পরিবারের কথা। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে পড়ে থাকে আগের প্রজন্ম, আর মেধাবী পরের প্রজন্ম সমৃদ্ধ করে প্রথম বিশ্বের কোনও দেশকে। দূর থেকে প্রযুক্তির মাধ্যমে ছেলের নতুন সংসার, বিদেশিনী পুত্রবধূ আর নাতনিকে দেখে আশ মেটায় বাবা-মা। আমেরিকায় যাওয়ার মতো খরচ করার সামর্থ্য তাঁদের নেই। তাই সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে তথ্যপ্রযুক্তি। সেখানেও বাধা হয়ে ওঠে টেলিফোনের আন্তর্জাতিক কলের বিপুল খরচ। আর সেজন্যই ছেলের নির্দেশে খরচ কমানোর জন্য ফোনের পরিবর্তে ইমেল করে যোগাযোগের চেষ্টা করে বাবা-মা। কিন্তু সেখানেও বাধা। সে বাধা সময়গত। আমেরিকায় যখন দিন, ভারতে তখন রাত। তাই রাত এগারোটার সময়ে সাইবার কাফেতে ইমেল করতে যেতে হয় এই বৃদ্ধ দম্পতিকে। বিশ্বায়নের একাধিক মাত্রা উঠে আসে এ গল্পে। আর স্বাভাবিকভাবেই এ গল্পের ছত্রে ছত্রে উপস্থিত হয় প্রযুক্তির অনুপুঙ্খ—

> স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁগো ওরা দোকান খুলে রাখবে তো?...
>
> ‘দোকান নয় বাসবী, একে বলে সাইবার কাফে। কম্পিউটার নিয়ে কারবার।’
>
> ‘ওই হল। আমি বাবা ওসব চা কফি বুঝি না। দোকানে ঠিকমতো বলে রেখেছ তো? তোমার যা ব্যাপার। হয়তো গিয়ে দেখব, ঝাঁপ ফেলে পালিয়েছে।’
>
> ‘পালাতে পারে। তবে আমি বিকেলেই বলে এসেছি। ছেলেটা মিত্তিরের ভাইপো। ওরই বিজনেস। কলকাতা থেকে ক’টা কম্পিউটার এনে বসিয়েছে।...[৭১]
>
> ‘লাস্ট টু মান্থ তোমাদের একটা ডলারও পাঠাতে পারিনি, কেন পারিনি সেটা একবার ভেবে দেখেছ মা ? বিকজ আমাদের মেয়ের এডুকেশন। তোমার নাতনির লেখাপড়া। এখানে এখন এডুকেশন কস্ট দিন দিন বাড়ছে। শুধু এখানে কেন, সব দেশেই এক কাণ্ড। এটা একটা গ্লোবাল ফেনমেনন।

আমাদের সকলকেই এটা মেনে নিতে হবে। প্লিজ, একটু বোঝো মা। আজকালকার দিনে সবদিক থেকে আমাদের সাশ্রয় করতে হবে। টেলিফোনের বদলে ইমেল এখন অনেক সস্তা, অনেক সহজ। কম্পিউটারের সামনে বসবে, ব্যস।'

'সে বাবা, সস্তা দামি যাই হোক, আমরা কম্পিউটারের কী জানি? না, না আমরা পারব না।'

সূর্য এবার রেগে যায়। বলে 'দুধের ছেলেমেয়েরা যেটা পারে তোমরা কেন পারবে না! তা ছাড়া এটা সায়েন্স টেকনোলজি। এটা আমাদের সকলকে অ্যাডপ্ট করাতে হবে। না জানলে শিখতে হবে। নো নো মা, এটা আমি মানব না, কিছুতেই মানব না।'[৭২]

প্রযুক্তি যেমন মানুষের মধ্যেকার ভৌত দূরত্ব কমিয়েছে, তেমনি বাড়িয়েছে মানসিক দূরত্ব। প্রযুক্তি মানুষকে বাধ্য করেছে তাকে ব্যবহার করতে, কিংবা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়াতে। তাই তরুণ পুত্র অনায়াসে বৃদ্ধা মাকে চাপ দেয় প্রযুক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে। কিছুটা হলেও বিধ্বস্ত হয় অপেক্ষাকৃত প্রবীণ প্রজন্মের বয়সগত শ্রদ্ধেয় পরিসরটি। আর এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে প্রথম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তৃতীয় বিশ্বের জীবনযাত্রা, এমনকি অনুভূতির দিকগুলিকেও। তাই আর পথ 'বকুল বিছানো' থাকে না, হয়ে ওঠে 'ইমেল বিছানো'।

'কৃষ্ণচূড়া' গল্পটি খানিকটা কাল্পনিক হলেও প্রযুক্তি এ গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে লেখকের অদ্ভুত দক্ষতায়। এ গল্পে উঠে আসে রোবটদের কাল্পনিক জগৎ। বিজ্ঞান এতটাই উন্নত হয়ে ওঠে, যে রোবট প্রযুক্তিতে বানিয়ে ফেলে খেলার সঙ্গী কিংবা ডোমেস্টিক হেল্পার রোবট। কোনো বিজ্ঞানী তৈরি করে ফেলেন একেবারে নিখুঁত মডেলের মতো নারী রোবট। এদের নামও বড়ো অদ্ভুত—এন টু, জেড ফোর, কে সিক্স ইত্যাদি। নারীর অবয়বে এবং মননে গড়া রোবট কে সিক্স-কে দেওয়া হয় এক মানবিক নাম-শকুন্তলা—

‘কে সিক্স শুধু ভাল মডেলই হয়নি, তার অ্যাপিয়ারেন্সও চমৎকার হয়েছে। শাড়ি পরিয়ে টিপিক্যাল বাঙালি অল্পবয়সি মেয়ের ইমপ্রেশন দেওয়া হয়েছে। ড. মিত্র মডেলের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে গয়না পর্যন্ত আনিয়েছেন। হাইড্রলিক সিস্টেম এমনভাবে প্রোগ্রাম করেছেন, যাতে মেয়েটা নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যালে কপালের উপর পড়া চুল ঠিক করতে পারে। রোবট বলে মনেই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সত্যিকারের কলেজপড়ুয়া মেয়ে।...

‘স্যার কে সিক্স ইজ জাস্ট আ ফ্রেন্ড। কম্পানি দিতে পারে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারবে, ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। বহু দেশে তো স্যার আজকাল এটা একটা সিভিয়ার প্রবলেমের আকার নিয়েছে। বন্ধু নেই, কথা বলার লোক নেই।’[৭৩]

একদিন এহেন কৃষ্ণচূড়া ল্যাবরেটরি থেকে পালায়। তার প্রেম হয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিতে চাকরিরত যুবক সিঞ্চনের সঙ্গে। নারী রোবটটিকে এত নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, যুবকটি ধরতেই পারে না, সে আদতে এক রোবটের সঙ্গে প্রেম করছে। গল্পকার নিখুঁত দক্ষতায় সেই রোবটের মুখে বসিয়ে দেন প্রযুক্তি জগতের উপযুক্ত ভাষা, তবু ছেলেটি বুঝতে পারে না, রোবট কথা বলছে। বুঝবেই বা কী করে! প্রযুক্তির বিশ্বায়ত যুগে মানুষের ভাষাকেও দখল করে নেয় যান্ত্রিকতা। সেই পরিসরে মানুষ আর যন্ত্র পারস্পরিক স্থান বিনিময় করে ফেলে অজান্তেই। কে সিক্স, অর্থাৎ কৃষ্ণচূড়ার কয়েকটি কথোপকথন এখানে উল্লেখযোগ্য—

‘মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। আমার সেন্সরগুলো খুব পাওয়ারফুল।’...

‘আরও একটা নাম আছে, সেটা কিন্তু তত সুন্দর নয়।’

‘ডাকনাম?’

কৃষ্ণচূড়া হেসে বলল, ‘না কোডনেম। শুনতে চাইবেন না।’

সিঞ্চন বলল, ‘আপনি কিন্তু চমৎকার হেঁয়ালি করতে পারেন কৃষ্ণচূড়া। পাজলের মতো।’

‘আমি পাজল ভাঙতেও পারি।’[৭৪]

এ গল্পের শেষে দেখা যায় নিখুঁত মানবসম্মত অভিনয় করেও রোবট শেষপর্যন্ত রোবটই থেকে যায়। গল্পের শুরুর দিকেই বলা হয়েছিল এ রোবট শুধু বন্ধুত্ব এবং সঙ্গ দিতে পারবে। সেই প্রোগ্রামিংকে পেরিয়ে মানুষের বন্ধুত্ব যেমন প্রেমে রূপ নেয়, মননগত প্রেম উভয়ের শরীরকে জাগিয়ে তোলে, সেই মানসিক জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন রোবটের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না। মন থেকে শরীরে যাওয়ার পথে বিরূপ আচরণ করে কৃষ্ণচূড়া। তার প্রোগ্রামিং এ কাজকে সাপোর্ট করে না। ততদিনে তার ইন-বিল্ট চার্জও ফুরিয়ে আসছিল। শেষপর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে ফিরে যায় সে। হতভম্ব, বিস্মিত,অপরাধবোধে আক্রান্ত সিঞ্চন এর কোনো মানে খুঁজে পায় না।

এ গল্প কল্পবৈজ্ঞানিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে অতীতের কল্পবিজ্ঞানের অনেক কিছুই বর্তমান দিনে যেভাবে সম্ভব হয়ে উঠছে, তাতে করে একদিন হয়তো এ গল্পের লেখকের দূরদর্শিতা প্রমাণিত হবে। যদি তা সত্যিই হয়, সে বড়ো অপূর্ণতার দিন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে (১৮৯২) লিখেছিলেন 'একটা আষাঢ়ে গল্প'[৭৫]। সে গল্পের শেষে তাসের দেশের বাসিন্দাদের যান্ত্রিকতা থেকে মানবিকতায় একরকমের উত্তরণ ঘটেছিল। একশো সতেরো বছর পরে আর এক আষাঢ়ে (১৯শে জুন, ২০০৯) প্রচেত গুপ্ত যে প্রযুক্তির পৃথিবী কিংবা যান্ত্রিকতার কথা লেখেন, তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ গল্পের তাই কোনো হ্যাপি এন্ডিং নেই, রয়েছে যান্ত্রিকতায় আক্রান্ত নিষ্ফল ক্রন্দনের অনুভূতি। এভাবেই লেখক তাঁর একাধিক গল্পে প্রযুক্তিকে যেভাবে তুলে ধরেন, তার প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই অধঃক্ষিপ্ত হয় নেতিবাচকতা।

৩.১০॥ কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্তমান সময়ের এক অন্যতম শক্তিশালী ছোটোগল্পকার কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬৪, ব্যারাকপুরে। প্রথম জীবন কেটেছে শ্যামনগরে। ইছাপুর নর্থল্যান্ড বয়েজ হাইস্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা। স্কুলজীবন থেকেই লেখালিখির সূত্রপাত। প্রথমে অনিয়মিতভাবে কিছু লিটিল ম্যাগাজিনে লিখতেন। ২০০৫ থেকে নিয়মিতভাবে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র বিভিন্ন প্রকাশনায় ছোটোগল্প লিখছেন। 'খেজুর কাঁটা' গল্পটি নিয়ে হয়েছে শ্রুতিনাটক। ছোটোগল্প 'ছবির মুখ' আকাশবাণীতে বেতারনাটক হয়ে সম্প্রচারিত হয়েছে। লেখকের 'ব্রহ্মকমল' গল্পটি ২০০৬-এ 'দেশ রহস্যগল্প প্রতিযোগিতা'য় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। ২০০৭-এ 'পূর্বা' শীর্ষক একটি কল্পবিজ্ঞান গল্পের জন্য 'দেশ গল্প প্রতিযোগিতা'য় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। *রাধিকা* লেখকের প্রথম উপন্যাস। পেশাদারি জীবনে ইঞ্জিনিয়ার, বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে কর্মরত। সাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত।[৭৬]

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *পঞ্চাশটি গল্প*-এর অন্তর্গত গল্পগুলি ২০০৫ থেকে ২০১৫ সময়কালের মধ্যে লেখা এবং এগুলি *দেশ, সানন্দা, উনিশ কুড়ি*, রবিবাসরীয় *আনন্দবাজার, এবেলা* প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৭৭]

উল্লেখিত সময়ে লেখা লেখকের একাধিক ছোটোগল্পে ধরা পড়েছে বিশ্বায়ন-বিধৌত সময় কিংবা তার একাধিক প্রভাব। এই সময়ে বিশেষ করে নাগরিক মানবজীবনে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে প্রযুক্তি কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। এসে গিয়েছে মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ কিংবা উচ্চ গতির ইন্টারনেট। লেখকের বেশ কিছু ছোটোগল্পের সূচনাতেই উঠে এসেছে আধুনিক প্রযুক্তির মোবাইলের ব্যবহার কিংবা প্রসঙ্গ। প্রযুক্তি-পণ্যের উপভোক্তা হয়ে

উঠতে মানুষ দ্রুত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম বিশ্বের জনগণের মতো তাদেরও পণ্যকেন্দ্রিক ঋণনির্ভর জীবন তৈরি হয়েছে। সে জীবন আশঙ্কার। প্রযুক্তি যখন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে, তখন সেগুলিকে ঋণের দায়ে হাতছাড়া হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে লেখকের একাধিক গল্পে। এ থেকে মানুষের জীবন হয়ে পড়ছে সমস্যাজটিল কিংবা হতাশায় পরিপূর্ণ। তবু সেইসব গল্পের শেষে লেখকের কল্পনায় যন্ত্রের অনুপস্থিতিকে প্রতিস্থাপন করে এই যান্ত্রিকতার জগৎ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে মানুষ। লেখকের একাধিক গল্পে এই প্রবণতা দেখা গিয়েছে। হয়তো এ এক আশাবাদ, তবু সেলসম্যান কিংবা লোন রিকভারি এজেন্টের মধ্যে থেকে মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন এক একটি পুরোদস্তুর মানুষের দেখা পাওয়া কিংবা লেখনীর মাধ্যমে তা তুলে ধরা নির্দিষ্ট এই সময়ে একজন লেখকের পক্ষে কম কথা নয়।

বিশ্বায়ন ত্বরান্বিত করেছে তথ্য-প্রযুক্তির জগতটিকে। মানুষের জীবন ক্রমশ এক জটিল যন্ত্রনির্ভরতার আবর্তে প্রবেশ করেছে। তার আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিও হয়ে উঠেছে যান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন। আর এইসবকিছুর মধ্যে দিয়ে শৈশব কেমনভাবে চুরি হয়ে যায়, লেখক সেকথা তুলে ধরেছেন অনায়াস দক্ষতায়। এইরকমই একটি ছোটোগল্প 'ছবির মুখ' (দেশ, শারদীয় ১৪১৪, ২০০৭)-এ লেখক দেখিয়েছেন পিতা-মাতার অহেতুক প্রতিযোগিতামূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিণাম। সন্দীপ আর অদিতির কন্যা ন'বছরের ঐন্দ্রিলা ওরফে টকির একটি ছবি ইংরেজি দৈনিকের পাতায় আকস্মিকভাবে ছাপা হওয়ার পর কিছুটা হলেও সেলিব্রিটি হয়ে ওঠে সে। যে দোকানটিতে দাঁড়িয়ে তার ছবিটি উঠেছিল, সেই দোকানটির বিক্রি বেড়ে যায় হু হু করে। এরপর অদিতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। কন্যাকে বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় প্রথম সারিতে কল্পনার চোখে দেখতে শুরু করে সে। এরপর এ গল্পে আগমন ঘটে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাড এজেন্সির এজেন্ট পরিচয় দেওয়া ওনিল ডিসুজার। মোবাইলে সে প্রস্তাব দেয় ঐন্দ্রিলাকে যাতে চাইল্ড

মডেলিং করানো হয়। এই প্রস্তাবে সহজেই আকৃষ্ট হয়ে লোকটিকে কন্যার বেশকিছু ছবি পাঠিয়ে দেয় সন্দীপ ও অদিতি। অন্যদিকে এই খ্যাতির দৌড়ে পিষ্ট হতে থাকে ন'বছরের ঐন্দ্রিলার শিশুমনের জগতটি। প্রতিযোগিতার দৌড়ে প্রবেশ করে সে সরে আসতে থাকে সুকুমার প্রবৃত্তির অনুশীলন থেকে। পাড়ার পুজোর স্যুভেনিরে তার আর আঁকা ছবি দেওয়া হয় না। কিছুদিন পরে লোকাল থানার ওসির সঙ্গে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা সন্দীপ-অদিতির বাড়িতে আসেন। জানা যায় শিশু ঐন্দ্রিলার ছবিগুলি সাইবার ক্রাইমের জগতে ব্যবহৃত হয়েছে পর্নোগ্রাফি তৈরির কাজে। ওনিল ডিসুজা ধরা পড়ার পর জানতে পেরে সেই সূত্রে পুলিশ আসে বাড়িতে। এ গল্পে সার্বিকভাবে বিশ্বায়ন কিংবা সংলগ্ন প্রযুক্তির দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বদলে যাওয়া মননের দিকগুলি উঠে আসে। অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তি এ গল্পের নির্মাণে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে---

> একটা লেডিজ টেলরিং শপের মালকিন মিসেস মাইতির চেনার কনফিডেন্সে ভর করে মেয়েকে ইন্টারন্যাশনাল মডেল করার লোভে অচেনা, অদেখা একটা লোককে মেয়ের গুচ্ছ গুচ্ছ ছবি পাঠিয়ে দিলেন। কোনও সন্দেহ হয়নি?
>
> হয়নি, কারণ কাগজের বিজ্ঞাপনেও তো কত অচেনা অদেখা লোকের কাছে আমরা বায়োডাটা, ছবি পাঠাই...
>
> সেগুলো তো নর্মাল মেলে যায়। একটা নির্দিষ্ট ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস থাকে। এমনকী বক্স নম্বর থাকলে তার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস খবরের কাগজের অফিসে বা পোস্ট অফিসে থাকে। কিছু গণ্ডগোল হলে ট্রেস আউট করার একটা রাস্তা থাকে। ই-মেল অ্যাড্রেসে সেরকম কোনও ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ট্রেস করা কি সম্ভব। আপনি আপনার ই-মেল কলকাতা, বনগাঁ, বর্ধমান, মাদ্রাজ, নিউ ইয়র্ক—সব জায়গা থেকেই তো অ্যাকসেস করতে পারেন। তাই না?[৭৮]

আবার কয়েকটা পাতা ওলটালেন অফিসার। তারপর ফাইলটা এগিয়ে দিলেন সন্দীপ-অদিতির দিকে। ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল দু'জন। বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে কদর্য পর্নোগ্রাফির ছবির প্রিন্ট আউট। চোখ বন্ধ করে ফেলল দু'জন।...

এবার চড়া গলায় বললেন অফিসার, কী হল তাকান? অ্যাম্বিশাস পেরেন্টস...

দেখতেই হল। কিন্তু এবারও আর এক দফা চমকাল দু'জনে। এ কীসের ছবি! একই ধরনের বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে কদর্য ছবি, শুধু মাথাগুলো নেই।

অবাক হচ্ছেন তো? এই মাথাগুলো তো আপনাদের মতো ক্যালাস বাবা-মায়েরাই অনেক সময় সাপ্লাই করে দেন। ডান কান থেকে বাঁ কান স্টেপ বাই স্টেপ ছবি। একটা স্টেপ তো মিলে যাবেই। তার ওপর সফিসটিকেটেড ফটো সফটওয়্যার। একদম স্কিন টোন পর্যন্ত মিলিয়ে দেবে। ইন্টারনেটে চাইল্ড পর্নোগ্রাফির ডিম্যান্ড কত জানা আছে আপনার?

আর কোনও কিছুই জানার ইচ্ছে নেই সন্দীপের। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে ওসি বললেন, এখন তো শুনি স্যার সফটওয়্যারেরই বাজার। লোকে লাখ টাকা মাসে মাইনে পাচ্ছে—কিন্তু কী সব সফটওয়্যার বানাচ্ছে দেখুন।

তোমার যেমন মাথা মিত্তির। রান্নাঘরের ছুরিটা দিয়ে তুমি আলুর ছাল ছাড়াবে না মানুষের গলা কাটবে, সেটা কি যে ছুরিটা তৈরি করেছে তার দোষ?...

স্যার আর একটা কথা, আমার মেয়ের ছবিগুলো কি ইন্টারনেটে হাতবদল হয়ে গিয়েছে?

ফ্র্যাঙ্কলি, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। ইন্টারনেট ইজ অ্যান ওশ্যান অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে না হয়ে থাকে।[৭৯]

'শোধ' গল্পটিতে উঠে আসে আর একধরনের বাস্তবতা। বিশ্বায়িত ভারতের প্রযুক্তি এবং ঋণনির্ভরতায় আক্রান্ত মানুষের অসহায়তার কথা উঠে এসেছে এ গল্পে। পুঁজিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিচিত্র ধরনের সব পেশার কথাও উঠে আসে এ গল্পে। অন্যদিকে দেখা যায় এইচ.আই.ভি-র মতো রোগেরও প্রসার।

এ গল্পের সূত্রপাতে দেখা যায় কেতাদুরস্ত যুবক অরিন্দমকে। বহু কাজ খোঁজার পরেও তার জন্য জোটে না কোনও প্রচলিত কাজ। শেষপর্যন্ত সে হয়ে ওঠে একজন রিকভারি এজেন্ট। তার কাজ হয় লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোন পরিশোধের জন্য চাপ সৃষ্টি করা। অনাদায়ে তাদের ঋণ করে কেনা কোনও জিনিস নিয়ে চলে আসা। এ দায়িত্ব পেয়ে যথেষ্ট কুণ্ঠিত হলেও অরিন্দম অনন্যোপায় হয়ে পড়ে উপার্জনের তাগিদে। তবু লেখক তার মধ্যে দিয়ে এই কঠিন সময়ের বিপরীত স্রোতের মধ্যেও জাগরূক রাখেন মানবিক চেতনা। সেজন্য এ গল্পে সে রিকভারি এজেন্ট হয়ে অন্যের জিনিস তুলে আনতে বাধ্য হলেও গল্পের শেষে তার মনে মানবিক বোধের জাগরণ ঘটে। আর এই সবকিছু মধ্যে জেগে থাকে প্রযুক্তি কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির একাধিক খুঁটিনাটি—

> হাত থেকে চায়ের কাপটা সেন্টার টেবিলে রেখে আবার পাতলা ফাইলটা তুলে নিল অরিন্দম। এর আগে কখনও মাল তুলে নিয়ে যেতে হয়নি অরিন্দমকে। ইনভয়েসের কপিটায় চোখ বোলাল। ভবিষ্যতে কীভাবে শোধ করবে না ভেবেই, গুচ্ছের জিনিস কম্বো প্যাকে কিনেছে। কালার টিভি, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন...। একুশ ইঞ্চি টিভিটা বসার ঘরে কোণে দেখেই রাগ হল অরিন্দমের। এইসব ঢাউস জিনিস নিয়ে যাওয়ার ঝক্কি অনেক। শংকরদাকে বলে দেবে এসব কাজ আর পারবে না। এটাই শেষ কাজ। নিজের মনেই বোধহয় বিড়বিড় করে বলছিল—ভাল ধান্দা করেছেন দিদি। এমনিতেই ইলেকট্রনিক্স গুডসের রিসেল ভ্যালু নেই। ফুর্তি হয়ে গিয়েছে। এবার লোনওয়ালা ল্যাঠা সামলাও।[৮০]
>
> উত্তর দেওয়ার আগেই ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন। হাতে একটা ডাফেল ব্যাগ। ওটা পেলাম না। তবে একটা ব্যাগ দিয়েছিল মিউজিক সিস্টেমটার সঙ্গে—খুঁজে পেয়ে গেলাম। এটা নিয়ে যান, এটা তো আর কোনও কাজে লাগবে না।...
>
> মাম মাম, কাকু ওটা কেন নিয়ে যাচ্ছে ?
>
> ওটা আজ খারাপ হয়েছে। কাকু ঠিক করতে নিয়ে যাচ্ছে সোনা।
>
> কাকু ওটা কবে ঠিক করে দেবে?

ওটা সারানো হয়ে গেলেই কাকু দিয়ে যাবে।

তা হলে আমার প্র্যাকটিস?

আমার ওয়াকম্যানটাতে করবে সোনা।

তুমি কিচ্ছু জানো না। ওয়াকম্যানে সিডি চলে নাকি?

গলাটা কেমন শুকনো লাগছে অরিন্দমের।

কাকু একটু দেখে নিয়ো, সারানো হয়ে গেলে নাচের বোলগুলো যেন ঠিক বাজে। সিডিটা দেব তোমায়?...

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন অরিন্দমকে।

ম্যাম একটা কথা বলব আপনাকে?

সিমপ্যাথি দেখাবেন তো? বলবেন আজ যাজ্ঞসেনীর জন্য মিউজিক সিস্টেমটা রেখে যাচ্ছেন, তার বদলে টিভিটা নিয়ে যাবেন। তারপর দেখবেন টিভিতে কার্টুন চলছে, তখন বলবেন ফ্রিজটা, ফ্রিজ খুলে দেখবেন যাজ্ঞসেনীর দুধ আছে...আপনি বোধহয় এই কাজে খুব নতুন, তাই ফুর্তির উলটো পিঠটা এখনও দেখতে পান।[৮১]

এ গল্পে যান্ত্রিক সভ্যতা কিংবা যান্ত্রিকতা অথবা বিশ্বায়িত প্রযুক্তির পৃথিবী হেরে গিয়ে তার অন্তরাল থেকে প্রকৃত মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটে। গল্পের শেষে তাই দেখা যায় লোন রিকভারি এজেন্টের কাঠিন্যের অন্তরাল থেকে মানুষ অরিন্দম প্রকাশিত হয়। যন্ত্রের উচ্চারিত নাচের বোলের জায়গা নেয় রক্তমাংসের মানুষ, একটি সম্পূর্ণ মন নিয়ে।

যে সময় এবং যে জনসমষ্টিকে নিয়ে লেখক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৬৪) লেখেন, সেই সময়ের সেই জনসমষ্টির দৈনন্দিনতা জুড়ে থাকে প্রযুক্তি, বিশেষভাবে বলতে গেলে তথ্য-প্রযুক্তি। তাঁর লেখার অনেকখানি অংশ জুড়ে উপস্থিত থাকে বিশ্বায়িত সময় এবং তরুণ প্রজন্ম। তাদের জীবিকা কিংবা উপার্জনের অথবা চিন্তাভাবনার প্রকাশে যন্ত্রনির্ভর সময়ের একাধিক অনুপুঙ্খ উঠে আসে। এই ধরনের একটি ছোটোগল্প 'উপার্জন' (*উনিশ কুড়ি*, ৪ মার্চ, ২০১১)। এ

গল্পে উঠে আসে তরুণ চাকুরীজীবী অভিমন্যুর কথা, প্রথম মাইনে পাওয়ার উত্তেজনায় সে যখন ভরপুর, হিসাব করে ফেলেছে প্রিয়জনের কার কার জন্য কী কিনবে, তখনই তার কাছ থেকে বিমা কোম্পানির একজন এজেন্ট আসে। এজেন্ট দোয়েল রায় তরুণী এবং অভিমন্যুরই সমবয়সী। তার প্রস্তাবিত বিমার প্রিমিয়ামটি অভিমন্যুর প্রথম উপার্জনের প্রায় কাছাকাছি। স্বভাবতই সে রাজি হয় না। প্রত্যাখ্যাত তরুণীটি নিরাশ হয়ে চলে যায়। সারাদিনের শেষে যখন অভিমন্যু তার প্রেমিকার কাছে প্রথম বেতনের উষ্ণতা নিয়ে যাবে, তখনই পুলিশের কাছ থেকে তার ফোনে ফোন আসে। জানা যায় সকালের সেই বিমা কোম্পানির তরুণীটির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তার ফোন থেকে ডায়াল করা নম্বর ঘেঁটে পুলিশ অভিমন্যুকে ফোন করেছে। এ খবরে স্থির থাকতে না পেরে অভিমন্যু হাসপাতালে যায়, দেখা হয় দোয়েলের বাবার সঙ্গে। প্রথম উপার্জনের টাকায় সেদিন আর প্রিয়জনদের জন্য উপহার কেনা হয় না অভিমন্যুর। সে প্রায় পুরো টাকাটা হসপিট্যালে জমা করে দিয়ে আসে দোয়েলের চিকিৎসার জন্য। এ গল্পে কর্পোরেট অর্থনীতির একাধিক অনুপুঙ্খ তুলে ধরলেও শেষপর্যন্ত মানবিক চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তারই অবসরে এ গল্পের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তথ্য-প্রযুক্তির একাধিক উপস্থিতি—

> নেট ব্যাঙ্কিং অ্যাকাউন্টে এই নিয়ে তিনবার লগ ইন করল অভিমন্যু। নাহ, এখনও আসেনি। জীবনের প্রথম উপার্জনের টাকাটা আজ, অর্থাৎ মাসের শেষ দিনেই জমা পড়ার কথা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। এই উত্তেজনাটাই অন্যরকম। তবে অফিসে বসে বারবার অ্যাকাউন্ট চেক করার কাজটা অন্যদের চোখ বাঁচিয়েই করতে হচ্ছে। নতুন অফিসে মাত্র এক মাস কাজ করার অভিজ্ঞতা তার। এই ব্যস্ত অফিসে অভিমন্যুই সবচেয়ে জুনিয়র অফিসার। মাইনেটা জমা পড়ল কিনা থেকে থেকে এভাবে দেখলে অন্যরা হয়তো হ্যাংলা ভাববে। ...

বিপ... বিপ... অভিমন্যুর ফোনে একটা এসএমএস এল। মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে এসএমএস-টা পড়তেই অভিমন্যুর মনটা ভরে গেল। ব্যাঙ্ক থেকে এসএমএস। “ইয়োর অ্যাকাউন্ট ইজ ক্রেডিটেড ফর রুপিজ ৩৭৬৪২...”

আপাতত আর কোনও কাজ নেই। তাই সময় যেন আর কাটতে চাইছে না। অহেতুক নেট ব্যাঙ্কিং অ্যাকাউন্টটা আর একবার লগ ইন করে পরম তৃপ্তিতে ৩৭,৬৪২ টাকার অঙ্কটা নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখল অভিমন্যু...

বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল অভিমন্যু। মনটা হালকা করতে একটু আড্ডা মারার দরকার। তারপর ল্যাপটপটা খুলে নেট কানেক্ট করে ইতস্তত খানিকক্ষণ ফেসবুক করেও মনের গুমোট ভাবটা কাটাতে পারল না। ভারী চোখে ল্যাপটপ বন্ধ করার আগে মেলবক্সের ড্রাফটে থাকা বাবা-মাকে লেখা চিঠিটা অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে পড়ল অভিমন্যু।[৮২]

উল্লেখিত গল্পে দেখা যায়, সকাল থেকে একেবারে ঘুমাতে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের জীবনে ঠিক কতখানি গভীরতায় তথ্যপ্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছে। কর্মে কিংবা মননে, সর্বত্রই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তথ্যপ্রযুক্তি। এই গল্পের অন্দরে সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে বেসরকারি পুঁজির একাধিক প্রসারের দিকসমূহ। তার একদিকে রয়েছে বিমা ক্ষেত্র, অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর চাকরি এবং অন্যদিকে স্বাস্থ্যক্ষেত্র। এ গল্পে তাই হয়তো বিমা কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় দোয়েল রায়কে, যে কিনা তার সংস্থার টার্গেট পূরণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। এরপর তাকে ভর্তি হতে দেখা যায় বেসরকারি হাসপাতালেই। আবার অভিমন্যুর প্রথম পাওয়া বেতনের আনন্দ উদযাপনে তার মনে উঠে আসে রেস্তোরাঁর দৃশ্য। সব মিলিয়ে বলা যায় কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে এইভাবেই উঠে এসেছে পুঁজিনির্ভর এক সময়ের দলিল। তাঁর লেখা এইধরনের আরও কয়েকটি ছোটোগল্প হল ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে’ (*উনিশ কুড়ি,* ১৯ জুলাই, ২০০৮), ‘পাঁচ মিনিট’ (*এবেলা,* ২১ এপ্রিল ২০১৩), ‘পনেরোই সেপ্টেম্বর’

(*আনন্দবাজার পত্রিকা*, শারদীয়া ১৪১৯), 'খেজুরকাঁটা' (*দেশ*, ১৭ মার্চ, ২০০৬), 'ব্রহ্মকমল' (*দেশ*, রহস্যগল্প সংখ্যা, ২ আগস্ট ২০০৬), 'বড়সাহেব' (*দেশ*, ১৭ জানুয়ারি ২০০৭) ইত্যাদি।

৩.১১॥ **সুকান্তি দত্ত**

উদারীকরণ, বিশ্বায়ন এবং তার দ্বারা সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ উৎপাদন ব্যবস্থা তথা সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ধরনের বদল এনেছিল তা এই সময়ে ক্রিয়াশীল যে ছোটোগল্পকারদের লেখায় অবশ্যম্ভাবীভাবে ধরা পড়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুকান্তি দত্ত (জন্ম-১৯৬৫, নিউ ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ)। বিদ্যালয় জীবনেই অবশ্য তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। লেখায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন নয়ের দশকে। সে-পর্যায়ে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় **১৯৯১** সালে। সেই থেকে তিন দশক ধরে নানা পত্রপত্রিকায় লিখেছেন একশো তিরিশটিরও বেশি গল্প, বেশ কয়েকটি উপন্যাস-উপন্যাসিকা ও অন্যান্য গদ্য। চারটি গল্পগ্রন্থসহ উপন্যাস প্রবন্ধ মিলিয়ে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ। সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত 'সোমেন চন্দ স্মারক পুরস্কার', 'নীললোহিত সম্মাননা', 'ভাষা-শহিদ বরকত স্মরণ পুরস্কার'-সহ বিভিন্ন সম্মাননা।[৮৩] তাঁর *শ্রেষ্ঠ গল্প* (জানুয়ারি ২০২০)-এর ভূমিকায় সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায় সার্থকভাবেই বলেন—

> নব্বই দশকে যে তরুণ প্রজন্মের লেখকরা বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অবশ্যই সুকান্তি দত্ত ছিলেন অন্যতম উল্লেখ্য প্রতিশ্রুতিবান।[৮৪]

যে সময়ে লিখতে এলেন এই তরুণ লেখক, সেই সময়টিকেও অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করে সাধন চট্টোপাধ্যায় জানান—

ঊননব্বইতেই সরকারিভাবে সোভিয়েত-এর পতন ঘোষণা, বিশ্বায়ন বা বিশ্বপুঁজির বদলচরিত্রের রূপ কর্পোরেটায়নকে একানব্বইতে আমাদের তৎকালীন সরকারের সিলমোহর, বাবরি মসজিদ ভাঙা, ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান, টেররিজম এবং প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সত্তায় রূপান্তরিত করে দেওয়া, হেডোনিজম বা ভোগ্যসংস্কৃতির রমরমায় দিকে দিকে রব উঠে গেছিল পরিবর্তন এবং উন্নয়ন।

ভাবনার জগতে, তত্ত্বগতভাবে নিত্য নতুন ইউরোপের ঢেউ এসে, আমাদের যা কিছু চিন্তার পুঁজি বাতিল বলে ঠেলে দেওয়া হল। উত্তর আধুনিক, গ্র্যান্ডন্যারেটিভ ভেঙে পড়া, সাবঅলটার্ন চেতনা থেকে লিঙ্গবৈষম্য, সাইবার জগৎ থেকে সত্য উৎপাদন, এন জি ও, পরিবেশ আন্দোলন—পৃথিবী যেন রেনেসাঁ পরবর্তী জগতের ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দর্শনগত নানা খণ্ড খণ্ড সত্যের সন্ধানে ছুটল। কোথাও কোনো অমোঘতা নেই; পৃথিবী এসে দাঁড়াল এক দর্শনগত সংকটের মুখে।

সুকান্তি বা নব্বই দশকের সচেতন লেখকদের প্রজন্ম এমনই প্রেক্ষিতে সাহিত্যচর্চা করতে এসেছিলেন।[৮৫]

তিন দশক ধরে প্রকাশিত গল্পের মধ্যে ১৯৯৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে লিখিত তেইশটি গল্পকে নির্বাচন করে প্রকাশিত হয়েছে সুকান্তি দত্তের *শ্রেষ্ঠ গল্প* (অভিযান, জানুয়ারি ২০২০)। তাঁর এই তেইশটি গল্পের বেশিরভাগেরই অন্যতম বিষয় কিংবা চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন ও তার বাজার অর্থনীতি। লেখকের কলমে গল্পগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা নয়, বিশ্বায়ন কিংবা বাজার অর্থনীতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় কেমন চেহারা নেয়, তাঁর এই ছোটোগল্পগুলি পাঠকের সামনে তা তুলে ধরে সুনিপুণ ভঙ্গীতে। গল্পের বিষয় কিংবা অনুষঙ্গে অবধারিতভাবে এসে যায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও বিবর্তন, বিশ্বায়ন বনাম ব্যক্তির মননের বিরোধ তথা অসহায়তা, শ্রমিকের ক্ষুধা আর ক্ষুধাকে কেন্দ্র করে ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা পুঁজিমালিকের ভাবনাগত অবস্থান, পাশাপাশি এক একটি গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে বিশ্বায়িত এই দুনিয়ায় ব্যক্তি ও পরিবার সম্পর্কের বদলসমূহ।

গল্পে জায়গা করে নেয় বদলে যাওয়া অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং তার সাপেক্ষে মানুষের অবস্থান। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মানুষের কাছে এই সময় ও প্রতিবেশ কেমন ভূমিকা নিয়েছে, তা গল্পের কাহিনিসূত্রে চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন। আর এই নির্মাণের অবসরে তাঁর কলম ছোটোগল্পে সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে লেখকের নিজস্ব পাঠজগতের বহু অভিজ্ঞতাকে। তাই তাঁর ছোটোগল্পে পাঠক আবিষ্কার করে নেন রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন কিংবা জীবনানন্দ দাশ পাঠের গভীর উপলব্ধি কোথাও কোথাও চেতনার প্রকাশে লীন হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বায়ন শুধু যে তাঁর ছোটোগল্পে চালিকাশক্তি হয়ে উঠে ব্যক্তি কিংবা সমষ্টিমননকে নিজ অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে এমনটা একমাত্রিকভাবে সত্য হয়ে ওঠেনি; বরং তাঁর এই তেইশটি ছোটোগল্পের অন্তত বেশ কয়েকটিতে বিশ্বায়নের স্রোতের নীরব কিংবা সরব বিরোধিতায় উজ্জ্বল একাধিক চরিত্রের দেখা পান পাঠক। ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাতের অন্তরালে লেখকের রাজনৈতিক চিন্তাধারাটিকেও পাঠক আবিষ্কার করে নিতে পারেন পাঠ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এই ক্ষেত্রে লেখক তাঁর রাজনৈতিক আদর্শকে প্রশ্নহীনভাবে তুলে ধরেন নি; বরং একাধিক ছোটোগল্পে রাজনৈতিক আদর্শ কীভাবে ব্যক্তি এবং পুঁজির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার পরিপন্থী ভূমিকা পালন করেছে, তা দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন। উদার অর্থনীতির প্রসার বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানকেও অনুকূলে আনতে পেরেছিল, যার ফল সাধারণ মানুষের পক্ষে ভালো হয় নি। এই সমস্ত ধরনের প্রবণতাকে আমরা দেখার চেষ্টা করব তাঁর *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এ প্রকাশিত গল্পসমূহের নিরিখে।

যে তিন দশকের মানবমন ও অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় বিবর্তনকে তাঁর ছোটোগল্পে লেখক আত্তীকৃত করেছেন, তার একাধিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে বিষয়টির অগ্রগতি মানুষকে পূর্বতন দশকগুলি থেকে আলাদা করে দিয়েছিল তা হল প্রযুক্তি, বিশেষভাবে

তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার। একাধিক ছোটোগল্পে মানুষের সুখ থেকে শোক পর্যন্ত প্রযুক্তি কীভাবে জড়িয়ে থাকে তার বিবরণ অনায়াস দক্ষতায় তুলে ধরেছেন লেখক। সেইরকমই একটি ছোটোগল্প 'পর্নোগ্রাফির দিনরাত'।এই ছোটোগল্প এক সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে 'পর্নোগ্রাফি' শব্দটিকে পাঠকের মননে হাজির করে। পাঠক উপলব্ধি করেন মনহীন শরীরের সাধনা ব্যক্তি মানুষকে সম্পর্কসমূহ থেকে দূরে নিয়ে যায়। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ্যপণ্যের দিকে ধাবিত হওয়ার অবকাশে নারী পুরুষ হারিয়ে ফেলে সম্পর্কের অন্তর্লীন প্রেমকে। আর সেই প্রেমহীন দাম্পত্যকে পর্নোগ্রাফি ছাড়া আর কিই বা মনে করা যায় ? সম্পর্কের যে নৌকায় বহুদূর পাড়ি জমানোর অঙ্গীকার নিয়ে একটি দম্পতির যাত্রা শুরু হয়েছিল, প্রেমহীন সেই দাম্পত্যের ফাটল দিয়ে হু হু করে প্রবেশ করতে থাকে ব্যভিচার আর তার বাহক হয়ে ওঠে তথ্য-প্রযুক্তির স্রোত--

> বাংলা পর্নোগ্রাফির সিডির প্রিন্ট সাধারণত ভালো হয় না। অস্পষ্ট, ক্যামেরার ঝাঁকানি, কখনও বা আলো কম। এটা কিন্তু বেশ ঝকঝকে। বাবুরাম ভক্ত, অফিসে কম্পিউটার ও তা সম্পর্কিত সব কিছুর সাপ্লায়ার, সিডিটা হাতে দিয়ে বলেছিল—আজ রাতে দেখবেন স্যার, একদম ফাটাফাটি।[৮৬]
>
> ...ইন্টারনেট-তরঙ্গ বেয়ে যজ্ঞের রথ ছুটে চলে, ডলারের থলি হাতে উন্নয়নের খই ছুড়ে দিয়ে সে ছুটে চলে দুদ্দাড়, শুনতে পাও কি তুমি? সময়ের আগ্নেয়গিরি থেকে ধেয়ে আসা লাভাস্রোত আমোদ-সংস্কৃতির পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে তোমায়।[৮৭]

'হত্যাকাণ্ডের আনুপূর্ব' একটি বহুমাত্রিক গল্প। বিশ্বায়নের প্রভাবে বদলে যাওয়া মূল্যবোধ, বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে প্রতিকার না চেয়ে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ভগ্নীপতির সঙ্গে টাকার বিনিময়ে রফা করে নেওয়া দাদা কিংবা পুরুষতন্ত্রকে অন্তরে বহন করে চলা আধুনিক বৌদি কর্তৃক মৃত্যুকে পুঁজি করে সুবিধা আদায়ের কাহিনির পাশাপাশি এই গল্পের শুরুতেই অবধারিত স্বাভাবিকতায় জায়গা করে নেয় তথ্যপ্রযুক্তি—

> ইলেকট্রিক-চুল্লির গনগনে গর্তে বডি ঠেসে দেওয়ার ঠিক আগ-মুহূর্তে সেলফোনে কল। হাই-ভল্যুম রিংটোনে জনপ্রিয় চটুল সুর। যদিও কোনো কান্না হা-হুতাশের চিহ্ন নেই চারপাশে, তবু বোনের শরীরটুকু চিরতরে পৃথিবী থেকে মুছে যেতে বসার আগ-মুহূর্ত, কার কল না দেখেই কেটে দেয় প্রলয়।[৮৮]

লক্ষণীয়, “হাই-ভল্যুম রিংটোনে জনপ্রিয় চটুল সুর” বাক্যবন্ধের মাধ্যমে সেলফোনের মালিকের চরিত্রটি সম্পর্কে পাঠককে নির্ভুল ধারণায় পৌঁছে দেন লেখক। এখানে গল্পের চরিত্রের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে তারই ব্যবহৃত সেলফোনের রিংটোন। ‘রাজগিরের চিঠি’ গল্পের চরিত্র আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত জিনিসের তালিকাতেও তথ্যপ্রযুক্তির ছাপ লক্ষণীয়—সে কাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে ল্যাপটপ কিংবা ই-বুক। তবে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাধিক প্রভাব দেখা গিয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের শেষতম ছোটোগল্প ‘গল্প@ফেসবুক’-এ গল্পের নামকরণ থেকে চরিত্র কিংবা তাদের জীবনযাত্রা—সবক্ষেত্রেই পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ফেসবুক ইত্যাদির ব্যবহার। এই সময়ের পাঠকও এতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন যে, খুবই স্বাভাবিকতার সঙ্গে এ গল্প পাঠকসমাজে গৃহীত হচ্ছে। যদিও প্রশ্ন থেকে যায় যে, দেশের কত শতাংশ মানুষই বা এই জগতের সঙ্গে পরিচিত তা নিয়ে। তাঁরা কি নাগরিক সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের মতো দক্ষ মননের স্বাভাবিকতায় এ গল্প পড়তে পারবেন? এ প্রশ্ন সত্ত্বেও আমরা আবিষ্কার করে নিতে পারি যে, আজকের দিনের টেকস্যাভি লেখক বইয়ের কিংবা পত্রিকার পাতার বদলে সামাজিক মাধ্যমে যখন লেখেন, তখন পাঠকরুচি কেমনভাবে তার মতামত ব্যক্ত করে। কিংবা সেই পাঠকরুচি গতানুগতিকের বাইরে অন্য কোনও গন্তব্যে অগ্রসর হওয়া লেখককে কী ধরনের সমালোচনা করে। আর এই সব কিছু নিয়েই গড়ে ওঠে আর একটি গল্প। সেখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তথ্যপ্রযুক্তি ও সেই সংক্রান্ত পরিভাষা—

স্মার্টফোনের গ্যালারি ঘেঁটে ফোটোগুলো দেখছিল সৌরভ। ফোনটা বছরখানেক আগে কেনা, খুব বেশি দামি নয়, কিন্তু ক্যামেরাটা বেশ ভালো, চমৎকার ফোটো ওঠে। তারিখ ধরে ধরে পেছিয়ে যেতে যেতে আঠারোই মার্চের তোলা ফোটোগুলোর দিকে চোখ আটকে গেল তার।[৮৯]

কিংবা—

কম্পিউটারে এসে ফের কি-বোর্ডে সচল হয়ে উঠল আঙুল, টাইপ-এডিট-টাইপ, একটানা চলল রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। কাল রবিবার, সুতরাং নিশ্চিন্ত। লগ অন করল ফেসবুকে, আরও অনেকগুলি লাইক পড়েছে পোস্টটায়। সদ্য শেষ করা গল্পটিতে ফের চোখ বুলিয়ে নিয়ে আপলোড করে নতুন একটা পোস্ট দিয়ে অপেক্ষা করে কয়েক মিনিট। না কোনো লাইক কমেন্ট নেই, এত রাতে কে আর জেগে আছে, লগ আউট করে শুতে চলে যায়।[৯০]

সুকান্তি দত্তের *শ্রেষ্ঠ গল্প* তেইশটি গল্পের সংকলন হলেও প্রতিটি গল্পই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। তা সে গল্পের কথনবৈশিষ্ট্য নিয়েই হোক কিংবা একাধিক গল্পে জাদু বাস্তবতার প্রভাব বিষয়কই হোক। গল্পগুলির মধ্যে অন্তর্লীন রাজনীতি কিংবা গল্পকারের রাজনৈতিক বীক্ষাও আলোচ্য হয়ে উঠতে পারে অনায়াসেই। তবু বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়পর্বে কেমনভাবে সমাজ তথা ব্যক্তিমানসে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল তা যে অনবদ্যভাবে লেখকের কলমের মাধ্যমে ছোটোগল্পের জগতে স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে সেই প্রমাণই ধারণ করে গল্পগুলি স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

৩.১২॥ **তিলোত্তমা মজুমদার**

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে যে গল্পকাররা তাঁদের ছোটোগল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার কিংবা প্রভাবকে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিলোত্তমা মজুমদার। লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদারের জন্ম ১১ জানুয়ারি, ১৯৬৬, উত্তরবঙ্গে। কালচিনি চা-বাগানে ইউনিয়ন একাডেমি স্কুলে পড়াশোনা।

পড়েছেন আলিপুরদুয়ার কলেজ এবং স্কটিশচার্চ কলেজে। ১৯৯৩ সাল থেকে লিখছেন তিনি। আনন্দ পাবলিশার্সে সম্পাদনাকর্মের সঙ্গে যুক্ত। ভালবাসেন গান ও ভ্রমণ। ‘বসুধারা’ উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। ‘একতারা’-র জন্য পেয়েছেন ‘ডেটল-আনন্দবাজার পত্রিকা শারদ অর্ঘ্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পুরস্কার’, ‘রাজপাট’ উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন কেরলের ‘কাকানাডন সাহিত্য পুরস্কার’। এ ছাড়াও ভাগলপুরের ‘শরৎস্মৃতি পুরস্কার’, ‘শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কার’, ‘খোঁজ সাহিত্য পুরস্কার’, ‘প্রতিভা বসু শতবর্ষ স্মারক সম্মান’ এবং ‘মতি নন্দী সাহিত্য পুরস্কার’। তিনি ২০১৭-তে অংশ নিয়েছেন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ তম আন্তর্জাতিক সাহিত্য কর্মশালায়।[৯১]

তিলোত্তমা মজুমদারের লেখা ছোটোগল্পের সংখ্যা দেড়শোর বেশি। এর অনেকগুলিই রয়েছে তাঁর পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ *ঋ* এবং *পঞ্চাশটি গল্প* গ্রন্থে। যৌথ পরিবার, হোস্টেল জীবন, প্রেম, রাজনীতি—এ সবই হাজির হয়েছে তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটোগল্পে। তাঁর *গল্প সংগ্রহ* (আনন্দ, ২০২০)-এর মধ্যে সংকলিত হয়েছে ২০০৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত লেখা এবং ইতোপূর্বে অপ্রকাশিত কয়েকটি ছোটোগল্প।

তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটোগল্প তার ভাবনা, নির্মাণ কিংবা প্রকাশভঙ্গিতে তাঁর সমকালীন গল্পকারদের ছোটোগল্প থেকে অনেকটাই আলাদা। তাঁর লেখা ছোটোগল্পের অনেকগুলিই নাতিদীর্ঘ, অনেকগুলিই আবার অতিদীর্ঘ। তবে শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যের বিচারেই নয়, গল্পের রসের বিচারে সেগুলি সার্থক ছোটোগল্পে যে উত্তীর্ণ হয়েছে, সে কথা আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে না।

কথাসাহিত্যের পথে তিলোত্তমার যাত্রা-সূচনার সময়কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ১৯৯৬ সালকে। ততদিনে ভারতে মুক্ত অর্থনীতি বয়সগত বিচারে শৈশব থেকে বাল্যদশা প্রাপ্ত

হয়েছে। তার প্রভাবের একাধিক দিক তখন পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে। তিলোত্তমার কথা-যাত্রার অগ্রগতিতে তাই এই সময়ের প্রভাব খুঁজে পাওয়া স্বাভাবিক। তবু বলা যায় হয়তো খানিকটা সচেতনভাবেই লেখিকা এড়াতে চেয়েছেন বিশ্বায়নের নাগরিক প্রভাবসমূহকে। তবু সম্পূর্ণত তা এড়ানো অসম্ভব, তাই লেখিকার বেশ কয়েকটি গল্পে খুঁজে পাওয়া যায় বিশ্বায়নের একাধিক সময়চিহ্নকে। তাই পাঠক আবিষ্কার করেন তিলোত্তমার গল্পে বিশ্বায়নের পণ্যভুবন সার্বিকভাবে প্রবল প্রতিস্পর্ধায় উপস্থিত না হলেও সময়নির্ভর প্রযুক্তির জগতটি তাঁর গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষের একাকীত্ব কাটাতে, কিংবা বিপরীতভাবে দেখলে বলা যেতে পারে মানুষের একাকীত্ব আরও বাড়াতে দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়েছে প্রযুক্তির জগত।

তিলোত্তমার গল্প লিখতে শুরু করার একেবারে প্রথম দিকে ১৯৯৮ সালে একটি ছোটোগল্প রচনা করেন। গল্পের নাম 'অমরাবতী ও সেরা পুতুলের গল্প'। বিশ্বায়ন এবং বিশ্বায়নপরবর্তী প্রযুক্তিনির্ভর সময়ের প্রতি এ গল্প একরকম প্রতিবাদ তৈরি করেছে। কিছুটা রূপকথার ঢঙে নির্মিত এ গল্প মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প রচনার প্রথম পর্বের 'একটা আষাঢ়ে গল্প'-এর কথা। তিলোত্তমার গল্পে 'সুখশহর' নামে এক কাল্পনিক শহরের কথা উঠে আসে, যেখানে সব কিছুই সুন্দর, নিখুঁত এবং আরামপ্রদ। এক দক্ষ কারিগর সেই শহরে একটি পুতুলের দোকান খোলে। সেখানে পাওয়া যেতে থাকে বারো ঘণ্টার জন্য পুরুষদের যৌনতার সঙ্গী হয়ে উঠবে এমন সব মেয়ে পুতুল। এ গল্পে সমস্ত কাল্পনিক সৌন্দর্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে যান্ত্রিকতা—

> সারা শহরের মধ্যে একমাত্র কারিগরেরই কোনও সুখ নেই। এতসব নিটোল পুতুল তৈরি করেও তার তৃপ্তি নেই। সারা দিনরাত নাওয়া নেই, খাওয়া নেই সে কাজ করছে রসায়নাগারে। এই শহরের পক্ষে বেমানান পোশাক পরে, চুলদাড়িতে পারিপাট্য না এনে সে নাড়ছে, ঘাঁটছে কিউপ্রিক অক্সাইড, সোডিয়াম অকজালেট, রেডিয়াম, জটিল প্রোটিন ও কার্বন পলিমার। রামধনু থেকে সে সংগ্রহ করছে বিন্দু বিন্দু

ফোটন আর বসিয়ে দিচ্ছে নতুন নতুন পুতুলের এখানে ওখানে। তৈরি হচ্ছে সুন্দরীতমা পুতুলনারী। বার বার সৌন্দর্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি ভেঙে তৈরি হচ্ছে দোকানের বৈভব।[৬২]

এ গল্পের কারিগর প্রকৃতপক্ষে পুঁজির মালিক, পুতুলগুলি তার পণ্য, যুবকরা উপভোক্তা। লেখিকা চোখে আঙুল দিয়ে এ গল্পের মাধ্যমে দেখিয়ে দেন, বিশ্বায়নের প্রযুক্তিনির্ভর পণ্যের পৃথিবীতে উপভোক্তা পুরুষ জাতি, নারী সেখানে পণ্য। এ গল্পের শেষে এক যান্ত্রিক 'পুতুল' নারীর মধ্যে স্বাধীন অনুভূতি প্রকাশিত হয়। লেখিকা দেখান যান্ত্রিকতার পণ্যের পৃথিবীতে স্বাধীন অনুভূতি কিংবা ইচ্ছেরা বেশ বিপদজনক, কাজেই সেই পুতুল নারীটিকে মাটিতে আছড়ে ফেলা হয় ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে। তবু গল্পের শেষে লেখিকা জাগিয়ে রাখেন আশাবাদ—সে পুতুল নারী ধ্বংস হয় না, তার থেকে বেরিয়ে আসে করুণ, মধুর এক অন্যরকম স্বর, যা গড় পুতুলদের থেকে আলাদা। রূপকথার ঢঙে লেখা এই গল্পে যান্ত্রিকতার বিশ্বায়িত পৃথিবীতে যান্ত্রিকতাকে অতিক্রম করে প্রাণের সঞ্চার দেখাতে চেয়েছেন লেখিকা।

'অনুচ্চারিত' (জুন, ২০০৭) ছোটোগল্পটিতে উঠে আসে মা আর দুই মেয়ের কাহিনি। এ গল্পে তাদের পিতা অনুপস্থিত, আর সেজন্য কন্যারা দায়ী করে মা-কে। এই দায়ী করার উত্তরাধিকার তারা পেয়েছে পরিবার এবং ঠাকুরমায়ের থেকে। মায়ের শাসন তারা মেনে নিতে পারে না। এই প্রবণতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে শেষে একদিন মাকে আঘাত করে বসে বড়ো মেয়েটি। প্রবল রক্তপাতের মুহূর্তে মায়ের কাছ থেকে তারা জানতে পারে আসল সত্য—তাদের বাবা অন্য জায়গায় বিবাহ করে সংসার পেতেছে, যে খবর এতদিন মা তাদের থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কারণ পলাতক লোকটিকে তিনি এখনও ভালোবাসেন। এইরকম একটি গল্পের অনুপুঙ্খে একাধিকবার উঠে আসে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, খানিকটা সময়চিহ্নের মতো। যেমন—

...গান বেজে চলেছে। 'জিন্দেগি কি সফর মে গুজর যাতে হ্যায় যো মোকাম/ ও ফির নেহি আতে...!' সে পুরো ফিল্ম দেখতে পায়নি। কিন্তু গানটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। গুগল করে পড়ে ফেলেছে পুরো গান।–[৯৩]

"সোনা সেলফোন নিয়ে ছুটছে—অ্যাম্বুলেন্স! একটা অ্যাম্বুলেন্স!"[৯৪]

লেখিকার 'শোকসন্তাপ' (২০১২) ছোটোগল্পটি প্রকাশিত হয় আমেরিকার *দুকূল* পত্রিকায়। এ গল্পে উঠে আসে চাকরিজীবী দম্পতি আরতি ও সুখময়ের কলেজপড়া মেয়ে একমাত্র সন্তান মৌটুসীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুখময়ের পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ার ঘটনার কথা। প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক উঠে আসে এ গল্পে। এরপর সন্তানহারা এই দম্পতি একাকীত্ব ভুলতে ধীরে ধীরে প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ে। টিভি চ্যানেলের রিয়্যালিটি শো-তে আসক্ত হয়ে একসময় সন্তানশোককে তুলে ধরতে সেই শো'তে অংশগ্রহণ করে আরতি। স্বামীকেও বাধ্য করে টিভি-ক্যামেরার সামনে তাদের সন্তানশোককে প্রকাশ করতে। আর এভাবেই এ গল্পের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় তথ্যপ্রযুক্তি কিংবা বিনোদনের জগতটি—

টেলিভিশনটাই এখন আরতির সবসময়ের সঙ্গী। তার একটিমাত্র মেয়ে, যে থেকেও নেই। উনিশ বছর বয়সে একদিন হঠাৎ সে আর কলেজ থেকে ফিরল না।[৯৫]

শুয়ে-বসে টিভি দেখতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য টিভিটা বসার ঘর থেকে এনে শোবার ঘরে রেখেছে আরতি।...

টিভি দেখার ব্যাপারে অন্তত ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে সমঝোতা চলে না। থাকা, খাওয়া ফিল্ম দেখা, এমনকী পর্যটনের স্থান নির্বাচন বিষয়েও একরকম বোঝাপড়া করে নেওয়া যায়। কিন্তু দৈনন্দিন টিভি দেখার বিষয়ে? অসম্ভব। তাই আরতি আরেকটি টিভি কিনে ফেলল। আগেরটি ছিল মাঝারি রকম, এইটি বেশ বড় পর্দার। ঝকঝকে ছবি। নির্ভেজাল রং। পোশাক আশাক বাদ দিলে সংসারে এই প্রথম একটি জিনিস এল যা সম্পূর্ণভাবে আরতির নিজস্ব।...[৯৬]

> বুম আর ক্যামেরার প্যাঁটরা নিয়ে দু'জন ঢুকল। দ্রুত হাতে ক্যামেরা তৈরি করে বুম ধরল আরতির মুখের কাছে। হা হা করে কেঁদে বিলাপ শুরু করল আরতি।...হঠাৎ ক্যামেরাম্যান বলল, 'এক মিনিট, এক মিনিট। একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে।'...
>
> হাত-পা হিম হয়ে এল সুখময়ের। ওরা হয়তো এরপর তার কাছে আসবে। একজন কন্যাশোকাতুর পক্ষাঘাতগ্রস্ত পিতার ভূমিকায় তাকে অভিনয় করতে হবে। নিজের ভূমিকায় অভিনয় করা কত কঠিন, ভেবে তার ভয় করতে লাগল। তার তো কান্না পাচ্ছে না। একটুও পাচ্ছে না। সে কী করে এখন?[৯৭]

একসময় মানুষের বিনোদন ছিল আসরকেন্দ্রিক। প্রযুক্তিকেও মানুষ সেইভাবেই আসরের মধ্যে গ্রহণ করেছিল। সেইকারণেই রেডিও কিংবা টেলিভিশন দেখা হত অনেকে মিলে। প্রযুক্তির সহজলভ্যতা সামূহিক পরিসরকে আরও বেশি ব্যক্তিগত করে তুলেছে। এ গল্প তাই দেখিয়ে দেয় যে, বাড়িতে দু'জন মানুষের জন্যও আলাদা আলাদা টিভির প্রয়োজন হয়। রুচির ভিন্নতা দুটি মানুষকেও পৃথক করে ফেলে। অন্যদিকে এ গল্পে প্রযুক্তিনির্ভর জগতটি সন্তানশোককে হারিয়ে দিয়ে প্রাধান্যলাভ করে। যে দুঃখ ছিল একান্তই ব্যক্তিগত, তা হয়ে ওঠে পণ্য। এভাবেই তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটোগল্পের জগতটি বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তির একাধিক প্রভাবকে তুলে ধরেছে বারে বারে।

৩.১৩॥ **তৃষ্ণা বসাক**

তৃষ্ণা বসাক (জন্ম-১৯৭০) এই সময়ের বাংলা ছোটোগল্পের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখিকা। শুধুমাত্র ছোটোগল্পই নয়, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, কল্পবিজ্ঞান রচনা ছাড়াও মৈথিলি অনুবাদকর্মে তিনি প্রতিমুহূর্তে পাঠকের সামনে খুলে দিচ্ছেন অনাস্বাদিত জগৎ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.

ই. এবং এম. টেক. তৃষ্ণা বসাকের কর্মজগতটিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সরকারি মুদ্রণসংস্থায় প্রশাসনিক পদ, উপদেষ্টাবৃত্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শী অধ্যাপনা, সাহিত্য আকাদেমিতে আঞ্চলিক ভাষায় অভিধান প্রকল্পের দায়িত্বভার প্রভৃতি বিচিত্র কর্ম অভিজ্ঞতা তাঁর লেখনীকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।[৯৮] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত নবীন এই লেখিকার ছোটোগল্পে অবশ্যম্ভাবী ভাবে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের প্রভাব। তাঁর ছোটোগল্পের বিষয় এবং শিরোনামে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রযুক্তির প্রভাব। এইরকমই কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'বার্তা', 'আউট অফ রিচ', 'বিপন্নভাষ', 'পূর্ণ', 'ভার্চুয়াল মূর্ছনা' ইত্যাদি। গল্পগুলির নামকরণ থেকেই প্রযুক্তির আভাষ পাওয়া যেতে থাকে। 'বার্তা' (*আলো*, মে ২০০৯) গল্পটিতে দেখা যায় একটি মোবাইল চুরিকে কেন্দ্র করে জি.আর.পি থানায় অভিযোগ জানাতে যাওয়া একজন মহিলা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যান। সম্পূর্ণ গল্পটিই *মহাভারতের* ভাষা ও বর্ণনারীতিতে তুলে ধরা হলেও প্রযুক্তিসংক্রান্ত শব্দগুলি পাঠককে বর্তমান সময়ে এনে দাঁড় করায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় হাস্যরস—

> অনন্তর যক্ষ বললেন, 'আশ্চর্য কী? বার্তাই বা কী?'
>
> সে উত্তর দিল। 'প্রতিদিন হাজার হাজার মোবাইল চুরি হয়, তবুও লোকে পাবার আশায় এফ আই আর করে—এর চেয়ে আশ্চর্যের কী আছে?'
>
> 'মোবাইল কখনো চুরি যায় না, হারিয়ে যায় মাত্র, আর হারানো মোবাইলের চেয়ে বিপজ্জনক কিছু নেই—এটাই বার্তা।'[৯৯]

'আউট অফ রিচ' (*আমার সময় ১৫ মিনিট*, ২০০৯) গল্পটির নামকরণ থেকেই তথ্যপ্রযুক্তির যোগটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই শব্দবন্ধই মোবাইল প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত। গল্পের শরীরে ছড়িয়ে থাকে নেটওয়ার্ক, অ্যানালগ, ডিজিট্যাল, চার্জার, প্লাগপয়েন্ট প্রভৃতি শব্দ—

নেটওয়ার্ক ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। কথা কেটে কেটে যায়। কথা কেটে বসে। তিনটে থেকে দুটো, দুটো থেকে একটা বার থাকে। অ্যানালগ চক্র ভাঙা ডিজিটাল সংকেত একমুখী তিরের মতো, কখনোই উৎসে ফেরে না। আর এইসব ঘটে চলে মেয়েটির মাথার ওপর।... ফোন চার্জ করতে আসতেই থাকে মায়া ললিতা, মায়া বিশাখা।[১০০]

'বিপন্নভাষ' (*ছায়াযাপন*, ২০০৯) ছোটোগল্পটি একইসঙ্গে বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তি উভয়কেই করে তুলেছে তার উপজীব্য। দুটি নারীর গল্প উঠে এসেছে এখানে। একজন উচ্চশিক্ষিতা, প্রযুক্তিনির্ভর। অপরজন প্রথাগত শিক্ষার নিরিখে প্রায় অশিক্ষিতা। একজনের প্রযুক্তি নির্ভরতা তাকে যন্ত্রদাসে পরিণত করে তুলেছে। অপরজন জীবিকার তাগিদে পরিচারিকা হলেও তার মধ্যে টিকে রয়েছে মানুষ, রয়েছে মাতৃসুলভ অনুভূতি। শ্রুতি আর তাপসী, দুই নারীর নামকরণ থেকেই তাদের পারিবারিক অর্থনৈতিক স্তরগুলিকে চিনে নেওয়া যায়। শ্রুতি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত। অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত উচ্চকোটির বাসিন্দা। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য নামী হাসপাতালে ভর্তি হলেও তাকে বিশ্রাম নিতে দেখা যায় না। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও হাসপাতালের বিছানায় বসে সে ল্যাপটপে কাজ করেই চলে। অবশেষে সন্তান জন্ম নেওয়ার পরে দেখা যায় এত শিক্ষিতা একজন মা সন্তানের কান্না ভোলানোর জন্য আবোল তাবোল কোনো কথা বা ছড়া বলতে পারে না। যান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন জীবনে যান্ত্রিক দুনিয়ার মা সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে—

শ্রুতি আর তমালের হাতে এতটুকু সময় ছিল না, ওদের দু'জনের ঘরে তৃতীয় কারও জন্যে ছিল না যথেষ্ট পরিসর।

এইভাবেই বিয়ের পর আট বছর কেটে গিয়েছে। ভেবে, পিছিয়ে, আবার ভেবে। ...

> তমাল না ফেরা পর্যন্ত সারাদিন সে ইন্টারনেট সার্ফ করে, সারাক্ষণ তার পাশে পড়ে থাকে পোষা কুকুরের মতো অনুগত মোবাইল ফোন। এমনকী এক এক রাতে ঘুম ভেঙে সে কম্পিউটারে বসে। ...
>
> 'কি হল? এত হাসি কিসের?'
>
> 'দিদির কোলজোড়া ছেলে হবে বলেছি, তাই হাসছে।'
>
> 'কোলজোড়া তো আছেই একটা' বলেই এগিয়ে যান ডাঃ মুখোপাধ্যায়। শ্রুতি বোঝে উনি ল্যাপটপটার কথা বলছেন।
>
> শ্রুতি যেন কোনও দামি গ্যাজেটে হাত দিচ্ছে, এমনভাবে দ্যুতিকে ছোঁয়। তাপসী অবাক হয়ে বলে 'কোলে নাও, নইলে খাওয়াবে কি করে?'[১০১]

একইভাবে 'পূর্ণ' (*ছায়াযাপন*, একুশশতক, ২০০৯) গল্পটির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে বিশ্বায়নের নতুন অর্থনীতির লক্ষণ। কেনাকাটার প্রয়োজন না থাকলেও বিনাকারণে শপিং মলে যাওয়ার অভ্যাস, বিজ্ঞাপনের সংস্কৃতি মানুষকে অন্তহীন ক্রেতায় পরিণত করে তোলে।এই গল্পের মূল চরিত্র রুনুকে এইসব বৈশিষ্ট্যের আধার হিসাবে পাঠক আবিষ্কার করে নিতে পারেন অনায়াসেই। বিশ্বায়িত দুনিয়ার বদলে যাওয়া কর্মসংস্কৃতি তার সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের দাম্পত্যেও প্রভাব ফেলে। এই গল্প শুধুমাত্র স্তন ক্যান্সারের কোনও কাহিনিকে বিবৃত করে না, পরিবার নামক অস্তিত্বটিকেও যেন ক্যান্সারের মতো কেটে বাদ দেয় এই নতুন সময়। তৈরি হয় তিনজন সদস্যের এক একটি ইউনিট। আজকের দিনের পরিবার। আর এইসব মানুষের বেঁচে থাকা আনন্দময় হয় শপিং মলের কেনাকাটায় ছাড় ঘোষণায়।

সোশ্যাল মিডিয়ার ক্রমবিকাশ আর মানুষে মানুষে ভার্চুয়াল যোগাযোগের প্রবণতা বৃদ্ধির সময়টি উঠে আসে 'পিঁপড়ের পায়ের শব্দ' (*নির্বাচিত পঁচিশটি গল্প*, একুশশতক, ২০১৪) গল্পটিতে।

ফেসবুক, অর্কুট, টুইটার, ইমেল আই.ডি. ইত্যাদি শব্দ অত্যন্ত স্বাভাবিকতায় গৃহীত হতে দেখি তৃষ্ণা বসাকের কলমে—

> ফেসবুকে আপনি নেই? অর্কুটে? টুইট করেন না?'
>
> 'আপনি করেন?'
>
> 'নাঃ, আমার ইমেল আইডিই নেই'
>
> 'তাহলে জানতে চাইছেন কেন?'
>
> 'না, আজকাল সবাইকেই তো পাওয়া যায় ফেসবুক, অর্কুটে'।[১০২]

তুলনায় একটু পরে রচিত 'ভার্চুয়াল মূর্ছনা' (*গল্প ৪৯*, কৃতি, ২০১৯) গল্পটিতে দেখা যায় কেমনভাবে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক যন্ত্র কিংবা পরিভাষাগুলি মানুষের দৈনন্দিনতা কিংবা ভালবাসা মন্দবাসার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে আমাদের অজ্ঞাতসারেই। প্রেম কিংবা অপ্রেমের মাধ্যম তথা সঙ্গী হয়ে উঠছে যন্ত্র। মানুষও এভাবেই হয়ে উঠছে যান্ত্রিক--

> তাদের যৌথ জীবন যখন শেষ হয়ে গেল, তখন মোবাইল সবে এসেছে কলকাতায়। কানে ইয়ারপ্লাগ গুঁজে গান শোনার চল হয়নি। আইপড তখন কোথায়? শাড়িটা দেখতে দেখতে তার মনে হল, তাদের সম্পর্কের ইতিহাসের সঙ্গে কলকাতার সংলাপের ইতিহাসও জড়িয়ে আছে কীভাবে যেন। তারা যখন প্রেম করছে, টক-টাইম, টাওয়ার, ছোটা রিচার্জ—এইসব শব্দ কে শুনেছে?...
>
> অনিমেষ চলে যাওয়ার পর তার প্রথম মোবাইল হল। সেসময় তার দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপের প্রয়োজন ছিল।...টাওয়ার পাওয়ার জন্য ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াত।[১০৩]

তৃষ্ণা বসাক তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে এইভাবেই বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তিকে তুলে ধরেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই নবীন প্রজন্মের এই লেখিকা সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত শব্দাবলিকে তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন। প্রজন্মের নিরিখে পরিবর্তিত হয়ে চলা প্রযুক্তির প্রভাব ব্যক্তিমনে কেমন প্রভাব

ফেলেছে তা তাঁর বর্ণনায় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় তাঁর লেখা গল্পের ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে বর্তমানের তরুণ প্রজন্মের ভাষা ব্যবহারের যোগসূত্র স্থাপিত হয় অনায়াসেই।

৩.১৪।। **উল্লাস মল্লিক**

বর্তমান সময়ের এক উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পকার হিসাবে উল্লাস মল্লিককে স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করে নেওয়া যায়। উল্লাস মল্লিকের জন্ম ১৯৭১ সালে হাওড়া জেলায়। বাবা সমরসিংহ মল্লিক, মা গীতা মল্লিক। একটু বড়ো হয়ে সপরিবারে চলে আসেন হাওড়া জেলারই আর এক চমৎকার গ্রাম কেশবপুরে। বাবা ছিলেন সেখানকার বিশিষ্ট শিক্ষক। স্নাতক হবার পর শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। চাকরি ছেড়েছেন; পেশা বদলেছেন। দুষ্টুমির বাল্য কৈশোর, অনিশ্চিত কর্মজীবন, চেনা-অচেনা, ভাল-মন্দ বাছবিচার না করেই মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, অদ্ভুত সব ঘটনা আর স্নিগ্ধ প্রকৃতি তাঁর লেখা জুড়ে। মনে আনন্দ আর রসবোধ নিয়েই বেঁচে থাকতে চান। ২০০০ সালে লেখালিখির শুরু। বিভিন্ন বছরে ‘দেশ’ হাসির গল্প প্রতিযোগিতায় বিজয়ী। তিনি এক ডজন উপন্যাস, দেড়শোর বেশি গল্প আর রম্যরচনা লিখেছেন।[১০৪]

উল্লাস মল্লিকের ছোটোগল্পে বার বার উঠে এসেছে শান্ত মফসসল জীবন। তাঁর কোনো কোনো ছোটোগল্পের মূল চরিত্র কর্পোরেট জগতের উচ্চপদে আসীন থেকেও গ্রাম এবং মৃত্তিকাসংলগ্ন সম্পর্কগুলির জন্য বেদনা এবং আকর্ষণ বোধ করেন। গ্রামের টানে, ফেলে আসা সম্পর্কের টানে তাঁরা ফিরে যান পুরানো মানুষজনদের কাছে। এইরকম একটি ছোটোগল্প হল ‘সুজনপুর’ (সাপ্তাহিক *বর্তমান*, ২০০৩)। এমনকি যে রহস্যগল্প কিংবা ভৌতিক গল্প তিনি লেখেন, তার অন্তরালেও একপ্রকার জীবনচেতনা অন্তঃসলিলা হয়ে থাকে। এইধরনের দুটি ছোটোগল্প হল

‘নিরস্ত্রীকরণ’ (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, রবিবাসরীয়, ২০০৪) এবং ‘হঠাৎ রাতের ফোন’ (*উনিশ-কুড়ি*, ২০০৯)। অন্যদিকে হাসির গল্পেও ছোটোগল্পকার উল্লাস মল্লিক অনাবিল হাস্যরসের আড়ালেও বজায় রাখেন জীবনসম্পর্কে ভিন্ন উপলব্ধি। তাঁর ‘মাৎস্যন্যায়’ (*দেশ*, ২০০৫) ছোটোগল্পটি তারই পরিচয়বাহক।

পূর্বেই বলা হয়েছে উল্লাস মল্লিকের ছোটোগল্পে বারে বারে উঠে এসেছে মফসসল জীবন কিংবা আত্মীয়বৃত্তের লতাপাতার মতো সম্পর্কসূত্রসমূহ, যেগুলির টানে নাগরিক জীবন থেকে কিছু চরিত্র অবসর খুঁজে চলে এসেছে। দেখা যায় লেখক খুব উচ্চকিত স্বরে কথা বলেন না, ঝকঝকে নাগরিক জীবন তাঁর ছোটোগল্পে উঠে এসেছে তুলনায় কম। সেইসূত্রেই দেখা যায়, তাঁর ছোটোগল্পে বিশ্বায়িত সময়ের প্রভাব পড়লেও তা খুব চড়া সুরে কথা বলেনি।

উল্লাস মল্লিক ছোটোগল্পের জগতে পদার্পণ করার পর দুই দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে উঠে এসেছে প্রযুক্তিনির্ভর সময়ের কথা। তবে কোনো কোনো গল্পে প্রযুক্তির দেখা মিললেও তা প্রতিযোগিতাময় কোনো সময়কে তুলে ধরতে প্রয়াসী না হয়ে বরং খুঁজে নিতে চেয়েছে বহুকাল আগের ফেলে আসা সম্পর্কের উষ্ণতা। তাঁর এইরকমই একটি ছোটোগল্প হল ‘ফোনটা বাজছে’ (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, রবিবাসরীয়, ২০০৭)। গল্পের নামকরণেই বিশ্বায়নের ছোঁয়া। কারণ বিশ্বায়নের হাত ধরেই মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল মোবাইল প্রযুক্তি। তবে এ গল্পে লেখক প্রযুক্তির সঙ্গে তারুণ্য কিংবা নাগরিক জীবনকে প্রাধান্য দেননি। বরং তার বিপরীতে হেঁটে তিনি একজন মফসসলের বৃদ্ধা মহিলার হাতে তুলে দিয়েছেন মোবাইল ফোন। সেই সূত্রে তুলে ধরেছেন সামাজিক নিয়মবিধির জালে আবদ্ধ মানুষের জীবনে স্মৃতির প্রতি ব্যাকুলতা। যে স্মৃতি-গন্তব্যে বাস্তবে বৃদ্ধা পৌঁছাতে পারেন না, তবু তাঁর মনোজগৎটি চির

পিপাসিত হয়ে থাকে সেই পরশ পাওয়ার জন্য। এ গল্পে উঠে আসে বৃদ্ধা কালীমতীর কথা। মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁর আর বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকে না। সহজে তাঁর সন্ধান পাওয়ার জন্য বড়ো ছেলে তাঁকে একটি ফোন কিনে দেয়। সেই খবর বৃদ্ধা কালীমতী চিঠি লিখে জানান তাঁর সই 'গঙ্গাজল' উমাশশীকে। উমাশশীর ফোন নেই, তাঁর কাছ থেকে কালীমতী জানতে পারেন বহুযুগ আগে তিনি যাঁকে পছন্দ করতেন, সেই সতীশদার কথা। সতীশের সঙ্গে বিবাহ হয় নি কালীমতীর। যে সংসারে তিনি বিবাহ হয়ে এসেছিলেন, সেখানেও বিধবা হিসাবে অতিক্রম করেছেন বহুদিন। তবু এখনও সতীশের কথা ভাবলে তিনি দ্বিধা এবং লজ্জায় আক্রান্ত হন এই ভেবে যে, তার সঙ্গে কথা বলা যাবে কিনা। এ গল্পের শেষে তাঁর ফোন বেজে উঠতে দেখা যায় গভীর রাতে। সতীশের নম্বর তিনি জানেন না, তবু তাঁর মনে হয় তিনিই হয়তো ফোন করেছেন উমাশশীর কাছে পাঠানো চিঠি থেকে কালীমতীর নম্বর পেয়ে। প্রযুক্তি মানেই তারুণ্য—সাধারণত এই নিরিখেই ভাবনার গতি পরিচালিত হলেও এ গল্পে ভিন্ন এক বাস্তবতায় সেই প্রযুক্তিকেই তুলে ধরেন লেখক—

> তাহার পর লিখি যে, বড় খোকা আমাকে একখানা ফোন কিনিয়া দিয়াছে। তার লাগানো ফোন নয়। মোবাইল ফোন। কী সুন্দর দেখিতে, তোকে কী বলিব! ছোট ছোট বোতাম। অন্ধকার হলে আলো জ্বলে। আমাকে নিয়ে ওদের বড় ভাবনা। বলে, তুমি হুটহাট বেরিয়ে যাও, হেথাসেথা চলে যাও—ফোনটা থাকলে তোমার খোঁজ করতে পারব। আমি এখনও সব বোতাম বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। নাতনিটা দিনরাত আমাকে নিয়ে পড়িয়া আছে। বলিয়াছে, তোমাকে পনেরো দিনের মধ্যে সব শিখিয়ে দেব। তোর কাছে একখানা এমন ফোন থাকিলে বেশ হত। যখন খুশি কথা বলিতে পারিতাম।[১০৫]

উমাশশীকে লেখা কালীমতীর এই চিঠির ভাষা পাঠ করলে সাম্প্রতিককালের প্রযুক্তির সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব বেশ ভালোই অনুমান করে নেওয়া যায়। তবু বিশ্বায়নের বহু পূর্ববর্তী প্রজন্ম প্রযুক্তিকে

কেমনভাবে গ্রহণ করছেন, সেই দিকটিও উঠে আসে এ গল্পে। তবে দেখা যায়, প্রযুক্তি কিন্তু সকলের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি—

> মৌটুসি তাড়া দেয়, কী বলবে তাড়াতাড়ি বল, আমার অনেক কাজ।
>
> কালীমতী বললেন, এই চিঠিটা ডাকে ফেলে দিস।
>
> কাকে দিচ্ছ ? তোমার সেই গঙ্গাজল উমাশশী ঠাকুমা ?
>
> হ্যাঁ। মনে করে দিবি কিন্তু।
>
> সে না হয় দেব। কিন্তু এবার চিঠিফিটি ছাড়। মোবাইল পেয়ে গেছ, আবার চিঠি কেন !
>
> তোমার বান্ধবীর মোবাইল নেই ?
>
> কালীমতী বলেন, তার ভাত-কাপড়ের জোগাড় হয় না তো আবার মোবাইল ![১০৬]

ধীরে ধীরে প্রযুক্তি কীভাবে আপন হয়ে ওঠে, লেখক তা এ গল্পে তুলে ধরেন। মনে রাখা দরকার প্রজন্মভেদে পৃথক পৃথক প্রয়োজনে বা মূল্যবোধে গৃহীত হয়েছিল প্রযুক্তির সাহচর্য। তাই দেখা যায়, নাতনি মৌটুসির মোবাইলের গুরুত্ব কিংবা ব্যবহার কালীমতীর ক্ষেত্রে অনেকাংশেই আলাদা-

> এত দিনে ফোন এলে ধরতে শিখে গেছেন কালীমতী। টুং টাং বাজনা বেজে উঠলে সবুজ বোতামটা টিপে দেন। বাইরে একটু দেরি করলেই কালীমতীর ফোন বেজে ওঠে। 'মা আপনি কোথায়? সেই কখন বেরিয়েছেন!' 'ঠাম্মু তুমি কী করছ? এত দেরি কেন?' কালীমতী ভাবেন, বড় আজব যন্ত্র একটা। চোখের আড়াল হলেও সুতোর বাঁধন ঠিক থেকে যায়।
>
> ফোনটা রাখবেন কোথায় তাই নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছিলেন কালীমতী। প্রথমে ক'দিন আঁচলে বেঁধে রেখেছিলেন। তার পর বড় বউমা ছোট একখানা ব্যাগ কিনে দিয়েছে। ব্যাগটা গলায় ঝুলিয়ে তার মধ্যে ফোনটা রাখেন। কালীমতী বলেন, তোরা আমাকে মহা পাপের ভাগী করলি। এই বয়েসে কোথায় জপের থলি নিয়ে ঘুরব, তা নয়, ম্লেচ্ছ একখানা জিনিস বুকে নিয়ে ঘুরছি।...
>
> মৌটুসি বলে, ঠাম্মু তোমার কী গান পছন্দ?

কেন রে?

তোমার রিং-টোনে সেট করে দেব। কার গান দেব বল, সনু না হিমেশ?

কি মেশ! কালীমতী অবাক হন।

--আচ্ছা ওসব বাদ দাও। রবীন্দ্রসংগীত পছন্দ, না বাংলা আধুনিক?

রিং-টোন ব্যাপারটা বুঝে নিলেন কালীমতী। তারপর বললেন, এই বয়েসে কি আর এসব গান-বাজনা মানায়! তার চেয়ে ওই গানটা দিতে পারিস, ওই যে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে...।'[১০৭]

'হঠাৎ রাতের ফোন' (*উনিশ-কুড়ি*, ২০০৯) গল্পের নামকরণেও প্রযুক্তির ছোঁয়া পাওয়া যায়। এটি একটি ভৌতিক গল্প। প্রেমের গল্পও বটে। তাই ভৌতিক হয়েও এ গল্প ভয়ের আবহ নির্মাণ করে না। অন্যদিকে এ গল্পের সূত্রপাত থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মোবাইল ফোন। বলা যায় গল্পের প্রায় নব্বই শতাংশের বেশি জুড়ে রয়েছে মোবাইলে দুই চরিত্রের কথোপকথন। আর এইভাবেই কথোপকথনের ঢঙে গল্পটি নির্মিত হয়েছে। এ গল্পে মোনালি এবং অভিষেক নামক দুই তরুণ-তরুণীর প্রেম এবং গল্পের সমাপ্তিতে অভিষেকের বিশ্বাসঘাতকতাকে তুলে ধরেছেন লেখক। তৃতীয় একটি চরিত্র এ গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে, লেখক প্রকাশ নামের এই চরিত্রটিকে ভৌতিক চরিত্র হিসাবে তুলে ধরলেও আশ্চর্যজনকভাবে চরিত্রটি মোবাইলের মাধ্যমে কথা বলে। তাই সব মিলিয়ে প্রযুক্তির আধুনিকতা, প্রেম এবং অতিপ্রাকৃতের এক অপূর্ব সহাবস্থান ঘটিয়েছেন লেখক। তারই অবসরে দেখা যায় এ গল্পে প্রযুক্তি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—

ঘরে ঢুকেই মোবাইলটা বিছানায় ছুড়ে দিল মোনালি।...

মিশমিশে অন্ধকার। বিছানা হাতড়ে মোবাইল খোঁজার চেষ্টা করছিল মোনালি, ঠিক তখনই ঘরময় আলো ছড়িয়ে বেজে উঠল মোবাইল। হাতে নিয়ে দেখল অচেনা নম্বর। একটু বিরক্ত হল সে। কথা বলতে ভাল

লাগছে না এখন, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। সুইচ টিপে খুব নিরাসক্ত গলায় মোনালি বলল, ‘হ্যালো...’

কোনও উত্তর নেই, তবে ধরে আছে বোঝা যাচ্ছে। এই ধরনের কল দিনে বেশ কয়েকটা পায় সে, অত্যন্ত গা-সওয়া ব্যাপার। দেরি না করে লাইন কেটে দিল।[১০৮]

প্রযুক্তি কেমনভাবে মানুষের ক্লান্তির বিশ্রাম কিংবা নিভৃত অবসরের মুহূর্তগুলিকে কেড়ে নিয়েছে, উপরের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়। সেইসঙ্গে একটি তরুণী মেয়ের জীবনে কতখানি বিরক্তি প্রযুক্তির মাধ্যমে সঞ্চারিত হতে পারে, সেই দিকটিও নজর এড়িয়ে যায় না। এ গল্পের শেষে উঠে আসে বিশ্বাসঘাতকতা এবং আশাভঙ্গের কাহিনি, সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রযুক্তি—

অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসে আছে মোনালি। মনটা অস্থির। অভিকে রিং করতে একটি মেয়েই ফোন ধরল, তারপর কোনওরকমে ‘অভিষেক ব্যস্ত’ বলেই ফোনটা কেটে দিল। তারপর মোবাইলটা বন্ধ হয়ে গেল।

কল লিস্ট দেখে আগের নম্বরে ফোন করল মোনালি। যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর জানিয়ে দিল যে, এই নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

চুপ করে মোবাইলটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে মোনালি। চোখ দু’টো একটু যেন ভিজে উঠছে!

ভীষণ আশা নিয়ে বসে আছে মোনালি। বড্ড অন্ধকার। খুব চাইছে আর-একবার আলো হয়ে জ্বলে উঠুক মোবাইলটা।[১০৯]

লেখক উল্লাস মল্লিক এভাবেই বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তির কথা তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরেছেন।

৩.১৫॥ তন্বী হালদার

বিশ্বায়ন এবং তার প্রভাব যেভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল, তা বর্তমান সময়ের ছোটোগল্পকাররা তাঁদের গল্পে অবধারিতভাবে তুলে ধরেছিলেন। এই ছোটোগল্পকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন তন্বী হালদার। লেখিকার জন্ম ১৯৭২ সালে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে। তিনি পেশায় সরকারি কর্মী। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *জলাভূমি*-র জন্য পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত 'সুতপা রায়চৌধুরী স্মারক পুরস্কার'। এছাড়াও তিনি 'সমর মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার', 'ডলি মিদ্যা স্মৃতি পুরস্কার', 'আরবিকা পদক-২০১৩', 'ইলা চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার-২০১৪', 'শর্মিলা ঘোষ সাহিত্য পুরস্কার-২০১৩', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত 'সোমেন চন্দ স্মৃতি পুরস্কার-২০২০' সহ বহু পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত। বদলির চাকরির কারণে কর্মরত থেকেছেন পুরুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাত বা বসিরহাট আবার কখনো বা বীরভূমে। এর ফলে তাঁর লেখার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ।[১১০]

তন্বী হালদার মূলত দু'হাজার সাল পরবর্তী ছোটোগল্পকার। স্বভাবতই তাঁর ছোটোগল্পের অন্যতম বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন কিংবা বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তি, বিনোদন ব্যবস্থা কিংবা পুঁজির প্রসার, নারীবাদী ভাবনা, টুকরো হতে থাকা যৌথ পারিবারিক জীবন কিংবা অণু পরিবারের চার দেওয়ালের গার্হস্থ্য হিংসা অথবা নারীর নিজস্ব পরিসরের সন্ধান। শুধুমাত্র নাগরিক জীবনের অনুপুঙ্খ নয়, নগরজীবন থেকে অনেক দূরে থাকা মানুষ ও সমাজের জীবনসংগ্রাম তাঁর ছোটোগল্পের বিষয় আশয় হয়ে উঠেছে। তাঁর একাধিক গল্পগ্রন্থের আখ্যানের বাস্তবতা ধরে রেখেছে একুশ শতকের দুটি দশকের প্রবহমান সময়কে। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলি হল— *জালাঙ্গীর গান অথবা গোখরো সাপের ভয়* (২০০৯), *চতুর্দশীর চাঁদ* (২০১১), *খুকি ও নিশিপদ্ম* (২০১৪), *নতুন*

গল্প ২৫ (২০১৬), *মজুররত্ন* (২০১৯), *বাছাই ২৫* (২০১৯)। উল্লিখিত গল্পগ্রন্থগুলির প্রায় শতাধিক ছোটোগল্পে বিগত দুই দশকের সামাজিক সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের অভিঘাত লেখিকার সংবেদনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তারই প্রভাব ফুটে উঠেছে তাঁর সৃষ্টির জগতে। লেখক আনসারউদ্দিন তাঁর ছোটোগল্প সম্বন্ধে সার্থকভাবেই উচ্চারণ করেন—

> খুব সাধারণ ঘটনাকে অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া একজন সফল গল্পকারের অন্যতম গুণ।...যেটুকু বুঝেছি, মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসা আর দায়বদ্ধতা থেকেই তন্বীর প্রতিটি গল্পের শরীর নির্মিত হয়। কান পাতলে তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাবেন তন্নিষ্ঠ পাঠক।[১১১]

একুশ শতকের দুই দশকের মানবমন এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও তার অভিঘাতসমূহকে লেখিকা অনায়াস দক্ষতায় তাঁর ছোটোগল্পে ধরে রেখেছেন। যে সময়ে তিনি ছোটোগল্পের জগতে আত্মপ্রকাশ করছেন, সেই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯১ সালে ভারতে গৃহীত হয়েছে মুক্ত অর্থনীতি, তার হাত ধরে ভারত বিশ্বায়ন ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়েছে। বিদেশি পুঁজির আগমন কিংবা দেশি পুঁজির বহুজাতিক হয়ে ওঠা আর সেই প্রতিযোগিতাকে ত্বরান্বিত করেছিল প্রযুক্তি ক্ষেত্রটি। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার সমাজ ও ব্যক্তির অবস্থানকে পূর্বতন দশক কিংবা শতাব্দী থেকে অনেকটাই আলাদা করে দিয়েছিল। আর অবশ্যম্ভাবীরূপে বাংলা ছোটোগল্পের দুনিয়া ধারণ করেছিল এই নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহকে। তন্বী হালদারের ছোটোগল্পেও তাই উঠে এসেছে বিশ্বায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব। তাঁর ‘বৃহন্নলা’ নামক ছোটোগল্পের (*গল্পসরণি*, শরৎ ১৪১২) অভিমুখ কিংবা উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রেক্ষিত সন্ধানী হলেও অনিবার্যভাবে তা ধারণ করেছে সময়চিহ্নকে। তৃতীয় লিঙ্গের অবস্থান নিয়ে এই ছোটোগল্প সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। গল্পের কুশলী পরিচালনায় যে প্রশ্নগুলির সামনে লেখিকা পাঠককে নিয়ে দাঁড় করান, তা অশ্রুভারাক্রান্ত করে

তোলার পাশাপাশি নতুন করে এই নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। আর সেই সমাজদ্বারা পরিত্যক্ত জীবনে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সাধ আহ্লাদের অন্যতম উপাদান হয়ে ওঠে প্রযুক্তি—

> শোনো নন্দদা, আমি একটা ছোট কালার টিভি কিনবো। তুমি চুপচাপ দোকানে নিয়ে চলো।... তুমি ফরেন লিকার শপে গিয়ে ভালো কিছু নিয়ে এসো।...প্রিয়ঙ্কা ঠোঁট টিপে হেসে মোড়কটা ছাড়িয়ে দেয়। তিনজনে একসাথে অবাক বিস্ময়ে চোখ গোল গোল ক'রে বলে—"হুঁ, কালার"।... তুমি সারাদিন ঘরে একা একা থাকবে। কেবল লাইনের কানেকশান নিয়ে নেবো, ব্যাস। তুমি রিমোট টিপে টিপে ইচ্ছেমতো চ্যানেল দেখবে।[১১২]

'জ্যোৎস্না-প্রেম' (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* রবিবাসরীয় ১২ই জুন, ২০১১) নামক ছোটোগল্পে দেখা যায় সদ্য কিশোরী মেয়ের মোবাইল ফোনটি মা নেয় গান শুনবে বলে। নিশীথ রাতে চাঁদের আলোয় সেই মোবাইলে যে কল আসে তার ওপারে থাকা কিশোর প্রেমিক বুঝতে পারে না, যে তার কিশোরী প্রেমিকা নয়, বরং তার মায়ের কাছে চলে গিয়েছে কলটি। আবেগে থরো থরো সেই কিশোর ঠিকমতো প্রত্যুত্তর ছাড়াই একতরফা ভাবে প্রেম নিবেদন করতে থাকে, আর অন্যপ্রান্তে থাকা মা এক প্রজন্মের ব্যবধানে আসলে তার নিজ কন্যার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই প্রেমের বার্তায় নিজে অবগাহন করতে থাকে। আর এই সম্পূর্ণ ঘটনাটির মাধ্যম হয়ে ওঠে প্রযুক্তি-

> আমার মোবাইলটায় গান শোনা, গান ভরা, ছবি তোলা—এসব কিছুই করা যায় না। আগের দিনের সাদা-কালো টিভির মতো সাদা-কালো মোবাইল। মেঘার মোবাইলে অসাধারণ সব রবীন্দ্রসংগীতের কালেকশন আছে। তাই মেঘা ঘুমিয়ে পড়লে বালিশের তলা থেকে ওর মোবাইলটা আগেই চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিলাম। মাদুর, তার উপর একটা মাথার বালিশ আর জলের বোতল—সন্ধ্যাবেলা বাবা-মেয়ে যখন ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা দেখছিল তখনই রেখে এসেছিলাম। ...
>
> বলে যায় ওই ছেলে আগল খুলে পাগলের মতো। তার ভেতরের সব ভালোবাসাটুকু উজাড় করে যায় সে মোবাইলের স্পীকারে।...

মোবাইলের রিসিভ কল, কল লিস্ট সযত্নে ডিলিট করে মেঘার বালিশের নিচে রেখে আসি।[১১৩]

বিশ্বায়ন পরবর্তী তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার সমাজের সব প্রজন্মের কাছে সমানভাবে গৃহীত হয় নি। একদিকে তরুণ-তরুণীরা যেমন দ্রুত এই বদলকে নিজেদের সংস্কৃতির অঙ্গীকৃত করে নিয়েছিল, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বয়স্করা এই প্রযুক্তির ব্যাপারে একদিকে যেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হননি, অন্যদিকে তাঁরা প্রযুক্তিকে কাজকর্ম এবং মানবিক মূল্যবোধের বাধা হিসাবে দেখতেন বা দেখেন। 'ফিমেল ওয়ার্ড' (*দিনক্ষণ*, শারদীয় ১৪১৭) গল্পটিতে তারই প্রতিফলন দেখা যায়—

এই তো রাখী যেদিন প্রথম এলো, সেদিন একটা মেয়ে মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে বিষ খেয়ে এসেছিল। এমার্জেন্সিতে পাকস্থলী ওয়াশ হয়েছিল। বেডে স্যালাইন, অক্সিজেন চলছে। হাত-পা খিঁচুনি ধরার ভয়ে বেঁধে রাখা। তবুও থেকে-থেকেই মেয়েটি বেঁকে-বেঁকে উঠছিল। গুঙিয়ে গুঙিয়ে কী যেন বলছিল। কিন্তু সদ্য পাশ করা নার্স মেয়েটি স্যালাইনের মাত্রা ঠিক করতে করতে কানে আইপড গুঁজে ভ্যালেন্টাইনস ডে'র গিফট নিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। বিষ খাওয়া কিশোরী মেয়েটিরও এই বিষ খাওয়ার কারণটি সেই 'মোবাইল'। মোবাইল কেনার নাছোড় বায়নায় মেয়েটি আত্মঘাতী হতে চেয়েছিল।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির বৃদ্ধ অভিভাবক, খুব সম্ভবত বাবাই হবে, আধুনিক প্রযুক্তির এই তনুদেহী যন্ত্রটাকে আর সহ্য করতে পারে না—ঠাস ক'রে চড় কষায় নার্সের গালে। ব্যাস কান্নাকাটি-চিৎকার-চেঁচামেচি হুলস্থুল কাণ্ড, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়া...সে এক বীভৎস ব্যাপার। বিষ খাওয়া মেয়েটি এরপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু যতদিন সে হাসপাতালে ছিল টুঁ শব্দটি করেনি।[১১৪]

বিশ্বায়ন বদলে দিয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থাকে। সেইসঙ্গে বদলে গিয়েছে পরিবার ব্যবস্থা। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারগুলি ভাঙতে ভাঙতে বাবা-মা-সন্তান—তিনজনের ক্ষুদ্র পরিবারে পরিণত হয়েছে। বাড়ির জায়গায় উঠেছে ফ্ল্যাট, হারিয়ে গিয়েছে উঠোন, আর ফ্ল্যাটের এজমালি ছাদে আসা

রোদ্দুরও ভাগাভাগি করে নিতে হয় আর পাঁচজনের সঙ্গে। কাজেই এহেন ফ্ল্যাটের তিনজনের পরিবারে প্রযুক্তি যে দ্রুত জনহীনতার পরিসরটিকে দ্রুত দখল করে নেবে তাতে আর আশ্চর্য কি! আরও একটু এগিয়ে যদি দেখা যায় যে বাবা-মা উভয়েই চাকরিরত হন, তবে সন্তানের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য কিংবা তার খোঁজ রাখার অছিলায় দ্রুত জায়গা দখল করে মোবাইল ফোন। অন্তত বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে এটাই দস্তুর। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের প্রযুক্তি ব্যবহারের বিচক্ষণতা বা বড়োদের নিয়মকানুন অনুযায়ী চলার দক্ষতা না থাকলে এই প্রযুক্তিই বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। অজানা মানুষের নানারকম বিকৃতির শিকারও হতে পারে তারা। আবার উল্টো কোনও অভিজ্ঞতাও হতে পারে। একাকী নিঃসঙ্গতায় ভোগা শিশু নিজেই খুঁজে নিতে পারে অবসর কাটানোর কোনো সঙ্গীকে। তন্বী হালদারের ছোটোগল্পে এইরকমই উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় একাধিক। উদাহরণ হিসাবে 'রং নাম্বার' (*নতুন গল্পপত্র*, শারদীয় ২০১০) নামক ছোটোগল্পটির কথা তুলে ধরা যায়, যেখানে কর্মরত দম্পতি লাবণ্য এবং হিমাদ্রীর দশ বছরের মেয়ে দোলার কথা উঠে আসে। সে এই বয়সেই প্রযুক্তির খুঁটিনাটি বিষয় জানে বলে এই দম্পতি রীতিমত গর্ব অনুভব করে। তাদের অবর্তমানে শিশুটিকে দেখভাল করে পরিচারিকা সালেমা পিসি। আর খোঁজখবর রাখার জন্য শিশুটির হাতে তুলে দেওয়া হয় মোবাইল ফোন। অবসরযাপনের মুহূর্তে এলোমেলো বোতামে চাপ দিয়ে বয়স্ক অপরিচিত এক পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায় তার। শিশু মনের আবেগ অনুভূতি এর পর আবর্তিত হয় সেই অপরিচিত এবং বয়স্ক পুরুষটিকে ঘিরে। বাবা মায়ের বাইরেও তাদের অগোচরে একরকমের আবেগের বন্ধন তৈরি হয় তাদের মধ্যে। এরপর একদিন সেই অচেনা বন্ধুর ফোন থেকে পুলিশের ফোন আসে, শিশুটির বাবা এতদিনে জানতে পারে সেই সম্পর্কের কথা। থানায় গিয়ে তারা জানতে পারে দোলার সেই অজানা বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে, আর তারই ফোন থেকে নম্বর পেয়ে দোলাকে অভিভাবকসহ থানায় ডেকে আনা

হয়েছে। কারণ পুলিশও সেই মৃত মানুষটির পরিচয় জানতে পারেনি। লেখিকা খুব দক্ষতার সঙ্গে টান টান উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে পাঠকের মননকে ব্যবহার করেন, কিন্তু শেষে অকল্পনীয় এক মোচড়ে যে পরিণতির সামনে পাঠককে তিনি নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন, তাতে ভিন্নতর এক মানবিক মূল্যবোধের যন্ত্রণায় চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। না, এ কোনো শিশুর বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের গল্প হয়ে ওঠে না। বরং একটি অল্পবয়স্ক এবং একটি পরিণতবয়স্ক নিঃসঙ্গ মানুষের মধ্যেকার অসম বন্ধুত্বের গল্প হয়ে ওঠে এটি। প্রযুক্তি যার মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিল। প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে কিছু পরে লেখা বিশ্বায়ন পরবর্তী নিঃসঙ্গতার এই ধরনের আর একটি গল্পের নাম 'জীবনবাবুর জীবনলিপি' (*এবং অন্যকথা,* শারদীয় ২০১৫)। লেখিকা এই ছোটোগল্পটিতে তুলে এনেছেন পরিবারের একাধিক বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভিড়ে নিঃসঙ্গ একাকী এক বৃদ্ধের কথা। সংসারের দাবিতে যে মানুষটিকে নিজের স্ত্রীর উপরে দাম্পত্যের অধিকারটুকুও ছেড়ে দিতে হয়েছে। কোণঠাসা হয়ে সরতে সরতে মানুষটি সবার কাছেই গুরুত্বহীন হয়ে একসময় আত্মহত্যা করেন। উলঙ্গ হয়ে তাঁর সেই আত্মহত্যা সবাইকে দাঁড় করিয়ে দেয় অনেক অপ্রিয় দৃশ্য এবং প্রশ্নের সামনে। পুলিশ মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে জীবনবাবুর আলমারি থেকে খুঁজে পায় বেশ কিছু নীল ছবির বই, খানকয়েক সিডি, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কন্ডোমের প্যাকেট এবং একটি ডায়েরি। এত কিছু নিষিদ্ধ উপাদান পাওয়া গেলেও এটি নিষিদ্ধ যৌনতার কোনো আখ্যান হয়ে ওঠে না। বরং আধুনিকতার অভিযাত্রায় ব্যস্ত মানুষের সমাজের পরিত্যক্ত এক বয়স্ক সদস্যের নিঃসঙ্গতার ব্যথাদীর্ণ একটি কাহিনি হয়ে ওঠে এটি। তদন্তে পুলিশ জীবনবাবুর সেই ডায়েরিটি থেকে খুঁজে বের করে তাঁর জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চাওয়ার একাধিক ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে। কীভাবে পরিবারের মধ্যেই, স্ত্রী, সন্তান সবার কাছ থেকেই তিনি দূরে সরে যান, ডায়েরির পাতায়

পাতায় তার বিবরণ আসলে চিনিয়ে দেয় মানবিক মূল্যবিযুক্ত আধুনিক এক সময়কে। যে সময়ে দাঁড়িয়ে জীবনবাবুর মতো একটি চরিত্র নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য প্রযুক্তিকে আশ্রয় করেন—

> ২৬.০৩.২০১২—ক-দিন ধরেই ভাবছিলাম একটা ল্যাপটপ কিনব। অফিসে কাজ করতে করতে কম্পিউটারটা শিখে গেছিলাম।
>
> ১৪.০৪.২০১২—ল্যাপটপ কিনে আনলাম। বাবু, দেবু, বউমারা এমনকি টোটোন পর্যন্ত দেখতে এল। রমাও এল। তবে এসে বলল – কী দরকার ছিল, শুধু শুধু কতোগুলো পয়সা খরচ !
>
> রমাকে বলি—এসো রমা তোমার একটা ছবি তুলি। ল্যাপটপের ওয়ালপেপার করে রাখব।
>
> রমা চরম অস্বস্তিতে পড়ে। শুক্লা খিল খিল করে হেসে উঠলে ফস করে বলে উঠি—হাসছ কেন ? দেবু তোমার একা ছবি তোলে না ? ...
>
> ১২.০৮.২০১২ – আমি বাড়ির সকলের সঙ্গেই প্রায় কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি। রমা কাজের মেয়েটাকে দিয়ে চা পাঠায়। আজ দুটো নীল ছবির সিডি কিনে এনেছি। রাতে চালিয়ে দেখলাম। ভালো ঘুম হল।[১১৫]

এইরকমভাবে দেখা যায় 'বিনিময়', 'দুষ্টু' (*খুকি ও নিশিপদ্ম*), 'সুখ-সারি', 'মজুররত্ন', 'আর্দ্রতা বিষয়ক', 'কৃষ্ণগহ্বরে একাকী আমি' (*নতুন গল্প ২৫*) প্রভৃতি গল্পেও অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে তথ্যপ্রযুক্তি। মানুষের জীবনের হিসাব নিকাশ কিংবা টানাপোড়েনকে পরিচালিত করেছে ভিন্ন খাতে। 'বিনিময়' (*এবং আমরা*, ২০১১) গল্পের চামড়ার ব্যবসায়ী মগরবের ব্যবসার পরিধিটাই বদলে দেয় মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি। তার পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যা বদল ঘটিয়েছিল। 'দুষ্টু' (*পত্রপুট*, ২০১২) গল্পে দেখা যায় সোহিনী এবং রজতের দাম্পত্যের জন্য কোনো অবসর নেই। রাত্রির একান্তযাপন যে সময় দাবি করে, সেই সময়েও রজত বিছানায় বসে ল্যাপটপে অফিসের কাজ করে। সারাদিন দুজনের কথা বলার ফুরসতই হয় না। সোহিনী কাছে আসতে চাইলে রজত রাগে ফেটে পড়ে তাকে জানিয়ে দেয়, তার অফিসে অডিট চলছে, তাই স্ত্রীকে ঘুমের

ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেয় সে। এভাবেই প্রযুক্তি মানুষের সম্পর্কের মাঝে কার্নিশের বট চারার মতো ঢুকে পরে শিকড় চারিয়ে দেয়, তৈরি করে ফাটল। তারপর বড়ো সাধে তৈরি করা সম্পর্কের ইমারত খসে পড়তে পড়তে একদিন সশব্দে ভেঙে পড়ে। 'সুখ-সারি' (*আমি উদিতা*, সেপ্টেম্বর ২০১১) গল্পটিতেও পাঠক খেয়াল করতে পারেন ক্ষয়িষ্ণু এক দাম্পত্য সম্পর্কের আখ্যানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'মোডেম', 'ইন্টারনেট', 'ল্যান্ডলাইন' ইত্যাদি শব্দগুলি। যে শব্দগুলি আমাদেরকে গল্পের মাঝখানে সময়চিহ্ন হিসাবে জানান দিয়ে যায় গল্পটির কাহিনিকাল সম্পর্কে। 'মজুররত্ন' (*আরাত্রিক*, শারদীয় ২০১২) গল্পে দেখা যায় শ্রমিকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য যে পুরস্কার চালু করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে 'চায়না সেটের মোবাইল'। এ থেকে সামাজিক প্রবণতা এবং অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে পাঠক বেশ কিছু সূত্রের সন্ধান পেতে পারেন। 'আর্দ্রতা বিষয়ক' (*এবং গল্পযাপন*, নভেম্বর ২০১৩) গল্পটিতে দেখা যায় দুটি ভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের দুটি মানুষ বিষ্ণুপদ এবং মেঘার দেখাশোনা করে বিবাহ হলেও মেঘার তথাকথিত আধুনিক ভিন্ন রুচির কারণে তাদের দাম্পত্য কখনোই মধুর হয়ে ওঠে না। ব্যাঙ্কের চাকরিজীবী বিষ্ণুপদকে বিবাহ করলেও মেঘা আসক্ত হয় পরকীয়ায়। তার কাছে স্বাধীনতা আসলে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। একারণেই দেখা যায় সে আকাশ নামে একটি পুরুষের প্রেমে আসক্ত হয় এবং বিষ্ণুকে ডিভোর্স করলেও বিষ্ণুর কেনা ফ্ল্যাটটির দখল ছাড়ে না, বরং সেখানেই সে আকাশকে নিয়ে লিভ টুগেদার করতে শুরু করে। দেখা যায় বিষ্ণুর সঙ্গে দাম্পত্যের ফাঁকে মেঘা আকাশের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায় প্রযুক্তির মাধ্যমে। এই সূত্রে উঠে আসতে দেখা যায় মোবাইলে কথোপকথন কিংবা ইন্টারনেটে চ্যাটিং-এর প্রসঙ্গ। আবিষ্কার করা যায় মেঘা নামক চরিত্রটির নীল ছবি দেখার প্রসঙ্গ কিংবা ল্যাপটপে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তির দিকটি। আর এইভাবে একটি বিশেষ সময়ে মূল্যবোধের সরণের প্রসঙ্গটিও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সূত্রেই উঠে আসে 'কৃষ্ণগহ্বরে একাকী

আমি' (*অন্য প্রমা,* শারদীয় ২০১৪) গল্পটির প্রসঙ্গ। অসুখী দাম্পত্যের গর্ভ থেকে উঠে আসা একটি নারী চরিত্র নিজের ফেলে আসা শৈশবের ট্রমায় মানসিকভাবে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে তাঁর আত্মজা তাকে পরামর্শ দেয় ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলার—

> মেয়ে আমাকে অনেকবার ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলতে বলে। কী ভেবে খুলেও ফেলি। মেয়ে বলে—আমি, বাবা বেরিয়ে যাওয়ার পর সারাদিন তো ঘুমাও আর সিরিয়াল দেখো। ফেসবুকে আননোন ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে চ্যাট করে দেখো কী ফানি সময় কাটবে।
>
> সত্যিই দেখলাম তাই হল। আমাদের কিশোর-কিশোরীবেলায় ছিল পত্রমিতালী। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব। সেও এক উত্তেজনা। বেঁচে থাকার আনন্দ। ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলার পর আমার সত্যি সত্যি মনে হল আমি যেন মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিতে হারিয়ে গেছি। এই গ্যালাক্সিতেই আমার ভেনাসকে খুঁজে পাওয়া। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়টাতে চ্যাটে বসা ছিল যেন নেশার মতো। অমোঘ হাতছানি। একটু একটু করে স্যাটেলাইটের কৃপায় আমি তার ঘর-বাড়ি, উঠোন, উঠোনের গোলাপ গাছ দেখি। ভয়েস রেকর্ডারে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনি। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি আমি ভেনাসের সমস্ত মর্মরধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি তার কল্লোলতা। তার ঢেউ একটু একটু করে আমাকে অন্য এক জীবনে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেও যেন এক কৃষ্ণগহ্বর।[১১৬]

এইভাবেই বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে প্রযুক্তির একাধিক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লেখিকা তন্বী হালদারের ছোটোগল্পে।

৩.১৬॥ **বিনোদ ঘোষাল**

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ের তরুণ কথাকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিনোদ ঘোষাল। তাঁর জন্ম ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬। হুগলির কোন্নগরে। ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকা আর অভিনয়ের

সখ ছিল। গ্রুপ থিয়েটারের কর্মী হিসেবেও কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যে স্নাতক এই লেখকের কর্মজীবন বিচিত্র। কখনও চায়ের গোডাউনের সুপারভাইজর, শিল্পপতির বাড়ির বাজার সরকার, কেয়ারটেকার আবার কখনও হিসাবরক্ষক, প্রাইভেট টিউটর। বর্তমানে একটি সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত। সঙ্গে নিয়মিত লেখালিখি করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। ২০০৩ সালে *দেশ* পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। নির্মেদ গদ্যশৈলী, অভিনব বিষয়ভাবনা এবং ছোটোগল্পে নতুন আঙ্গিক ও পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য প্রথম গল্পগ্রন্থেই স্বীকৃতি মেলে ২০১১ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার'-এর মাধ্যমে। প্রকাশিত গ্রন্থ ৮টি। ২০১৬ সালে প্রথম বাঙালি লেখক হিসাবে মাননীয় রাষ্ট্রপতির আহ্বানে রাষ্ট্রপতি ভবনে 'রাইটার্স ইন রেসিডেন্স' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।[১১৭]

বিনোদ ঘোষালের একাধিক ছোটোগল্পের বিষয় কিংবা অনুপুঙ্খে ধরা পড়েছে প্রযুক্তি কিংবা বিশেষ অর্থে তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাব। তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ের তরুণ প্রজন্ম এবং তাদের জীবন-জীবিকা, আবেগ-অনুভূতি কিংবা ভাবনার জগৎ। প্রযুক্তির ব্যবহার সেখানে এতখানি গভীরতায় পৌঁছিয়েছে যে, কোনো কোনো গল্পের বীভৎসতায় পাঠককে চমকে উঠতে হয় নিজের অজান্তেই। এইরকমই একটি ছোটোগল্প 'খেলনাবাটি'। এ গল্পে অতনু, কথা এবং তাদের আড়াই বছরের কন্যা ভুট্টি ওরফে বিতনুকা চক্রবর্তীর জগতটি উঠে এসেছে। এমবিএ পাশ অতনু চক্রবর্তী একটি কোম্পানিতে চাকরি করে। উচ্চ বেতন এবং অনেক সুখের বিনিময়ে তারা নিয়ে নেয় তার প্রায় সমস্ত সময়। তাদের মধ্যেকার স্বাভাবিক দাম্পত্য তার উষ্ণতা হারায়। ধীরে ধীরে দাম্পত্যের শূন্যস্থান ভরিয়ে তোলে প্রযুক্তি। কথা'-ও ইন্টারনেটের যুগে দ্রুত জড়িয়ে পড়ে পরকীয়া সম্পর্কের জালে। আর এই সমস্ত কিছুর মাঝখানে তাদের শিশুটি হয়ে পড়ে

অযত্নলালিত। শৈশবের মাধুর্য হারিয়ে সে শেষপর্যন্ত গল্পের শেষে যে গন্তব্যে পৌঁছায়, তাতে পাঠক অবশ্যম্ভাবীভাবে শিউরে উঠতে বাধ্য হন—

> গতকাল রাত্রে অফিস থেকে ফেরার সময় মোবাইলটাকে কিনেছিল অতনু। সেটা নিয়ে আজ সকাল সাড়ে আটটার সময় ঘুম থেকে উঠে বিছানায় মহানন্দে খেলছে ভুট্টি। অতনুর আড়াই বছরের মেয়ে। ভালো নাম বিতনুকা চক্রবর্তী। মাস কয়েক আগে লোকাল একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। প্লে গ্রুপ।...[১১৮]

এইভাবে খুব দ্রুত শিশুদের জগতে ঢুকে পড়ে প্রযুক্তি। ধীরে ধীরে একা হতে শুরু করে তারা। ভুট্টির ক্ষেত্রে এই একা হওয়ার শুরু একেবারে শৈশবেই।

বড়োদের জগতটিও এ গল্পে অন্তঃসলিলা যান্ত্রিকতাকে তুলে ধরেছে। অতনু আর কথা-র জীবনে কোনও আবেগ বেঁচে নেই। শারীরিক সম্পর্কটুকুও নিছক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়েছে—

> অনেক রাতে বাড়ি ফিরে কোনোমতে ডিনার সেরেই আবার নিজের ল্যাপি নিয়ে বসে যেত অতনু। এম আই এস রিপোর্ট, বাজেট আরও কী সব কঠিন কঠিন অফিসের কাজ, ভারী ভারী কথা। বিছানায় শুয়ে থাকত কথা। তার পাশেই বালিশে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে অতনু। ওর কোলে সেই ল্যাপটপের অদ্ভুত নীলচে আলোয় ভরে থাকত গোটা চুপ-ঘরটা। গভীর মনোযোগ দিয়ে কত রাত পর্যন্ত কাজ করেই যেত ও।
>
> এবার শুয়ে পড় প্লিজ। আর রাত জেগো না।
>
> আর একটুখানি, প্লিজ।
>
> একেকসময় ভীষণ বিরক্ত হয়ে কি-বোর্ডে ঝপাং ঝপাং আঙুল চালিয়ে সব এলোমেলো করে দিত কথা। অতনু সামান্য রেগে উঠত। আবার কখনও অনুরোধ করে প্লিজ আর হাফ অ্যান্ড আওয়ার প্রমিস বলেই কথাকে চুমু খেত। সেই চুমুতে শুধুই লালা থাকত, ভালোবাসা থাকত না। ঠোঁট মুছে অন্য দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ত কথা। ঘুমিয়েও পড়ত একসময়।[১১৯]

এভাবেই প্রযুক্তি মানুষের জগতকে সম্পূর্ণত দখল করে ফেলেছে। মানবিক সম্পর্কগুলি অনুভূতি কিংবা উষ্ণতা হারিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছে মৃত্যুকঠিন শীতলতার দিকে। নিত্যনতুন গ্যাজেট সেই শীতলতাকে যে অতিক্রম করতে পারে না, এ গল্প সেই কথাই তুলে ধরেছে—

> আমার আর ভালো লাগছে না অতনু প্লিজ... বড্ড লোনলি ফিল করি। হাতের মুঠোয় দামি ব্ল্যাকবেরি মোবাইল সেটটা চেপে ধরে একদিন বলে ফেলেছিল কথা। মোবাইলটাকে গত মাসেই কথার জন্মদিনে কিনে দিয়েছিল অতনু। অজস্র ফিচার। শিখতে বেশ কিছুদিন সময় নিয়েছিল। সারাদিন খুটখাট, ভুলে থাকা। যেই জানা হয়ে গেল অমনি পুরনো হতে শুরু করল জিনিসটা। বই পড়ার ধৈর্য নষ্ট হয়ে গেছিল আগেই। তারপর সিডি প্লেয়ার, আইপড, মোবাইলের নিত্যনতুন সেট, জিপিআরএস, এই স্কিম, ওই পাওয়ার রিচার্জ...একটা সময়ের পর সব ব্যস্ততা হঠাৎ একা হয়ে যায়।[১২০]

অতনু, কথা আর ভুট্টির ছোট্ট নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি জুড়ে শুধুই সম্পদ আর প্রযুক্তির বাহুল্য। কিন্তু সেই জগতটি নিষ্প্রাণ। আধুনিকতার অভিঘাতে মানুষ এখানে পারস্পরিক সম্পর্করহিত হয়ে পড়েছে। গল্পকার সেই দিকটিকে নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন—

> অতনুর তিনটে মোবাইল, দুটো ল্যাপটপ, একটা স্কোডা, ছটা রিস্টওয়াচ, তার মধ্যে একটা রোলে একটা র‍্যাডো। ফ্লাটে দেয়াল জোড়া প্লাজমা, সেন্ট্রালাইজড এসি, ডবল ডোর ফ্রিজ...সওব আছে। বাড়িতে থাকলে কথার সঙ্গে দেখা হয়। কথাও হয় টুকটাক প্রয়োজন মতো। কোনো ঝগড়া নেই অভিমান নেই। একেবারে কনকনে ঠাণ্ডা ফ্যামিলি। এখন কথারও ব্যস্ততা বেড়েছে অনেক। সপ্তাহে দু-তিনদিন কিটি পার্টি, বিউটি পার্লার, দুটো মোবাইল। টুজি-থ্রিজি। বাড়িতে থাকলে ল্যাপটপে ইন্টারনেটে গোটা দুনিয়া। সহস্র ছায়া-বন্ধু।[১২১]

শেষপর্যন্ত এ গল্পে প্রযুক্তির বাহুল্যে একেবারে একা হয়ে যাওয়া শিশুটির পরিণতিকে কেন্দ্র করে পাঠককে এক নিষ্ঠুর সত্যের উন্মোচনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন গল্পকার, যার অভিঘাতে যান্ত্রিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করে শিউরে উঠতে হয় তাঁকে—

> ল্যাপিটি টেবিলে নামিয়ে রেখে উঠল অতনু। নিজের বেডরুমে ঢুকতে গিয়ে আলগোছে একবার কথার ঘরের দিকে তাকাতেই দেখল ভুট্টি খাটের উপর নেই। কোথায় গেল! কথার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও। ভুট্টি কখন যেন বিছানা ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছে। মেঝেতে থেবড়ে বসে কথার বেখেয়ালে খুলে রেখে যাওয়া ওয়ারড্রোব থেকে শাড়ি-সালোয়ার সব টান দিয়ে নামিয়েছে। আর ওর হাতে...ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো শিউরে উঠল অতনু। ভুট্টির হাতে মায়ের ওয়ারড্রোব ঘেঁটে বার করা একটা নকল রাবারের পুরুষাঙ্গ, সেক্সটয় শপে যাকে ডিল্ডো বলে। জিনিসটাকে দু-হাতে চেপে ধরে ছোটো ছোটো দাঁতগুলো দিয়ে প্রাণপণে কামড়াচ্ছে ভুট্টি। জিনিসটা ওর লালায় মাখামাখি। বাবাকে দেখতে পেয়ে হি হি করে হেসে উঠল।[১২২]

এরপর এ গল্প আর ব্যাখ্যার দাবি রাখে না। প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীর যান্ত্রিকতা কোথায় পৌঁছে গিয়েছে তা উপলব্ধি করে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়।

'মূক ও বধিরদের জন্য একটি বিকেল' গল্পে আর একটি নষ্ট দাম্পত্যের গল্প উঠে আসে। ইন্ডিয়ান প্লাস্টো কোম্পানির সিনিয়র সেলস এক্সিকিউটিভ উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনীক সান্যালের সঙ্গে বিবাহ হয় বাগনানের বিদিশা ভট্টাচার্যর। বিদিশা বাংলায় অনার্স। তার জগত এবং মূল্যবোধ অনীকের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের এ বিবাহ সুখের হয়নি। কিছুটা বিদিশার আত্মঘাতী জেদে রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মারা যায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনীকের মনে এর বিশেষ প্রভাব পড়েনি। সে দ্রুত ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য সম্পর্কে জড়ায়। এ গল্পেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তথ্যপ্রযুক্তি—

> মোবাইলে ফোন করে জানারও উপায় নেই। গত পরশু দিনেই মেয়েটা ওর মোবাইলটা হারিয়েছে। অনীককে গত রাত্রেই চ্যাটিং-এ জানিয়ে দিয়েছে সে কথা। আজ কোনো প্রবলেমে পড়ল না তো?... তাহলে নিশ্চয়ই ফোন করে জানিয়ে দিত। অনীকের নাম্বার নিশ্চয়ই মুখস্ত হয়ে গেছে এতদিনে। মোবাইলে ফেসবুক চ্যাট খুলে দেখল অনীক; তটিনী অফলাইন। এবার একটু অধৈর্য লাগছে। আজকের

এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ওকে কোম্পানির একটা ভাইটাল মিটিং-এ অ্যাবসেন্ট থাকতে হয়েছে। এই নিয়ে আবার কোনো কথা না ওঠে। সিগারেটটা মাটিতে ফেলে শু দিয়ে ভালো করে পিষে মুখ তুলতেই ভুরুদুটো আপসে কুঁচকে উঠল অনীকের।[১২৩]

এ গল্পে কর্পোরেট দুনিয়া মানুষের জীবনের উপরে এতটাই প্রভাব ফেলে যে, জীবনসঙ্গিনী খোঁজার অবসরও মিলতে চায় না। অবসর মেলেনা জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে নিভৃত সময় কাটানোর। কিংবা মানুষ জীবনে সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে কর্পোরেট সংস্কৃতির অদৃশ্য তাড়ায়।

ভিন্ন ধরনের একটি ছোটোগল্প 'আপ ব্যান্ডেল লোকালে কয়েকজন'। এ গল্পে উঠে আসে সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তর এবং বিভিন্ন বয়সের কয়েকজন নারীর কথা, যারা সবাই কিছুক্ষণের জন্য আপ ব্যান্ডেল লোকালের যাত্রী হয়েছিল বেশ রাতে। এ গল্পে উঠে এসেছে বিভিন্ন পেশার এক একজন নারীর জগত। কেউ ছাত্রী, কেউ বেসরকারি অফিসে কর্মরত, কেউ বা লেডিজ কম্পার্টমেন্টে ওঠা মহিলা হকার। এই অল্প সময়ের যাত্রায় এদের সবার জীবনের গল্পকে তুলে ধরেছেন লেখক। অসামান্য দক্ষতায়। এ গল্প নারীবাদী পাঠের উপকরণ হয়ে উঠতে পারে সার্থকভাবেই। এ গল্পের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তথ্যপ্রযুক্তি—

সকাল থেকেই গুমোট গরম ছিল। গলায় জড়ানো ওড়নার একপ্রান্ত ধরে গলা, ঘাড় ভালো করে মুছল। অফিসে সারাদিন এসির ভেতর থেকে বাইরেটা ভুলে গেছিল একেবারে। ক্যামাক স্ট্রিটে বিপিওর ঝাঁ চকচকে অফিস ফ্লোরে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই থাকে না। শুধু কাজ আর মানুষ। আকাশ, মাটি, গাছ পিসি-র স্ক্রিনসেভারে। আজ সারাদিনে তিনবার কল্লোলের ফোন এসেছিল। শালিনীর শরীরের খবর, মনের খবর জানতে।[১২৪]

তবু বারবার বুকের সামনের ওড়না ঠিক করছিল মেয়েটা। শূন্যতা ঢাকার নিরলস অভ্যাসে। বাঁ হাতে ধরা পুরোনো মডেলের কালো ঢ্যাপ্পোস একশৃঙ্গ মোবাইল।[১২৫]

‘হ্যাঁ, ঠিক আছে। ছাড়লাম।’ বলার সঙ্গে সঙ্গে ফোন কট্। এতক্ষণ বেশ চিৎকার করেই ওদিক থেকে কথা বলছিল কল্লোল। শালিনী নিজের সেটটাকে কান থেকে খানিকটা দূরে রেখেও স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে। পাশের মেয়েটাও নিশ্চয়ই শুনেছে ওদের দুজনের কথা। সেদিনের ঘটনাটার পর থেকে কল্লোল হঠাৎ খুব বেশি কেয়ারিং হাজব্যান্ড হয়ে পড়েছে। কোনও ম্যানেজমেন্টের বই পড়ে শিখেছে বোধহয়। সুখী দাম্পত্য জীবন বজায় রাখার কিছু প্রয়োজনীয় টিপস। ---তবু এই এসব অভিনয়টুকুর জন্যই কি মানুষ একসঙ্গে থাকে? বাঁচে? চায়?... অপেক্ষা করে!

‘ওহ্। দু-দিন ধরে তো এয়ারটেলের টাওয়ারের খুব প্রবলেম চলছে না? লাইনই পাওয়া যাচ্ছে না।’ বলে যতটা সম্ভব সহজ হেসে তাকাল মেয়েটার চোখের দিকে।[১২৬]

এইভাবেই বিনোদ ঘোষালের একাধিক ছোটোগল্পে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে প্রযুক্তির অনুপুঙ্খ।

৩.১৭॥ **স্মরণজিৎ চক্রবর্তী**

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় ছোটোগল্পকার। কোনো লেখকের জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পশ্চাতে অনেকধরনের বিষয় ক্রিয়াশীল থাকলেও একথা স্বীকার করে নেওয়া যায়, স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাস কিংবা ছোটোগল্প ফেলে আসা প্রায় দুটি দশকের তরুণ প্রজন্মের কাছে সমাদৃত হয়েছে। স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর জন্ম ১৯শে জুন, ১৯৭৬, কলকাতায়। শৈশব কেটেছে বাটানগরে। বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। নঙ্গী হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভরতি। কিন্তু কিছুদিন পরে পড়া ছেড়ে দেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজির স্নাতক। কবিতা দিয়ে লেখালিখির শুরু। প্রথম ছোটগল্প বের হয় *উনিশ কুড়ি* পত্রিকায় ২০০৩-এ। প্রথম উপন্যাস *পাতাঝরার মরসুমে*।[১২৭]

স্মরণজিৎ প্রধানত একটি বাণিজ্যিক পত্রিকাগোষ্ঠীর হয়ে লেখেন। তাঁর বেশিরভাগ ছোটোগল্প সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়। একটি নির্দিষ্ট বয়সের জনসমষ্টিকে লক্ষ্য করে তাঁর বেশকিছু ছোটোগল্প লেখা বলেই হয়ত সেখানে অবধারিতভাবে উঠে আসে তাদের সংখ্যাধিক্য, তাদের ব্যবহৃত শব্দাবলি, প্রেম, প্রতিযোগী মনোভাব, ক্রীড়াজগতের বহু প্রসঙ্গ, হোস্টেল কিংবা কলেজ জীবন, ক্যাম্পাসের প্রেম ইত্যাদি। আর আসে উল্লেখিত বিষয়সমূহের পাশাপাশি প্রযুক্তির জগতের একাধিক উপাদান কিংবা অনুপুঙ্খের উপস্থিতির কথা। এ হয়তো অবশ্যম্ভাবী ছিল স্মরণজিৎ-এর লেখায়। কারণ তিনি তাঁর লেখা শুরু করছেন ভারতে উদার অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার প্রায় বারো বছর পরে। ততদিনে এই নতুন অর্থনীতির লক্ষণগুলি সম্যকভাবেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। যার কয়েকটি হল বেসরকারি ক্ষেত্রগুলির দ্রুত প্রসার, পুরানো সমাজব্যবস্থার বদল, প্রযুক্তির অসম্ভব দ্রুততায় মানবজীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠা।

স্মরণজিৎ তাঁর গল্পে বার বার তুলে ধরেছেন তরুণ প্রজন্মকে। তাদের আদব-কায়দা, চলাফেরা, কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দাবলি কিংবা আশা আকাঙ্ক্ষা—সব কিছুই পূর্বের প্রজন্মগুলির তুলনায় পার্থক্যের স্বাক্ষর রেখেছে তাঁর ছোটোগল্পে। তাঁর *উনিশ কুড়ির প্রেম* (২০০৮) কিংবা *প্রেমের উনিশ-কুড়ি* (২০১৬) গ্রন্থের একাধিক ছোটোগল্পে ধরা পড়েছে বদলে যাওয়া সময় আর মূল্যবোধের একাধিক দিক। উঠে এসেছে প্রযুক্তির পৃথিবীতে মানুষের একা হয়ে পড়ার কাহিনি। তাঁর এইরকমই একটি ছোটোগল্প 'একা এবং তিনজন' (*উনিশ কুড়ির প্রেম*)। এ গল্পে উঠে আসে সমবয়সি বন্ধুদল, তাদের আড্ডার পরিসর, ইন্টারনেটে ছায়া-জীবন, প্রেম, স্বপ্নভঙ্গ এবং বন্ধুত্বের স্বরূপকে পুনরাবিষ্কারের কাহিনি। এই গল্পের সূত্রপাতটি পাঠককে নির্দিষ্ট করে চিনিয়ে দেয় গল্পের কাহিনিকালের কালক্রান্তি—

টমিদা হল আমাদের সামনে যে বড়রাস্তা, তার ওপারের কাফে ডি অন্নপূর্ণার মালিক। আর ফিউশন হল টমিদার জীবনের মূলমন্ত্র। টমিদা বলল, ‘উন্নত প্রজাতির ভাষা বা সংস্কৃতি একমাত্র ফিউশনের মাধ্যমেই আসতে পারে। একটু চোখ মেলে দ্যাখ, দেখবি, চারদিকে ফিউশন। বড় ফ্ল্যাটের সামনের ফুটপাথে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকা মানুষ, দু'হাজার টাকা মাইনের জন্য ক্রেডিট কার্ড গুঁতিয়ে যাওয়া ছেলের দল। আরও কত কী ! আরে, ফিউশন ছাড়া কিছু হয়?’[১২৮]

স্মরণজিৎ এভাবেই স্পষ্ট করেন বিশ্বায়নের স্বরূপটিকে। চার বন্ধুকে নিয়ে তাঁর এই গল্পটি গড়ে ওঠে—কথক চরিত্র, রঘু, ডায়না এবং সুচির। রোজ তারা উপরিউক্ত কাফে তে আড্ডা দেয়। সুচির তাদের দলপতি। দেখা যায় সুচির ধীরে ধীরে দল থেকে আলাদা হয়ে পড়ছে। ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল পৃথিবীতে আসক্ত হয়ে পড়ছে সে। তার এতদিনকার রক্তমাংসের বন্ধুদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। সে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ভার্চুয়াল জগতে আলাপ হওয়া কোনো এক মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে ডেটিংয়ে। গল্পের শেষে তার ভুল ভাঙে। সে পুনরাবিষ্কার করে তার এতদিনের পুরানো বন্ধুদের হৃদয়ের উষ্ণতাকে, যা ভার্চুয়াল পৃথিবী থেকে নেমে আসা নতুন সম্পর্কটিতে একেবারেই অনুপস্থিত। সে সম্পর্ক কেবলই দেওয়া নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর এর মধ্যে দিয়ে উঠে আসে কীভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে বাস্তব মানুষের পৃথিবী থেকে তরুণ প্রজন্মের একাংশ মেতে ওঠে ভার্চুয়ালের নেশায়—

শীতের এমনই এক শেষ বিকেলে আমাদের আড্ডায় এসে সুচির গর্বের সঙ্গে বলল, “আজ একটা ফ্রেন্ডস ইন্টার-অ্যাকটিভ নেটওয়ার্কে জয়েন করলাম। আর আজই এমন একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল না! পুরো ফেটে গিয়েছে।”

... কফির কাপে ছোট্ট চুমুক দিয়ে বললাম, “তা, কেমন মেয়েটি? কথা হল ?”

“কথা ? কথা হবে কেন ? স্ক্র্যাপ করে আলাপ। একঘর মেয়ে।”[১২৯]

...সুচির পাত্তা না দিয়ে বলল, "মেয়েটার বিশাল ফ্যান ফলোয়িং। প্রায় বারো হাজার স্ক্র্যাপ। যা তা ব্যাপার। বুঝতেই পারছিস কী স্ট্যান্ডার্ডের মেয়ে !"

রঘু জিজ্ঞেস করল, "প্রথম দিনেই খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে, না?"

"খুব মানে ? খুব টু দি পাওয়ার টেন, রে। ওঃ, প্রায় দেড় ঘণ্টা স্ক্র্যাপে-স্ক্র্যাপে কথা হল। আমি তো আমার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে দিয়েছি।"

"তা, করেছে ফোন ?" ডায়নার গলার স্বরটা অন্যরকম ঠেকল আমার।...

"তোকে ওর মোবাইল নম্বর দিয়েছে?" আমি আবার চশমা ঠিক করলাম।

আগের চেয়েও এবার একটু বেশি থমকাল সুচির। তারপর সামান্য ড্যাম্পধরা গলায় বলল, "না... মানে... দেয়নি, তবে..."[১৩০]

আসলে সুচির আজকাল আমাদের স্কোয়্যার ওয়ানে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। বিকেলের ফ্রি-টাইমটা এখন ও সেই বন্ধু এঞ্জেলস টিয়ারের সঙ্গেই ওই অলক্ষুণে নেটওয়ার্কে গল্প করে কাটায়। ওর ঘরের কম্পিউটারের সামনে থেকে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও ওকে আমরা নাড়াতে পারিনি।

আগে যখন সুচির আমাদের সঙ্গে থাকত, পাড়ার কেউ আমাদের টিটকিরি দেওয়ার সাহস পেত না। কিন্তু এখন আমাদের অরক্ষিত পেয়ে মুদি দোকানের দেবুদা, সিডি লাইব্রেরির পুটাই বা সুপার লোটোর কার্তিক ব্যাপক আওয়াজ দেয়।[১৩১]

প্রযুক্তি শুধুমাত্র যে পণ্য হিসাবে বাজার দখল করেছিল, তাই নয়, বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তিবিদ্যা পড়বার প্রবণতাও বেড়ে গিয়েছিল পূর্বের তুলনায়। সেইকারণে স্মরণজিৎ-এর গল্পে উঠে আসে দক্ষিণ ভারতের শহরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাওয়া পড়ুয়াদের জগৎ--

আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে দূরে ছোট্ট পাহাড়ঘেরা এক জায়গায় আমাদের কলেজ। আমাদের ক্যাম্পাসে বয়েজ হস্টেল, গার্লস হস্টেল, সুইমিং পুল, জিমনাশিয়াম, লাইব্রেরি, সবই আছে। দেখলেই মনে হয় ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া কোনও ছবি। এই ছবির মধ্যে আমরা ছায়ার

মতো ঘুরে বেড়াই তটস্থ হয়ে। কারণ, ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট মানেই আসতে-যেতে সিনিয়রদের চড়চাপড়, গালিগালাজ খাওয়া। ভয় ধরানো র‌্যাগিং।[১৩২]

প্রযুক্তি যে মানুষের জীবনে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল এবং আবেগ-অনুভূতির জগতেও স্থান করে নিয়েছিল, স্মরণজিৎ-এর 'মিকি মাউসের গল্প'-এ সেই দিকটি উঠে এসেছে—

> 'তুমি খুশি থাকো। আমার পানে চেয়ে-চেয়ে খুশি থাকো'—গানটা ফাটাফাটি গাইছিল মিকি। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। তারপর আচমকা চিৎকার করে উঠল, "মওসম, তোমায় বলেছি না আমার মোবাইল ধরবে না। একটা কথা কতবার বলতে হবে?"
>
> মাসুদা থতমত খেয়ে মোবাইলটা নামিয়ে রাখল। প্রায় সন্ধেতেই আমাদের বাড়িতে একটা মিনি আড্ডা বসে। মিকি গান করে, সাহির ছ্যাবলামো করে, এরকমই আর কী। আজ হচ্ছিল রবীন্দ্রসংগীত। আর মিকির গানের কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাসুদা মিকির 'পানে চেয়ে-চেয়ে' খুশিই ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই মিকির এই বজ্রনির্ঘোষ। আসলে মোবাইলটা মিকির খুব সেনসিটিভ পজেশন। বাবা মারা যাওয়ার দু'দিন আগে ওটা মিকিকে কিনে দিয়েছিল। একবার অফিসের কেউ একজন মোবাইলটা হাত থেকে ফেলে খারাপ করে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে সারানো গিয়েছে। তারপর থেকেই মিকি ওটা কাউকেই ধরতে দেয় না। এমনকী, মা'কেও না।[১৩৩]

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর *প্রেমের উনিশ-কুড়ি* (আনন্দ, ২০১৬) গ্রন্থটির প্রচ্ছদ দর্শনেই বোঝা যায়, প্রযুক্তি ছোটোগল্পের উপরে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ এই গ্রন্থটির প্রচ্ছদে অঙ্কিত রয়েছে বর্তমান সময়ের মেসেজিং অ্যাপ 'হোয়াটসঅ্যাপ'-এর চিহ্ন। আর সেই চিহ্নটির মাঝখানে উপস্থিত রয়েছে অসংখ্য ইমোজি। এ থেকেই কিছুটা হলেও এ গ্রন্থের গল্পের মেজাজ বোঝা যায়। প্রযুক্তিনির্ভর সময়ের চিহ্ন উঠে আসে এ গ্রন্থের গল্পের নামকরণেই। তারই অনুপুঙ্খ ধরে রাখে 'সেলফি' নামক গল্পটি—

“তোর এই মোবাইলটা থেকেই আলেকজান্ডার কি পুরুর সঙ্গে কথা বলেছিল?” বিটু বিরক্ত হয়ে তাকাল আমার দিকে, “এই যুগে কেউ এমন ফোন ইউজ করে? সেই দু’হাজার দুই সালের মডেল ! শালা, এটাকে মিউজিয়ামে দিয়ে দে আর তুইও তার পাশের কোনও কাচের বাক্সে ঢুকে বসে থাকিস। লোকে টিকিট কেটে দেখবে!”[১৩৪]

আমি দেখলাম, গোটা কোচিংয়ের ছেলেমেয়েগুলো ওর সঙ্গে নিজের নিজের মোবাইলে সেলফি তোলার ধুম লাগিয়ে দিয়েছে।...

বিটু বলল, “কী রে, তুই তুলবি না ?”

বিটু জানে, আমি মৌসেনার সম্বন্ধে কী ফিল করি। তাই ওর কথার ভিতরের ছোট্ট পিনটা ধরতে পারলাম। বললাম, “না, সেলফি খুব সেলফিশ ব্যাপার।”

বিটু হাসল, “খোকা, নাগালের বাইরের আঙুরের টেস্টটা যেন কেমন ! এমন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি টাইপের মোবাইলে সেলফি ওঠে? ...[১৩৫]

মউ কিছু না বলে এগিয়ে এল এবার। তারপর আচমকা আমার হাত ধরে টেনে নিজের কাছে নিয়ে বলল, “বলছি, বিটুর মোবাইলে তুলব না। তোর সঙ্গে আমি আমার মোবাইলে তুলব, সেলফি। রেখে দেব তোকে আর তোর ছবিকে। আয়। আর একটু হাস এবার। প্লিজ!”

সেলফি যতই সেলফিশ ব্যাপার হোক, আসলে ততটাও খারাপ জিনিস নয়...[১৩৬]

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পে এভাবেই প্রযুক্তি তার ভালো-মন্দ সহকারে বারে বারে উঠে এসেছে। তাঁর লেখা ছোটোগল্পে জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী পুঁজি-পরিচালিত আধুনিক সময়ের প্রযুক্তিকেন্দ্রিক শব্দাবলি।

৩.১৮॥

বিশ্বায়নের সুফল মানুষের মধ্যে যোগাযোগের প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যমগুলিকে অত্যন্ত উন্নত করে তুললেও মানুষে মানুষে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। উপার্জনের তাগিদে পরিবার ও সমাজের এতদিনের গঠনটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার ব্যক্তিসম্পর্কের বদল ঘটিয়ে দিচ্ছে। ছোটোগল্পকাররা দ্রুত বদলে যাওয়া এই ঘটনাসমূহকেই যেন খণ্ড খণ্ড ছবির আকারে তুলে ধরেছেন। তাঁরা মানুষের মননের গভীর থেকে জটিল রহস্যগুলিকে গল্পে হাজির করে চলেছেন অক্লান্তভাবে। নতুন প্রকাশভঙ্গী, ভাষারীতি এবং শব্দব্যবহারের অভিনবত্বে বিশ্বায়ন পর্বের আগে লেখা ছোটোগল্পের সঙ্গে এইপর্বের ছোটোগল্প হয়ে উঠছে পৃথক। প্রবীণ থেকে নবীন প্রজন্মের একাধিক ছোটোগল্পকারের গল্পে সেই অভিনবত্বই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই অধ্যায়ে আলোচ্য ছোটোগল্পকারদের বেশ কয়েকজন আদর্শগতভাবে মূলত লিটিল ম্যাগাজিনে লেখালিখি করতেন, কিংবা এখনো করে চলেছেন। তাঁদের লেখা ছোটোগল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তিনির্ভরতার বিপদের একাধিক দিক। এ সম্পর্কে তাঁদের লেখা ছোটোগল্পগুলি কিছুটা হলেও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে। তাঁদের ছোটোগল্পে রয়েছে পুঁজির সীমাহীন বিস্তার এবং তার ফলে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ব্যতিক্রমী জীবনধারাসমূহের ধ্বংসের বিরোধিতা। অন্যদিকে যে গল্পকাররা লিটিল ম্যাগাজিনের পাশাপাশি বৃহৎ মিডিয়া হাউসের হয়ে লেখেন, তাঁদের লেখায় কিছুটা হলেও খুঁজে পাওয়া যায় ধনতান্ত্রিক পুঁজি ব্যবস্থার প্রসার কিংবা প্রযুক্তির আগমনকে স্বাগত জানানোর মনোভাব। আলোচ্য সময়ের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনসমূহকে তাঁরা তরুণ প্রজন্মের নিরিখে তুলে ধরেছেন তাঁদের গল্পে। একারণে তাঁদের গল্পগুলি কিছুটা হলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসারের ক্ষেত্রে ধনাত্মক অনুঘটকের কাজ করেছে বলে

মনে করা যায়। তবে এতৎসত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, লিটিল ম্যাগাজিনে দীর্ঘদিন ধরে লিখে আসা ছোটোগল্পকারদের পাশাপাশি বৃহৎ মিডিয়া হাউসের ছোটোগল্পকারদের গল্পেও ধরা পড়েছে গভীরতর মানবিক মূল্যবোধের কথা কিংবা চেতনাসমূহ। তাঁদের জীবিকা বৃহৎ পুঁজির উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল হলেও তাঁরা মানবিক মূল্যবোধ থেকে সরে যাননি, বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একরকম সমালোচনা কিংবা অপূর্ণতার দিকগুলি উঠে এসেছে তাঁদের লেখায়।

উল্লেখপঞ্জি:

১. https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_India Accessed on 22/09/2019 at 7.15 pm

২. https://www.news18.com/news/tech/on-this-day-20-years-ago-the-first-mobile-phone-call-was-made-in-india-1028471.html Accessed on 22/09/2019 at 7.37 pm

৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_India Accessed on 22/09/2019 at 8.12 pm

৪. লাহিড়ী, সৌমিত্র, 'তথ্যপ্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন', *তথ্যপ্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন*, সৌমিত্র লাহিড়ী, মানসপ্রতিম দাস (সম্পা.), কলকাতা: একুশশতক, ২০০২

৫. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *গল্পসমগ্র ১*, কলকাতা: করুণা ২০১০

৬. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'লেখক পরিচিতি'(ব্লার্ব), *বাছাই ৪৯*, কলকাতা: একুশ শতক ২০১৫

৭. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'কাহিনির মরীচিকায় পাঠকের চৈতন্য', *গল্প ৫০*, কলকাতা: প্রকাশভবন ২০০৯

৮. মণ্ডল, বরেন্দু, 'আখ্যানের ভাঙাগড়া ও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প', *শুভশ্রী: ছোটোগল্পকার: স্মরণে-বিস্মরণে*, শান্তনু সরকার (সম্পা), ১৪১৮, পৃষ্ঠা ৪৫৩

৯. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'মাংসখেকো ঘোড়া', *গল্প ৫০*, কলকাতা: প্রকাশভবন ২০০৯, পৃষ্ঠা ১১

১০. পূর্বোক্ত

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

১২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'খেলার খোঁজে', *গল্প ৫০*, কলকাতা: প্রকাশভবন ২০০৯, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৮-৯০

১৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'পটভূমি বদলে যায়', *গল্প ৫০*, কলকাতা: প্রকাশভবন ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৮৯

১৫. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'মরুদ্যানের মূল্যতালিকা', *গল্প ৫০*, কলকাতা: প্রকাশভবন ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৬১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৪

১৭. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর, 'লেখক পরিচিতি'(ব্লার্ব), *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দেজ, ২০১১

১৮. বসু, অরুণকুমার, 'ভূমিকা', *সেরা ৫০টি গল্প*, ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: দেজ, ২০১১

১৯. পূর্বোক্ত

২০. রায়, দেবেশ, 'ভূমিকা', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: দে'জ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৩-১৪

২১. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর, 'ওল্ড ব্লক নিউ ব্লক', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: দে'জ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২০৬-২০৯

২২. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর, 'আত্মগোপনের আপনজন', *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দেজ, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৪৯-৩৫০

২৩. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর, 'প্রধানমন্ত্রীর সড়ক...', *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দেজ, ২০১১, পৃষ্ঠা ২৯৮-৩০০

২৪. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর, 'সহবাসী', *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দেজ, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৩২

২৫. দাস, বিপুল, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৯

২৬. দাস, বিপুল, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৯

২৭. দাস, বিপুল, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৯

২৮. দাস, বিপুল, 'তাপ একপ্রকার শক্তি', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১২, পৃষ্ঠা ২০-২১

২৯. দাস, বিপুল, 'বীজ', *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, ২০১২, পৃষ্ঠা ৭৬, ৮০

৩০. দাস, বিপুল, 'সর্পদংশন', *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৭৩, ১৭৮, ১৮০

৩১. দাস, বিপুল, 'পাগলানিমের ক্লিভেজদর্শন', *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৮৭

৩২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *সেরা ৫০টি গল্প,* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১১

৩৩. 'একটি সতর্কতামূলক রূপকথা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮

৩৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'আর্সেনিকভূমি', *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা ৫৪

৩৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'ঝড়ের পাতা', *সেরা ৫০টি গল্প,* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১১, পৃষ্ঠা ১৯৮

৩৭. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা: দে'জ, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫১

৩৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'মোবাইল সোনা', *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭

৩৯. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'ব্লু সি. ডি. নিয়ে একটি গল্প', *সেরা ৫০টি গল্প,* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১১, পৃষ্ঠা ২২৪

৪০. মিত্র, অমর, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দেজ, ২০১২

৪১. মিত্র, অমর, 'ভূমিকা', *২১টি গল্প,* কলকাতা: সৃষ্টিসুখ, ডিসেম্বর ২০১৯

৪২. মিত্র, অমর, 'চাঁচর', *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দেজ, ২০১২ পৃষ্ঠা ১১-১৭

৪৩. মিত্র, অমর, 'অন্ন', *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দেজ, ২০১২ পৃষ্ঠা ১০৪

৪৪. মিত্র, অমর, ‘পতিগৃহে যাত্রা’, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: দেজ, ২০১২ পৃষ্ঠা ১০৯

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১২

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৪

৪৭. মিত্র, অমর, ‘ভারতবর্ষ থেকে ভারতবর্ষে’, *২১টি গল্প*, কলকাতা: সৃষ্টিসুখ, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৭০

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭১-১৭২

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৪

৫০. রায়, কিন্নর, ‘টেকনোলজি, টেকনোলজি’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ৪৭৯-৪৮০

৫১. রায়, কিন্নর, ‘মণ্ডুককথা’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৪৫

৫২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭

৫৩. রায়, কিন্নর, ‘বরফের গায়ে আগুন’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৩

৫৪. রায়, কিন্নর, ‘প্রহেলিকা সিরিজ’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ১২৪

৫৫. রায়, কিন্নর, ‘বাঞ্ছাকল্পতরু’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ৫৯

৫৬. পূর্বোক্ত

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬

৬০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, ‘লেখক পরিচিতি’ (ব্লার্ব), *গল্প ৫১*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০১৭

৬১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, ‘স্পর্শ’, *গল্প ৫১*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০১

৬২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, ‘ভাবের ঘর’, *গল্প ৫১*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৬৭

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৩

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৪

৬৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, 'আলোর তরবারি', *গল্প ৫১*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৯৩

৬৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, 'ইহাদের কথা', *গল্প ৫১*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৩৫-৪৩৯

৬৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, 'মায়েরা', *গল্প ৫১*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৫১-৫৬৭

৬৮. গুপ্ত, প্রচেত, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১০

৬৯. গুপ্ত, প্রচেত, 'মোবাইল', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৩৫

৭০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭

৭১. গুপ্ত, প্রচেত, 'ইমেল বিছানো পথে', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১

৭২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭২

৭৩. গুপ্ত, প্রচেত, 'কৃষ্ণচূড়া', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১০, পৃষ্ঠা ২৭৪

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৮

৭৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'একটা আষাঢ়ে গল্প', *গল্পগুচ্ছ* ১, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১১, পৃষ্ঠা ৮২

৭৬. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬

৭৭. পূর্বোক্ত

৭৮. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, 'ছবির মুখ', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৬২

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬৩

৮০. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, 'শোধ', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৪৬৩

৮১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬৫-৪৬৬

৮২. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, 'উপার্জন', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৯-৬৬

৮৩. দত্ত, সুকান্তি, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: অভিযান, জানুয়ারি ২০২০

৮৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'যেখানে সুকান্তি দত্ত ছোটোগল্পে স্বতন্ত্র', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, সুকান্তি দত্ত, কলকাতা: অভিযান, জানুয়ারি ২০২০

৮৫. পূর্বোক্ত

৮৬. দত্ত, সুকান্তি, 'পর্নোগ্রাফির দিনরাত', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: অভিযান, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ১৩৩

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭

৮৮. দত্ত, সুকান্তি, 'হত্যাকাণ্ডের আনুপূর্ব', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: অভিযান, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ১৪২

৮৯. দত্ত, সুকান্তি, 'গল্প@ফেসবুক', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: অভিযান, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ২৪২

৯০. পূর্বোক্ত, ২৪৩

৯১. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *গল্প সংগ্রহ*, কলকাতা: আনন্দ, ২০২০

৯২. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'অমরাবতী ও সেরা পুতুলের গল্প', *ঋ*, কলকাতা: আনন্দ ২০০৩, পৃষ্ঠা ৭১

৯৩. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'অনুচ্চারিত', *গল্প সংগ্রহ*, কলকাতা: আনন্দ, ২০২০, পৃষ্ঠা ১

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭

৯৫. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'শোকসন্তাপ', *গল্প সংগ্রহ*, কলকাতা: আনন্দ, ২০২০, পৃষ্ঠা ৬৫

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

৯৮. বসাক, তৃষ্ণা, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *নির্বাচিত পঁচিশটি গল্প*, কলকাতা: একুশশতক, এপ্রিল ২০১৪

৯৯. বসাক, তৃষ্ণা, 'বার্তা', *দশটি গল্প*, কলকাতা: পরশপাথর, পৌষ ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২০

১০০. 'আউট অফ রিচ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১

১০১. বসাক, তৃষ্ণা, 'বিপন্নভাষ', *ছায়াযাপন*, কলকাতা: একুশশতক, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৮

১০২. বসাক, তৃষ্ণা, 'পিঁপড়ের পায়ের শব্দ', *নির্বাচিত পঁচিশটি গল্প*, কলকাতা: একুশশতক, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৬৪

১০৩. বসাক, তৃষ্ণা, 'ভার্চুয়াল মূর্ছনা', *গল্প ৪৯*, কলকাতা: কৃতি, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩২৬

১০৪. মল্লিক, উল্লাস, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৯

১০৫. মল্লিক, উল্লাস, 'ফোনটা বাজছে', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা ১২০

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩-২৪

১০৮. মল্লিক, উল্লাস, 'হঠাৎ রাতের ফোন', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৭১

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৭

১১০. হালদার, তন্বী, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৬

১১১. আনসারউদ্দিন, 'ভূমিকা নয়, ভূমিতলের কথা', *মজুররত্ন*, তন্বী হালদার, কলকাতা: গুরুচণ্ডা৯, ২০১৯

১১২. হালদার, তন্বী, 'বৃহন্নলা', *জালাঙ্গীর গান অথবা গোখরো সাপের ভয়*, কলকাতা: উবুদশ, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৫১

১১৩. হালদার, তন্বী, 'জ্যোৎস্না-প্রেম', *খুকি ও নিশিপদ্ম*, কলকাতা: উবুদশ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৪০

১১৪. 'ফিমেল ওয়ার্ড', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭০

১১৫. হালদার, তন্বী, 'জীবনবাবুর জীবনলিপি', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৬ পৃষ্ঠা ১৬৫-৬৬

১১৬. 'কৃষ্ণগহ্বরে একাকী আমি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৬-৩৭

১১৭. ঘোষাল, বিনোদ, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, জুন ২০১৯

১১৮. ঘোষাল, বিনোদ, 'খেলনাবাটি', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১১৫

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬

১২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬-১৭

১২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৯

১২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৯-২০

১২৩. ঘোষাল, বিনোদ, 'মূক ও বধিরদের জন্য একটি বিকেল', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৫৩

১২৪. ঘোষাল, বিনোদ, 'আপ ব্যান্ডেল লোকালে কয়েকজন', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২২

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩

১২৭. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *উনিশ কুড়ির প্রেম*, কলকাতা: আনন্দ, নভেম্বর ২০০৮

১২৮. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, 'একা এবং তিনজন', *উনিশ কুড়ির প্রেম*, কলকাতা: আনন্দ, নভেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা ১০৪

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৫-০৬

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭-০৮

১৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯

১৩২. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, 'র‍্যাগিংয়ের দিনগুলোয় প্রেম', *উনিশ কুড়ির প্রেম*, কলকাতা: আনন্দ, নভেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৮

১৩৩. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, 'মিকি মাউসের গল্প', *উনিশ কুড়ির প্রেম*, কলকাতা: আনন্দ, নভেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা ৪০

১৩৪. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, 'সেলফি', *প্রেমের উনিশ-কুড়ি*, কলকাতা: আনন্দ, নভেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা ১০৭

১৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮

১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১০

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্বায়ন, চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র ও বাংলা ছোটোগল্প

১৯৯১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতে বিশ্বায়নের সূত্রপাত ঘটেছিল। বিদেশি পুঁজির অবাধ বিস্তার, দেশি পুঁজির বহুজাতিক হয়ে ওঠার এই বিশ্বায়নের প্রকৃতি ছিল মূলত অর্থনৈতিক। বলা যায়, এই বিশ্বায়নের প্রভাব এসে পড়েছিল বহুতর ক্ষেত্রে, যার অন্যতম ছিল স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র।

৪.১॥

বিশ্বায়নের ফলে ভারতের চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। প্রযুক্তি সেক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। একদিকে মেডিক্যাল ট্যুরিজম-এর বৃদ্ধি যেমন এর ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, অন্যদিকে একাধিক দেশের মধ্যে চিকিৎসক, নার্স কিংবা মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানদের চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সম্পর্কে অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী তাঁর *Globalization and Health Sector in India* (DEEP & DEEP, 2009) গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> Globalization has brought in, over the past decade, a spurt in technological advances and emergence of new forms of business opportunities, process and organizations, impacting a wide range of sectors including healthcare. Globalization of health services involves various modes of transaction. It involves cross-border electronic delivery, such as telediagnosis, teleconsultations, and transmission of medical images. As well as traditional shipments of medical

> reports and samples and, more recently, outsourcing of clinical trials. It also involves cross-border movement of consumers to avail of healthcare services in another country, often because such treatment is not available or is too expensive in the patient's home country. These may also be combined with tour packages, giving rise to the term 'medical tourism', and focusing attention on countries like Thailand, aggressively marketing it. Globalization of health sector is also evident from the growing foreign equity participation in this sector and establishment of joint ventures, alliances and management tie-ups among care establishments, resulting in the transfer of technology, skills and practices. Finally, there is the global movement of doctors, nurses and technicians, and the resulting networks of healthcare professionals that are sources of investment and know how.[১]

দেখা যায়, বিশ্বায়নের ফলে এইভাবে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রটি বাণিজ্যিক হয়ে ওঠার পাশাপাশি বেশ কিছু পরিমাণে উন্নতও হয়ে উঠেছিল। তবে এই উন্নতির সুযোগ কারা কী পরিমাণে পেয়েছিলেন, তা আরও বিস্তৃত আলোচনাসাপেক্ষ।

৪.২॥

বিশ্বায়ন পরবর্তী ভারতে পুঁজির প্রসার ঘটেছে যে যে ক্ষেত্রে, তার অন্যতম ছিল পর্যটনশিল্প। আর অনেকরকম পর্যটনের মধ্যে অন্যতম হল চিকিৎসাপর্যটন বা মেডিক্যাল ট্যুরিজম। ভারতে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই মেডিক্যাল ট্যুরিজম। এর অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় পূর্বোক্ত সময়পর্বে ভারতে চিকিৎসাক্ষেত্রের দ্রুত বেসরকারিকরণ। একদিকে এই ক্ষেত্রটিতে দেশি বিদেশি পুঁজির দ্রুত বিনিয়োগ ঘটেছিল, অন্যদিকে সরকারিভাবে

খুব স্বল্প প্রতিদানের বিনিময়ে এই বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতে থাকে। প্রকৃত অর্থে দেশের জনগণ নবকলেবরে বৃদ্ধি পাওয়া এই স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্র থেকে তেমন কিছুই সুবিধা পায়নি, বরং পরোক্ষে তা মেডিক্যাল ট্যুরিজমের বৃদ্ধি সূচিত করেছিল। একাধিক দেশের স্বাস্থ্যপর্যটকরা তাদের নিজেদের দেশের তুলনায় কম খরচে চিকিৎসার সুযোগ নেওয়ার জন্য ভারতে আসতে শুরু করে। এই পর্যটকদের আসার অন্যতম কারণ হিসাবে যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করা যায়, তা হল সারোগেসি। এক্ষেত্রে নিঃসন্তান বিদেশি দম্পতিরা এদেশে এসে স্বল্প অর্থের বিনিময়ে সন্তানধারণে সক্ষম কোনো মহিলার গর্ভ ভাড়া নিয়ে 'টেস্ট টিউব' পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তানধারণ করিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সেই সন্তানকে নিয়ে চলে যেতেন। এতে মানবিক, নীতিগত এবং আইনি অনেক প্রশ্ন তৈরি হতে শুরু করে। তবে শুধু দেশের বাইরে থেকে আসা বিদেশি মানুষরাই নয়, দেশের অভ্যন্তরেও নিঃসন্তান দম্পতিদের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যেতে থাকে। উচ্চ অর্থনৈতিক স্তরের মানুষ এভাবেই ব্যবহার করতে শুরু করে নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষদের। অন্যদিকে দেশের মানুষদের ভরসা কিংবা বিশ্বাস হারাতে শুরু করে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি। খুব স্বল্প সামর্থ্যের মানুষজনও চিকিৎসার প্রয়োজনে ভিড় করতে থাকে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কিংবা ছোটো ছোটো নার্সিংহোমগুলিতে। অন্যদিকে এইসময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও বেড়েছিল স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ পূর্বের তুলনায় বেশি পরিমাণে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। মানুষের সচেতনতার পাশাপাশি গণমাধ্যমে পূর্বের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞাপন এই পর্বে দেখা গিয়েছিল, যেগুলি ছিল স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রে মানুষকে আকৃষ্ট করে তোলার একরকম উপকরণ। যার ফলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মানুষের

সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আরও বেশি পরিমাণ উপভোক্তা তৈরি হয়ে যায় এই ক্ষেত্রটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার জন্য।

১৯৯১ পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা-ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ কীভাবে দেশের মানুষের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, তা তুলে ধরেছেন পেশায় চিকিৎসক বিষাণ বসু, তাঁর *কিনে আনা স্বাস্থ্য* (ধানসিড়ি, অক্টোবর ২০২০) গ্রন্থে—

> মোটামুটি বিগত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকেই, দেশে আর্থিক উদারবাদের পদার্পণের পাশাপাশিই, এদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বৃহৎ পুঁজির রমরমা শুরু। না, চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রাইভেট সেট-আপ তার আগেও ছিল, কিন্তু সে ছিল মূলত প্রাইভেট চেম্বার বা ছোটো-মাঝারি নার্সিং হোম। দেশীয় বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন নার্সিংহোম যে ছিল না, এমন নয়। কিন্তু, সে প্রায় ব্যতিক্রম। বৃহৎ পুঁজি, বা এককথায় সিরিয়াস কর্পোরেট মানি-র আনাগোনা ওই নব্বইয়ের আশপাশেই। পরবর্তী তিনটি দশকে দেশের চিকিৎসার চালচিত্রে বদলটি লক্ষ্যণীয়।
>
> ১. একদিকে, চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাবনীয় উন্নতি। বিশ্বের প্রায় সেরা মানের চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো বা সমতুল টেকনোলজি এখন মেলে যে-কোনো মেট্রো শহরে।
>
> ২. চিকিৎসার লাগামছাড়া ব্যয়। প্রাণে মারা যাওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে ধনেপ্রাণে মারা যাওয়ার সংখ্যা কিছু কম নয়। স্রেফ চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রতিবছর দেশের কয়েক লক্ষ মানুষের নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যাওয়ার যে-বাস্তবতা, তার পিছনে এই অর্গ্যানাইজড প্রাইভেট হেলথকেয়ারের অবদান কিছু কম নয়।
>
> ৩. চিকিৎসকদের সামাজিক অবস্থানের অবনতি। বা, এককথায় বলতে গেলে, প্রায় অযাচিত যে সামাজিক সম্মান চিকিৎসকেরা পেতে অভ্যস্ত ছিলেন বহু শতাব্দী যাবত, সেই সম্মানটি থেকে চিকিৎসকেরা বঞ্চিত হতে শুরু করলেন—বলা ভালো, প্রায় নির্বিচারে চিকিৎসকেরা পেশাগতভাবে অসম্মানিত হতে শুরু করলেন।[২]

এই উদ্ধৃতিতে কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসাব্যবস্থার স্বরূপকে তুলে ধরার পাশাপাশি লেখক এর দ্বারা মানুষের দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যাওয়ার মতো একটি কঠোর সত্যকে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে তিনি এইরকম একটি ব্যবস্থায় চিকিৎসকের প্রকৃত অবস্থানটিকেও তুলে ধরেছেন—

> মজার ব্যাপার হল, নগ্ন এই শোষণের ব্যবস্থায়—অনেকসময় শোষকের মুখটি থাকে অন্তরালে। শোষণ জারি থাকে যে-মুখকে সামনে রেখে, তিনিও শোষিত।... কখনও ভেবে দেখেছেন, কর্পোরেট মালিক মুনাফা আদায় করলেও, সামনে যাঁর মুখ থাকে, শোষক বনাম শোষিতের বাইনারিতে তাঁর অবস্থান ঠিক কোথায়? হ্যাঁ, আমি চিকিৎসকের কথা বলতে চাইছি। শুনতে অবাক লাগলেও, বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার মুনাফা অর্জনের মুখ্য হাতিয়ার এবং মুখ যে-চিকিৎসক, তিনিও নির্মম শোষণের শিকার। কর্পোরেট প্রভুর শেয়ারের দাম চড়চড় করে বাড়তে থাকলেও তাঁর বেতন বাড়ে না তেমনভাবে, তাঁর নাম করে ব্যবসা হলেও রোগীর চিকিৎসাব্যয়ের দশ কি পনেরো শতাংশ জোটে তাঁর ভাগ্যে, বিভিন্ন তথাকথিত জনকল্যাণ প্রকল্পে হাসপাতাল যোগ দিলে তাঁর সেই প্রাপ্য ভাগ গিয়ে ঠ্যাকে চার কি পাঁচ শতাংশে, তাঁর আয়ের এবং চাকরির বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই, এবং হাসপাতালের কর্মপদ্ধতির ওপরে তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকা তো দূরের কথা, নিজের চাকরিটি নিয়ে অনিশ্চিত চিকিৎসকের পক্ষে নিজের কণ্ঠস্বরটি শোনানোর ন্যূনতম সুযোগটুকুও নেই।[৩]

বলাই বাহুল্য, যে বিশ্বায়ন-ব্যবস্থা চিকিৎসাপরিষেবাক্ষেত্রের দুই প্রধান অংশীদার রোগী কিংবা চিকিৎসককে অপ্রধান করে দিয়ে প্রধান করে তুলেছিল কর্পোরেট পুঁজির মালিকদেরকে। এর ফল যে ভয়াবহ হয়েছিল তা লেখকের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উঠে এসেছে।

এইরকম একটি বিশ্বায়ন-প্রভাবিত সময় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রটিকেও অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রভাবিত করেছিল। বহু পুরানো সময় থেকেই স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রটি ছিল মানুষের কৌতূহল এবং সমীহের জায়গা, বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও এই ক্ষেত্রটি প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে থাকে। সেজন্য মানবজীবনে

এর প্রভাব কিংবা একে কেন্দ্র করে মানুষের মননের জগতটি কেমনভাবে ক্রিয়াশীল হচ্ছে বা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে, তা তুলে ধরেছেন সাহিত্যিকরা। বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই এই অধ্যায়ে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রটিকে যে যে ছোটোগল্পকার তাঁদের ছোটোগল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের কিছু প্রাসঙ্গিক গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রকৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.৩॥ **ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়**

লেখক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৪৮) সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সেজন্য তাঁর সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে একথা বলা যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে অন্যান্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি উঠে এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জনজীবন। ডায়মন্ড হারবারে জন্মগ্রহণ করা এই লেখকের কলমে সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাশাপাশি উঠে এসেছে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের যাপিত জীবনের একাধিক দিক। ট্রলারে করে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবী, ভাঙা জাহাজ পাহারা দেওয়া কলেজ পড়ুয়া যুবক, গ্রামীণ এলাকার ভিডিও হলের মালিক প্রমুখ বহুমুখী চরিত্রের অনুপুঙ্খ ধরা পড়েছে তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে। পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা, পঞ্চায়েত ভোটে নারী প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ, ভোটে যাওয়া সরকারি কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা কিংবা আয়লা আক্রান্ত মানুষের ত্রাণসামগ্রী গ্রহণের টুকরো চিত্র প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ তাঁর ছোটোগল্প পাঠকের সামনে এক অন্য ভারতের কথা হাজির করে। সেই ভারত নাগরিক পরিষেবা থেকে অনেক দূরে বাস করে। একটা ভিডিও হল খোলার জন্য

যুবতী নারীকে নিজের সন্তানধারণের অক্ষমতার কথা অফিসে অফিসে জানিয়ে বেড়াতে হয় অনুকম্পা আদায়ের জন্য। ঝড়েশ্বর তাঁর গল্পে তুলে ধরেন এমনই সব জগতের কথা।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে ভারতে পুঁজির প্রসার এবং পুঁজি অনুসারী উন্নয়ন মূলত নগরকেন্দ্রিক। চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের নিরিখে এই কথা আরো বেশি করে অনুভব করা যায়। বৃহৎ পুঁজিনির্মিত বড়ো বড়ো হাসপাতালগুলি প্রায় সবই মেগাসিটি কিংবা সিটি সমূহে অবস্থিত। গ্রামীণ ভারতের চিকিৎসাপরিষেবা প্রায় মধ্যযুগেই পড়ে রয়েছে। উদার অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার তিন দশক পরেও ভারতের যে কোনো মূল শহর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে গেলেই যে গ্রাম কিংবা মফসসল পাওয়া যাবে, সেখানে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের যথাযথ ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারের অভাব অনুভূত হবে। গ্রামীণ ভারত এখনও হাতুড়ে ডাক্তার, ডিগ্রিবিহীন হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, কবিরাজ কিংবা ওঝা-গুণিনের উপরে নির্ভরশীল। নাগরিক জীবনের স্বাদ পাওয়া চিকিৎসকেরাও সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চাকরি করার ব্যাপারে প্রায় উৎসাহহীন। অথচ এর বিপরীতেই মহকুমা শহর কিংবা মেগাসিটিগুলিতে চিকিৎসা-পরিষেবাকেন্দ্র এবং চিকিৎসকের প্রাচুর্য। অবশ্যই তা বেসরকারি উদ্যোগে। সে কারণেই ভিটেমাটি বিক্রি করে হলেও সাধারণ মানুষের গন্তব্য হয়ে ওঠে বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহকুমা সংলগ্ন কিংবা মফসসলের বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নার্সিংহোমগুলি একজন বা দু'জন অস্থায়ী চিকিৎসক নির্ভর। যাঁরা অন্য বহু কাজ সামলানোর পাশাপাশি এই নার্সিংহোমগুলি চালান। এইরকম পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ এলাকার চিকিৎসাপরিষেবাক্ষেত্রের একাধিক অনুপুঙ্খ গল্পের কাহিনিপ্রসঙ্গে উঠে এসেছে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কলমে। এর মাধ্যমে অনুমান করে নেওয়া যায় গ্রামীণ ভারতের মানুষ চিকিৎসাপরিষেবা থেকে কীভাবে বঞ্চিত, কিংবা কোন ধরনের চিকিৎসাপরিষেবা কতখানি আর কীভাবে পেয়ে থাকে। এইরকমই একটি গল্প 'নব পর্যায়ে

প্রতিবেশী' (সাপ্তাহিক *বর্তমান*, ১৯৯৫)। এ গল্পে উঠে এসেছে গ্রামীণ বিনোদন, ভিডিও হল, উপার্জনের তাগিদে একাধিক পেশা গ্রহণ করা গ্রামীণ শিক্ষক আর গ্রামে পোস্টিং হওয়া পুলিশ অফিসারের কথা। বিনয় মাস্টার ভিডিও হল চালায়, প্রমোদ মাস্টার শিক্ষকতার পাশাপাশি ডাক্তারিও করে। হাইস্কুলের অবনী মাস্টার নতুন ভিডিও হল খোলার উদ্যোগ নেয়। থানার এ.এস.আই. মুখার্জী সব কিছু তদারক করে বেড়ায়। তাকে সবাই সমীহ করে। পুলিশ বলে কথা। এ গল্পের কাহিনি থেকে গ্রামীণ চিকিৎসাপরিষেবার আভাস পাওয়া যায়—

> স্টিল চামচেয় অমলেট কাটে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর। গালে পুরে দেয়। মা ভাবে, এত বড়ো পুলিশ অফিসার আমাদের বাড়িতে বসে গল্প করে। পড়শি অমর মাস্টাররা তো সইতে পারেনি। দু-তিন টুকরো অমলেট চিবিয়ে মুখার্জি বলে, প্রমোদবাবু—
>
> —বলুন স্যার?
>
> —ইস্কুল তো আছেই। আপনার প্র্যাকটিস, পেশেন্ট কেমন হচ্ছে?
>
> —স্যার যা ওষুধপত্তরের দাম বাড়ছে স্যার। লোকে রোগী বাঁচাবে কী? আর সংসার রক্ষা করবে কী? পেটেন্ট আইনে কী সব প্যাঁচ! তিন দিনও যায় না দাম বাড়ে একই ঔষধের।
>
> —কেন? খুব তো বাগদা, কাঁকড়া ধরছে লোকে। বিদেশে বাগদার বাজার ভালো। দেশে দাম তো জোর--?[৪]
>
> মুখার্জি সাহেব এগোয়। হাওয়াই চটির ফটাস ফটাস শব্দে পা মেলায় প্রমোদ মাস্টার। পাকা গাঁথনি দোকানঘরে আলমারি ভর্তি ওষুধ। রোগী, লোকজনের ভিড়। মুখার্জি পথ চলতে চলতে শুধোয়, ওটা কার ডাক্তারখানা মাস্টারমশাই? বেশ ঝকমকে তো?
>
> মনে বড্ড লাগে। তবু তো বুকের জ্বালা মেটায় প্রমোদ মাস্টার মুখের বাক্যে, ওই দেবনগর হাসপাতালের রিটায়ার্ড কম্পাউন্ডার ডাক্তারখানা খুলেছে। যত রোগী তো সার ওখানে..[৫]

শহরের অলিতে গলিতে উপযুক্ত ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারের যেখানে ছড়াছড়ি, সেখানে গ্রামীণ চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রটি অবহেলায় নিমগ্ন। কম্পাউন্ডাররাই সেখানে ডাক্তারখানা খোলেন। গ্রামীণ মানুষেরও উপায় থাকে না হাতে কলমে সামান্য কিছু চিকিৎসাবিদ্যা শিখে প্রায় অনেকটাই আন্দাজে চিকিৎসা চালানো এই ডিগ্রিবিহীন হাতুড়ে ডাক্তারদের উপর ভরসা করা ছাড়া। এ গল্পের শেষে দেখা যায় এত কিছু উপার্জনের চেষ্টা করেও কিছুটা ব্যর্থ প্রমোদ মাস্টার ডাক্তারির আড়ালে লুকিয়ে মদের ব্যবসা করে বেশি উপার্জনের আশায়। নতুন অর্থনীতিতে মূল্যবোধকে অতিক্রম করে অর্থই এইভাবে হয়ে ওঠে মূল লক্ষ্য—

> প্রমোদ মাস্টার সোজা ওষুধপত্তর রোগী দেখার চেম্বারে ঢুকে যায়। আলমারির পাল্লা খোলে। হাতের টর্চ জ্বেলে ভিটামিন টনিক, কাফ সিরাপ, লিভ ফিফটি টু ক্যাপসুলের প্যাকেট, ট্যাবলেটের পলিথিন, ডিবের ভিড়ে, জিনিস দুটো খোঁজে।
>
> বউ বলে, কী গো? কী?
>
> কোনো উত্তর না দিয়ে তিন-শো পঁচাত্তর এম.এল অ্যারিস্টোক্র্যাট বোতলটা হাতড়ায়। আর একটা না পেয়ে বউয়ের দিকে তাকায়। হাতের ছোট্ট কুপির আলোয় স্বামীর চোখে নিরুচ্চারে ভাষাময় জিজ্ঞাসা শুনতে পায়। বউ নিজেই বলে, সৌটা আমি বেচছি—
>
> —কত লাভে?
>
> —দশ।
>
> একটু চাপা হাসি দিয়ে ফিসফিস করে বলে, পনেরো উঠতে পারলেনি? মাছ ভরতি আরও ট্রলার ভিড়তেছে যে—[৬]

লেখকের ‘মেমদি’ (শারদীয় *আজকাল,* ২০০৭) গল্পেও উঠে আসে গ্রামীণ এলাকার চিকিৎসাপরিষেবার টুকরো চিত্র—

> বাঁধের ঢালুমুখে ডানদিকে কাঠের ফ্রেমে টিনের বোর্ডে লেখা;

রোগ মুক্তি

ডাঃ পূর্ণচন্দ্র হাজরা, আর এম পি

কাঠের ফ্রেমে কাচ বসানো দু-পাল্লার আলমারি। পাঁচ-সাতখানা সাধারণ রোগে চিকিৎসার ওষুধপত্তর। ট্যাবলেট, অ্যান্টিবায়োটিক ফাইল। ডেটল তুলো ব্যাণ্ড-এড, ইঞ্জেকশনের ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ। ডিস্টিলড ওয়াটারের শিশি। টেবিলে স্টেথো আর স্পিগমোমিটার সাজিয়ে চেম্বার।[৭]

‘কেয়ারবাবু ও সংক্রান্তির শিশির’ (শারদীয় *নন্দন*, ২০০৮) গল্পেও লেখক তুলে ধরেছেন গ্রামীণ চিকিৎসা পরিকাঠামোর চিত্র—

লোহার গেট খুলতেই সম্মুখের পাকা পথটায় খোয়া পিচ চটে ঘা ঘেউড়ির ক্ষত। সিমেন্ট বাঁধানো দাওয়ায় পাকা দেওয়াল ঘিরে টালি শেডয়ে ডাক্তারখানা।

নিরাময়

ডাঃ সাধন কর (আর এম পি)

স্বনামধন্য ডাঃ ঘোষের কম্পাউন্ডার।

সময়-সকাল ৮টা—১২টা, বিকাল

৩টা—রাত ৯টা প্রত্যহ।[৮]

‘শ্যাওলা রঙের ম্যাক্সি’ (*সুখী গৃহকোণ*, ২০১০) গল্পে মূলত উঠে এসেছে সুন্দরবনের জনজীবনে আয়লা ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী বাস্তবতা। আশ্রয়শিবির কিংবা শহর থেকে আসা ত্রাণসামগ্রীর প্রকৃতি বিষয়ে লেখকের দর্শন ফুটে উঠেছে এই গল্পে। তার পাশাপাশি এ গল্পে উঠে এসেছে গ্রামীণ চিকিৎসাব্যবস্থার অনুপুঙ্খ—

তিন চাকা ভ্যানরিকশা। সাদা পলিথিন বস্তায় বাঁধা মস্ত পোঁটলা ক’খানা। সঙ্গে দু’জন ছোকরা। হাঁক দেয়, ও সুধাংশুবাবু—সুধাংশুবাবু আছেন গো?

রোগা লম্বায় ফরসাটে চামড়ায় আটাশ-ঊনত্রিশের যুবক। পা প্যান্টের ওপরে সস্তা রঙিন পাঞ্জাবি। বুক পকেটে মোবাইলের কর্ড ঝুলে। সড়কের তেমাথানি মোড়ে জ্বর আমাশার ট্যাবলেট সর্দি কাশির সিরাপ গ্লুকোজ সঙ্গে মেয়েদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের পিল নিয়ে ছোট্ট ডাক্তারখানা। পাশের আলমারিতে পনেরো-বিশখানা হোমিওপ্যাথির লিকুইড ওষুধ এক শিশি গ্লোবিউলস আর প্লাস্টিক কৌটোয় সুগার নিয়ে 'আরোগ্য নিকেতন'। ওষুধ বিক্রি ও রোগের চিকিৎসা দুই-ই করে সুধাংশু শাসমল। শালপাতার খিচুড়ি চেটে সাফ। দাওয়ায় বসেই দু-তিনজন মুখ বাড়ায়, কে! কে যেন ডাকেঠে...! পরক্ষণেই তারাই চেঁচায়, কাকে?

—আগো সুধাংশুবাবু

—কোন সুধাংশু? ডাক্তার সুধাংশু?[৯]

গ্রামীণ এক ডাক্তারখানার চিত্র তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে লেখক তার মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য। প্রথমত, এই ধরনের ডাক্তারখানা, যেগুলি বহু মানুষের ভরসাস্থল, সেগুলিতে কী কী উপাদান থাকে। দ্বিতীয়ত সুধাংশুবাবুর ডাক্তারখানায় মেয়েদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের পিল পাঠককে অনেকগুলি কথাই জানায়। একদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজলভ্যতা, অন্যদিকে সন্তানধারণের উপরে নারীর কিছুটা নিয়ন্ত্রণের কথা অনুচ্চারিত থেকে যায় এই জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল-এর উল্লেখে। এই দিকটিও সেইসঙ্গে উঠে আসে যে, গ্রামীণ এই ডাক্তারখানাগুলিতে মিশ্র পদ্ধতির চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি চিকিৎসাপদ্ধতির দ্বারা সাধারণ রোগসমূহ নিরাময় করার জন্য কিছু ওষুধ এইধরনের ডাক্তারখানাগুলিতে থাকত। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে এভাবেই একাধিকবার উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের একাধিক অনুপুঙ্খ। এই গল্পগুলি অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখিয়ে দেয় বিশ্বায়িত পুঁজির প্রভাবে যে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের

দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে, তা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক। গ্রাম সেই পরিষেবার আওতা কিংবা সুফল থেকে এখনো রয়ে গিয়েছে বহু দূরে।

৪.৪॥ **বিপুল দাস**

বিপুল দাস (জন্ম ১৯৫০) মূলত উত্তরবঙ্গের কথাকার। তবে ছোটোগল্পকারের কথাযাত্রা যে শুধুমাত্র তাঁর ভৌগোলিক অবস্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে এমনটি নয়। বরং তাঁর বীক্ষার জগতটি সামগ্রিকভাবে ধরা দেয় তাঁর সৃষ্টিকর্মে। বিপুল দাসও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর *পঞ্চাশটি গল্প* (আনন্দ, ২০১২) কিংবা *শ্রেষ্ঠ গল্প* (অভিযান, ২০২০) গ্রন্থের একাধিক ছোটোগল্পে উঠে এসেছে তারই স্বাক্ষর, যেখানে লেখক তাঁর ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছেন বিশ্বজনীন।

বিপুল দাসের ছোটোগল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়াটির একাধিক অনুপুঙ্খ। একদিকে যেমন তাঁর গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তিজগতের অনুপুঙ্খ, অন্যদিকে তাঁর গল্পে চিকিৎসাপরিষেবা ক্ষেত্রেরও একাধিক অনুপুঙ্খ খুঁজে পাওয়া যায়।

এমনটি ভেবে নেওয়া খুব সমীচীন হবে না যে, বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে মানুষের রোগব্যাধি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। আগে যে সব রোগ হতো না, এখন সেইসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। এই ভাবনা আংশিকভাবে সত্য। অন্য দিক থেকে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তী সময়ে বেসরকারি পুঁজির প্রভাবে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রটির সম্প্রসারণ ঘটেছিল। এর ফলে দেশের মানুষ বেশি পরিমাণে চিকিৎসাপরিষেবার আওতাধীন হয়। সেইকারণে ইতোপূর্বে স্বাস্থ্য সচেতনতার হার যা ছিল, এসময়ে তার বৃদ্ধি ঘটে। এর পশ্চাতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচার কিংবা পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞাপনের জগত। ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের

ক্যানসারের মতো রোগ আরও বেশি করে ধরা পড়ছিল পূর্বের তুলনায়। সেইধরনের রোগসমূহকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক, রোগী কিংবা তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে এমনকি বৃহত্তর জনসমষ্টিতেও যে তীব্র মানসিক-অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হচ্ছিল তার প্রভাব এসে পড়েছে বাংলা ছোটোগল্পের জগতে।

বিপুল দাসের 'দেখা হবে' (*দেশ*, ২রা জুন, ২০১১) গল্পটিতে উঠে আসে এই ধরনের কিছু অনুপুঙ্খ। এ গল্পে উঠে এসেছে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবন। তাঁদেরই একজন সহকর্মী বিজ্ঞানের শিক্ষক রানা। ইউসুফ রানা মজুমদার নামের আড়ালে যে বহন করছে মুসলমান পিতা এবং হিন্দু মাতার প্রেমের উত্তরাধিকারকে। এ গল্পে উঠে আসে অসাধারণ প্রতিভাশালী গায়ক রানার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া এবং চিকিৎসার কাহিনি। গল্পের প্রায় শেষাংশে উপস্থিত হয় রানার প্রেমিকা শাওন। তাদের বিবাহ না হলেও আসন্ন মৃত্যুর আগে মায়ের গানের খাতাটি তাকে দিয়ে যায় রানা। একদিকে অন্তঃসলিলা প্রেমের তীব্র প্রকাশ, অন্যদিকে তারই পটভূমিতে এ গল্পে রচিত হয় মৃত্যুর পদধ্বনি। সেই দৃশ্যের রচনার অন্তরালে উঠে আসে মারণ ক্যানসারের অনুপুঙ্খ—

> থার্ড কেমো দেওয়ার পর রানার চুল সামান্য পড়তে শুরু করেছিল। এমনিতে কিছুই বোঝা যেত না। শেষের দিকে ওর কাশির ধরন দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল। জোর করেই ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিলাম। আশিস ভদ্র ভালো ডাক্তার। নামকরা চেস্ট স্পেশ্যালিস্ট। ভাল করে দেখেশুনে বুকের এক্স-রে করতে দিয়েছিলেন। রিপোর্ট পড়ে আমার কিছু বোধগম্য হল না। রানাকে কিছু না জানিয়ে বিকেলে রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। সঙ্গে অনেক রকম ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট। দুধসাদা কাচের ওপর কালো প্লেট রেখে ভিতর থেকে আলো জ্বেলে রানার বুকের ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টগুলো পড়লেন। ডাক্তার আশিস ভদ্রের চোখের তারার ছোট-বড় হওয়া, ভুরুর নাচন, মুখের প্রতিটি পেশির কাঁপন আমি লক্ষ করছিলাম।[১০]

দুটো টেলিফোন নম্বর রানা আমাকে দিয়েছিল। একটা বর্ধমানে ওর মামাবাড়ির। অন্যটা ওর এক ছাত্রীর। দু'জায়গাতেই খবর দিয়েছিলাম। আসলে আমরা এখানে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। কলকাতায় আসা-যাওয়া, ব্লাড দেওয়া, নার্সিংহোমে রাখা, ওকে দেখাশোনা করা, কেমো-র খরচ। অবশ্য তখনও জানি না রে দেবে নাকি কেমোথেরাপি হবে। বড়মামা, ছোটমামা দু'জনেই এসেছিলেন। ছোটমামা যে ডাক্তার জানতে পেরে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

ফ্লুইড টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ ছিল। স্ক্যান করা হল। অনেকটাই ছড়িয়ে গিয়েছে। প্রথম কেমো ওখানেই দেওয়া হয়েছিল। এখানকার মেডিক্যাল কলেজের অঙ্কোলজিস্টের সঙ্গে কথা বলে বাকি কেমোগুলো এখানেই দেওয়ার ব্যবস্থা ওর মামাই করেছিলেন। দিন ও রাতের নার্স বহাল করা হল। লোকজন এলে বসার জায়গা নেই, দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার কেনা হল।[১১]

গল্পের যতখানি উদ্ধৃত করা গেল, তাতে উঠে এসেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একাধিক পরিভাষা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতির কথা, প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার বিবরণ এবং নার্সিংহোম, অর্থাৎ বেসরকারি চিকিৎসাপরিকাঠামোর কথা। এগুলি থেকে কিছুটা হলেও এ গল্পের সময়টিকে আবিষ্কার করে নেওয়া যায়।

'সোনার টুকরো' (*ভাষাবন্ধন*, উৎসব ২০০৫) গল্পে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের অনুপুঙ্খ উঠে আসে ভিন্নতর বাস্তবতায়। এ গল্পেও উঠে এসেছে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবনের নৈমিত্তিক অনুপুঙ্খ। একদিকে এ গল্পে জাতের ভিত্তিতে সাংবিধানিক নিয়মে সংরক্ষণ, অন্যদিকে সংরক্ষণের বিরোধিতা—এই দুইই উঠে এসেছে। তপশিলি উপজাতিভুক্ত (ST) শিক্ষককে সহকর্মীদের দ্বারা 'সোনার টুকরো' সম্বোধন এবং সেই শব্দবন্ধকে এ গল্পে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় স্থাপন করেন গল্পকার। এ গল্পে তপশিলি উপজাতিভুক্ত শিক্ষক দীপক সরেন-এর কথা উঠে আসে। দুটি মেয়ের জন্মের পর তার পুত্রসন্তানকামনায় তার স্ত্রীর আবার গর্ভলক্ষণ দেখা যায়। এ গল্পে

লেখক তুলে ধরেছেন পুত্র কিংবা কন্যা সন্তান জন্মানোর ক্রোমোজোমগত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি। অন্যদিকে এর পাশাপাশি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পুত্রসন্তান আকাঙ্ক্ষার দিকটিকেও তুলে ধরেছেন তিনি। আর তা তুলে ধরতে গিয়ে আধুনিক চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের প্রযুক্তিনির্ভর দিকটি উঠে আসে এ গল্পে—

> এসব অনেক আগের কথা। তখন দীপকের বউয়ের সদ্য পেট হয়েছে। দীপক গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গের ব্যাপারে মানসিকভাবে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকে। মঙ্গল তাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির কথা বলেছিল। কিন্তু হাসপাতালে তো প্রশ্নই ওঠে না, নার্সিংহোমও রিস্ক নেবে না। এসব ব্যাপারে সরকারি কানুন এখন খুব কড়া। জানাজানি হলে নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। মঙ্গল বলেছিল কন্যা ভ্রূণ অ্যাবরশন খুব বেশি হচ্ছে। সবাই ছেলে চায়। পেটে মেয়ে আছে জানতে পারলেই নষ্ট করে ফেলে।
>
> সেদিন রাত্তিরে তার বউ ঘুমিয়ে পড়লে দীপক তার বউয়ের পেটের কাপড় সরিয়ে অনেকক্ষণ দেখল। শেষে খুব সাবধানে পেটের ওপর কান পেতে কিছু শোনার বা বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। মঙ্গল একটা ওয়ান্ডার কিটের কথা বলেছিল। পেটে ছেলে আছে, না মেয়ে আছে— বাড়িতে বসে নিজেরাই পরীক্ষা করে বের করা যায়। এটাকে বলে ফিটাল জেন্ডার টেস্টিং সেট। এটা সদ্য আমেরিকায় বেরিয়েছে। মূল্য দুশো পঁচাত্তর ডলার। এটা মায়ের রক্তে ভেসে বেড়ানো ভ্রূণের ডিএনএ পরীক্ষার ভিত্তিতে কাজ করে। মঙ্গল বলেছিল, মঙ্গল দি টেলিগ্রাফ-এ পড়েছে। দীপক টাকা এবং ডলারের হিসেব জানতে চাইলে মঙ্গল হেসে বলেছিল ইন্ডিয়া সরকার এ মেশিন এ দেশে আমদানি করতে দেবে না।[১২]

বিশ্বায়নের ফলে একদিকে যেমন চিকিৎসাপ্রযুক্তি মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়েছিল, অন্যদিকে কিছুটা হলেও বেড়ে গিয়েছিল তার মানববিরোধী অপব্যবহার। তা প্রতিহত করতে আইন চালু হলেও কতখানি প্রতিহত করা গিয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে পুঁজিনির্ভর নতুন কালের চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেকক্ষেত্রেই নারীঘাতী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেছে লিঙ্গবৈষম্যকে। আইনের আড়ালে রমরমিয়ে চলেছে এই প্রক্রিয়া। আবার এ গল্পেই দেখা যায়, ভারতের মাটিতে যা আইনিভাবে অবৈধ, আমেরিকায় তা বৈধ। তাই বলা যায় নতুন যুগের চিকিৎসাপ্রযুক্তি কোনো বিশ্বায়িত মানবিক নীতি মেনে চলে নি। বরং দেশভেদে তার ব্যবহার হয়ে উঠেছে পৃথক। প্রথম বিশ্বের অমানবিকতা ডানা মেলতে চেয়েছে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের মনে।

'পরিবর্তিত পরিস্থিতি' (*নবান্ন*, বইমেলা ১৪১২) গল্পটিতে উঠে আসে আর একধরনের বাস্তবতা। এ গল্পের সূত্রপাতে লেখক কিছুটা জাদু বাস্তবতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। গল্পের অন্দরে উঠে এসেছে ফেলে আসা যৌথ পরিবার, দ্রুত নগরায়ণ, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়। এ গল্পের চরিত্র অরিন্দমকে কিছুটা হলেও নেশাতুর চরিত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন লেখক। তার অ্যালকোহলপীড়িত চেতনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে আরশোলার মতো মানবেতর প্রাণী, এবং এইভাবে এক জাদুবাস্তবতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে গল্পে। অন্যদিকে এ গল্পের বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের অনুপুঙ্খ—

> ম্যানেজার পি মাইতির প্রস্টেট গ্ল্যান্ডে ঝামেলা হচ্ছিল। অপারেশনের ডেট ঠিক হলেও তিনি সার্জেন মজুমদার বিষয়ে অরিন্দমের কাছে ভরসা চাইছিলেন। এর আগে অরিন্দমের কুঁচকির ফোড়া মজুমদার বড় সুন্দর কেটেছিল। ব্রাঞ্চের সবাই সেটার ডিটেইলস জানে। কিন্তু প্রস্টেট গ্ল্যান্ড আর বাগি এক জিনিস নয়। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড ফুলে উঠলে এক ধরনের প্রবলেম হয়, বাগি হলে অন্যরকম। পি মাইতি সাপোর্ট চাইছিল। প্রধানত তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল, অরিন্দম বুঝতেই পারছিল, পোস্ট-অপারেটিভ পিরিয়ডে কনজুগাল লাইফে অসুবিধা হয় কিনা। ঠিক এ ভাষাতেই সামান্য লাজুক মুখে পি মাইতি জিজ্ঞেস করেছিল। অরিন্দম বোঝে, মাইতি খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছে। মনে মনে হেসেছিল অরিন্দম। আসলে ম্যানেজারবাবু জানতে চাইছে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড কেটে দিলে সহবাসে সে সক্ষম কি না। মাইতি হয়তো ভেবেছে ভ্যাসেকটমি

টাইপের কিছু। দূর, কোনও ব্যাপারই নয়। অরিন্দম ভরসা দিয়েছিল। ওখানে একদম লেটেস্ট যন্ত্রপাতি।...

থার্ড কেমোর পর একদিন দীপাকে দেখতে অরিন্দম ঠাকুরপুকুরে গিয়েছিল। দীপাকে চেনা যায় না। টপ অ্যাঙ্গেল শট না হলেও দীপাকে অনেক ছোট দেখায়। অরিন্দম আবার টের পেল সেই অনুভূতি, এবং এই প্রথম তার মনে হল নখ ও চুল স্নায়ুবিহীন, তথাপি কেমন করে স্রোত বয়ে যায়। দীপার মুখের দিকে তাকালে অরিন্দম টের পেল আর একটা পরমা স্রোত, সেটা দীপার ঠোঁটের সামনে এসে থরথর কাঁপছে। মাসখানেক বাদে সেই অনন্তধারা অন্য পাইপ দিয়ে নেমে গেল।[১৩]

দেখা যায় এভাবেই বিশ্বায়ন পরবর্তী চিকিৎসাপরিষেবা ক্ষেত্রের একাধিক অনুপুঙ্খ এবং জনজীবনে তার বহুতর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াসমূহকে বেশ কিছু ছোটোগল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন গল্পকার বিপুল দাস।

৪.৫॥ **স্বপ্নময় চক্রবর্তী**

স্বপ্নময় চক্রবর্তী (জন্ম-১৯৫১)-র একাধিক ছোটোগল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন ও বিশ্বায়ন পরবর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের নানা অনুপুঙ্খ। বিশ্বায়ন পরবর্তী ভারতে পুঁজির প্রসার বহুতর ক্ষেত্রে ঘটেছে। পর্যটনশিল্প যার অন্যতম। আর অনেকরকম পর্যটনের মধ্যে অন্যতম হল চিকিৎসাপর্যটন বা মেডিক্যাল ট্যুরিজম। ভারতে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মেডিক্যাল ট্যুরিজম। এর অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে ভারতে চিকিৎসাক্ষেত্রের দ্রুত বেসরকারিকরণ। একদিকে এই ক্ষেত্রটিতে দেশি বিদেশি পুঁজির দ্রুত বিনিয়োগ ঘটছিল, অন্যদিকে সরকারিভাবে খুব স্বল্প প্রতিদানের বিনিময়ে এই বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতে থাকে। প্রকৃত অর্থে দেশের

জনগণ নবকলেবরে বৃদ্ধি পাওয়া এই স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্র থেকে তেমন কিছুই সুবিধা পায়নি, বরং পরোক্ষে তা মেডিক্যাল ট্যুরিজমের বৃদ্ধি সূচিত করেছিল। একাধিক দেশের স্বাস্থ্যপর্যটকরা ভারতে আসতে শুরু করে তাদের নিজেদের দেশের তুলনায় কম খরচে চিকিৎসার সুযোগ নেওয়ার জন্য। এই পর্যটকদের আসার অন্যতম কারণ হিসাবে যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করা যায়, তা হল সারোগেসি। এক্ষেত্রে নিঃসন্তান বিদেশি দম্পতিরা এদেশে এসে অল্প অর্থের বিনিময়ে সন্তানধারণে সক্ষম কোনো মহিলার গর্ভ ভাড়া নিয়ে ‘টেস্ট টিউব’ পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তানধারণ করিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সেই সন্তানকে নিয়ে চলে যেতেন। এতে আইনি এবং মানবিক অনেক প্রশ্ন তৈরি হতে শুরু করে। তবে শুধু দেশের বাইরে থেকে আসা বিদেশি মানুষরাই নয়, দেশের অভ্যন্তরেও নিঃসন্তান দম্পতিদের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যেতে থাকে। উচ্চ অর্থনৈতিক স্তরের মানুষ এভাবেই ব্যবহার করতে শুরু করে নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষদের। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর ‘স্বপন বপন’ (*সেরা ৫০টি গল্প*, দে’জ, ২০১১) গল্পটিতে এই বাস্তবতার স্বরূপকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ গল্প শুরু হয় একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে—

> ‘প্রজননে অক্ষম একটি দম্পতির জন্য অতীব সুশ্রী, স্লিম, ফর্সা, ৫’-৪”-এর মতো উচ্চতা, টানা চোখ, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিত এগ-ডোনার চাই। তাঁর নিজস্ব একটি সন্তান থাকা আবশ্যক। বয়স ৩০ বছরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোবাইল নম্বর...’[১৪]

গল্পের পরবর্তী বিস্তারে পাঠকের সামনে উঠে আসে অর্থনৈতিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত এক দম্পতির কথা—অরুময় আর মিতা। অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবনযুদ্ধে হিমসিম খেতে থাকা এই দম্পতি যখন অর্থনৈতিকভাবে দিশাহারা, তখন তাদের সামনে সুখের হাতছানি দেয় এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের অপর প্রান্তে উঠে আসে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল আর এক দম্পতি অতীন এবং শাশ্বতীর কথা। অনেক সম্পদ থাকলেও যারা সন্তানহীন। তাই অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসাপ্রযুক্তির

মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে আনতে চান তাদের সন্তানকে। এই কাজে মিতা হয়ে ওঠে ডিম্বাণুদাত্রী। অর্থের বিনিময়ে। এইভাবে কিছুটা হলেও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। এ গল্পের গন্তব্য অন্যরকম হলেও তার অগ্রগতির পথে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে নতুন যুগের চিকিৎসাপ্রযুক্তির অনুপুঙ্খ—

> অরুময়ের সামনে এখন এই বিজ্ঞাপন। 'এগ ডোনার চাই'। অরুময়ের তো ডিম্বাণু নেই, থাকলে বিক্রি করে দিত। ওর এরকম বায়োডাটায় খুশি হত না? সবই তো ছিল। দেখতে-শুনতেও খারাপ না। কিন্তু ওর ডিম্বাণু নেই। স্পার্ম আছে। কিন্তু স্পার্ম বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন চোখে পড়েনি কখনও। স্পার্ম ব্যাঙ্ক আছে। একটা স্পার্ম ব্যাঙ্কের সন্ধানও জানে কলকাতায়। ওটা একজন বিখ্যাত গায়নোকলজিস্টের মালিকানায় আছে। ওঁর কাছে নাকি বিখ্যাত সাহিত্যিক, বিরাট কর্পোরেট ম্যানেজার, বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়, বিখ্যাত সিনেমা হিরো, বিজ্ঞানী, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, এমনকি বিখ্যাত মাফিয়া ডন-এর স্পার্ম হিমায়িত অবস্থায় রাখা আছে। যাঁরা স্পার্ম ব্যাঙ্ক থেকে ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য বীজ কিনবেন, তাঁরা তো এইসবই হাইফাই বীজ কিনবেন। কেন বাষট্টি-চৌষট্টি পার্সেন্ট নম্বর পাওয়া গড়পড়তা আই আর এইট/ মিনিকেট বীজ নেবেই বা কেন? কিন্তু মাফিয়া? ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিল অরুময়, মাফিয়া কেন রাখলেন স্টকে? উনি বলেছিলেন, রেখে দিলাম, কতরকমের মহিলা আছে। অনেক প্রসপেকটিভ সিঙ্গল লেডি আছেন, যাঁরা ইনসিকিউরিটিতে ভোগেন, ওঁরা চাইতেই পারেন একটা এগ্গাবগ্গা ডানপিটে সাহসী ছেলে হোক।[১৫]

কিংবা—

> মিতা বলে, এগটা কীভাবে নেবে?...
>
> অরুময় বলল, যদ্দূর জানি একটা ছোট্ট নিডল ফুটিয়ে তুলে নেয়। পিঁপড়ের কামড়ের মতো সামান্য ব্যথা লাগে।...
>
> অরুময় বলল, যদ্দূর জানি, যে লোকটা বাবা হতে চাইছে, তার স্পার্ম ওই এগটাতে মেশাতে হবে ল্যাবরেটরিতে। ফার্টিলাইজেশন আর কি। তারপর হয়ত ওর স্ত্রীর জরায়ুতে রিপ্লেস করা হবে।[১৬]

এ গল্পে শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের খুঁটিনাটিই নয়, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বেশ কিছু প্রশ্ন, অবশ্যই তা মনোজাগতিক, বেশ কিছু পরিমাণে নৈতিকও বটে। অর্থের বিনিময়ে কিংবা আধুনিক চিকিৎসাপ্রযুক্তির সহায়তায় নাহয় জন্ম নিল এক সন্তান, কিন্তু এই ঘটনাকে সমাজ কেমনভাবে নেবে? গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই প্রশ্নটি—

> পেটটা যখন বড় হতে থাকবে মিতার, সবাই তো ভাববে আর একটা বাচ্চা হচ্ছে ওর। স্কুলের কলিগরা, আত্মীয়রা, পাড়াপ্রতিবেশী...। তারপর যখন বাচ্চাটাকে দিয়ে আসবে ওদের, তখন কী বলবে? যখন সবাই জিজ্ঞাসা করবে বাচ্চাটা কোথায় গেল? কী বলবে মিতা? ও কি বলতে পারবে যে আমি এতদিন পেট ভাড়া দিয়েছিলাম...! পেট ভাড়া দেওয়াটা কি অন্যায়? কেন অন্যায় হবে? আমার শরীর, আমার পেট, আমার জরায়ু। আমি যা খুশি করব। তাতে কার কী? কারও পরোয়া করব না...। তাহলে তো যখন গর্ভসঞ্চারের লক্ষণগুলো ফুটে উঠবে, তখনই বলে দেওয়া ভালো—আমি পেট ভাড়া দিয়েছি। পেট ভাড়া কথাটা শুনতে খুব খারাপ লাগে। সারোগেট মাদারশিপ নিয়েছি বললে কিন্তু খারাপ শোনায় না।[১৭]

'হাড়ের ভিতরের মজ্জা' (*সেরা ৫০টি গল্প*, দে'জ, ২০১১) গল্পেও স্বপ্নময় তুলে এনেছেন চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যানুপুঙ্খের কথা। এ গল্পে উঠে আসে বাঁকুড়ার এক গ্রামের স্কুল শিক্ষক আর মুচি সম্প্রদায়ের এক ছাত্রের কথা। প্রাথমিকভাবে সমাজসেবার ব্রত নিয়ে চলা মাস্টারমশাই বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার অর্থে আয়োজিত এক স্বাস্থ্যশিবিরের মাধ্যমে জানতে পারেন মুচি সম্প্রদায়ের ছাত্র নিবারণ রুইদাসের শরীরে বোম্বাই গ্রুপের রক্তের উপস্থিতির কথা। এরপর মাস্টারমশাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে আক্রান্ত তাঁর পাঁচ বছরের ভাগ্নের কথা মনে পড়ে যায়, যার রক্তের গ্রুপও বিরল বোম্বাই গ্রুপের। এই গল্পে তাই তৈরি হয় এক অর্থের বিনিময় সম্পর্ক। ভাগ্নের বাড়িতে থেকে ভালো খাওয়া এবং পড়াশোনার বিনিময়ে নিবারণের রক্ত নেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময় পর পর। তাতে করে ভাগ্নেও ভালো থাকবে,

নিবারণও খেয়ে পরে বাঁচবে। এভাবেই মানবিকতাকে অতিক্রম করে এ গল্পে অগ্রসর হয় অর্থ এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের যুগলবন্দী। আর সেই কাহিনির বুননে উঠে আসে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুপুঙ্খ—

> সুমিতের ভাগ্নেটার বোম্বাই গ্রুপ। সম্প্রতি ধরা পড়েছে ওর অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। যেটা সাধারণ অ্যানিমিয়া থেকে একদম আলাদা। সাধারণ অ্যানিমিয়া ভালো মন্দ খেলে সেরে যায়। এটা সারে না।
>
> ভাগনেটার বয়েস এখন পাঁচ। চার বছর বয়েসেই ছুটোছুটি করতে গিয়ে হাঁপ ধরত। মাঝে মাঝেই নাক কিংবা দাঁত দিয়ে রক্ত বেরোত। তখনই ডাক্তার দেখানো শুরু। রক্তে হিমোগ্লোবিন কম, সেই সঙ্গে ব্যাসোফিলও কম। বর্ধমানের ডাক্তাররা সব ফেল। কলকাতার ডাক্তাররা কেবল এই টেস্ট ওই টেস্ট করাল। ইতিমধ্যে গায়ে লাল লাল র‍্যাশ, মাঝে মাঝে জ্বর। কেউ ভাবল লিউকোমিয়া, কেউ ভাবল, থ্যালাসেমিয়া। শেষ অবধি ভেলোরে বোনম্যারো টেস্ট করে এখন বলছে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। রক্ত দিতে হবে। কিন্তু দেখা গেল ওর বোম্বাই গ্রুপ। এ নিয়ে খুব চিন্তা। বোম্বাই গ্রুপের রক্ত তো বোম্বাইতে পাওয়া যায় না, তা হলে যত টাকাই লাগুক, আনানো যেত। এই রক্ত খুব কম মানুষের শরীরেই আছে। কলকাতার একটা নার্সিংহোম বোম্বাই গ্রুপ আনিয়ে দেয়। অনেক টাকা নেয়। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী তো দিতে পারে না। এজন্য দিদি জামাইবাবুর খুব চিন্তা। টাকার অভাব নেই। অথচ রক্ত পাচ্ছে না।
>
> খুব জুলজুল চোখে, লোভীর চোখে, শয়তানের চোখে নিবারণের দিকে দৃষ্টি দেয় সুমিত।[১৮]

স্বপ্নময়ের একাধিক ছোটোগল্পে এভাবেই উঠে আসে বিশ্বায়ন প্রভাবিত আধুনিক সময়, কিংবা চিকিৎসাবিজ্ঞান অথবা পরিষেবাক্ষেত্রের অনুপুঙ্খ। এই ধরনের আরও কয়েকটি ছোটোগল্প হল—‘কাকায়ন’, ‘যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল’, ‘ডিপ ফ্রিজ’ ইত্যাদি।

৪.৬॥ **অনিতা অগ্নিহোত্রী**

অনিতা চট্টোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৫৬) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়েছেন। আই এ এস-এর সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকের বেশি। কাজের সূত্রে ঘুরেছেন পূর্ব ও মধ্য ভারত। সাহিত্যের সব ধারাতেই তাঁর আনাগোনা। অতল স্পর্শ, মহুলডিহার দিন, আয়নায় মানুষ নাই, পঞ্চাশটি গল্প, কবিতা সমগ্র, মহানদী ইত্যাদি চল্লিশটিরও বেশি বইয়ের লেখক। অগ্নিহোত্রী পদবি ব্যবহার করছেন ১৯৮২ থেকে। মহারাষ্ট্র সন্তান ড. সতীশ বলরাম অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে বিবাহের পর।

তিনি নানা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্মাননা', 'গজেন্দ্র মিত্র স্মৃতি পুরস্কার', 'শরৎ পুরস্কার', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক', 'প্রতিভা বসু সাহিত্য পুরস্কার' এবং ইংরাজিতে অনূদিত গল্প সংকলন *Seventeen*-এর জন্য 'Crossword Economist Award' ইত্যাদিতে সম্মানিত। তাঁর লেখা সুইডিশ, জার্মান এবং ইংরেজিতে অনূদিত।[১৯]

অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটোগল্পে ধরা পড়েছে আদিবাসী প্রান্তিক জনজীবন কিংবা মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের একাধিক অনুপুঙ্খ। ভারত সরকারের প্রশাসক হয়েও তাঁর লেখিকা সত্তাটি প্রান্তিক মানবজীবনের সন্ধান করেছে বারে বারেই। কোনো গল্পে উঠে এসেছে ইটভাঁটার শ্রমিক জীবন ('উষ্মকোঠি', *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, দে'জ, ২০১৮) আবার কোনো গল্পে ধরা পড়েছে তরুণ পুলিশ অফিসারের পেশাগত জীবনের সমস্যা ও আশঙ্কার দোলাচল ('অন্তর্ঘাত', *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, দে'জ, ২০১৮) । সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে এককথায় অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটোগল্পের জগতটি বহুমাত্রিক।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখকজীবনের যাত্রাপথটি ভারতে উদার অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার পরবর্তী বিশ্বায়নের সময়পর্বকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে। স্বভাবতই তাঁর লেখায় এই পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি যে ধরা পড়বে, একথা বলাই বাহুল্য। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিশ্বায়ন পরবর্তী চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের কর্পোরেটায়ন ধরা পড়েছে তাঁর ছোটোগল্পে। এইরকম একটি ছোটোগল্প হল 'অতলস্পর্শ', (*পঞ্চাশটি গল্প*, আনন্দ, ২০১৯)। এ গল্পে বেসরকারি চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের অমানবিক দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছে—

> ভাল লাগা মন্দ লাগার মধ্যে ব্যাপারটা আসলে আর নেই। আমি নামী কলেজ থেকে পাশ করেছি, রেজাল্ট ভাল ছিল, হাউস স্টাফ ছিলাম বিখ্যাত প্রফেসরের। তারপর এক প্রাইভেট হাসপাতালে জয়েন করলাম। সেও এক জীবন। মাইনে মন্দ না, প্রাইভেট প্র্যাকটিস চলে। হঠাৎ একদিন সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সুন্দরবনের এক প্রান্তিক চাষি তার মেয়েকে ভর্তি করল। ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, তার ওপর চিরকালের অপুষ্টি তো আছেই। আমিই ডাক্তার। চিকিৎসার ফল তো আপনি জানেন। ওইসব হাসপাতালে সন্ধেবেলা প্রিন্টার থেকে একটা সদ্য ছাপা বিল বেরিয়ে আসে। আট হাজার, ছ' হাজার। সাড়ে পাঁচ হাজার। বোকার মতো তাকিয়ে থাকে মেয়ের বাবা। আর ছুটে ছুটে দেশে গিয়ে জমি বেচে আসে। টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসে। এক টুকরো চাষের জমি বেচল। আর এক টুকরো বেচল। তৃতীয়টা যখন বেচছে মেয়ে তখন আই সি ইউ-তে। ভেন্টিলেটরে আছে। এবার লোকটা এসে বলল, আর পারব না। বসতবাড়ি আর জমি বেচতে হচ্ছে। আরও দুটো ছেলেমেয়ে আছে। টাকা আর নেই। হাসপাতালের লোকাল চিফ ম্যানেজমেন্ট গ্র্যাজুয়েট। অর্ডার এল। পেশেন্টকে আই সি ইউ থেকে বার করে দাও। পার্টির টাকা নেই। ভেন্টিলেটর খুলে নাও। খোলা হল। আমার চোখের সামনে মেয়েটা মারা গেল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেঁচে ছিল।
>
> তারপর ? নলিনী যেন নিজের গলাই শুনতে পাচ্ছিলেন না। সেদিন রাতেই চাকরি ছাড়লাম। তিন মাস খুব ঘুরলাম, এখানে ওখানে উদভ্রান্তের মতো। বই পড়তে পারছি না, গান শুনি না। তারপর মাস্টারমশাইয়ের কাছে এসে বললাম, আমাকে কাজ দিন। আপনি ভাবছেন, এখানেও তো মানুষ মারা

যায়। এই সুন্দরবনে। বিনা চিকিৎসা, কুচিকিৎসায়। সত্যিই তাই। তবে যতটা পারি আমি তাদের সঙ্গে থাকি। লড়াই করি শেষ পর্যন্ত। আমাকে কেউ কারও শ্বাসবায়ু কেড়ে নিতে বাধ্য করে না।[২০]

লেখিকার উল্লেখিত ছোটোগল্পটি থেকে উঠে আসে কর্পোরেট চিকিৎসাক্ষেত্রের অমানবিক দিকগুলি। আদর্শবান চিকিৎসকেরাও সেখানে অসহায় হয়ে পড়েন, পুঁজি যখন তার শোষক চরিত্রকে প্রকাশ করে। বেসরকারি চিকিৎসাক্ষেত্র হতদরিদ্র মানুষকে এভাবে সর্বস্বান্ত করে শেষপর্যন্ত অমানবিকভাবে তার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকার অধিকারকে কেড়ে নেয়। একমাত্র আশার কথা এই যে, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও কিছু মানুষ পূর্বোক্ত পুঁজিনির্ভর সংস্কৃতিকে সমর্থন করেন না। ডা. বিষাণ বসু চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রে কর্পোরেট হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

দীর্ঘদিন ধরে ভালোমন্দ মিশিয়ে চলে আসা এই ব্যবস্থায় বদল আনল কর্পোরেট অনুপ্রবেশ—যাকে বৈপ্লবিক বদলই বলা চলে। চিকিৎসার কর্পোরেট পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্যই হয়ে দাঁড়াল মুনাফা—চিকিৎসক-পক্ষ ও রোগী-পক্ষের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটল তৃতীয় পক্ষের—দুই পক্ষের মাঝখানে যাঁরা দাঁড়ালেন, তাঁদের স্বার্থ চিকিৎসক বা রোগী উভয়পক্ষের স্বার্থ থেকেই আলাদা—অর্থাৎ, রোগী সারিয়ে তোলার শেষে চিকিৎসকের উপার্জন এবং রোগীর সেরে ওঠা, এই দুইয়ের বাইরের স্বার্থের কিছু মানুষ চিকিৎসাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। এই নতুন ব্যবস্থায় চিকিৎসক উপার্জন করতে পারলেন না অথবা রোগী সুস্থ হতে থাকলেন না, এমন কখনোই নয়—কিন্তু, চিকিৎসার উদ্দেশে নির্মিত একটি পরিকাঠামোর মুখ্য উদ্দেশ্য বদলে গেল—সেই অভীষ্টের মাঝে পড়ে যাঁরা চিকিৎসা করলেন এবং করালেন—করছেন এবং করাচ্ছেন—তাঁদের লাভ বা ক্ষতি এই ব্যবসায়িক ব্যবস্থার মূল প্রোডাক্ট নয়—স্রেফ বাই-প্রোডাক্ট মাত্র। মূল প্রোডাক্ট মালিক তথা শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফা, যাঁরা, আবারও মনে করিয়ে দেওয়া যাক, চিকিৎসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই যুক্ত নন।[২১]

এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝে নেওয়া যায়, কর্পোরেট পুঁজির মূল লক্ষ কী। পীড়িতের আরোগ্য থেকে তাদের উদ্দেশ্য বহু দূরগামী। অন্তত অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটোগল্পটি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪.৭॥ **সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়**

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৬১)-এর বেশকিছু ছোটোগল্পে তিনি সার্থকতার সঙ্গে বিশ্বায়ন পরবর্তী চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র এবং তাকে কেন্দ্র করে জনমানসে তৈরি হওয়া বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার একাধিক দিককে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে কখনো উঠে এসেছে কর্পোরেট হাসপাতালের টুকরো টুকরো অনুপুঙ্খ, স্বাস্থ্যবিমা থেকে অন্যায়ভাবে মুনাফা আদায় করার ষড়যন্ত্র, চিকিৎসাব্যবস্থার মূল ভূমিকায় যুক্ত থাকা চিকিৎসকদের মূল্যবোধের একাধিক দিকসমূহ। কখনো আবার এই নির্দিষ্ট সময়ে একেবারে মফসসলের মানুষের কাছে চিকিৎসাপরিষেবা ক্ষেত্রটি কী ভূমিকা পালন করছে, সেই প্রবণতাগুলিকেও লেখক সার্থকভাবেই তাঁর ছোটোগল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লেখকের *পঞ্চাশটি গল্প* (আনন্দ, ২০১২) কিংবা *গল্প ৫১* (মিত্র ও ঘোষ, ২০১৭) গ্রন্থদুটির একাধিক গল্পে কখনো মূল বিষয় হিসাবে আবার কখনো বা মূল উপজীব্যের নির্মাণের অনুপুঙ্খে উঠে এসেছে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র।

'ক্ষেত্রভূমি' (শারদীয়া *মাতৃশক্তি*, ২০০৯) গল্পটিতে লেখক চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের পাশাপাশি অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন মানুষের মূল্যবোধের জগতটিকে। শুধু সেই জগতটিই নয়, তার দোলাচল, জিঘাংসা এবং শেষপর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধের কাছে নিষ্ঠুরতার পরাভূত হওয়াকেই এ গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক। এ গল্পের মূল চরিত্র সৃজা একজন ডাক্তার। মৈনাক তার সহকর্মী। বিবাহিত সৃজা একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরি করে। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান

হওয়ার কারণে চাকরি এবং শ্বশুরবাড়ির সমস্ত দায়িত্ব সামলানোর পরেও বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখাশোনা করে সে। রোগে আক্রান্ত তার বৃদ্ধ বাবা। তাঁকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়। কিছু মনে রাখতে পারেন না তিনি। প্রস্রাব-পায়খানা করে ফেলেন যখন তখন। তাঁকে সামলাতে তাঁর স্ত্রী এবং একজন আয়াকে হিমসিম খেতে হয়। এইরকম অবস্থায় সৃজার মা স্বামীর মৃত্যুকামনা করেন। দীর্ঘদিন ধরে সেবা করে করে ক্লান্ত সেই বৃদ্ধার মননে তাতে এতটুকু রেখাপাত করে না। চিকিৎসক কন্যাকে তিনি বারে বারে সেই কথাই বুঝিয়ে চলেন, যাতে সে ওষুধ প্রয়োগ করে তার বাবাকে যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি দেয়। সৃজার মনে একদিকে চিকিৎসকের নীতিবোধ, বাবার প্রতি মমত্ববোধ, অন্যদিকে মায়ের ক্রমাগত প্ররোচনা। সব মিলিয়ে সে বাবাকে বিষ ইনজেকশন দিয়ে মুক্তি দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেও শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়ে। আশ্রয় নেয় তার বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া চির পরিচিত সেই বাবার বুকেই। এ গল্পে লেখক মানবিকতার জয় ঘোষণা করেছেন সার্থকভাবেই, তবে এ গল্পের নির্মাণে মানুষের মনের গহনটিকেও তিনি করে তুলেছেন উন্মুক্ত—

> জল খেয়ে সৃজা বলল, আর কী করতে পারি বলো ! কলকাতার দু'জন নামী নিউরোলজিস্টকে দেখালাম। দু'জনেই মেডিকেলে আমায় পড়িয়েছেন। যত্ন করে দেখেছেন বাবাকে। দুই স্যারের একই কথা প্রথমদিকে ধরা না পড়লে এ রোগের ইমপ্রুভমেন্ট সম্ভব নয়। ক্রমশ খারাপ হবে অবস্থা। সাপোর্টিং মেডিসিন দিয়ে যতটুকু যা সামলে রাখা যায়। এমনিতেই কিয়োরেবল নয় ডিজিজটা।[২২]

> ...ওই ওষুধটা আরও একটু বেশি করে দেওয়া যায় না? তাতে ওই লোকটার শান্তি, আমাদেরও রেহাই। সৃজা অনুভব করে তার শরীরের বেশ কিছু অনৈচ্ছিক পেশি নিজের মতো কাঁপতে শুরু করেছে। ভিতর ভিতর উত্তেজনা হচ্ছে ভীষণ। মায়ের প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে পারছে না। তবু বলে, এটা হয় না।

কেন হয় না শুনি ? যে লোকটাকে চিরনিদ্রায় পাঠিয়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে, সে তোর বাবা নয়। সে অনেক দিন আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ভুলে গেছে ইহজগতের সবকিছু। শুধু তার শরীরটা আছে বলেই তাকে সেবাযত্ন করে যেতে হবে ? আমাদের অপরাধ তা হলে ওটাই, আমরা তাকে ভুলতে পারিনি। তাই যদি হয়, সে আমাদের স্মৃতিতে থাক।

কপালের রগ দুটো দপদপ করছে সৃজার। টেবিলে রাখা গ্লাসে তলানি জল পড়ে আছে। তুলে নিয়ে গলায় ঢালে সৃজা। বলে, এসব করলে ধরা পড়ে যাব। ডেথ সার্টিফিকেট দেবে না ডাক্তার।

সার্টিফিকেট অন্য ডাক্তার দেবে কেন ! তুই দিবি।

না মা, ডাক্তারি এথিক্সে এটা আমরা করতে পারি না।[২৩]

মানুষকে বাঁচানোর যে ম্যাক্সিমাম দাগটা আছে সিরিঞ্জে তার চেয়ে অনেক বেশি ভরে নিল সৃজা। বাবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। নিজেকে মনে হচ্ছে মানুষকে মৃত্যুদানের প্রথম প্রতিনিধি। লোকে এতদিন ভেবেছে, করে উঠতে পারেনি। আবার এমনও হতে পারে, এ ঘটনা অনেকবার ঘটেছে, কেউ জানতে পারেনি। যেমন জানতে পারবে না সৃজাদের ব্যাপারটা। কন্ডিশন ফুলপ্রুফ।

শোয়া অবস্থায় বাবা দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন অপেক্ষায় ছিল কারুর। সৃজা ঘরে পা দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। কনুইয়ের ভরে আধশোয়া হয়ে বলে উঠল, আপনি এসে গেছেন, আসুন !

মেঝেতে পা গেঁথে যাচ্ছে সৃজার। কী করুণ, নিঃসহায়ের হাসি হাসছে বাবা। সৃজার হাত থেকে পড়ে যায় ওষুধ ভরা সিরিঞ্জ।[২৪]

এ গল্পে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রে প্রচলিত একাধিক অনুপুঙ্খ কিংবা শব্দাবলির ব্যবহারে গল্পের আবহনির্মাণে তা সহায়ক হয়ে উঠেছে। তার পাশাপাশি এ গল্পে ক্রিয়াশীল হয়েছে মানবিক মূল্যবোধ। শেষপর্যন্ত সেই বোধেরই জয় হয়েছে এ গল্পে।

‘ঠুঁটো’ (শারদীয় *দেশ,* ২০০৬) গল্পটিতে লেখক তুলে ধরেছেন আর একধরনের বাস্তবতাকে। এ গল্পের মূল চরিত্র সুমিত পেশায় একজন চিকিৎসক। সে হসপিট্যালের সরকারি চাকরির পাশাপাশি ডিসপেনসারিতে রোগী দেখে। এ গল্পে তার কোয়ার্টারে বেড়াতে আসে বন্ধু বাবলা এবং তার স্ত্রী তুলিকা। দ্রুত রোগী দেখা শেষ করার বাসনা থাকলেও সে পারে না। সবশেষে তার কাছে হাজির হয় এক বৃদ্ধ রোগী, যার রোগ বড়ো অদ্ভুত। তার নিজেরই দুটি হাত তার নিজেরই দুই গালে সারাক্ষণ চড় মারতে থাকে, এতে বৃদ্ধের ইচ্ছার কোনো ব্যাপার নেই। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই যেন ব্যাপারটি ঘটতে থাকে। লেখক এখানে একধরনের জাদুবাস্তবতাকে ব্যবহার করেছেন। একধরনের অপরাধবোধের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে নিজের গালে নিজেই চড় মারতে থাকার এই রোগ সারিয়ে দেওয়ার বদলে ডাক্তারকেই পেয়ে বসে এই রোগে। সকলের আড়ালে নিজের গালে চড় মারার অভ্যাস জন্মে যায় তার। এই আত্মনিগ্রহের ফলে একরকম আরাম পায় সে। গল্পের পরবর্তী অংশে লেখক তুলে ধরেন এই ডাক্তারের সফল জীবনের পশ্চাতে রয়েছে তার পরিবার তথা পিতার আত্মত্যাগ। কিন্তু তার উপযুক্ত প্রতিদান দেয় নি সুমিত। সেই অপরাধবোধই তাকে তাড়া করে ফেরে। এইরকম একটি গল্পের অগ্রগতির ফাঁকে ফাঁকে উঠে আসে বদলে যাওয়া মূল্যবোধ কিংবা সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার উপরে জনগণের ভরসার একরকম অবসানের কথা—

> চলে গেল শিবু। বাবলা উঠে বসেছে বিছানায়। বলে, পেশেন্টগুলো হাসপাতালের আউটডোরে যায় না কেন? তোর কোয়ার্টারের পেছনেই তো আউটডোরটা।
>
> ওদের হয়তো ধারণা, পয়সা দিয়ে দেখালে ডাক্তারবাবু যত্ন করে দেখবেন।
>
> এই হাসপাতালের সব ডাক্তারই তার মানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে? জিজ্ঞেস করে বাবলা নিজেই উত্তর খুঁজে নেয়। বলে, এখন অবশ্য সরকারি ডাক্তারদের প্র্যাকটিস বেআইনি নয়।

কথার পিঠে চুপ করে থাকে সুমিত। বাবলার জ্ঞাত তথ্যটা ওপর ওপর, খবরের কাগজ ভিত্তিক। আসলে নন-প্র্যাকটিশিং অ্যালাউন্স হিসেবে বেতনের সঙ্গে হাজার চারেক টাকা পায় সুমিত। তাও টাকা নিয়ে পেশেন্ট দেখে। না দেখে উপায় নেই। এটাই এখানকার সিস্টেম। অগুনতি রুগি। এলাকায় প্রাইভেট ডাক্তার ভাল নেই। জীর্ণ, অবহেলিত সীমান্ত শহরে কেন আসবে তারা। এখানে রোগ বেশি, টাকা কম। আউটডোরে এত ভিড় হয়, সামাল দেওয়া যায় না। আলাদা সময় বার করতেই হয়। জলজ্যান্ত ডাক্তার হয়ে এই এলাকায় প্র্যাকটিস না করাটাই বরং অপরাধের।[২৫]

দেখা যায়, বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়েও শহর থেকে দূরে বসবাসকারী মানুষেরা চিকিৎসাপরিষেবা থেকে বঞ্চিত। সেই অসহায়তার কারণে তাদেরকে নির্ভর করতে হয় প্রাইভেট চেম্বারের ডাক্তারের উপরে। যে ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যবোধের উপরেও ক্রিয়াশীল হয়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী পুঁজিনির্ভর সময়—

মফসসলের জীর্ণ হাসপাতালে বাবা শয্যাশায়ী। অমিত ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে ব্রেনস্ক্যান করিয়ে এনেছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ক্লট করেছে রক্ত। ভাগ্য ভাল, বডির কোনও সাইড প্যারালিসিস হয়নি। ...বাবা যেন তার অপেক্ষাতেই ছিলেন। বড় ছেলেকে দেখে বললেন, আমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে চল।

দেখছি, কী করা যায়।

দেখছি নয়। এখনই নিয়ে চল। এখানে থাকলে মরে যাব আমি। জানি, খরচ হবে। তুই তো এক বছর পরেই ডাক্তার হয়ে যাবি। পারবি না সংসার সামলাতে?

সুমিত উত্তর দিচ্ছিল না। বাবা বলতেন, ডাক্তার হলে গরিব মানুষদের একটু দেখিস। সুমিত ডাক্তার হওয়ার আগেই তস্য গরিব পেশেন্ট হয়ে গেলেন বাবা। মা আগেই মারা গেছেন। বাবা মরে গেলে পেনশন বন্ধ। বোনেদের বিয়ের জন্য যতটুকু সঞ্চয় করেছেন বাবা, পনেরো দিনে নার্সিংহোমে সব টেনে নেবে। সংসার চলবে কী করে? বাবা বেডে শুয়ে একই কথা বলে যাচ্ছেন বার বার। অবুঝ বাচ্চার মতো।... ওই হাসপাতালের একটা বদনামও ছিল, এলাকার লোক বলত ‘ওয়ান ওয়ে।’ একবার যে ঢোকে বেরোয় না। এরকম বদনাম বহু মফসসল হাসপাতালের থাকে। সিরিয়াস পেশেন্টকে সাময়িক

ভাবে ভরতি করা হয়, তারপর নিয়ে যাওয়া হয় নার্সিংহোমে অথবা কলকাতার বড় হসপিট্যালে। সেখানে তো বেড পাওয়াই দায়।[২৬]

উদ্ধৃত অংশে সরাসরি না বলে দিলেও পরোক্ষে অনেক কথাই বলে দেন লেখক। যেমন, সরকারি হাসপাতালের তুলনায় বেসরকারি নার্সিংহোমের উপর মানুষের বেশি ভরসা তৈরি হয়েছিল। যেমন তৈরি হয়েছিল সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগে দেখানোর চেয়ে প্রাইভেটে দেখানোর প্রতি ভরসা। মফসসল হাসপাতালে জটিল অবস্থায় কোনো রোগীর সেইভাবে চিকিৎসা না হওয়ার কথাও এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। এছাড়াও এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় চিকিৎসার বিপুল খরচের দিকটিও উঠে আসে। সব মিলিয়ে এ গল্প পাঠকের সামনে তুলে ধরে বিশ্বায়ন পরবর্তী চিকিৎসাপরিষেবা ক্ষেত্রের কয়েকটি খণ্ডচিত্র। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ধরনের আরও কয়েকটি ছোটোগল্প হল ‘স্বজন’ (*পঞ্চাশটি গল্প*), ‘জার্ম’ (*গল্প ৫১*), ‘অঙ্গারিত’ (*গল্প ৫১*) ইত্যাদি।

৪.৮॥ **কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়**

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৬৪), বর্তমান সময়ের একজন প্রথিতযশা ছোটোগল্পকার। *দেশ*, *উনিশ-কুড়ি* সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বেশকিছু ছোটোগল্প। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এই ছোটোগল্পকারের গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময় এবং তার একাধিক অনুপুঙ্খ। একদিকে যেমন তাঁর গল্পে এই সময়ের প্রযুক্তিনির্ভরতার বিভিন্ন দিক নানা মাত্রায় উঠে এসেছে, অন্যদিকে পণ্যভুবন, বদলে যাওয়া মূল্যবোধ ইত্যাদি হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটোগল্পের বিষয়। আবার বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রটির নানা অনুপুঙ্খও তাঁর লেখার মাধ্যমে উঠে

এসেছে ছোটোগল্প নামক সংরূপের মাধ্যমে। তাঁর এইরকমই একটি ছোটোগল্প হল ‘ঢেউ’ (*পঞ্চাশটি গল্প*, আনন্দ, ২০১৬)। সানন্দা পত্রিকার ১৫ই জুন, ২০১০ সংখ্যায় এই ছোটোগল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ গল্পের সূত্রপাত কিংবা প্রেক্ষাপট জুড়ে থাকে বর্তমান সময়ের আধুনিক সুবিধাযুক্ত, কর্পোরেট সংস্থা নিয়ন্ত্রিত একটি হাসপাতালের কথা। যে হাসপাতাল আধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত, ঝাঁ চকচকে। সরকারি হাসপাতালের মালিন্য সেখানে নেই। সেইরকম একটি প্রেক্ষাপটেই গল্পের ঘটনাপ্রবাহ অগ্রসর হতে থাকে। মধ্যবয়সী বিভাস হাসপাতালে ভর্তি। সারারাত তার স্ত্রী রঞ্জা ওয়েটিং রুমে বিভাসের জন্য বসে থাকে। ভোরবেলা ডাক্তার তাকে ডেকে পাঠায়। আইসিইউ তে থাকা অচৈতন্য বিভাস থেকে থেকেই শর্মিলার নাম করছে। শর্মিলা বিভাসের পুরানো প্রেমিকা। তার সঙ্গে শেষপর্যন্ত বিবাহ হয়নি বিভাসের, তবু স্মৃতির গহনে থেকে যায় সে। ডাক্তার রঞ্জাকেই শর্মিলা ভেবে বসেন। শেষপর্যন্ত বিভাসের ভাইয়ের মধ্যস্থতায় শর্মিলাকে ডেকে আনা হয় বিভাসের অবস্থার উন্নতির জন্য। এ গল্পের শেষে এক অন্যরকম বন্ধুতার সৃষ্টি করেন লেখক। শর্মিলার সঙ্গে রঞ্জার একরকম সমঝোতা হয়ে যায়, তার ছেলের সঙ্গে রঞ্জার মেয়ের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আর এইসবের মধ্যে উঠে আসে চিকিৎসাক্ষেত্রের নানা অনুপুঙ্খ—

> ভোর পৌনে চারটের সময় ওয়েটিং হলে এসে হাঁকডাক আরম্ভ করল ঘন নীল ইউনিফর্ম পরা সিকিয়রিটির লোকটা। রঞ্জার স্বপ্নটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। বিভাস বোসের নামটা শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। অবিন্যস্ত শাড়ির আঁচলটা ঠিক করার কথা খেয়াল থাকল না। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তা হলে...
>
> এই যে ভাই, আমি আছি। কোনও রকমে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করে রঞ্জা বলল।

সিকিয়রিটির লোকটা নির্লিপ্ত গলায় জানান দিল—পাঁচ তলার আই সি সি ইউ-তে চলে যান। আর এম ও খুঁজছেন বাড়ির লোককে।[২৭]

‘ওয়েটিং হল’, ‘ইউনিফর্ম’, ‘সিকিয়রিটি’ ইত্যাদি শব্দগুলি অবধারিতভাবেই পাঠককে জানান দেয় যে, এ গল্প সাধারণত সরকারি হাসপাতালের কথা বলছে না। বিশ্বায়িত পুঁজি চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের যে কর্পোরেটায়ন ঘটিয়েছে, সেইরকম একটি প্রেক্ষাপটে এ গল্প লিখিত। স্বাভাবিকভাবেই এ গল্পে উঠে এসেছে চিকিৎসাকেন্দ্রিক একাধিক অনুপুঙ্খ—

হসপিটালে একটা অদ্ভুত ঝাঁঝালো গন্ধ থাকে। আই সি ইউ-তে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা আরও তীব্র হল। সেই সঙ্গে চারদিকে সার সার শুয়ে থাকা মানুষের বেঁচে থাকার প্রামাণ্য বিপ বিপ আওয়াজ। রঞ্জা বোধশূন্য দৃষ্টিতে বিভাসের বেডের দিকে তাকাল। বুক পর্যন্ত কচি কলাপাতা চাদরটা টানা। ঘাড়টা অল্প কাত হয়ে হেলে আছে। নাকের মধ্যে একটা সরু নল ঢোকানো ছাড়া এদিকে-ওদিকে আরও নল, আঙুলের ডগায় ক্লিপ। মাথার কাছে মনিটরটায় একটা উজ্জ্বল সবুজ লাইন ঢেউয়ের মতো অবিরাম বয়ে চলেছে। এই ঢেউটাকে রঞ্জা চেনে। বেঁচে থাকার স্পন্দন। অনেকটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। ভোরের স্বপ্নটায় যেমন একটা ভিজে প্রশান্তি পেয়েছিল, মনিটরটাকে দেখে সেই প্রশান্তিই যেন ছুঁয়ে গেল গোটা শরীরটা।[২৮]

লক্ষ করা যায় যে, চিকিৎসাক্ষেত্রের একাধিক বিবরণ কিংবা ভাষাবৈশিষ্ট্য কীভাবে ছোটোগল্পের অন্দরে প্রবেশ করে গল্পের ভাবনির্মাণের সহায়ক হয়ে উঠছে।

‘মাকড়সা’ (*সানন্দা*, বোধন ২০১৩) গল্পে উঠে আসে আর একরকমের বাস্তবতা। এ গল্পে পত্রলেখা ও শুভঙ্করের দাম্পত্যের জগতটি উঠে আসে। একটি বেসরকারি স্কুলে চাকরিরত পত্রলেখা এবং একটি কর্পোরেট অফিসে চাকরিরত শুভঙ্করের বিবাহের বহুদিন পরেও সন্তান আসছিল না। অনেক চেষ্টার পর যখন সন্তান গর্ভে এল, সেই সন্তানের জন্য স্কুলের চাকরিটি

ছাড়তে হল পত্রলেখাকে। তাকে বিশ্রাম নিতে হবে, ভালো খেতে হবে, পরিশ্রম করা চলবে না, তাই চাকরিটি ছাড়তে হল। স্বামী হিসাবে শুভঙ্কর একাজে তাকে বাধ্য করল। এরপর শূন্য ফ্ল্যাট আর অনেক অবসর পেয়ে অবসাদে ভুগতে শুরু করল পত্রলেখা। মনোবিদের ভাষায় যাকে বলে "প্রি-পার্টাম ডিপ্রেশন। গর্ভাবস্থায় অবসাদ।" এ গল্পের নির্মিতিতেও স্থান করে নিয়েছে চিকিৎসাক্ষেত্রের পারিভাষিক শব্দাবলি—

> শুভঙ্কর যে বাবা হতে চলেছে আর এই অনুভূতিটাই যে কী দুর্দান্ত, সেটা একটুও উপভোগ করতে পারল না শুভঙ্কর। প্যাথোলজিক্যাল ক্লিনিকের ইউরিন টেস্টের পজিটিভ রিপোর্টটা দেখে শুভঙ্করের প্রথম প্রতিক্রিয়াটাই ছিল, "তোমাকে এবার চাকরিটা ছাড়তে হবে লেখা।"
>
> পত্রলেখা উড়িয়ে দিয়েছিল, "ধুৎ ! বাচ্চা হওয়ার জন্য কেউ চাকরি ছাড়ে নাকি? ছ'মাসের মেটারনিটি লিভ পাওয়া যায় জানো না ?"
>
> "প্রশ্নটা ছ'মাসের নয় লেখা। তুমি জানো কতটা ডিফিকাল্ট ওয়েতে তোমার প্রেগনেন্সিটা এসেছে। ইউ জাস্ট কান্ট অ্যাফোর্ড টু লুজ ইট। তা ছাড়া বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত একটা ফেজ। তারপর সেই বাচ্চাকে বড় করা, মানুষ করা আরও অনেক বড় একটা ফেজ। অনেক বেশি দায়িত্বের।"[২৯]

এ গল্পে আর একটি ভিন্ন প্রেক্ষিত গুরুত্ব পেয়েছে। সন্তান ধারণের কথা বলে নারীর কর্মের সুযোগকে সঙ্কুচিত করার মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে এখানে। নারীর পরিসরকে সীমিত রাখার বহুকাল ধরে প্রবাহিত প্রচেষ্টা এ গল্পে আর একবার উঠে এসেছে—

> "আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি, ভালবাসা তো দূরের কথা, তোমার আমার জন্য বিন্দুমাত্র রেসপেক্ট নেই। তোমার সঙ্গে আমার আর থাকা সম্ভব নয়। আই ওয়ান্ট অ্যান এন্ড অফ আওয়ার রিলেশনশিপ।"
>
> "তোমার কী হল আজকে ?"

"কিছু হয়নি। আই অ্যাম ফাইন। তোমাকে বলেছিলাম না, তুমি আমার চাকরিটা ছাড়িয়ে দিয়ে বেসিক্যালি আমার খুব উপকার করেছ। আমি অনেক কিছু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার টাইম পাচ্ছি। আমাদের রিলেশনশিপটার মধ্যে কোনও মিউচুয়াল রেসপেক্ট নেই। আছে শুধু একটা স্বার্থ। আমার কনসিভ করা। যে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে তুমি সব জায়গায় অ্যাডভার্টাইজ করবে যে তুমি ইমপোটেন্ট নও। সব প্রবলেম আমার ছিল। ঠিক আছে। বাচ্চাটাকে আমি তোমাকে দিয়ে দেব।"

কথা বলতে বলতেই ট্রেনে উঠে পড়ল শুভঙ্কর, "প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো। নাউ ইউ হ্যাভ কনসিভড। এসব নিয়ে এখন ভাবছ কেন? কেউ কথা বলছে না এ নিয়ে।"

"তোমায় বললাম না, এখন আমি ভাবার অনেক সময় পাচ্ছি। তুমি কখনও চিন্তা করে দেখার সময় পেয়েছ কি কনসিভ করতে গিয়ে আমাকে কী কী করতে হয়েছে? একেকটা ডাক্তারের চেম্বারে আমাকে গিনিপিগের মতো যেতে হয়েছে। প্রেসক্রিপশনের ডেট দেখে দেখে তোমার সঙ্গে শুতে হয়েছে। চাকরি ছাড়তে হয়েছে। তোমার মনে আছে, শুধুমাত্র একবার সিমেন টেস্ট করাতে যেতে তুমি কী এমবারাসড ফিল করেছিলে... প্রবলেম শুধু আমার ছিল না। তোমারও স্পার্ম কাউন্ট নিয়ে প্রবলেম ছিল। ইনাফ ইজ ইনাফ। এবার একটা লাইন ড্র করার দরকার।"[৩০]

এ গল্পে নারী স্বাধীনতার দিকটিও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সন্তান আসায় এই বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে দাঁড়িয়েও নারীকেই প্রধানত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এ গল্পের শেষে গল্পকার শুভঙ্করকে ছুটি নিতে দেখান, কিন্তু মনে রাখা দরকার সে ছুটিই নেয়, পত্রলেখার মতো তাকে চাকরি ছাড়তে হয় না বাধ্য হয়ে। তাই বলা যায় বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তিগতভাবে মানুষের অনেক উন্নতি হলেও নারীর অবস্থানটি সেই পিতৃতন্ত্র নির্ধারিতই রয়ে গিয়েছে।

'বড়সাহেব' (*দেশ*, ১৭ই জানুয়ারি ২০০৭) গল্পটির প্রেক্ষাপটেও উপস্থিত হয় একটি বেসরকারি হাসপাতাল এবং চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক। এ গল্পের মূল চরিত্র তেজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রিটায়ার করেছিলেন সিলভেস্টার কোম্পানির রিজিওনাল ডিরেক্টর হিসাবে।

তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হন। পাশের কেবিনেই ভর্তি হন তাঁর কোম্পানির বর্তমান রিজিওনাল ডিরেক্টর। এ গল্পে অ্যালঝাইমার্সে আক্রান্ত তেজেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার প্রয়াসটি জারি থাকে। তাঁর কথোপকথনে উঠে আসে বিশ্বায়নের একাধিক দিক। আর এই সবকিছুর প্রেক্ষাপটে জীবন্ত হয়ে ওঠে একটি হাসপাতাল জীবন—

> চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন তেজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস তাঁর কোনওকালেই নেই। এই নার্সিংহোমের বেডেও তাই ঘুম আসে না। কতদিন আই সি সি ইউ-তে ছিলেন হিসেব করতে পারেন না। আই সি সি ইউ-তে শেষের দিকে দুপুরগুলো তাও কেটে যেত। কিছু মানুষজন, যন্ত্রের বিপ বিপ ছিল। কিন্তু এই কেবিনের দুপুরগুলো অসহ্য। ভিজিটিং আওয়ার্সের দিকে চেয়ে বসে থাকা।...
>
> ভারী শরীরের ওজনটা মেয়েটার কাঁধে ছেড়ে চৌকি থেকে মাটিতে নামলেন তেজেন্দ্রনাথ। দাঁড়িয়ে মাথাটা একটু টলটল করছে। হাঁটুতেও ঠিক জোর পাচ্ছেন না। হাঁটুটা ভেঙে যাচ্ছে। মেয়েটি কিন্তু ঠিক সামলে নিল।
>
> এক পা...এক পা...দরজাটা এগিয়ে আসছে। দরজার কাছে এসে পায়ের চাড়ে মেয়েটি দরজাটা খুলে ফেলল। দরজাটা দিয়ে বেরোতেই লম্বা প্যাসেজ। কচি কলাপাতা রঙের লম্বা টানা দেওয়াল। দু'দিকে সার সার বহু দরজা। প্যাসেজের একদম শেষপ্রান্তে ডিউটি নার্সদের ডেস্ক। তার পাশেই বড় বড় দু'পাল্লার কাচের দরজা। মনটা ভাল হয়ে যাচ্ছে তেজেন্দ্রনাথের। দুর্বল হাঁটুদুটোয় জোর ফিরে আসছে। পা দুটোও যেন দৃঢ় হচ্ছে। পা শক্ত হলেই আত্মবিশ্বাসটা ফিরে আসে।[৩১]

এভাবেই তাঁর ছোটোগল্পে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র কিংবা তার একাধিক অনুপুঙ্খকে জীবন্ত করে তুলেছেন লেখক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। উঠে এসেছে বেসরকারি হাসপাতালের পরিষেবার একাধিক দিক। পাঠক লক্ষ করে নিতে পারেন যে, তাঁর প্রায় সবগুলি গল্পই প্রকৃতপক্ষে তুলে ধরেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী বেসরকারি পুঁজি নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেট হাসপাতালের কথা। মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে যান। তাই সংগতভাবেই

সেই পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত আধুনিকতম প্রযুক্তি কিংবা একাধিক সুবিধার কথা গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে গল্পের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একাধিক পারিভাষিক শব্দাবলি।

৪.৯॥ **তিলোত্তমা মজুমদার**

তিলোত্তমা মজুমদার (জন্ম-১৯৬৬) বর্তমান সময়ের নারী লেখিকাদের মধ্যে অন্যতম এক স্বর। ছোটোগল্পের পাশাপাশি উপন্যাসের জগতেও তাঁর সমান দক্ষতা। তাঁর ছোটোগল্পের জগতে পদার্পণ করার পর প্রায় দুই দশক অতিক্রান্ত। একদিকে তাঁর ছোটোগল্পে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের জনজীবন কিংবা নাগরিক শহর কলকাতা, উঠে এসেছে প্রবাসী হোস্টেল জীবন, সমপ্রেম, বিশ্বায়ন কিংবা নারীর ভুবনের অনেক অনালোচিত বিষয়সমূহ, তেমনি তাঁর ছোটোগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে চিকিৎসাপরিষেবাক্ষেত্রের একাধিক অনুপুঙ্খ। তা কখনো সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে, কখনো বা বেসরকারি ক্ষেত্রের চিকিৎসাব্যবস্থার খুঁটিনাটিকে কেন্দ্র করে। নারীর জগতটি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবনবোধ হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটোগল্পের বিষয় আশয়। এই সূত্রে বলা যেতে পারে নারী এবং নারীর সূত্রে চিকিৎসাক্ষেত্রের একাধিক অনুপুঙ্খ উঠে এসেছে তাঁর ছোটোগল্পে। তা একদিকে যেমন নারীর জগতের না বলা কথাসমূহকে আলোকিত করে তুলেছে, অন্যদিকে উঠে এসেছে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার নারীসম্পর্কিত বিভিন্ন দিক।

বিশ্বায়ন ভারতীয় পরিবারব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছিল অনেকাংশে। একান্নবর্তী যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো অণু পরিবার তৈরি হচ্ছিল। উপার্জনের ধরন বদলে যাওয়ার ফলে মূলত নগরকেন্দ্রিক অবস্থানে বাস করার একধরনের তাগিদ ক্ষুদ্র পরিবারগুলির মধ্যে দেখা

গিয়েছিল। পূর্বতন সামাজিক রক্ষণশীল মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও বদল দেখা দিয়েছিল। যার প্রভাব এসে পড়েছিল বিবাহের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর। পূর্বের বিবাহপদ্ধতিকে অস্বীকার করে তরুণ প্রজন্মের একাংশ একত্রে বসবাস বা 'লিভ টুগেদার'-এ বিশ্বাসী হয়। বলাই বাহুল্য এই সংস্কৃতি মূলত পাশ্চাত্যের, যাকে বহুগুণে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল পণ্যসংস্কৃতি। তিলোত্তমা তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে এই বিষয়টিকে দেখিয়েছেন। তাঁর এই ধরনের একটি ছোটোগল্প হল 'গ্রহণ' (*শ্*, আনন্দ, ২০০৩), যে গল্পটি লিখিত হয়েছিল ২০০০ সালে। এ গল্পের চরিত্র দীপাঞ্জন এবং সাহানা বেশ কিছুদিন প্রেমের পর একত্রে বসবাস করতে শুরু করে। দীপাঞ্জন ট্যুইশন করত আর সাহানা ছোটো কম্পিউটার ইন্সটিটিউটে কাউন্সেলর। তারা দু'জন বাগুইআটিতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। কিন্তু বাড়িটির সবদিক ভালো হওয়া সত্ত্বেও একটি প্রস্তাবে তারা আটকে যায়, তা হল যতদিন তারা বাচ্চা-কাচ্চা নেবে না, বাড়িটিতে ততদিনই তারা থাকতে পারবে। বাচ্চা-কাচ্চা এলেই তাদের বাড়িটি ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারাও সেই শর্ত মেনে নেয়। তবু মানবজীবন এতখানি কাঠিন্যে পর্যবসিত হয়নি বলেই হয়ত তাদের বাচ্চা আসে। আর এই ভাড়া বাড়িটির নিরাপদ আশ্রয় তাদের ত্যাগ করতে হবে বলেই তারা গর্ভটি নষ্ট করে ফেলতে উদ্যত হয়। গল্পের অগ্রগতিটি এরকম হলেও এ গল্পের শেষে পক্ষ মেলে মানবতা। যে বাড়িওলা প্রৌঢ় দম্পতি সন্তানগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, তাঁরাই এই তরুণ দম্পতির আসন্ন সন্তানটির জন্য বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আর এই সবের প্রেক্ষাপটে টুকরো টুকরো অনুপুঙ্খে উপস্থিত থাকে চিকিৎসাক্ষেত্র—

> দেখতে দেখতে সেপ্টেম্বর এসে গেল। পেরিয়ার যাবার প্রস্তুতি নিতে হবে। কিন্তু সাহানার শরীর ভাল নেই। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। খাবারে রুচি নেই। দীপাঞ্জন প্রথমে অ্যাপেটাইট টনিক দিয়েছিল, তারপর

ভিটামিন খাইয়েছিল। শেষে লেকটাউনে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার দেখেশুনে রায় দিলেন—মা হবে। দুই মাস।[৩২]

'ফার্ন' (*ঋ*, আনন্দ, ২০০৩) গল্পটি লিখিত হয়েছিল ২০০২ সালে। এ গল্পের সূত্রপাতেই রয়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপস্থিতি। একটি নারীর গর্ভবতী হওয়ার খবর উঠে আসে এইভাবে—

> অন্তত সন্তান ধারণের খবরে এ বাড়ির লোক খুশি হবে বলে তার ধারণা হয়েছিল। মে মাসের এই ভোর, যখন সারা রাত গরমে হাঁসফাঁস করে মানুষের চোখে নেমেছে পবিত্র প্রার্থিত ঘুম, আর গভীর ঘুমের মধ্যে সুস্বপ্নরা ধরা দিচ্ছে, তখন, প্রেগ কালার টেস্ট বা গর্ভধারণের নিশ্চয়তা পরীক্ষার সরু টিউবটিকে দু' আঙুলে ধরে সে দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে এসেছিল এবং কিছু উত্তেজিত, কিছু আনন্দিত ঠেলায় স্বামীটির ঘুম ভাঙিয়ে বলেছিল—এই, ওঠো, ওঠো ! পজিটিভ ![৩৩]

এ গল্পে তিলোত্তমা তুলে ধরেছেন এক যৌথ পরিবারের ছেলে ইন্দ্ররূপের সঙ্গে বিবাহিতা তিয়ার অসুখী দাম্পত্যের কাহিনিকে। তিয়া ততখানি সুন্দরী নয়, যৌতুক হিসাবেও খুব আহামরি কিছু আনতে পারেনি বাপের বাড়ি থেকে। তাকে নিয়ে স্বামীর পরিবারের কেউ সুখী নয়। তাই গর্ভাবস্থাতেও তার জন্য কোনো আলাদা যত্ন কারুর মধ্যে লক্ষ করা যায় না। পরিবারের অবহেলায় তার শারীরিক ও মানসিক পীড়া দেখা দেয়। এরপর তার রক্তপাত শুরু হলেও তাকে নার্সিংহোমে না রেখে খরচের ভয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ গল্পের অবসরে লেখিকা তুলে ধরেন সরকারি চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের দুর্গতিপূর্ণ অবস্থাকে। গল্পরচনার সময়কালের নিরিখে তা হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সময়ে বেসরকারি পুঁজিনিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা অনেক ভালোমানের পরিষেবা দিচ্ছিল, যে কারণে সরকারি হাসপাতালের তুলনায় নার্সিংহোমে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ গল্পে বেআব্রু হয়ে পড়ে সরকারি সরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবাক্ষেত্রটি—

হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ বলে খ্যাত স্থানটিতে আনা হয়েছিল তিয়াকে। জটিল অবস্থার আরও অন্যান্য রোগীদের সঙ্গে যে-ঘরটিতে তাকে রাখা হয়েছিল তাতে পঞ্চাশটি বেড। যে কোনও পরিস্থিতিতেই ডাক্তার তার উঠে বসা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। ফলে, শুয়ে শুয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল যতখানি তার মধ্যে তার চোখে পড়েছিল নার্সদের ঘরটি এবং আশেপাশের অন্তত দশটি বেড। প্রত্যেকটি বেডের নীচে আবর্জনা ছিল। হয়তো-বা সাফাইওয়ালার কোনও দায়বদ্ধতা ছিল না প্রতিদিন আসার। বেডপ্যানগুলি মলে-মূত্রে উপচে থাকছিল। এমনকী রক্তমাখা প্যাড নিয়ে খেলা করছিল দু'-একটি বেড়াল। জং পড়ে যাওয়া অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলিকে দেখাচ্ছিল প্রাচীন সমাধিফলকের মতো। ইতস্তত তুলো ও সিরিঞ্জও দেখা যাচ্ছিল। সে যে-দিন এসেছিল সে-দিন রাত্রেই তার পাশের বিছানার অক্সিজেন নিতে থাকা বৃদ্ধাটি মারা যায়। যেহেতু এ মৃত্যু নিঃশব্দ ছিল সেহেতু প্রাথমিক সে কিছু টের পায়নি। কিন্তু টের পেয়ে যাবার পর একটি দুর্বহ যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করেছিল। হাসপাতালের গন্ধ, পরিবেশ, রোগীদের গোঙানি এবং মৃত্যুর আবর্তে তার ঘুম আসেনি প্রায় সাতদিন।[৩৪]

এ গল্পে তিলোত্তমা তুলে ধরেন ডেলিভারি রুমের ভয়াবহ বর্ণনা। গল্পের শেষে এই ব্যবস্থাপনার উদাসীনতায় মৃত সন্তান প্রসব করে তিয়া—

কয়েক মিনিটের মধ্যে তিয়া যে-ঘরে নীত হয়েছিল সেখানে সার সার টেবিল। তাতে গোল ছ্যাঁদা। প্রত্যেকটি টেবিলে পা তুলে শুয়ে ছিল অচেতন, অর্ধচেতন প্রায় উলঙ্গ মহিলারা। তাকে শাড়ি তুলে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে রক্তপাত গর্তে বাহিত হয়। তার আগে সে দেখেছিল গর্তের মুখে অন্যজনের রক্ত লেগে আছে। মোছা হয়নি। বহুক্ষণ পর তাকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জন্মদানের পর্ব সেখানেও পর পর। সার সার ছোট ছোট বেড জুড়ে মাতৃত্ব সম্পাদিত হচ্ছিল। একটি ঘরে, একই সঙ্গে, চল্লিশটি জন্মদান। সে-ঘরে কোনও ডাক্তার ছিল না। মাঝে মাঝে তাঁদের আগমন ঘটছিল। মাঝে মাঝে তীব্র চিৎকার করে কেউ জন্ম দিয়ে ফেললে অন্যান্য বেদনাকাতর মায়েরা চিৎকার করছিল—ও ডাক্তারবাবু, আসুন বাচ্চা হয়ে গেছে—কোনও একজন ডাক্তার এসে যাচ্ছিলেন তখন। মনুষ্যজন্মের অতি

সস্তা প্রক্রিয়ায় একটি বেড শূন্য হলেই আরও এক গর্ভবতী সেই জায়গা পূর্ণ করছিল। গড়ে ত্রিশটি জন্মের দায়ভার সারাদিনে এক-একজন ডাক্তারকে নিতে হচ্ছিল।[৩৫]

ভীষণ শ্রান্তিতে, দীর্ঘ যুদ্ধের পরে যেমন, ভারী হয়ে আসা চোখের পাতা খুলেছিল সে। ডাক্তারের হাতে একটি এক হাত লম্বা, ছোট্ট তুলতুলে মেয়ে পুতুল। শক্ত। ঘুমন্ত। অনড়।[৩৬]

'কাকোল' (*গল্প সংগ্রহ*, আনন্দ, ২০২০) গল্পটির রচনাকাল ৯ই মে, ২০১২। এ গল্পে লেখিকা তুলে ধরেন সহায় সম্বলহীন চালকলের শ্রমিক এক মা এবং তার বছর দশেকের ছেলেকে। মা অসুস্থ হয়ে পড়লে উপায়হীন ছেলেটি তাকে নিয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে আপাতদৃষ্টিতে সরকারি হাসপাতালে সব কিছু ফ্রি বলা হলেও সেখানে রমরম করে চলা দালালচক্রের কথা উঠে আসে লেখিকার কলমে। তাদেরকে টাকা না দিলে সরকারি হাসপাতালে বেড মেলা দুষ্কর। এই সবের পাশাপাশি এ গল্পে ঈশ্বর সম্পর্কে বা তাঁর কল্যাণের ধারণা সম্পর্কে বার বার বালকটির মনে প্রশ্ন জাগিয়েছেন লেখিকা। এ গল্পেও উঠে এসেছে সরকারি চিকিৎসাক্ষেত্রের দুর্বিষহ অবস্থার দিকটি—

রাজু পকেট থেকে টাকা বার করল। পঞ্চাশ টাকা দিল তারকের হাতে। মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষের বাইরে আরও পাঁচ-ছ'জনের ফাঁকে মাকেও কম্বল পেতে শুইয়ে দেওয়া হল। এ হল যাওয়া-আসার অলিন্দ। দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল রাজু। কোথাও মলবর্জনের পাত্র, মূত্রভর্তি বোতল, রক্তমাখা তুলো। রোগিণীর শিয়রের পাশে তারই নিক্ষিপ্ত থুতু-কফের স্তূপ। নোংরা দেওয়ালে বিচিত্র দাগ। বেড়াল ঘোরাফেরা করছে। দুটি কুকুরের বাচ্চা লেজ নাড়তে নাড়তে ঘুরছে। রোগিণীদের কারও পেট ফুটো করে নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারও উদোম গা। কেউ অর্ধ উলঙ্গ। কেউ কাঁদছে। কেউ দ্রুত চলতে থাকা সেবিকার পা জড়িয়ে ধরছে। সেবিকা পদাঘাত করতেই কেবল বাকি রাখছেন। রাজুকে দেখে কড়া ধমক দিলেন একজন। 'এখনও এখানে কী করছিস? বেরো। ড্যাব ড্যাব করে দেখছে দেখো।'[৩৭]

সরকারি চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের অবনমনের দিকটিকে লেখিকা তাঁর ছোটোগল্পে এভাবেই তুলে ধরেছেন। ধীরে ধীরে পূতিগন্ধময় এবং সবরকম অব্যবস্থার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ। পশুর সঙ্গে মানুষের সেখানে একত্র সহাবস্থান। প্রকৃতপক্ষে সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার নিয়ামকদের উদাসীনতায় এভাবেই একেবারে প্রান্তিকতম দরিদ্র মানুষজনও সরকারি ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা গ্রহণ করতে নিরুৎসাহী করে তোলে। বিপরীতপক্ষে ভিটেমাটি বিক্রি পর্যন্ত করে দরিদ্রতর মানুষ পর্যন্ত চিকিৎসাপরিষেবা পাওয়ার জন্য দেশের বিভিন্নপ্রান্তে হন্যে হয়ে ছুটে আসতে থাকে। পরিষেবা পাওয়ার জন্য ভিড় জমাতে থাকে দক্ষিণভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে। সেখানেও মূলত বেসরকারি পুঁজিনির্ভর চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রকেই আশ্রয় করতে হয় সাধারণ মানুষজনকে। তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর ছোটোগল্পের মধ্যে দিয়ে এইভাবেই তুলে ধরেছেন বিশ্বায়ন-পরবর্তী চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের একাধিক অনুপুঙ্খকে।

৪.১০॥ **তৃষ্ণা বসাক**

তৃষ্ণা বসাক (জন্ম-১৯৭০) বর্তমান সময়ের একজন জরুরি কথাকার। নবীন প্রজন্মের নারী কথাকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.ই. ও এম. টেক. তৃষ্ণা বসাকের ছোটোগল্পেও এসে পড়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপনের একাধিক দিক। তাঁর *ছায়াযাপন* (একুশশতক, ২০০৯), *দশটি গল্প* (পরশপাথর, ১৪১৭), *নির্বাচিত পঁচিশটি গল্প* (একুশশতক, ২০১৪) প্রভৃতি গ্রন্থের একাধিক ছোটোগল্পে উঠে এসেছে প্রযুক্তিনির্ভর নাগরিক জীবন, নারী বিষয়ক একাধিক প্রশ্ন, মধ্যবিত্ত জীবন অথবা বদলে যাওয়া সময়। উল্লেখিত তিনটি গ্রন্থের আটান্নটি ছোটোগল্পের নিরিখে এ কথা বলা যায়। সেই সঙ্গে লেখিকার প্রশাসনিক পদ,

উপদেষ্টা-বৃত্তি, আংশিক সময়ের অধ্যাপনা, পূর্ণ সময়ের লেখালিখি ইত্যাদি তাঁর বিচিত্র ও বিস্তৃত কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ফসল স্তরীভূত হয়েছে তাঁর লেখায়।[৩৮]

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে বাংলা ছোটোগল্পের বিষয় হিসাবে অনেকসময়েই উঠে এসেছে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র কিংবা মানুষের অন্তর্গত চিকিৎসা-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির একাধিক প্রকাশ। এই সচেতনতার প্রকাশের পশ্চাতে একদিকে যেমন পূর্বের তুলনায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়াকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, অন্যদিকে এই ক্ষেত্রটিতে পূর্বের তুলনায় পুঁজির বহুল প্রসারও ছিল অন্যতম কারণ। একদিকে পুঁজির প্রসার, অন্যদিকে পুঁজি-পরিচালিত বিজ্ঞাপনকেন্দ্রিক সচেতনতা- উভয়প্রকারে মানুষের মধ্যে যে সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটেছিল, তার ছাপ এসে পড়েছিল বাংলা ছোটোগল্পে। তৃষ্ণা বসাকের ছোটোগল্পের কয়েকটিতে সেই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাঁর *ছায়াযাপন* গ্রন্থের ‘বিপন্নভাষ’ গল্পটিতে উঠে এসেছে এইধরনের কিছু বিষয়। এ গল্প তমাল আর শ্রুতির দাম্পত্যের কথা তুলে ধরে। দু’জনেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সফল। কিন্তু সেই সাফল্যের পথে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের বিবাহিত জীবনের আটটি বছর। সন্তান আসেনি। এ গল্পে শ্রুতিকে দেখা যায় একটি হাসপাতালের পরিবেশে। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য ভর্তি হয়েছে সে। তবু সেখানেও পিছু ছাড়েনি তার পেশাগত জীবন। হাসপাতালে বসেই সে ল্যাপটপে কাজ করে যায়, পাশে পড়ে থাকে মোবাইল ফোন। তার জীবন ইন্টারনেট নির্ভর। সেই জীবনকে সে সরিয়ে রাখতে পারে না আসন্ন সন্তানের প্রতীক্ষায়। এ গল্পের শেষে দেখা যায়, এত শিক্ষিত একটি নারী হয়েও সদ্যোজাত সন্তানকে পরিচর্যা করার বিদ্যা তার নেই, যা আছে তার পরিচারিকা তাপসীর কাছে। এ গল্পের সমাপ্তিতে তাই তাপসীকেই দেখা যায় স্বাভাবিক মাতৃত্বে শ্রুতির সন্তানকে কোলে আঁকড়ে রাখতে। আর এরই মধ্যে দিয়ে এ গল্পে উঠে আসে হাসপাতাল জীবনের অনুপুঙ্খ—

ভিজিটিং আওয়ার শেষ। পেশেন্ট পার্টিরা চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। কেউ কেউ নিজের গাড়ি বারান্দায় উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে। কারও পেশেন্ট হয়তো ওটিতে। কারও বা এখনি ঢুকবে। ওষুধ, ব্লাড—সম্ভাব্য নানা ছুটোছুটির আগাম প্রস্তুতি টানটান করে রেখেছে বাড়ির লোকেদের। ওখানে শ্রুতির কেউ নেই। ওর আর ওর বাড়ির লোকের হাতে এখন অনেক সময়, এই হাসপাতালের দীর্ঘ দীর্ঘ করিডোরের মতো। সময় যে কখন উপচে পড়ে, আবার কখন বাড়ন্ত হয়ে যায়, সে এক মজার ধাঁধা। শ্রুতি আর তমালের হাতে এতটুকু সময় ছিল না, ওদের দু'জনের ঘরে তৃতীয় কারও জন্যে ছিল না যথেষ্ট পরিসর। এভাবেই বিয়ের পর আট বছর কেটে গিয়েছে। ভেবে, পিছিয়ে, আবার ভেবে। তমাল ওর থেকে একটু এগিয়ে ছিল। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ। ওর মধ্যে দু-তিন বছর ধরেই একটা তুষ্টি কাজ করছিল, মুখের রেখায় তিরতির করত একটা স্বপ্ন। শ্রুতির সঙ্গে এতদিন বাস করার পরেও ফেলে আসা যৌথ পরিবার ও পরিবারবোধকে হয়তো ও বয়ে বেড়ায়। হয়তো এখনও ওর মধ্যে বংশানুক্রমের লোভ আছে, আছে পুরুষতন্ত্রের আঁশ। ও বাবা হতে চাইছিল। ওর তাগিদ একসময় শ্রুতিকেও ছুঁয়ে ফেলল। কিংবা তার রক্তে নড়ে উঠল আদিম মাতৃপুরাণ, যাতে সায় দিল টিভি বিজ্ঞাপনের সুখী জননী। সুস্থ পুষ্ট শিশুকে গোল করে ঘিরে থাকা উষ্ণ সুরক্ষা বলয়।[৩৯]

কিংবা—

একেকসময় কাজ থামিয়ে তাপসীর দিকে ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে থাকে শ্রুতি। হাজার হাজার গিগাবাইট ডেটার ভারে তার ঘাড় টন টন করে। চোখের সামনে সবসময় ঝোলে ক্যাথোড রে টিউবের নীলাভ পর্দা। তাপসীকে ভাল করে দেখতে পায় না শ্রুতি। সে পেটের উপর হাত রাখে। নড়ছে তো? সপ্তাহখানেক পরে তার ডেট। তার আগেই সিজার করা হবে। তিনদিন ধরে সকালে ফাস্টিং-এ থাকতে হচ্ছে। সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে বেবির মুভমেন্ট নোট করে রাখতে হয় একটা রাইটিং প্যাডে। সেটা দেখে ডাঃ বাগচি ডিশিসন নেবেন। মানে যে কোনওদিনই। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে।[৪০]

এই গল্পে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের বেশ কিছু দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন নির্দিষ্ট এই ক্ষেত্রটির একাধিক পরিভাষা গল্পের ভাষাব্যবহারের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে সরকারি

চিকিৎসাব্যবস্থা যে সমাজের উচ্চকোটির মানুষের ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানে পার্থক্য রচনা করে, তাও উঠে এসেছে এ গল্পে। মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রযুক্তিনির্ভরতাও এ গল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে।

'পূর্ণ' (*ছায়াযাপন*) গল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে স্তন ক্যানসার সম্পর্কিত ভাবনা এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নারীবাদী প্রশ্ন। এ গল্পের চরিত্র মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাটবাসী রুনুর স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতার উৎস রঙিন ছবিওয়ালা একটি পত্রিকা। যেটি পড়ে সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তনে লাম্প হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে শেখে। এ কাজ তার কাছে বৈচিত্র্যহীন পৌনঃপুনিকতা সৃষ্টি করলে সে পত্রিকাটি বিক্রি করে দেয়। কিন্তু এর পরপরই তার শরীরে বাসা বাঁধে স্তন ক্যানসার, যা তার নারীসুলভ অস্তিত্ব কিংবা যৌনজীবনে একটি প্রশ্নচিহ্ন হিসাবে উঠে আসে। শেষপর্যন্ত ম্যাসটেকটমি করে তার বাম স্তনটি বাদ দিতে হয়। এ থেকে তার প্রাত্যহিক জীবনটি বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়, পাশাপাশি তার মনে উঠে আসে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন—

> বেসিনের উপর ঝুঁকে মুখ ধুতে গিয়ে নিজের বাম স্তনের ছায়া দেখতে পেল রুনু। পেস্তা রঙের বেসিনে সেই ছায়াস্তন দেখে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সটান। তখন দেওয়ালে আরও স্পষ্ট, আরও শারীরিক দেখাল যুগলের একটিকে। রুনু বিমূঢ় হয়ে গেল।...
>
> রাতের খাওয়া, টেবিল মোছা, বেঁচে যাওয়া খাবার ফ্রিজে তোলা ইত্যাদির পর সে এবার ব্রাশ করবে, অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ডোবানো তুলো দিয়ে মুখ, ঘাড় পরিষ্কার করবে, চুল আঁচড়াবে, পাউডার মাখবে, লোকসমাজে অচল একটি ফিনফিনে নাইটি পরে রঙিন ছবিওয়ালা কিছু পড়বে। যেখানে সুপরামর্শ থাকে, প্রতি সংখ্যাতেই থাকে, আলো ঠিকরোনো ত্বক, সুছাঁদ শরীরের। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিভাবে স্তনে লাম্প হয়েছে কিনা দেখতে হবে, তা এইসব পড়েই জেনেছে রুনু। ও ঠিক পড়েনি, বিশ্বজিৎ তাকে পড়তে বলেছে অনেকদিন।[৪১]

অসাড়েই রুনুর হাত উঠে এল ওর বাম স্তনে, মানে যেখানে স্তনটি ছিল সেই জায়গায়। ম্যামোসোনোগ্রাফিতে জানা গেছিল স্টেজ টু-তে আছে ও। ম্যাসটেকটমি না করে ব্রেস্ট কনজারভেসন করাই যেত। রুনুর হাতে একটু চাপ দিয়ে তুখোড় ডাক্তারটি বলেছিল, 'অ্যাকসিডেন্টে লোকের হাতপা-ও তো বাদ যায়!'

রুনু ভালো করে ওর হাত-পা জরিপ করল। এর যে কোনো একটা চলে গেলে ওর কি আরও অসুবিধা হত না ? কিংবা যদি চোখই চলে যেত? স্তন-বিযুক্ত নারীর জন্যে সংসারের কোনো ক্ষতি তো হয় না। আর কিছুদিন পরেই তো সে আগের মতো হয়ে যাবে, আবার দশ হাতে সামলাবে সংসার। মা দুর্গার ম্যাসটেকটমি হলে কি মহিষাসুর মারতে পারত না?

আর কাজকর্মের বাইরে বিশ্বজিতের সঙ্গে যে সম্পর্ক—তাতেও তো আটকাবে না কিছুই। আশ্বাস দিয়েছেন ডাক্তাররা। একটা এন জি ও থেকে একগাদা বুকলেট ধরিয়ে দিয়ে গেছে। বিশ্বজিৎও বলেছে, ওসব নিয়ে ভাবছে না সে, তার মাথাব্যথা রুনুর ভালো হয়ে ওঠা নিয়ে, আর যেন অন্যটাতে বিষ না ছড়ায়।

আবার অজান্তে হাত চলে যায় বুকের বাঁ দিকে। ডাক্তারটা ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে কি এত অনায়াসে কেটে ফেলতে পারত এই স্তন, হাত পায়ের তুল্যমূল্যে? এই সেদিনও ছেলে এটা থেকে দুধ খেয়েছে, এক অলৌকিক রাতের আশ্লেষ লেগে এর প্রতি রোমকূপে...। স্মৃতি কেটে ফেললেও পাশ থেকে ফ্যাকড়া বেরোয়।[৪২]

এ গল্পে বিশ্বায়নের পণ্যসংস্কৃতি একটি বড়ো জায়গা করে নিয়েছে, তার সঙ্গে সচেতনতা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে নারীর শরীরবিষয়ক বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যা আসলে পণ্যে পরিণত করা নারীদেহ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন মূল্যবোধের প্রশ্নকে তুলে ধরেছে। সেইসঙ্গে এ গল্পে উঠে এসেছে চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিছু পারিভাষিক শব্দাবলি।

৪.১১॥ **তন্বী হালদার**

বিশ্বায়ন এবং তার প্রভাব যেভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল, তা বর্তমান সময়ের ছোটোগল্পকাররা তাঁদের গল্পে অবধারিতভাবে তুলে ধরেছিলেন। এই ছোটোগল্পকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন তন্বী হালদার। লেখিকার জন্ম ১৯৭২ সালে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে। তিনি পেশায় সরকারি কর্মী। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *জলাভূমি*-র জন্য পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত 'সুতপা রায়চৌধুরী স্মারক পুরস্কার'। এছাড়াও তিনি 'সমর মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার', 'ডলি মিদ্যা স্মৃতি পুরস্কার', 'আরবিকা পদক-২০১৩', 'ইলা চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার-২০১৪', 'শর্মিলা ঘোষ সাহিত্য পুরস্কার-২০১৩', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত 'সোমেন চন্দ স্মৃতি পুরস্কার-২০২০' সহ বহু পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত। বদলির চাকরির কারণে কর্মরত থেকেছেন পুরুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাত বা বসিরহাট আবার কখনও বা বীরভূমে। এর ফলে তাঁর লেখার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ।[৪৩]

তন্বী হালদার মূলত দু'হাজার সাল পরবর্তী ছোটোগল্পকার। স্বভাবতই তাঁর ছোটোগল্পের অন্যতম বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন কিংবা বিশ্বায়ন পরবর্তী তথ্যপ্রযুক্তি, বিনোদন ব্যবস্থা কিংবা পুঁজির প্রসার, নারীবাদী ভাবনা, টুকরো হতে থাকা যৌথ পারিবারিক জীবন কিংবা অণু পরিবারের চার দেওয়ালের গার্হস্থ্য হিংসা অথবা নারীর নিজস্ব পরিসরের সন্ধান। শুধুমাত্র নাগরিক জীবনের অনুপুঙ্খ নয়, নগরজীবন থেকে অনেক দূরে থাকা মানুষ ও সমাজের জীবনসংগ্রাম তাঁর ছোটোগল্পের বিষয় আশয় হয়ে উঠেছে। তাঁর একাধিক গল্পগ্রন্থের আখ্যানের বাস্তবতা ধরে রেখেছে একুশ শতকের দুটি দশকের প্রবহমান সময়কে। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলি হল-- *জালাঙ্গীর গান অথবা গোখরো সাপের ভয়* (২০০৯), *চতুর্দশীর চাঁদ* (২০১১), *খুকি ও নিশিপদ্ম* (২০১৪), *নতুন*

গল্প ২৫ (২০১৬), *মজুররত্ন* (২০১৯), *বাছাই ২৫* (২০১৯)। উল্লিখিত গল্পগ্রন্থগুলির প্রায় শতাধিক ছোটোগল্পে বিগত দুই দশকের সামাজিক সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের অভিঘাত লেখিকার সংবেদনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তারই প্রভাব ফুটে উঠেছে তাঁর সৃষ্টির জগতে। লেখক আনসারউদ্দিন তাঁর ছোটোগল্প সম্বন্ধে সার্থকভাবেই উচ্চারণ করেন—

> খুব সাধারণ ঘটনাকে অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া একজন সফল গল্পকারের অন্যতম গুণ।...যেটুকু বুঝেছি, মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসা আর দায়বদ্ধতা থেকেই তন্বীর প্রতিটি গল্পের শরীর নির্মিত হয়। কান পাতলে তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাবেন তন্নিষ্ঠ পাঠক।[৪৪]

বিশ্বায়নের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রভূত উন্নতি ঘটেছে এবং মানুষের মধ্যে সেই সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসাপদ্ধতিতেও এসেছে বেশ কিছু যুগান্তর ঘটানো বদল। উচ্চবিত্ত মানুষের নাগাল থেকে চিকিৎসাব্যবস্থা বিশ্বায়নের প্রভাবে পৌঁছে গিয়েছে মধ্যবিত্তের নাগালে। যে চিকিৎসাব্যবস্থা নব্বইয়ের দশকের আগে মূলত ছিল সরকারি উদ্যোগনির্ভর, উদার অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে দেশি বিদেশি পুঁজির প্রভাবে তা নব্বইয়ের দশকের পরবর্তীকালে বেসরকারিভাবে মানুষের কাছে লভ্য হয়ে ওঠে। অর্থের বিনিময়ে যে কেউ পরিষেবা পেতে শুরু করে এই ক্ষেত্র থেকে। এর সঙ্গে দ্রুত আগমন ঘটতে শুরু করে চিকিৎসার বিদেশি প্রযুক্তিসমূহ। দেশীয় গবেষণা এবং আবিষ্কারের ক্ষেত্রও সমৃদ্ধ হতে থাকে। তবে মনে রাখা দরকার যে, চিকিৎসাবিজ্ঞান একদিকে যেমন উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় মানুষকে রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, তেমনি এর অপব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছে অপরাধ। মানবভ্রূণের গঠনের স্বাভাবিকতা নির্ণয়ে যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা ব্যবহৃত হতে শুরু করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের কাজে, এবং অধিকতরভাবে কন্যাভ্রূণ হত্যার কাজে। খানিকটা যে কারণে ১৯৯৪ সালে ভারত সরকার

PCPNDT Act চালু করতে বাধ্য হয় এবং উল্লেখযোগ্যভাবে মাত্র দশ বছরের মধ্যে ২০০৩ সালে এই আইনকে সংশোধনের দ্বারা আরও কঠোর করে তুলতে বাধ্য হয়।[৪৫] এর পাশাপাশি দেখা যায় ১৯৭১ সালে পাশ হওয়া মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি (MTP Act) আইনটি ২০০২ সালে সংশোধন করা হয় এবং ২০০৩ সালে এই আইনের জন্য বেশ কিছু অধিনিয়ম তৈরি করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৪ সালেও এই আইনের উপর বেশ কয়েকটি সংশোধনী নতুন করে আনা হয়।[৪৬] বোঝা যায়, বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে মানুষ মননগতভাবে অনেক অবনমনের দিকে যাত্রা করছিল। তবে এর পাশাপাশি রোগ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ার ফলে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছিল।

বিশ্বায়ন পর্বে রচিত বাংলা ছোটোগল্প এই বিষয়গুলিকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ধারণ করেছিল। লেখিকা তন্বী হালদারের একাধিক ছোটোগল্পে এই ধরনের বিষয়সমূহের ছাপ দেখা যায়। এইরকম একটি ছোটোগল্প ‘মৃত্যুভয় অথবা অলীক স্তনের স্বপ্ন’[৪৭] (*আলো*, শারদীয় ২০০৯)। গল্পটিতে দেখা যায় মণিমালা মুখার্জি নামের একটি নারীচরিত্রকে। সারা গল্প জুড়ে দুঃস্বপ্নের মতো তাকে তাড়া করে বেড়ায় স্তন ক্যান্সারের ভয়। আর শুধু ক্যান্সারের ভয়ই নয়, মধ্যবিত্ত নারীর ক্যান্সারের চিকিৎসায় বিপুল অর্থব্যয়ের আশঙ্কাও তাকে রোগ নির্ণয়ের পূর্বেই ভয়ে আধমরা করে ফেলে। শুধু কি এটুকুই? নাকি নারী তার শরীরের বিশেষ এই অঙ্গ হারিয়ে তার পুরুষসঙ্গী তথা পরিবারে নিজের অবস্থানটি হারানোর আশঙ্কাতেও ভোগে? রোগনির্ণায়ক ক্লিনিকের যান্ত্রিক পরিবেশের পশ্চাৎপটে লেখিকা নিপুণভাবে সেই মানসিক দীর্ণতার জায়গাটি নির্মাণে সক্ষম হয়ে ওঠেন। আমরা এই গল্পটি পড়ার সময় মনে রাখব ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকের ব্রেস্ট ক্যান্সার আন্দোলনের কথা, যা কিনা বিশ শতকের নারী আন্দোলন কিংবা নারী স্বাস্থ্য আন্দোলন থেকে গড়ে উঠেছিল।[৪৮] কিংবা ‘পিঙ্ক রিবন’ আন্দোলনের তাৎপর্য, যা গড়ে উঠেছিল ১৯৯০-এর দশকে আমেরিকায়। এই ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতার প্রচারের পৃষ্ঠপোষকতা

করেছিল সে দেশের বেশ কিছু কোম্পানি, যারা পিঙ্ক রিবন বিক্রির মাধ্যমে একদিকে নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধি করেছিল, পাশাপাশি ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতার কাজে এই অর্থের কিয়দংশ দান করা হতো সমাজের প্রতি কর্পোরেট দায়বদ্ধতা থেকে।[৪৯] এইসব ঘটনাবলির নিরিখে উপরিউক্ত আলোচ্য গল্পটিকে নির্দিষ্ট সময়ের নিরিখে পড়া যেতে পারে।

'একটা অসফল অঙ্ক' (*সকালবেলা,* ১০ই মার্চ, ২০১৩) নামক ছোটোগল্পটিতে উঠে আসে কর্মরতা নারীর অসহায়তার দিকটি। সরকারি বিজ্ঞাপনের 'ছোটো পরিবার'-এর আদর্শ চিত্রটিকে নিজের জীবনে সফল করার স্বপ্ন দেখে দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করে বিদিশা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তারা কর্মরত। তাই প্রথম সন্তান তিন বছরের মিমিকে পরিচারিকা রিংকুর তত্ত্বাবধানে ফ্ল্যাটে রেখে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না তার। কিন্তু একটি সন্তানকে সময় দিতে কিংবা সামলাতে না পারা নিয়ে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়বার গর্ভধারণে সায় ছিল না স্বামী রাতুলের। খুব কষ্টের সময়েও বিদিশার পাশে না দাঁড়িয়ে রাতুল তার এই দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ নিয়ে মানসিক অত্যাচার করে। শেষপর্যন্ত পৃথিবীতে অনাগত গর্ভস্থ সেই সন্তানকে নার্সিংহোমে গিয়ে গর্ভপাত করে আসে বিদিশা। ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে জানায়—"আইন অনুযায়ী সন্তান জন্ম দেবে কী দেবে না সেটা গর্ভে যে ধারণ করবে সেই ঠিক করবে।"[৫০] এই গল্প আমাদেরকে বলে সেই সময়ের কথা, যে সময়ে মানবিক মূল্যবোধ এবং অনুভূতিসমূহকে অতিক্রম করে জাগরুক হয়ে থাকে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অর্থমুখী ইঁদুর দৌড়, যা ব্যক্তিগত সুখের অন্বেষণে পরিবার পরিকল্পনার নামে পরিবারহীনতার দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে।

'তৃতীয় বিশ্বের চিঠি' (*বর্তিকা,* শারদীয় ২০১০) গল্পটিতে আর একধরনের বাস্তবতা উঠে আসে। বিশ্বায়নের হাত ধরে প্রসার ঘটেছে মেডিক্যাল ট্যুরিজম-এর। সেই কারণে বিদেশ থেকে

ভারতে আসা মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই গল্পে দেখা যায় সারোগেসির বিষয়টি। সরাসরি সন্তান উৎপাদনে অপারগ দম্পতির শরীরের বাইরে কাঁচের পাত্রে শুক্রাণু-ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে ভ্রূণ তৈরি করে তা গর্ভধারণে সক্ষম নারীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। সেই নারীটি নিজ শরীরের অভ্যন্তরে শিশুটিকে ধারণ করেন আর তার জন্মের পর নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে সন্তানহীন দম্পতির হাতে তুলে দেন। এইভাবে অন্যের সন্তান ধারণের জন্য গর্ভ ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বলা হয় সারোগেসি। প্রথম বিশ্বের দেশগুলির তুলনায় অনেক কম মূল্যে এই ব্যবস্থা ভারতে সুলভ বলে বিদেশি দম্পতিদের ভারতে এসে এইভাবে সন্তানলাভ করতে দেখা যায়। এই ব্যবস্থার ফলে প্রশ্নের মুখে পড়ে মানবিক মূল্যবোধ। লেখিকা সচেতনভাবে সেই দিকটিকে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে—

> আপনাদের দেশে যে কোনো শ্রমেরই ভীষণ দাম। তাই এখন প্রায় সময় আপনারা এ দেশে আসেন ‘গর্ভ’ ভাড়া নিতে, অর্থাৎ কিনা সারোগেটেড মায়ের খোঁজে। কালো চামড়ার নীচে গর্ভাশয় বহন করে টুকটুকে একটা ভ্রূণ।[৫১]

উপরিউক্ত ছোটোগল্পে লেখিকা বেশ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকে তুলে ধরেছেন। প্রথম বিশ্বের মানুষ অর্থের বিনিময়ে তৃতীয় বিশ্বের কোনো নারীর গর্ভ ভাড়া নিলেও সে পারিশ্রমিক পায় প্রথম বিশ্বের অর্থের মূল্যমানের নিরিখে নয়, বরং তৃতীয় বিশ্বের নিরিখে। এতে করেই উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতি কিংবা প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রথম বিশ্বের দ্বারা শোষিত হয় তৃতীয় বিশ্ব। এর সঙ্গে উঠে আসে মানুষের মানবিক অনুভূতির একাধিক বিপন্নতার অনুচ্চারিত প্রশ্নসমূহ। ন'মাস দশদিন ধরে দেহের অভ্যন্তরে প্রতিপালন করা শিশুটি যতই পুঁজি কিংবা চিকিৎসাপ্রযুক্তির উন্নতির ফলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, মাতৃগর্ভ ব্যতিরেকে তার জন্মগ্রহণ অসম্ভব। আরও অসম্ভব, মায়ের পক্ষে এতদিন ধরে একটি প্রাণকে শরীরের অভ্যন্তরে ধারণ করে অর্থের বিনিময়ে তাকে

অন্যের হাতে সমর্পণ করা। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে লেখিকা সেই দিকটিকেও তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। আর এইভাবেই বিভিন্ন অনুপুঙ্খে বিশ্বায়ন পরবর্তী চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রটিকে তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন লেখিকা তন্বী হালদার।

৪.১২॥ **বিনোদ ঘোষাল**

ছোটোগল্পকার বিনোদ ঘোষালের জন্ম ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬। হুগলির কোন্নগরে। গ্রুপ থিয়েটারের কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যে স্নাতক এই লেখকের কর্মজীবন বিচিত্র। কখনও চায়ের গোডাউনের সুপারভাইজর, শিল্পপতির বাড়ির বাজার সরকার, কেয়ারটেকার আবার কখনও হিসাবরক্ষক, প্রাইভেট টিউটর। বর্তমানে একটি সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত। সঙ্গে নিয়মিত লেখালিখি করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। ২০০৩ সালে *দেশ* পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। নির্মেদ গদ্যশৈলী, অভিনব বিষয়ভাবনা এবং ছোটোগল্পে নতুন আঙ্গিক ও পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য প্রথম গল্পগ্রন্থেই স্বীকৃতি মেলে ২০১১ সালে ‘সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার’-এর মাধ্যমে। প্রকাশিত গ্রন্থ ৮টি। ২০১৬ সালে প্রথম বাঙালি লেখক হিসাবে মাননীয় রাষ্ট্রপতির আহ্বানে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাইটার্স ইন রেসিডেন্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।[৫২]

বিনোদ ঘোষালের একাধিক ছোটোগল্পে স্থান করে নিয়েছে বিশ্বায়ন-পরবর্তী চিকিৎসাব্যবস্থা এবং সেই বিষয়টির সঙ্গে সংলগ্ন আরও একাধিক প্রাসঙ্গিক অনুপুঙ্খ। আর সেই অনুপুঙ্খগুলিই গল্পের একমাত্র সত্য হয়ে ওঠেনি, বরং সেগুলি উল্লিখিত চিকিৎসাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে মানুষের মননগত দিকসমূহ বা ভাবজগতের বিভিন্ন টানাপোড়েন কিংবা অনুভূতির

দিকগুলিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে। এর পাশাপাশি অবধারিতভাবে গল্পে উঠে এসেছে একাধিক চিকিৎসাবিজ্ঞানকেন্দ্রিক শব্দাবলি। বেশ কিছুটা পরিমাণে তা পালটে দিয়েছে গল্পের মেজাজকে। উদাহরণ হিসাবে 'প্রাণ' গল্পটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> বাচ্চাটা এখনও বেঁচে আছে। অথচ হাসপাতালের সকলে অপেক্ষা করছে ওর মৃত্যুর জন্য। আজ সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ জন্মেছে। গোটা পিঠ জুড়ে মস্ত একটা টিউমার। সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে শরীরের সব ফ্লুইড বেরিয়ে যাচ্ছে। বাঁচবার আশা প্রায় নেই-ই। অথচ বেঁচে আছে। গতকাল ভোর পাঁচটার সময় আমার স্ত্রী শ্রীময়ীও একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিল। দীর্ঘ নয়-দশ মাস আগে থেকে গত পরশু রাত্রি পর্যন্তও সব কিছু ঠিক ছিল। ডাক্তার বলেছিলেন এভরিথিং ওকে। নর্মাল ডেলিভারিতে কোনও প্রবলেম নেই। যদিও শ্রীময়ী চেয়েছিল সিজার হোক। নর্মাল ডেলিভারির যন্ত্রণা ও নিতে চায়নি, তবু আমি আর ডাক্তার মিলে রাজি করিয়েছিলাম ওকে। গতকাল ভোরবেলা, পৃথিবীর সব জীবিত প্রাণী, যখন সবে ঘুম থেকে উঠছে কিংবা উঠব উঠব করছে, তখন শ্রীময়ী একটি মৃত শিশু প্রসব করেছে। ডাক্তার, নার্স, ম্যানেজার সকলে মিলে আমাকে আপ্রাণ বুঝিয়েছেন যে এটা আসলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট, নইলে সব কিছুই সত্যি সত্যি ঠিক ছিল। আমি মেনে নিয়েছি শেষ পর্যন্ত। হৃৎপিণ্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতা কামড়ানোর মতো সেই যন্ত্রণাকেও মেনে নিয়েছি। আমাদের বিয়ের দু-বছর পরের প্রথম ইস্যু। আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম একটা ছেলে হোক। তাই-ই হয়েছিল। সদ্যপ্রসূত মৃত পুত্রসন্তানকে আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে মুড়ে আমি নিজের কোলে তাকে...নাহ...আমি প্রাণপণে ভুলতে চাই গতকালের সেই দৃশ্যগুলো।[৫৩]

একটি ছোটোগল্পের সূত্রপাত এবং ব্যবহৃত শব্দাবলি এভাবেই নির্মাণ করেছে গল্পের মেজাজটিকে। এর গাম্ভীর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে চিকিৎসাবিদ্যায় ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ। এর মাধ্যমে যেমন গল্পে উঠে এসেছে ব্যক্তিমননের শাখাপ্রশাখা, তেমনি গল্পের পরবর্তী অংশে ধরা পড়েছে

পুঁজিনিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট এই সময়ের অর্থনৈতিক বাস্তবতার দিকটি। নিম্নবিত্ত কিংবা কোনোমতে টিকে থাকা মধ্যবিত্তের চিকিৎসা পরিষেবার ক্রয় ক্ষমতার দিকটিও সুস্পষ্টতা লাভ করে এই সময়ে—

> আমি রঙ্গিত দে, আদিসপ্তগ্রামে নবপল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়কের চাকরি করি। চৌত্রিশ বছর বয়স। এখনও পারমানেন্ট হইনি। শ্রীময়ীর বত্রিশ চলছে। প্রতি বছর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দেয়। কবিতার বই পড়তে ভালোবাসে। আমি ওসব বুঝি না। আমার জীবনে একমাত্র শখ দিঘা বেড়াতে যাওয়া। বহুবার গেছি। আরও যাব। 'সস্তায় পুষ্টিকর' বলে বন্ধুরা আড়ালে প্যাঁক দেয়। আমার যা রোজগার তাতে শ্রীময়ীকে বড়ো কোনও নার্সিংহোম-এ ভরতি করার দম ছিল না। যদিও শ্রীময়ীর ইচ্ছা ছিল। দু-একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাকে জানিয়েওছিল সে ইচ্ছের কথা। আমি এড়িয়ে গেছি। তাছাড়া শ্রীময়ীর প্রেগন্যান্সিতে কোনোরকম কমপ্লিকেশনও ছিল না। তাই পরশু রাতে ওর পেইন শুরু হবার পর বাড়ি থেকে অটোয় করে এই নবপল্লি সেবাসদনেই ভরতি করেছিলাম ওকে। এই সেবাসদনটা পঞ্চায়েতের টাকায় চলে। এমনিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রচুর পেশেন্ট হয়। দুর্নামও নেই তেমন। গতকালও প্রায় তিন চারটে ডেলিভারির কেস হয়েছে। সবকটি সুস্থ, শুধু আমার ছেলেই মৃত প্রসব হয়েছে।[৫৪]

চিকিৎসাব্যবস্থার দ্রুত বেসরকারিকরণ এবং পণ্যায়ন বিশ্বায়নের অন্যতম একটি সাফল্য। সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের দুনিয়াকে বহুলপরিমাণে ব্যবহার করে তা মানুষের মনের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে যে, বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান মানেই উন্নত পরিষেবা। আর সেই পরিষেবা না নিতে পারা মানে কোথাও যেন সামাজিকভাবে অদৃশ্য এক প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া। এইরকম পারিপার্শ্বিক চাপের কারণে মানুষের মননগত অস্তিত্বের দিকটিও বারে বারে সাংঘাতিকভাবে ধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

বিশ্বায়নের ফলে পুঁজির বৈশ্বিক প্রসার ঘটেছে। পণ্যভুবনটি বিবর্ধিত হয়েছে বহুগুণ। বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন ঘটেছে, উন্নত এবং সস্তা হয়েছে প্রযুক্তি। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশেও প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে অভূতপূর্বভাবে। চিকিৎসাক্ষেত্রটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবু দিকে

দিকে রয়ে গিয়েছে অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীনতা, লিঙ্গনিরপেক্ষতাহীনতার মতো ভয়াবহ সব পশ্চাদপদতা। অর্থাৎ পুঁজির হাত ধরে বিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তির প্রসার ঘটলেও যুক্তিবাদের প্রসার ঘটেনি। বৈজ্ঞানিক চেতনা থেকেও মানুষ থেকে গিয়েছে বহু দূরে। মানবিক বোধসমূহও একারণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে বারে বারে। আলোচ্য গল্পটিতে তাই লক্ষ করা যায় উপস্থিত রয়েছে পুত্রসন্তানাকাঙ্ক্ষা। সেইকারণে দুটি কন্যাসন্তানের উপস্থিতি সত্ত্বেও একটি পুত্র সন্তানের আশায় শেষপর্যন্ত একটি অসুস্থ শিশু জন্মগ্রহণ করে—

> দুজন বয়স্কা মহিলার কোলে দুটি তিন-চার বছরের মেয়ে ছিল, যারা ওই লোকটাকে 'পাপা' ডাকছিল। আজ সকাল সাড়ে সাতটার সময়, বাচ্চাটা জন্মানোর আগে পর্যন্ত ওরাও কেউ এতটুকু ঘুমোয়নি। নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত গ্রাম্য হিন্দি ভাষায় বকবক করেছে, হাসাহাসি করেছে। একজন মহিলা ওই লোকটাকে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তু সোচ মত বিড্ডু, তেরো লেড়কোই হোগা, হম কহথনি, মান লো।' উত্তরে শুধু গালভরা হেসেছিল ছেলেটা।[৫৫]

এ গল্প তবু শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে মানবিকতার। তাই মৃত সন্তান প্রসব করা শ্রীময়ী শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত শোকের পরিসরকে অতিক্রম করে পাশের বেডের এই অসুস্থ শিশুটিকে নিজের স্তন্যদান করে বাঁচানোর চেষ্টা করে। রঙ্গিতের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের পরিচয়টি সরিয়ে রাখতে পারে না সে। এভাবেই এ গল্প মানবিকতার পরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ হয়েছে।

'জাতক কাহিনি' (*নতুন গল্প ২৫*) গল্পেও উঠে এসেছে চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের একাধিক অনুপুঙ্খ। আগের গল্পটির মতো এ গল্পেও উঠে আসে একটি সদ্যোজাত তথা অসুস্থ শিশুর বর্ণনা। উপস্থিত হয় চিকিৎসাপরিষেবা ক্ষেত্রটির খুঁটিনাটি। আর এই সব কিছুর উপস্থিতিকে আত্মস্থ করে অগ্রসর হতে থাকে গল্পের ঘটনাপ্রবাহটি—

> বাচ্চাকে দেখে যান, একজন নার্স সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে বলল,

সিগারেট ধরা হাতটা সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল অনুপমের।... পাঁচিলে আগুনটা ঘসে নিভিয়ে আধপোড়া সিগারেটটা পকেটে ঢুকিয়ে তিন লাফে নার্সিংহোমের ফার্স্ট ফ্লোরে উঠল। করিডরে একটা খাঁচার মতো ছোট্ট লোহার বেড়ে পালক ছাড়ানো মুরগি রঙের ফুট খানেক লম্বা একটা প্রাণী শুয়ে। প্রাণীটির নাভির থেকে সাদা প্যাঁচানো প্যাঁচানো একটা আট-নয় ইঞ্চি লম্বা নল বেরিয়ে রয়েছে, যার মুখটা ক্লিপ দিয়ে আঁটা। অনুপম বুঝল ওটাই নাড়ি। চোখ পড়ল বাচ্চাটার লিঙ্গের দিকে। পুংলিঙ্গ। সে আনন্দটুকুর সময় পেল না ও। কয়েকজন ডাক্তার মিলে গম্ভীর মুখে বাচ্চাটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শিশুটার মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো। ডাক্তারগুলোর পরনে সবুজ গাউন। মুখের মাস্কও খোলেনি কেউ। অনুপম আন্দাজ করল, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে নিশ্চয়ই। বুক কেঁপে উঠল ওর।

—কী হয়েছে?

—এদিকে আসুন, বছর ষাট বয়সের চাইল্ড স্পেশালিষ্ট ডাঃ দাশ অনুপমকে অন্য দিকে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, দেখুন ব্যাপার হচ্ছে আপনার বেবি থারটি সিক্স উইকসে হয়েছে, মানে প্রায় বর্ডার লাইনে। কিছুটা প্রিম্যাচিওরড। ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছে। কাঁদতে পারছে না। ডিস্ট্রেসড। আমরা বেবিকে আরও কিছুক্ষণ অক্সিজেন চালিয়ে দেখব, যদি নরমাল স্টেট এ এসে যায় তো ভালো, আদারওয়াইজ ইম্প্রুভ না করলে ওকে কলকাতার কোনও ওয়েল ইক্যুইপড নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করতে হবে। বলে ডাক্তার একটু চুপ থেকে বললেন, নার্ভাস হবেন না। ক্রিটিকাল কোনও কেস নয়, সিজারিয়ান বেবিদের অনেক সময় এমনটা হয়ে থাকে।...

—শি ইজ কোয়াইট ও. কে। লেট আস ওয়েট ফর দ্য বেবি, বলে ডাঃ দাশ চলে গেলেন। উত্তরপাড়ায় এই নার্সিংহোমটা ওনারই। ছোটো নার্সিংহোম। মেটারনিটি কেসই বেশি। তার থেকেও বেশি হয় অ্যাবরশন। বাইরে গ্লোসাইনে লেখা আছে নো এমারজেন্সি। অনুপম ধীরে ধীরে হেঁটে এসে সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। অক্সিজেন মাস্কে মুখ ঢেকে থাকা, নিজের সদ্য জন্মানো শিশুর দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তের অনুভূতিটা বুঝতে চেষ্টা করল। সম্পূর্ণ নতুন একজনের জন্য একেবারে নতুন একটা অনুভূতি?... পিতৃত্ব? ... না...হ বোধহয়। অনুপমের স্ত্রী সুলগ্নার সিজার করেছেন যে লেডি ডাক্তার,

তিনি বাচ্চাটার পা দুটো আলতো করে তুলে ছেড়ে দিলেন। পা দুটো একটু গুটিয়ে নিল গোলাপি রঙের এইটুকু শরীরটা।[৫৬]

এ গল্পের আবহনির্মাণে উদ্ধৃত অংশের সংলাপগুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তেমনি সেই সংলাপগুলি আরও বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেছে চিকিৎসাক্ষেত্রের একাধিক পরিভাষার প্রয়োগের কারণে। অন্যদিকে উপরের আলোচ্য গল্প থেকে অন্তত এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, চিকিৎসাব্যবস্থায় বেসরকারিকরণ কীভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিকতায় পৌঁছে গিয়েছে। বেড়ে গিয়েছে নার্সিংহোমের সংখ্যা, যেগুলি আসলে হাসপাতালের তুলনায় অনেক কম দক্ষ হলেও মানুষের ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে। তাই এ গল্পে অসুস্থ বাচ্চাটিকে একটি নার্সিংহোম থেকে অন্য নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করার কথা বলা হয়। আর এই সবকিছুকে আত্মস্থ করে গল্পটি পৌঁছাতে চায় অন্য এক গন্তব্যে। গল্পের শেষে দেখা যায় অনুপম একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় নার্সিংহোমের আয়া মঞ্জুর সঙ্গে। তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বুভুক্ষুর মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। এ গল্পে লেখক পাঠককে নিয়ে যান আধুনিক মানুষের জটিল মনের অন্দরমহলে, যেখানে পূর্বতন মূল্যবোধের নিরিখগুলি অত্যন্ত বদলে গিয়েছে। তাই হয়তো আলাদা দুটি নার্সিংহোমে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সদ্যোজাত অসুস্থ পুত্র এবং স্ত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই অনুপমের লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

'বালিশ এবং চোখের জল' গল্পেও লেখক বিনোদ ঘোষাল গল্পের আঙ্গিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষাকে। মানুষের মনের জগতে তার প্রভাবটিও উঠে আসে এই গল্পে—

কিন্তু এত কিছু করেও তৃষার রোগটা গেল না। কেন যে গেল না জানা নেই। শেষের বছর দুয়েক ও প্রায় সারাক্ষণই কোনো আনন্দই পেত না কখনও। বোধ হয় দুঃখও নয়। কনসিভ করেছিল।

> চারমাসের মাথায় বাথরুমে পা পিছলে বিচ্ছিরি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মিসক্যারেজ। মা হবার সম্ভাবনা চিরকালের মতো ঘুচে গেছিল। তখনও খুব একটা দুঃখের প্রকাশ ঘটেনি তৃষার। আসলে আশ্চর্যভাবে তৃষাকে কখনও কাঁদতে দেখেনি অনিমেষ। ভীষণ অস্বস্তিকরভাবে কখনোই কাঁদত না। ভোঁতা হয়ে তাকিয়ে থাকত শুধু কোনো শোকের আবহে। মিসক্যারেজ হবার দিন দশেক পর মাস দেড়েক আগে করা ওর আলট্রাসোনোগ্রাফির প্লেটটা তৃষাকে বেশ কয়েকবার নাড়াচাড়া করতে, টিউবলাইট কিংবা দিনের বেলায় জানলার সামনে তুলে ধরতে আড়ালে লুকিয়ে দেখেছে অনিমেষ। তৃষার জলভরা অন্ধকার পেটে সেই এক আঙুল মাপের প্রাণটার নেগেটিভ প্লেটটাকে দেখে অনিমেষ কেঁদে ফেলেছে হু হু করে। কিন্তু তৃষা কাঁদেনি।[৫৭]

বিনোদ ঘোষালের একাধিক ছোটোগল্পে এভাবেই উঠে এসেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা অনুপুঙ্খ। সেই সঙ্গে বেসরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি মানুষের বেড়ে চলা নির্ভরতা কিংবা সেই ক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করে একাধিক পেশার মানুষ চরিত্র হিসাবে গল্পগুলিতে উঠে এসেছে। অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একাধিক পরিভাষা গল্পের উপাদান হয়ে উঠেছে।

৪.১৩॥

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে ভারতের চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ কিংবা কর্পোরেট পুঁজির বিপুল বিস্তার ঘটে। এই বিষয়ে সরকারও বিভিন্নভাবে তাদেরকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এরফলে যে ব্যবস্থাটি ফুলে ফেঁপে ওঠে, তার সহায়তা দরিদ্র মানুষ পায়নি। এই ব্যবস্থাকে অনন্যোপায় হয়ে কখনও তারা আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হলেও তার খেসারত তাদেরকে দিতে হত প্রায়শই ভিটেমাটি বন্ধক দিয়ে, এমনকি বিক্রি পর্যন্ত করে। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বের মানুষদের কাছে ভারতীয় কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত চিকিৎসা-পরিষেবার মূল্য ছিল তুলনামূলকভাবে সস্তা,

তাই প্রথম বিশ্বের একাধিক দেশসহ অন্যান্য দেশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতে আসা মেডিক্যাল ট্যুরিস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল—

> India also exports health services through consumption abroad. Patients come from industrialized and developing countries (including Bangladesh, the Eastern Mediterranean, Nepal, Sri Lanka, the United Kingdom and the USA) for surgery and specialized services in areas such as neurology, cardiology, endocrinology, nephrology, and urology. They are attracted by India's pool of highly qualified health care professionals and by the country's ability to provide good quality and affordable treatment. In India, a coronary bypass operation costs Rs. 70,000-100,000, compared to Rs. 1.5-2.0 million in Western countries. A liver transplant in India costs one-tenth of that in the USA. Specially hospitals, such as those in the Apollo group in India, get surgery cases from the USA, foreign tourists, non-resident Indians, and foreign residents for such treatments. Each year an estimated 50,000 patients come to India from Bangladesh and spend over US $ 1 million per year on the specialized treatment of diseases.[৫৮]

এইভাবে একদিকে বিদেশি চিকিৎসা-পর্যটকের ভিড় বৃদ্ধির কারণে ভারতের কোষাগারে বৈদেশিক মুদ্রার আমদানি হচ্ছিল, ঠিক তার বিপরীতে পুঁজি-চালিত এই চিকিৎসাব্যবস্থার শোষণে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছিল আর একদল মানুষ। নির্দিষ্ট এই সময়ে উভয় বাস্তবতাই ধরা পড়ছিল।

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত মানুষ বেশি পরিমাণে বেসরকারি চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। এর কারণ হিসাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলা চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের

প্রতি ক্রমবর্ধমান ভরসাহীনতা ক্রিয়াশীল ছিল। সরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিষেবার মানের হ্রাস ছিল এর অন্যতম কারণ।

বাংলা ছোটোগল্পের পরিসরে বিশ্বায়ন-পরবর্তী চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্র কিংবা তার অনুসারী বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিষয় কিংবা অনুপুঙ্খে উঠে এসেছে। সরাসরিভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একাধিক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে ছোটোগল্পে। সেইসঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে বেড়ে চলা বিভিন্ন রোগের কথা যেমন ছোটোগল্পের অন্দরে উঠে এসেছে, তেমনই চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কথা অনায়াসে অত্যন্ত স্বাভাবিকতার সঙ্গে উঠে এসেছে। গুরুত্ব পেয়েছে বিভিন্ন রকম ক্যান্সার, যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার ইত্যাদির প্রসঙ্গ। সারোগেসি সংক্রান্ত অনুপুঙ্খ উঠে এসেছে কিছু গল্পে। সেই সঙ্গে গল্পকাররা কোথাও গল্পের অন্দরে এই বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের সঙ্গে নতুনভাবে সংযোগ স্থাপন করছিলেন। এছাড়াও আর একধরনের সত্য উঠে এসেছে এইসময়ের বাংলা ছোটোগল্পে, তা হল চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের এই রমরমা মূলত শহরকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চল সেই পরিষেবার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও লাভ করতে পারেনি। গ্রামীণ মানুষ পড়ে থেকেছে আধুনিক এই পরিষেবাক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে। দেখা যায়, চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি তাদের কাছে সেভাবে পৌঁছায়নি। তাই বলা যায় বিশ্বায়ন চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের অনেক উন্নতিসাধন করলেও সামগ্রিকভাবে অসাম্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জি

১. Chatterjee, Biswajit. 'Globalisation, GATS and Health Sector', *Globalization and Health Sector in India.* New Delhi: Deep and Deep, 2009, p 23

২. বসু, বিষাণ, 'বাজার-পুঁজি-মুনাফা, নব্যউদারপন্থী স্বাস্থ্যনীতি বনাম সবার জন্য স্বাস্থ্য', *কিনে আনা স্বাস্থ্য: বাজার-পুঁজি-মুনাফা আর আপনি.* কলকাতা: ধানসিড়ি, অক্টোবর ২০২০, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

৪. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'নব পর্যায়ে প্রতিবেশী', *সেরা ৫০টি গল্প.* কলকাতা : দে'জ, জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা ১০৫

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮

৭. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'মেমদি', *সেরা ৫০টি গল্প,* কলকাতা : দে'জ, জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৪০

৮. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'কেয়ারবাবু ও সংক্রান্তির শিশির', *সেরা ৫০টি গল্প,* কলকাতা : দে'জ, জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৬৮

৯. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, 'শ্যাওলা রঙের ম্যাক্সি', *সেরা ৫০টি গল্প,* কলকাতা : দে'জ, জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা ৪১৪

১০. দাস, বিপুল, 'দেখা হবে', *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা ২১৭

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২০

১২. দাস, বিপুল, 'সোনার টুকরো', *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা ২২৪-২২৫

১৩. দাস, বিপুল, ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতি’, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৫

১৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, ‘স্বপন বপন’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা, দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ২৯৬

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৯

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০২-৩০৩

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১২

১৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, ‘হাড়ের ভিতরের মজ্জা’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা, দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩১৭

১৯. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা, দে’জ, ২০১৮

২০. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, ‘অতলস্পর্শ’, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা, দে’জ, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১২১

২১. বসু, বিষাণ, ‘উপসংহার’, *কিনে আনা স্বাস্থ্য: বাজার-পুঁজি-মুনাফা আর আপনি.* কলকাতা: ধানসিড়ি, অক্টোবর ২০২০, পৃষ্ঠা ১৫২

২২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, ‘ক্ষেত্রভূমি’, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১২, পৃষ্ঠা ২০৫

২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৬

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৮

২৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, ‘ঠুঁটো’, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১২, পৃষ্ঠা ৩৫০

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫৬

২৭. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, ‘ঢেউ’, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ১৯৭

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৮

২৯. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, ‘মাকড়সা’, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ২৯৮

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১০

৩১. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, ‘বড়সাহেব’, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫০০

৩২. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'গ্রহণ', *ঋ*, কলকাতা: আনন্দ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১০২

৩৩. 'ফার্ন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০০

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১১

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৪

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৫

৩৭. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'কাকোল', *গল্প সংগ্রহ*, কলকাতা: আনন্দ, ২০২০, পৃষ্ঠা ৬০

৩৮. বসাক, তৃষ্ণা, *ছায়াযাপন*, কলকাতা: একুশশতক, ২০০৯

৩৯. বসাক, তৃষ্ণা, 'বিপন্নভাষ', *ছায়াযাপন*, কলকাতা: একুশশতক, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১০৫

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭

৪১. বসাক, তৃষ্ণা, 'পূর্ণ', *ছায়াযাপন*, কলকাতা: একুশশতক, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৪৬

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯

৪৩. হালদার, তন্বী, লেখক পরিচিতি (ব্লার্ব), *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৬

৪৪. আনসারউদ্দিন, 'ভূমিকা নয়, ভূমিতলের কথা', *মজুররত্ন*, তন্বী হালদার, কলকাতা, গুরুচণ্ডা৯, ২০১৯

৪৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Conception_and_PreNatal_Diagnostic_Techniques_Act,_1994 Accessed on 28/01/2021 22:37 pm

৪৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_India#:~:text=Abortion%20 in%20 India%20is%20legal,it%20is%20called%20induced%20abortion. Accessed on 28/01/2021 23:18 pm

৪৭. হালদার, তন্বী, 'মৃত্যুভয় অথবা অলীক স্তনের স্বপ্ন', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৩৭-৪০

৪৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Breast_cancer_awareness Accessed on 28/01/2021 23:31 pm

৪৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_ribbon Accessed on 28/01/2021 23:45 Pm

৫০. হালদার, তন্বী, 'একটা অসফল অঙ্ক', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৬

৫১. হালদার, তন্বী, 'তৃতীয় বিশ্বের চিঠি', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, ২০১৬, পৃষ্ঠা ১৯৭

৫২. ঘোষাল, বিনোদ, *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, জুন ২০১৯

৫৩. ঘোষাল, বিনোদ, 'প্রাণ', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, জুন ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৭৫

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৬

৫৫. পূর্বোক্ত

৫৬. ঘোষাল, বিনোদ, 'জাতক কাহিনি', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, জুন ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬

৫৭. ঘোষাল, বিনোদ, 'বালিশ এবং চোখের জল', *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, জুন ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮

৫৮. Chatterjee, Biswajit. 'Globalisation, GATS and Health Sector', *Globalization and Health Sector in India.* New Delhi: Deep and Deep, 2009, p. 28

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্বায়ন, পরিযাণ এবং বাংলা ছোটোগল্প

১৯৯১ সালে ভারত সরকার মুক্ত অর্থনীতিকে স্বাগত জানানোর ফলে ভারত বিশ্বায়ন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতোপূর্বে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে ভারতে মিশ্র অর্থনীতি প্রচলিত ছিল। বিশ্বায়ন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে পূর্বেকার ব্যবস্থার অবসান ঘটল, সূত্রপাত হল দেশি-বিদেশি কোম্পানির প্রতিযোগিতানির্ভর নতুন এক বাজার অর্থনীতির। আর নতুন সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাবে পরিযাণের প্রসার ঘটল। প্রকৃতিগতভাবে সেই পরিযাণ অন্তর্দেশীয় এবং পাশাপাশি আন্তঃদেশীয়। অর্থাৎ পুঁজির প্রসারের ফলে দেশের ভিতরে এবং বাইরে জনগণের চলাচল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।

নানাবিধ কারণে পরিযাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানুষ অধিক উপার্জন, শিক্ষাগ্রহণ, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া ইত্যাদি কারণে পরিযাণকে গ্রহণ করে। উনিশশো একানব্বই পরবর্তী সময়ে ভারতে বাণিজ্য এবং শিল্প অর্থনীতির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে চলমানতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ নিজ জন্মভূমি ছেড়ে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে মাথাপিছু কৃষিজমি হ্রাস পাওয়া, সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্তির সুযোগ সংকুচিত হওয়া, বেসরকারি ক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণ ইত্যাদির কারণে নিজ এলাকায় মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ কমে আসে। স্বভাবতই তারা বাধ্য হয় বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে। আবার বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে পুঁজি কিংবা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ভারতে পরিযাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তা ছিল অন্যতম কারণ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়,

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একারণে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষিণভারতমুখী স্রোত তৈরি হয়, যা ছিল এই সময়ের বৈশিষ্ট্য।

মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তী দুই দশক সময়ে বিশ্বায়নকালে বাংলা ছোটোগল্পের যে জগতটি গড়ে উঠেছে, তাতে বিশ্বায়ন নামক এই নতুন অর্থ-ব্যবস্থাটি তার বৈশিষ্ট্যসমূহসহ অঙ্গীভূত হয়েছে একাধিক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। তাঁরা পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণে এই ব্যবস্থাটিকে দেখেছিলেন। সেই কারণে তাঁদের অবস্থানও ছিল কিছু পরিমাণে পৃথক। এই অধ্যায়ে সমকালীন সেইরকমই কয়েকজন লেখককে নির্বাচন করে তাঁদের ছোটোগল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে চাওয়া হয়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণের বিভিন্ন মাত্রা কিংবা পরিযাণের প্রভাবসমূহকে। অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদে পরিযাণ কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল তা দেখা যেমন এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য, তেমনই এর পাশাপাশি পরিযাণের প্রভাব সমকালীন সমাজমানসে কীভাবে রেখাপাত করেছিল, সেই বিষয়টিও অন্যতম অন্বিষ্ট। সেইকারণে লেখক/লেখিকাদের জন্মসালের ক্রমানুসারে অধ্যায়টি বিন্যস্ত হয়েছে। বেছে নেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানবিরোধী ছোটোগল্পকারদেরকেও।

৫.১॥ **ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়**

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জন্মগ্রহণ করা সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৪৮)-এর ছোটোগল্পে অবধারিতভাবেই জায়গা করে নিয়েছে তাঁর জেলা। তাঁর লেখায় একদিকে যেমন উঠে এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গ্রামীণ জীবনের একাধিক অনুপুঙ্খ, গ্রামীণ বিভিন্ন চরিত্র, মৎস্যজীবীদের জীবনসংগ্রাম, রাজ্য-রাজনীতির গ্রামীণ রূপ, তেমনি তাঁর লেখায় একাধিক স্থানে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণের বিভিন্ন মাত্রা। কখনো সেই পরিযাণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানকে ভিন রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো, কখনো বা আবার পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে

গ্রামীণ যুবকদের ভিনরাজ্যে উপার্জনের কারণে গমন। তাঁর লেখা এই ধরনের কয়েকটি ছোটোগল্প হল--- ‘ওল্ড ব্লক নিউ ব্লক’ (*রবিবারের প্রতিদিন*, ২০০২), ‘কনকস্বরম’ (*দেশ*, ২০০২), ‘স্বপ্নধারণ’ (*শারদীয় দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২০০৩), ‘আত্মজন আপনজন’ (*মাতৃশক্তি শারদ সম্ভার*, ২০০৮), ‘টাওয়ার ডগায় মেঘ’ (*রবিবারের সকাল বেলা*, ২০১০) ইত্যাদি।

‘ওল্ড ব্লক নিউ ব্লক’ কিংবা ‘কনকস্বরম’ গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গবাসী মধ্যবিত্ত বাবা-মায়ের সন্তানদের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার লক্ষ্যে দক্ষিণ ভারতে ভিনরাজ্যে গমন। একটি বা দুটি সন্তানকে ভিন রাজ্যে পৃথক পরিবেশে রেখে এসে বাবা-মায়ের উৎকণ্ঠা কিংবা আশঙ্কা এ গল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তারই ফাঁকে ফাঁকে শিল্প কল-কারখানা, কর্মসংস্থান, ভিনরাজ্যে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সুফল ইত্যাদি বিষয়ক প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে এই গল্পগুলির অন্যতম আলোচ্য। বলাই বাহুল্য যে, এই প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে বিশ্বায়নের একধরনের অবধারিত যোগ ছিল। কারণ ভারত সরকার বিশ্বায়নকে দেশে আগমনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার এক বা দেড় দশক পরে রচিত এই গল্পগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে তার গ্রহণ-বর্জনের রাজনীতির প্রভাব জনগণের উপরে এসে পড়েছিল। অবধারিতভাবেই যে জনসংখ্যার মানুষের উপযুক্ত সামর্থ্য ছিল, তারা তাদের সন্তানকে যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভিন রাজ্যে পাঠিয়েছিল। কিন্তু শুধু পাঠানোই শেষ কথা নয়, সন্তান থেকে দূরে থাকা বাবা-মায়ের মনোজগতের একাধিক বদল ঘটেছিল এই কারণে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ১৯৯২ সালে উত্তরপ্রদেশের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের এক দশক পূর্তি হতে না হতেই ২০০২ সালে গুজরাটের দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ঘটে যাওয়া কার্গিল যুদ্ধের (১৯৯৯) কথাটিও মনে রাখা দরকার। এইরকম নানাবিধ কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই অস্থিরতা জারি ছিল। স্বভাবতই এইরকম পরিস্থিতিতে ভিন রাজ্যে

পরিযায়ী সন্তানদের কথা ভেবে বাবা-মায়ের অস্থিরতা খুবই স্বাভাবিক। সেই অস্থিরতাই উঠে এসেছে গুজরাট দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত ‘স্বপ্নধারণ’ গল্পে। এ গল্পে দেখা যায় হাওড়া থেকে ছাড়া করমণ্ডল এক্সপ্রেসে চড়ে বেশ কিছু যুবক যুবতী দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে চলেছে। তারা যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ম্যানেজমেন্ট পড়তে। সে রাজ্যে গিয়ে তারা যে বাড়িটিতে থাকবে, তার মালিক একজন মুসলমান ভদ্রলোক। ট্রেন ছেড়ে চলে যায়, অভিভাবক-অভিভাবিকারা বাড়িতে ফেরেন, টিভির সংবাদে উঠে আসে গুজরাট দাঙ্গা। তাঁরা মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে থাকেন, কিছু যদি হয়ে যায় তাঁদের সন্তানদের! বাড়ির মালিক যে মুসলমান! এ গল্পের ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে পরিযায়ী সন্তানদের প্রতি বাবা-মায়ের উৎকণ্ঠা।

গুজরাট দাঙ্গার মতো ভয়াবহ ঘটনা এ গল্পের আবহনির্মাণে যেমন ভূমিকা নিয়েছে, তেমনি এ গল্প তুলে ধরেছে নতুন যুগের উপযোগী পেশা খুঁজে নেওয়ার ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষায় ভিনরাজ্যগামী তরুণপ্রজন্মের স্রোতকে—

> এস সেভেন কোচের এদিকে জানালায় টাইট প্যান্ট শার্ট-এ মেয়েটি। পিঠে ঝোলানো ব্যাগটা সবে সিটের ওপর রেখেছে। এখনও চেন দিয়ে বাঁধেনি। মা-বাবা দুজনেই মেয়ের হাত ধরে জানায়, রিমা... সাবধানে থাকবি। বাঙ্গালোরে পৌঁছেই ফোন করবি। নতুন ক্যাশকার্ড। যখন দরকার বাড়িতে কথা বলবি—
>
> রিমার বাবা মেয়ের হাতের মুঠি থেকে হাত সরিয়ে নেয়। জানালার এপার থেকে সঙ্গী ছাত্র তিন জনের গায়ে হাত বুলোয়। সেই পরশে যে কত আশঙ্কাময় অনুরোধ, তাহলে ইয়াং বয়েজ তোমরা রিমা —তোমাদের ক্লাসমেটকে ঠিকমতো হোস্টেলে পৌঁছে দিও।
>
> —কাকু নো প্রবলেম। টেনশান করবেন না।
>
> —সার্টেনলি। তোমরা তো ভালো ছেলে। বিসিএ-তে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছ। এবার ম্যানেজমেন্টেও পারফরম্যান্স ভালো হবে।[১]

এক বার ভোঁ বাজিয়ে ট্রেনটা গায়ে দুলকি মারে। ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, রোগী, বসবাসী পরিবার ভ্রমণকারীদের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, ম্যানেজমেন্ট ছাত্র-ছাত্রীরাও সহযাত্রী।

ইঞ্জিনটা লাইনে গড়ায়। কোচ নম্বর এস সেভেনকে একটু একটু টানে। মা-বাবারা এক-পা, দু-পা এগিয়ে থমকে যায়। জানালার বাইরে ছাত্র-ছাত্রী যাত্রীদের হাত নড়ে। বাবা-মায়েরা আমূল ব্যথায় সমতালে হাত নাড়িয়ে নিজেদের উজাড় করে। এস এইট পাশ দিয়ে চলে যায়। চলে যায় এস নাইন। গতিময়তায় আপনজনেরা আপনজনদের থেকে দূরগামী। এতক্ষণ হাজার কথায় মুখর আত্মজন বাক্য হারিয়ে কয়েক মুহূর্ত মূক।[২]

দাসবাবু খানিক গ্লানি কাটাতে বলে, আমাদের ছেলেদের খুব বেশি দোষ নেই। জনসংখ্যা বেড়েছে, ছাত্রসংখ্যাও বেড়েছে কিন্তু জয়েন্টে সিট তেমন বাড়েনি। বাড়াতে পারেনি গরমেন্ট কলেজও। যখন বাড়াল তখন তো ছেলেরা বাইরে চলে গেছে—

—বাড়াক গ্যে। এখানে থেকে হাতি হত? কলকারখানা সব ডকে উঠে যাচ্ছে। যত বিশ্বায়ন টিশ্বায়ন সব এখেনে...[৩]

এর সঙ্গে সঙ্গেই এ গল্পে অভিভাবকদের কথোপকথনের মাধ্যমে উঠে আসে ভিন রাজ্যে কর্মনিযুক্তির অনেক বেশি খতিয়ানের কথা—

প্যান্ট শার্টে ভদ্রলোক দু-জন। সঙ্গে সালোয়ার কামিজে মধ্যবয়সিনী। হৃতরূপেও কেমন দমকে চটি খটমটিয়ে যেতে যেতে বলে, আরে অভীক তো রামাইয়া কলেজ থেকে মেক্যানিক্যাল করে বেরোতেই বাঙ্গালোরে দু-খানা কোম্পানিতে চাকুরির অফার পেয়েছে। আর কম্পিউটারের অলোকেশ এস, আই, টি তমকুর থেকে বেরোতেই ইনফোটেক না কোথায় জয়েন করে গেছে—

দাসবাবুর স্ত্রী দাসবাবুর শার্ট টানতে গিয়ে পিঠের চামড়ায় আঁচড়। ঘাড় ফেরায় স্ত্রীর দিকে, কি হল?

—শুনলে তো?[৪]

এর পাশাপাশি অভিভাবকদের মনে সংগতভাবেই উঠে আসে এই শিক্ষা-পরিযাণের কারণ—

> ক্রমশ একটা পরাজয়ও স্মরজিৎকে সেঁতিয়ে দেয়। আচারিয়ার ছাদে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল, নিজের দেশ... প্রদেশ থাকতে পড়াশোনার জন্য এখানে এতদূরে কেন...? শুধু কি ছাত্রদের যোগ্যতা, না অযোগ্যতা? নাকি পরিস্থিতি মাফিক যোগ্য ব্যবস্থা নিতে পারেনি আমার প্রদেশ। এক সময় কত দেশ প্রদেশ থেকে ছাত্র ছুটত পশ্চিমবঙ্গের দিকে।[৫]

লেখক এ গল্পে পরিযাণের কারণকে সংগতভাবেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অভিভাবকদের উপায়হীনতাকে তিনি অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন।

'আত্মজন আপনজন' গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন একটি যুবতী মেয়ের অস্তিত্ব সন্ধানের কাহিনি। তার পাশাপাশি এ গল্পে উঠে এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কৃষি শ্রমিকদের জীবনসংগ্রাম। এ গল্পে লংকার ক্ষেতে ফসল তোলা নারী কিংবা পুরুষ শ্রমিকদের কথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি এর পাশাপাশি প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে অধিক পরিশ্রম প্রদানের পর স্বল্প মজুরীতে তাদের জীবিকানির্বাহের সংকটের কথা। তার পাশাপাশি এ গল্পে উঠে এসেছে অধিক মজুরীর আশায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা। গ্রামীণ হাটে টেলিফোন বুথে তারা ভিন রাজ্য থেকে ফোন করে পরিজনদের সঙ্গে কথা বলার আশায়। এ গল্পে তার পাশাপাশি উঠে আসে স্বল্প মজুরীর কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ না করে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন—

> ফেরিঘাটার গা-ছুঁয়ে হাট। ভিডিও হলের ওপাশে হাটের এস টি ডি বুথের মাথা বরাবর লম্বা উঁচু বাঁশের ডগায় বাঁধা মাইকটায় বেজে ওঠে, ফুলমণি মাইতি।
>
> ঘোষণাটা কানে লাগতেই খাটুয়ার লংকা বাড়ির মেয়ে পুরুষ লেবাররা উঠে দাঁড়ায়। ওদিকে খালপাড়ে সামন্তদের লংকা বাগানে মজুররা কাজ ছেড়ে সোজা তাকায় হাটে মাইকের দিকে। দু-চারজন গেরস্ত ঘর ছেড়ে উঠোন দাওয়ায় হাজির। ভাবে, কোন ফুলমণি...। মাইতি পদবিতে অনেকগুলো ফুলমণি...

তাদের হাতে কাজের লাঠি, কাটারি পাকানো সুতোর লেচি। বউদের দু-একজন রান্নাশাল থেকে খুন্তি হাতেই বেরিয়ে এসেছে।

মাইক থেকে পুনরায় ঘোষণা, ফুলমণি মাইতি-ই স্বামী রূপচাঁদ মাইতি—

আপনার মেজো ছেলে বোম্বে থেকে ফোন করেছে। আধ ঘণ্টা পরে আবার করবে। চলে আসুন সঙ্গে দু—টাকা আনুন। বাকি চলবে না। আধ ঘণ্টায় চলে আসুন—[৬]

ফুলমণি মাইতি হুটপাট পা ফেলে। সেদিকে গৌরী উদাস, ... আমাদের যদি অমন কেউ থাকত আমার জন্যে...মায়ের তরেও কত পুইস্যা আনত বোম্বে থিকে...।

বালতি হাতে একদম পিছনে হাজির। চাপা স্বরে বলে, এই—

হঠাৎ পুরুষকণ্ঠে একটু সংকোচ।...

—এই নে, বলে নিজের সংগৃহীত লংকাগুলো ঢেলে দেয় গৌরীর বালতিতে।...ভরাট হয় তো গৌরীর বুকের ভিতর। ফিসফিসিয়ে বলে, তুমি আমাকে বোম্বে নিয়ে যাবে?

—কেন?

—ওইখানে গেলে নাকি মানুষের অনেক রোজগার। মেয়েরা সোনা হীরার কাজ করলে অনেক মজুরী পায়...। ভালো খায় পরে...পয়সা জমায়...

—জমাক না।

—চলো। আমাকে লে চলো বোম্বে।

—গেলে?

—দু জনে চার হাতে রোজগার করব।

—দুস। আগে আমি যাই। তারপর তো মেয়েরা।[৭]

এ গল্পে উঠে আসে হাটের বর্ণনা। তার সঙ্গে আসে ভিন রাজ্যে পরিজনকে ফোন করার জন্যে উন্মুখ ভিড়ের কথা—

পাকা দেওয়াল ছাউনিতে বাঁধা ওষুধ দোকান। দেওয়ালে হলুদ বাক্সের চেহারায় কয়েন অপারেটেড ফোন। কাচের শো-কেসে চার ছখানা নতুন মোবাইল রেখে ভোডাফোন, এয়ারসেল, এয়ারটেল ক্যাশকার্ড সাজানো। স্টেশনারি দ্রব্যের সঙ্গে তো এসটিডি বুথ।

ক-জন ছেলে ছোকরা বাচ্চা কোলে বউয়ের সঙ্গে অল্পবয়সি মেয়েরাও দাঁড়িয়ে বুথটার সামনে। বাচ্চা কোলে বউটা হাতে একটা চিরকুট নিয়ে ছোকরা বুথমালিককে বলে, ভাই ধরে দাও দিনি। আমার পুরুষমানুষটা যে অন্ধেরে গেছে তেলের খোঁজে পাথর ফাটাতে। কই টাকা পাঠায়নি তার লেবার কনটাকটার শাসমলবাবুটা...

বুথমালিক বলে, ধরে দিচ্ছি। কাচের ঘর থেকে বার হোক ওই মেয়েটা...[৮]

‘টাওয়ার ডগায় মেঘ’ গল্পে পূর্বের গল্পের তুলনায় আরও বেশি করে উঠে এসেছে পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা। তারা ছড়িয়ে থাকে মুম্বাই, গুজরাট, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি, চেন্নাই প্রভৃতি ভিন রাজ্যের শহরে। সেখানে শ্রমিকের শ্রমের মূল্য তাদের রাজ্যের থেকে অনেক বেশি। উপরি রোজগারের হাতছানিও আছে বাড়তি হিসাবে। তাই গ্রামে আর যুবকরা সেভাবে থাকে না। বেশিরভাগই প্রায় বাইরে থাকে। তাদের ফোন আসে ভিন রাজ্য থেকে পাড়ার দোকানের টেলিফোন বুথে। বাড়ির লোককে মাইকে ডেকে দেয় তারা। আর এভাবেই এ গল্পে উঠে আসে উপার্জনের তাগিদে নিজ এলাকা ছেড়ে শ্রমিকদের পরিযাণের কথা—

দোকানটায় রেডিও টর্চলাইট হ্যাজাকও সারানো হয়। সদ্য দু-একটা সাদা-কালো টিভির টুকিটাকি গোলমাল মেরামত করে ভাগ্যধর বেরা। তেইশ-চব্বিশের স্বাস্থ্যবান লম্বা ছোকরা। কালো চেহারায় মাথাভরতি কোঁকড়ানো আর কালো চুল।

কাচের শো-কেসের উপর টেলিফোন সেট। ক্রিরির...ক্রিরির...রিংটোন। হাতের কাজ ফেলে ভাগ্যধর রিসিভার তোলে, হ্যালো—আমি প্রমথ—প্রমথ মিদ্যা বলছি গো।

কে? প্রমথ...কোন প্রমথ...কোন প্রমথ..., বেশ ধন্দে ভাগ্যধর বেরা। নিজের শো-কেস-এর মোটা কাচে মুখটা এবড়ো-খেবড়ো, রোগা বাঁকা লাগে, —পাকার হাটে উত্তরপাড়ার প্রমথ...

ভাগ্যধর খানিক হদিশ পেয়ে আর একটু সাব্যস্তে উদ্যোগী, ওহ! আমাদের কুমিরে-কাটা রামানন্দ কাকার প্রমথ...!

—নয়তো কী?

—তুই কেমন আছিস রে?

—ভালো।

—এখন...কোথায়? বোম্বাই?

—হ্যাঁ, মুম্বাই। মাকে ডেকে দাও—না গো—জোরে হাঁক দিবে। আমি পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট পর...

সম্মুখে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় নতুন খোয়া পিচ ঢালাইয়ে পাকা পথ। ফেরিঘাট অব্দি। দোকানের সামনে তিনখানা লোহার খুঁটির উপর তার...নিচে যন্ত্রপাতি সহযোগে তো ডব্লু এল এল ফোন ব্যবস্থা। পাশেই ব্যাটারি সহযোগে তার পৌঁছেছে মাইকের মাউথপিসে। লম্বায় প্রায় আকাশছোঁয়া বাঁশের ডগায় মাইক বাঁধা। তাতেই উত্তরপাড়া পুব-পশ্চিম পাড়ার রোদ বাতাস বয়ে যায়। মাইক বেজে ওঠে। পাশে গাঙ সমুদ্দুরের নোনাজল। পুরোনো হেঁতাল বানি ক্যাওড়া হরকোচ গেমুয়ার জঙ্গলে বেষ্টিত এ-দ্বীপভূমি। ভাগ্যধর মাইক্রোফোনে চেঁচায়, উঠোন বাগানে কে আছেন গো? তোমাদের ছেলে প্রমথ ডাকতিছে। প্রমথ মিদ্যা—বোম্বে থেকে খবর করেছে—প্রমথ মিদ্যা...[৯]

এরপর প্রমথর সঙ্গে তার মা সনকার কথোপকথনের মাধ্যমে উঠে আসে তার পরিযায়ী শ্রমিক হওয়ার কারণ—

—হ্যালো..., কানে উত্তর শুনেই ভাগ্যধর রিসিভার বাড়িয়ে দেয়, এই যে...কাকি তোমার

—হ্যাঁ বলুরে খোকা...

—তোর শরীর ঠিক আছে? সময়মতো খাবার খাচ্ছিস ? কবে দেশে ফিরবি?

ওপার থেকে আর এক প্রস্ত উত্তর শোনার পর মা সনকা বলে, তুই বোম্বাই থেকে আবার গুজরাত? যত কলকারখানা, বিল্ডিং সব ওই দেশে? ছাদ ফেলেছিস? তোর ঠিকাদার ওইখানে দাঁড়িয়ে কাজ করাচ্ছে—। আয়-না গো—এদেশেও তো কতরকম ঘরবাড়ি, অফিস-কারখানা...

তখন ফোনে ওপার থেকে অনেক ফিরিস্তি শোনে। তার মধ্যে দু-চার কথা গুছিয়ে সাজায় সনকা, হ্যাঁ মনি অডারে টাকা পাইছি। তুই যখন বলছিস আমাদের এদিকে...এদেশে আজ কাজ আছে কাল নাও থাকতে পারে—যা গোলমাল। তুই বাপু গোলমালে যাবিনি। হ্যাঁ রে অউখানার মেয়ে-টেয়ে বিয়ে করে ফেলাসনি তো বাপ...[১০]

...বাঁশ ডগালির মাইকে বাজে, উত্তরপাড়ার হাসেম শেখ, হাসেম শেখ ডাকতিছে। হাসেম শেখ। হাসেম শেখ—ব্যাঙ্গালোর থেকে ছেলে নুরউদ্দিন ডাকতিছে। হাসেম শেখ আপনার নুরউদ্দিন ডাকতিছে—এ... হাওয়ায় ভেসে আসে, পোস্টঅফিস মোড়ের শ্রীকণ্ঠ মাইতি—শ্রীকণ্ঠ মাইতি আপনার মেয়ে-জামাই দিল্লি থেকে কথা বলবে—তাড়াতাড়ি চলে আসুন। পোস্ট অফিস মোড়ের শ্রীকণ্ঠ মাইতি—[১১]

এইভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে লেখক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিশ্বায়ন-পরবর্তী পরিযাণকে তুলে ধরেছেন। তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা, মানুষের উপায়হীনতা কিংবা এর ফলে পারিবারিক-সামাজিক অবস্থানের একাধিক পরিবর্তনসমূহকেও তিনি তাঁর ছোটোগল্পের মাধ্যমে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৫.২॥ **নন্দিতা বাগচী**

বর্তমান সময়ে (২০২২) বাংলা ছোটোগল্পের জগতে নন্দিতা বাগচী (জন্ম-১৯৪৯) এক পরিচিত নাম। শুধুমাত্র একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত বলেই নয়, তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি আলাদা করে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলা ছোটোগল্পের বৃত্তে। তিনি একজন প্রবাসী ভারতীয় লেখিকা, যিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় একাধিক উপন্যাসের পাশাপাশি সমান তালে অবদান রেখে চলেছেন ছোটোগল্পের জগতটিতেও। মোটামুটি নয়ের দশকের প্রথম দিক থেকে তাঁর লেখালিখির সূত্রপাত। সেই হিসাবে তাঁর লেখালিখির তিনটি দশক প্রায় অতিক্রান্ত। তাঁর ছোটোগল্প

প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে।[১২] প্রকাশকালের নিরিখে তাঁকে দু'হাজার সালের পরবর্তী লেখিকা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

তাঁর *প্রথম পঁচিশ* (দীপ প্রকাশন, ২০২১) গ্রন্থের লেখিকার পরিচিতি অংশ থেকে জানা যায় নন্দিতা বাগচীর জন্ম উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে। স্কুল কলেজের পড়াশোনা বিজ্ঞান ও অঙ্ক নিয়ে। বিয়ের পরবর্তীকালে কেটেছে পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়ায়। সেখানেই শিক্ষকতা করেছেন এবং ডাক্তার স্বামীর কর্মসূত্রে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে সমাজসেবা করেছেন। পেশায় শিক্ষক হলেও নেশায় তিনি পর্যটক। ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশে। বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সঙ্গে এবং সমাজের নানা স্তরে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন। তাই বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রার আস্বাদে সমৃদ্ধ তাঁর ঝুলি। দেশে ফিরে এলেও বছরের বেশ কিছুটা সময় কাটান বিদেশে। সাহিত্য পাঠ করেছেন ছোটবেলা থেকেই। তবে লেখালিখির শুরু দেশে ফিরে আসার পর। বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় নিয়মিত ছোটোগল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি লেখেন।[১৩]

নন্দিতা বাগচীর লেখালিখির সূত্রপাত ইংরেজি পত্রিকা *The Statesman*-এ ভ্রমণবিষয়ক লেখালিখি দিয়ে। বাংলা পত্রিকা *ভ্রমণ*-এও তাঁর এইধরনের লেখালিখি প্রকাশিত হত। এরপর তিনি সরাসরি ছোটোগল্প ও উপন্যাস রচনার জগতে প্রবেশ করেন। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক ছোটোগল্প লিখেছেন, যেগুলি পরে পুস্তক হিসাবে একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। *দেশ* পত্রিকা ছাড়াও তিনি *আনন্দবাজার পত্রিকা* এবং *সানন্দা*-তেও নিয়মিত লেখালিখি করেন।[১৪]

লেখিকা নন্দিতা বাগচীর বেশ কয়েকটি ছোটোগল্প-গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *ইতি তোমার মণি*, *বৃষ্টির পুত্র কন্যারা*, *স্কাইলাইট*, *৫০টি গল্প*, *প্রথম পঁচিশ* ইত্যাদি।

তাঁর ছোটোগল্পে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি মানুষের জগৎ— যাঁরা প্রবাসেও টিকিয়ে রাখতে চেয়েছেন নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে, আবার একইসঙ্গে তাঁরা হয়ে উঠেছেন বিশ্বনাগরিক। তাঁর গল্পে একেবারে সাধারণ নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন থেকে শুরু করে বিদেশে বসবাসরত উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনের অনুপুঙ্খ ধরা পড়েছে। তাঁর *প্রথম পঁচিশ* গ্রন্থের 'বোধন' গল্পে যেমন উঠে এসেছে নিম্নবিত্ত পরিচারিকার জীবন, 'ডাকপিয়ন' গল্পে উঠে এসেছে নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ডাকপিয়ন পদে চাকরিরতা চরিত্রের কথা, তেমনি তাঁর 'সুরভি-অণু' নামক ছোটোগল্পে ধরা পড়েছে ২০০১ সালে আমেরিকায় আল-কায়দা গোষ্ঠীর বিমান হানা ও সেই সময়কালে এক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসজীবন কিংবা প্রেম। এভাবেই তাঁর ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটি হয়ে উঠেছে বহুমুখী।

নন্দিতা বাগচীর ছোটোগল্পের বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ। উল্লেখযোগ্যভাবে বলা যেতে পারে যে, তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম *পরিযায়ী* (২০০৮), যেখানে উঠে এসেছে আমেরিকা প্রবাসী এক চিকিৎসক ও তাঁর পরিবারের ভারতে ফেরা এবং দেশে নার্সিংহোম প্রতিষ্ঠা করে পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবার প্রচেষ্টার কাহিনি, যা ব্যহত হয়েছিল দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজমানসিকতার কারণে। যাইহোক, লক্ষ করা যায়, তাঁর একাধিক ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন-পরবর্তী পরিযাণ। তাঁর এইধরনের কয়েকটি ছোটোগল্প হল— 'কালাত্যয়', 'স্মৃতিবাসর', 'চান্দ্রায়ণ', 'আরোহণ', 'শব্দভেদ', 'সুরভি-অণু' ইত্যাদি। উল্লেখিত ছোটোগল্পগুলি সবই *প্রথম পঁচিশ* (২০২১) গ্রন্থের অন্তর্গত।

'কালাত্যয়' গল্পে উঠে এসেছে একটি জমি বিক্রিকে কেন্দ্র করে বিক্রেতা দম্পতির কথোপকথন। অমলেন্দু-সুমিতার সঙ্গে এই উপলক্ষ্যে আলাপ হয় ক্রেতা মানবেন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে। গোটা আলাপপর্ব জুড়ে কেনাবেচার কথা হয় সামান্যই, বরং উঠে আসে একটি মানুষের জীবন সম্পর্কে দর্শন। সেই সূত্রেই উঠে আসে পরিযাণ কিংবা বিশ্বায়নের টুকরো টুকরো প্রাসঙ্গিক অনুপুঙ্খ—

> বছর পনেরো আগে বড় শখ করে জমিটা কিনেছিল ওরা। অমলেন্দু আর ওর তিন বন্ধু। একেক জনের কুড়ি কাঠা। বড়সড় একটা বাগানবাড়ি হবে। উইক এন্ডে বাচ্চাদের নিয়ে হইচই করবে। কত জল্পনা। কত কল্পনা। বাচ্চাগুলো কবে যে সব বড় হয়ে গেল! স্কুলে ভর্তির পরীক্ষা-বাৎসরিক পরীক্ষা-নাচের পরীক্ষা। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-জয়েন্ট এন্ট্রান্স। দৌড়-দৌড়-দৌড়। কেরিয়ার তৈরির ইঁদুর দৌড়েই কেটে গেল ওদের শৈশব-কৈশোর। বাবা-কাকাদের সঙ্গে উইকএন্ড কাটাবার আগেই তারা ফুড়ুৎ করে নাগপুর-দিল্লি-ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে গেল। নামকরা আর্কিটেক্ট দিয়ে তৈরি করা ব্লুপ্রিন্টে এখন অসংখ্য ফুটো। নীলরং সময়ের জলে ধুয়ে মুছে আশমানি। সুইমিং পুলের জায়গাটা ছেঁড়া। পুকুরে মাছের বদলে সাঁতরে বেড়ায় সিলভার-ফিশ পোকাগুলো।[১৫]

এহেন স্বপ্নের জমিটি অমলেন্দু বিক্রি করে ব্যাঙ্গালোরে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর খরচ জোগাড় করার লক্ষ্যে—

> অমলেন্দু আঁকিবুঁকি কাটে সেন্টার টেবিলের কাচে। পৈলান পার্কের জমিটা বিক্রি করা প্রয়োজন। ছেলেটা ব্যাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। মাসে প্রায় সাত হাজার টাকা খরচা। এদিকে নিজেদের স্ট্যাটাস বজায় রেখে উদ্বৃত্ত থাকে না কিছু। অন্যান্যদের মতো আন্ডার দ্য টেবলও কিছু করতে পারে না। কোনো মতে মন্ত্রীদের ধরে টরে সল্টলেকের জমিটা পেয়েছে। বাড়িটাও কমপ্লিট করতে পারে নি এখনও।[১৬]

উদ্ধৃতিতে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা-পরিযাণের কথা। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারগুলি নিজ রাজ্যে যুগোপযোগী শিক্ষার অপ্রতুলতায়

সন্তানদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ভিনরাজ্যে, মূলত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। এজন্য তারা জমি কিংবা সম্পত্তি বিক্রিরও ঝুঁকি নিয়েছিল। এই দিকটির পাশাপাশি এ গল্পে মানবেন্দ্র গোস্বামী চরিত্রটির প্রসঙ্গে সরাসরি উঠে আসে বিশ্বায়নের কথা—

> সুমিতা কাজ ফেলে রেখে সম্মোহিতভাবে শোনে ওঁর গল্প। ভদ্রলোক কি ডিপ্রেশনে ভুগছেন। নাকি সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সে? ছেলের সঙ্গেই বা বিরোধ কেন? যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও তো কিছুটা পরিবর্তন আসবেই। যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে গেছে। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি প্রাধান্য পাচ্ছে। বিশ্বায়নের সঙ্গে পশ্চিমি হাওয়াও আসবে স্বাভাবিকভাবেই। তবে এত জেনারেশন গ্যাপের কথা কেন।[১৭]

'স্মৃতিবাসর' গল্পটিতে উঠে এসেছে সচ্ছল এবং প্রতিষ্ঠিত চৌধুরী পরিবারের এক বৃদ্ধের শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে আত্মীয়স্বজনের সমবেত হওয়া এবং তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রসমূহের কার্যকলাপ। বনেদী এই পরিবারের বেশিরভাগ মানুষই স্ব-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই দেশে বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। এ গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের সেই অসহায় দিক, যেখানে উপার্জনের কারণে পরিযায়ী হয়ে পড়া মানুষজনেরা প্রিয়জনের মৃত্যুতেও শেষ বারের মতো তাকে দেখতে যথাসময়ে হাজির হতে পারে না—

> তামসী এসে পৌঁছুল সব কাজ মিটে যাবার পর। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে, টিকিট কেটে, ফ্লাইট বুক করে, ভিসা করিয়ে আসতে আসতে দশদিন লেগে গেল। ট্র্যাভেলার্স চেক করাও, রি-এনট্রি পারমিট নাও, ঝক্কিও তো কম নয়। থাকেও তো বহুদূরে। অস্ট্রেলিয়া ছাড়িয়ে পাপুয়া নিউগিনিতে। ছোট পিসির ছেলে গৌতম গিয়েছিল এয়ারপোর্টে।[১৮]

এ গল্পে দেখা যায়, সন্তান তার পিতার মৃত্যুর সময় পাশে থাকতে তো পারেই না, উপরন্তু পৃথিবীর দূর প্রান্তে ছড়িয়ে থাকার কারণে মৃত পিতাকেও দেখার শেষ সুযোগ তার ঘটে না। বিশ্বায়িত

পৃথিবীতে মানুষের জীবনটিই নিয়ন্ত্রিত হয় পুঁজির অঙ্গুলিহেলনে। তারই ইঙ্গিত মানুষকে পরিবার থেকে নিয়ে যায় বহুদূরে। মানুষ হয়ে পড়ে পরিযায়ী।

'চান্দ্রায়ণ' গল্পেও উঠে আসে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দক্ষিণভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিযাণ। এ গল্পে দুই বন্ধু—দীপক চন্দ্র ও তমাল সিংহরায়ের কথোপকথনে উঠে আসে সেই পরিস্থিতির কথা—

> নীরবতা ভাঙল দীপকই।
>
> —তারপর বল, তোর বউ-ছেলে-মেয়ে কেমন আছে!
>
> —ভালো। তোকে তো লিখেইছিলাম, শুভ্রা গভর্মেন্ট হসপিট্যালে নার্সের কাজ করে।...
>
> —আর ছেলে-মেয়েরা?
>
> —মেয়ে-ফেয়ে নেই। ওই একলতা পিয়াল। নাগপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস। বাঙালি ছেলে-মেয়েরাও আজকাল পড়তে চায় না এখানে। আর ওদেরই বা দোষ কি? পপুলেশন যে হারে বেড়েছে সে তুলনায় সিট তো বাড়েনি কলেজগুলোতে। আমাদের সময়ে যা ছিল তাই-ই রয়ে গেছে। নাগপুর, পুনা ব্যাঙ্গালোর আর দিল্লির জে-এন-ইউ তে গিয়ে দেখ, বাঙালি স্টুডেন্ট গিজ গিজ করছে। ব্যাঙ্গালোরের এম-জি রোডের ফুটপাথে হেঁটে দেখিস। কোনো ইয়াং ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে যদি ধাক্কা লাগে, সে নির্ঘাৎ বাঙালি।[১৯]

বিশ্বায়নের কারণে সারা বিশ্বে তথ্য-প্রযুক্তিসহ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন শাখায় পড়ার চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে একটা সময় পর্যন্ত এই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা বিপুল পরিমাণ তরুণ জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীর ছোটো বড়ো বিভিন্ন কোম্পানিগুলিতে। তবে ভারতে উদার অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি তরফে দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরিতে সায় না দেওয়ার ফলে এ রাজ্যে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল অনেক পরে। ততদিনে বেশ কয়েকটি

বছরের ছাত্রছাত্রী ধারাবাহিকভাবে পাড়ি দিয়ে চলেছিল রাজ্যের বাইরে। এভাবেও পরিযাণের একটি স্রোত তৈরি হয়েছিল।

'আরোহণ' গল্পেও দেখা যায় উচ্চবিত্ত পরিবারের বধূ সংহিতার কন্যা সংযুক্তা উচ্চশিক্ষালাভ এবং একইসঙ্গে বিবাহের কারণে পাড়ি দেয় মার্কিন দেশে। প্রকৃতপক্ষে এটিও ছিল একধরনের পরিযাণ—

> দেখতে দেখতে সংহিতার মেয়ে সংযুক্তা কলেজ-ইউনিভার্সিটির গণ্ডি ছাড়াল। ভারী মেধাবী তাঁর সন্তান দুটি। তেমনি সচেতন তাদের কেরিয়ারের ব্যাপারে। কলেজে থাকাকালীন বন্ধুদের সঙ্গে আমেরিকান সেন্টারে যাওয়া শুরু করেছিল। খবরটা বাবা-মাকে জানাতে হল পরীক্ষার ফি দেবার সময়ে। চন্দ্রচূড়-সংহিতা বাধা দেননি। তবে তাঁরাও মেয়েকে না জানিয়ে একটা কাজ শুরু করলেন, পাত্র খোঁজা। মেয়েকে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যেতে দিতে আপত্তি নেই সেন-দম্পতির। তবে ঘোরতর আপত্তি বিধর্মী বিবাহে।
>
> সংযুক্তা সুন্দরী, মেধাবী। বাবার রোজগারও সচ্ছলতার অনেকটাই ঊর্ধ্বে। তাই পাত্র জুটতেও দেরি হল না। ইতিমধ্যে নানা মার্কিনি ইউনিভার্সিটি থেকে স্কলারশিপসহ নির্বাচনী পত্রও পেয়ে গেল। অতএব শুভদিনে, শুভক্ষণে, সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে পৃথ্বীরাজ জাম্বো জেটে চেপে সংযুক্তাকে নিয়ে উড়ে গেল।[২০]

'সুরভি-অণু' গল্পটি লিখিত হয়েছে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় জঙ্গি হামলা এবং টুইন টাওয়ার ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে। এ গল্পে পরিযাণ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মাত্রায়। একদিকে এ গল্পে উঠে এসেছে মার্কিনদেশে দুর্গাপুজোর মতো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে জঙ্গি হামলার ফলে এ গল্পে ঘটে যায় দুই ভারতীয় নরনারীর প্রেমের অপমৃত্যু। এ গল্পে কলকাতার নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত আর দিল্লির মেয়ে সৃজার প্রেমের সূত্রপাত হয় আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে। দু'জনেরই বিবাহ

যখন স্থির, সেইসময় আমেরিকায় জঙ্গি হামলার কারণে বিদেশিদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। নীল চাকরি পেয়ে সবুজ ছাড়পত্রের আবেদন করেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে পায় পিংক স্লিপ। অর্থাৎ তার সবুজ ছাড়পত্র মঞ্জুর হয় না। আমেরিকায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তার ভবিষ্যৎ। আর এইকারণেই সৃজার সঙ্গে তার সম্পর্কটিও আর স্থায়ী হয় না। সৃজার বাবা-মা তার বিয়ে ঠিক করেন ক্যালিফোর্নিয়ায় সিলিকন ভ্যালির বড়কর্তা তথা আমেরিকার বাসিন্দা হওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া সাগ্নিকের সঙ্গে। তার মিলিয়ন ডলারের বাংলো। এইভাবে এ গল্পে একটি সন্ত্রাসবাদী হানা এবং আমেরিকায় বসবাসের অনুমতির তারতম্য একটি প্রেমের সম্পর্ককে প্রকৃতপক্ষে হত্যা করে, যার অন্তরালে লুকিয়ে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। প্রথম বিশ্বের নাগরিকত্ব এইভাবেই অধিক কাম্য হয়ে ওঠে মানবিক সম্পর্ককে হারিয়ে দিয়ে—

> দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়েছে উইক এন্ডে। কমিউনিটি হল ভাড়া করে। দেশের নিয়ম অনুযায়ী পুজো শেষ হয়ে গেছে তিনদিন আগে। কিন্তু আজ ওদের অষ্টমী। অ্যান আরবার শহরের বাঙালিরা আর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট-ফ্যাকাল্টিরাই উদ্যোক্তা। আশেপাশের শহর ডিয়ারবর্ন, ক্যান্টন, ব্লুমফিল্ড হিল থেকেও ঝেঁটিয়ে বাঙালি বাবু-বিবিরা সব হাজির। ধাক্কাপাড় ধুতি, তসরের পাঞ্জাবি। লালপাড় গরদ-কাঞ্জিভরম-ওয়ালকলাম-বিচিত্রপুরীর চিত্র-বিচিত্র মেলা। পি সি চন্দ্র-এ সরকার-অঞ্জলি জুয়েলার্স-এর কারুকলার প্রদর্শনী।[২১]

> ...অফিস সুদ্ধ সবাই হামলে পড়েছে টিভির ওপরে। আতঙ্কবাদের ভয়াবহ সমাচার টিভির পর্দায়। খবর দেখছে সৃজাও। বারবার উড়ন্ত প্লেনটা এসে সেঁধিয়ে যাচ্ছে মস্ত কাচের বাড়িটার পেটের ভিতর। পৃথিবীর উচ্চতম বাড়িটা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে। আগুন-ধোঁয়া-ছাই-ধুলো। ধোঁয়াশায় ভরে গেছে চতুর্দিক। ঝড়ের মুখে পড়া ডানা ঝাপটানো পাখির মতো আতঙ্কিত মানুষজন। ছুটোছুটি করছে রাস্তায়। কী হয়, কী হয়! ...

সবুজ ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেছিল নীলাঞ্জন। চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই। উকিল বলেছিলেন আর কটাদিন মাত্র। আঙুল ছাপের ডাক আসে আসে। কিন্তু নীল-এর সবুজপত্রের রং বদলে হয়ে যায় গোলাপি। অফিসের ডেস্কে পিংক স্লিপ। খবর পেয়ে দৌড়ে আসে সৃজা। নীল-এর অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রুমে বসে ওর মাথাটা তুলে নেয় নিজের কোলে। আদরে আদরে ভরিয়ে দেয় ওকে। আবেগে থরথর কাঁপে সৃজার ঠোঁট দুটো।

—ডোন্ট ওরি নীল, এভরিথিং উড বি ফাইন। আমি তো আছি।

হ্যাঁ, সৃজা আছে। রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্টশিপের টাকা ভাগাভাগি করে চালিয়ে নেয়। চিত্রলেখাদি, উমাবউদিরা আছেন। প্রকৃতিস্থ হয় নীল। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে ধীরে ধীরে। কিন্তু চাকরি ফেরে না। খবর গেছে চিত্তরঞ্জন পার্কে। দেশপ্রিয় পার্কে।

ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল নীলের। তা ছাড়া অত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। এক কথায়ই ডেকে নিলেন ওঁরা ডক্টরাল প্রোগ্রামের জন্য। বছর তিনেক লেগে যাবে। ততদিনে হয়তো শান্ত হবে পৃথিবী। কিন্তু অশান্ত সৃজার বাবা-মায়ের মন। ইন্টারনেটে বড় ভালো ছেলের সম্বন্ধ পেয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায়। সিলিকন ভ্যালির বড়কর্তা। সিটিজেনশিপ হাতের মুঠোয়। মিলিয়ন ডলারের বাংলো।[২২]

বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ এভাবেই বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত হয়েছে উপরিউক্ত গল্পটিতে। এমনকি তা বদলে দিয়েছে ব্যক্তি মননের যাবতীয় মানবিক অনুভূতিকে।

লেখিকা নন্দিতা বাগচী এইভাবেই তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরেছেন বিশ্বায়নপরবর্তী পরিযাণের বিভিন্ন দিক কিংবা অনুপুঙ্খসমূহকে।

৫.৩॥ **বিপুল দাস**

বর্তমান সময়ে যাঁরা বাংলা ছোটোগল্পকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন বিপুল দাস (জন্ম-১৯৫০)। তাঁর লেখা একাধিক ছোটোগল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ প্রসঙ্গ।

'ভর উঠেছে, আউল বাতাস' গল্পে লেখকের কলমে উঠে আসে এক বস্তির জীবনযাত্রা। পাশেই নোংরা, কালো জলের খাল, পচা পাঁকের দুর্গন্ধ, খানিকটা সেইরকমই বস্তির মানুষজনের মুখের ভাষা কিংবা আচার-ব্যবহার। এহেন বস্তির ছেলেরা বড়ো হলেই উপার্জনের তাগিদে বাইরে চলে যায়। মূলত ভিনরাজ্যে জরির কাজে তারা যায়। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তির সহায়তায় তারা বাড়ির সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে। এ গল্পে দেখা যায় বাতাসী নাম্নী এক যুবতীর স্বামী এরকমভাবেই ভিন রাজ্যে জরির কাজ করতে গিয়ে আর ফেরে না। তার প্রায় সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী তার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করলেও তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকতে থাকতে একসময় একাকী বধূ বাতাসীর উপরে মনসার ভর হয়। এর পর থেকে সে পাড়ায় সম্ভ্রম ও ভক্তির পাত্রী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল একাকী নারীর সমাজের বিষদাঁত থেকে আত্মরক্ষার এক কৌশল, যা মানুষের অন্ধ বিশ্বাস এবং ধর্মীয় সংস্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে এ গল্পে উঠে আসে শ্রমিক হিসাবে বস্তির যুবকদের পরিযাণের প্রসঙ্গটি—

> এখানকার এইট্টি পারসেন্ট ছেলে আঠারো পার হতেই জরির কাজে বাইরে চলে যায়। সেখানে তারা রোজগার করে নিজের পেট ও শরীরের অন্যান্য ক্ষুধাপ্রবণ অঞ্চলে দানাপানি দিয়ে থাকে। ইদানীং তাদের অনেকেরই মোবাইল থাকার জন্য এবং বাড়িতেও বউ কিংবা বাপের কাছে আর একটি মোবাইল থাকার জন্য জানা যায় যে, ওখানে ইউনিয়ান করা বারণ। তা ছাড়া, নিরামিষ বেশি চলে এবং এবার বাড়ি ফেরার সময় এখানকার একটি আশ্চর্য জিনিস নিয়ে যাবে। সাধারণত সপ্তাহে একদিন কথা হয়।
>
> বাতাসির বর সুবলসখা ছিল জরি বসানোর ওস্তাগর। বাতাসির সঙ্গে বিয়ের এক সপ্তাহ বাদেই সে কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছিল। তার কাছে একটা ক্যামেরাসহ মোবাইল ছিল। এটি সে নিজামের থেকে পাঁচশো টাকায় কিনেছিল। এই মোবাইলে সে বাতাসিকে নিয়ে একটি হাসিহাসি মুখের ছবিও তুলেছিল। কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার সময় সুবলসখা এই মোবাইল বাতাসিকে দিয়ে যায়, টেপার কায়দাও শিখিয়ে

দেয়। সে নিজে একটি নতুন মোবাইল কিনে নেয় এবং 'জানু' নামে বাতাসির নম্বর সেভ করে। ফিরে যাওয়ার পর সুবল কিছুদিন বাদেই জানায় যে, সে একটি আলাদা ঘর ভাড়া করবে এবং তার জানুকে নিয়ে যাবে। কিন্তু সস্তায় নতুন ঘর পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলত বাতাসির যাওয়া ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় একবছর বাদে সুবলসখার ফোন আসা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে গেল। জানা যায় যে, উক্ত ফোন এখন পরিষেবা সীমাসে বাহার। তার খবর জুলফিকার, আব্বাস কিংবা নদেরচাঁদ—কেউ দিতে পারল না। সুবলসখা মণ্ডল পুরো ভ্যানিশ হয়ে গেল।[২৩]

গল্পের সুবলসখার মতো বহু শ্রমিক ভিনরাজ্যে গিয়ে এভাবেই হারিয়ে যায়। কেউ হয়তো একেবারেই নিখোঁজ হয়ে যায়, কেউ আবার ভিনরাজ্যেই সংসার পেতে বাস করা শুরু করে। তারা আর নিজ বাসভূমে সহজে ফেরে না। অন্যদিকে এই শ্রমিকদের ফেলে আসা পরিবারেও নানান সমীকরণ তৈরি হয়। স্বামীর অনাদর কিংবা দীর্ঘ অদর্শনে স্ত্রীরাও অন্য সম্পর্কে জড়ায়। কখনো বা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে পরিবারব্যবস্থার মধ্যেও একধরনের বদল লক্ষ করা যায়। সেই দিকগুলিকে গল্পকার এ গল্পে তুলে ধরেছেন।

'রক্তচন্দন ও কালোমহিষ' গল্পে উঠে এসেছে কবিরাজ তারাকান্তের কথা। স্ত্রী চারুবালা আর এক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে থাকেন তিনি। চর্চা করেন কবিরাজি বিদ্যার। তাঁর আর এক পুত্র এবং কন্যা থাকে অন্যত্র। তারা দূরে থাকায় তাদের সঙ্গে সম্পর্কের শিকড় আলগা হতে থাকে। অন্যদিকে তাঁর প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতির উপর ভরসা রাখতে পারে না পরবর্তী প্রজন্ম। এ গল্পে একদিকে উঠে এসেছে গাছ-পালা লতা-পাতার উপর একজন ব্যক্তির অকৃত্রিম বিশ্বাস কিংবা ভালোবাসা, অন্যদিকে দেখা যায় বিশ্বায়িত পৃথিবী তার আগ্রাসী উন্নয়নের থাবা দিয়ে গ্রাস করতে চায় তাঁর সেই বনজ গাছপালার পৃথিবীকে। তিনি ক্রমশ একা হতে থাকেন। দূরত্ব বাড়তে থাকে সন্তানদের সঙ্গে। তারাও উপার্জনের তাগিদে পরিযাণকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়—

এ সংসারে সব কিছু মসৃণভাবে গড়িয়ে চলেছে। বড়োছেলে চিন্ময় জামশেদপুরে। বড়ো চাকুরে। সাহেবি কেতায় তার চালচলন। কাল রাতেও টেলিফোনে কথা হয়েছে। একমাত্র নাতি দেবল এবার ব্যাঙ্গালোরে চলে যাবে। ক-দিনের জন্য এখানে এসেছে। ছোটোছেলে মৃন্ময় এখানে কলেজে পড়ায়। ছেলেদুটির জন্যে মাঝে মাঝে গর্বে বুক ভরে ওঠে। টানাটানির সংসারে ওরা বড়ো হয়েছে। বাবা-মার কাছে চিরকাল মাথা নীচু করে থেকেছে। যেমন খেতে-পরতে দিয়েছেন, হাসিমুখে তাই মেনে নিয়েছে। তা ছাড়া তারাকান্ত চিরকালই সন্তানদের একটু অভাবের মধ্যে রেখে মানুষ করার পক্ষপাতী ছিলেন। একটু টানের মধ্যে। বিলাসিতার তো প্রশ্নই ওঠে না, ক্ষমতা থাকলেও ন্যূনতম প্রয়োজনের বেশি কোনো জিনিস ছেলেমেয়েদের জন্য বরাদ্দ করেননি।[২৪]

চিন্ময় বাবার কাছে চিঠিতেই সব জানিয়েছিল। মাকে আলাদা চিঠি দিয়েছিল অনেক পরে। এ বাড়িতে ঘরদোরের যা অবস্থা, সব ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি করা প্রচুর ঝামেলা। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে না করালে কিছুই ঠিকঠাক হবে না। চিন্ময়ের পক্ষে এখন তা একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া, তার যা চাকরি, তাতে কোনোকালেই এখানে ট্রান্সফার হয়ে আসা সম্ভব নয়। চিরকালের জন্যই তার জামশেদপুরে থাকা। ওখানেই অফিসের কয়েকজন মিলে একই কমপ্লেক্সে কয়েকটা ফ্ল্যাট নিচ্ছে। আরও একটা খবর দিয়েছে চিন্ময়। ফ্ল্যাটের জন্য লোনের কিস্তি কাটতে শুরু করলে বাড়িতে কীভাবে টাকা পাঠাবে, বুঝতে পারছে না।[২৫]

নতুন বিশ্বব্যবস্থার কাছে অসহায় এক কবিরাজের অসহায়তা ও আর্তি যেন মূর্ত হয়ে ওঠে এ গল্পে—

'না, চারু, আমার ঘুম আসছে না। আমি কেমন করে তোমার কাছে মুখ দেখাব! কোন বৃক্ষের রসে মানুষ আবার কাছাকাছি আসে— আমি জানি না। সব গাছের শেকড়ে কীট বাসা বেঁধেছে। সমস্ত কলমিশাকের ঘন সবুজে বিবর্ণ খয়েরি ছোপ, রক্তচন্দন মাটির বাঁধন ছিঁড়ে মাটিতে লুটিয়ে আছে। সমস্ত পৃথিবী থেকে কত তাড়াতাড়ি সব সবুজ উধাও হয়ে যাচ্ছে। সর্পগন্ধা, গুলঞ্চ, ধুতরো, বাসক —সব পরিষ্কার করে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে পৃথিবী জুড়ে। ছ-শো পঁচাত্তর স্কোয়ার ফিট, সাড়ে আটশো স্কোয়ার ফিট। হাটবাজার

থানা হাসপাতাল পোস্ট অফিস বাচ্চাদের খেলার পার্ক, আরও দুটো নতুন বাসরুট শিগগির খুলবে। পুকুর বুজিয়ে, বাঁশঝাড় কেটে ফেলে নতুন কলোনি বসছে। শৃঙ্খলা ভেঙে, কেন্দ্রগত আকর্ষণ তুচ্ছ করে, ঋণাত্মক কণা ছুটে যাচ্ছে ছশো পঁচাত্তরের মোহে।'[২৬]

এ গল্পে একদিকে পরিযাণ, অন্যদিকে বিশ্বায়নব্যবস্থা তার আগ্রাসী রূপ নিয়ে বৈচিত্র্যময় পৃথিবীকে কীভাবে দ্রুত ধ্বংস করে এগিয়ে চলেছে, তা এভাবেই তুলে ধরেছেন লেখক বিপুল দাস। তাঁর কলমে গল্পটিতে সামগ্রিকভাবে নতুন অর্থনীতিতে মানবিক সম্পর্কগুলির বদলের বিভিন্ন মাত্রাও ধরা পড়েছে।

৫.৪॥ **স্বপ্নময় চক্রবর্তী**

ভারতে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে মানব-পরিযাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল বিভিন্ন ধরনের কারণ। শিক্ষাগ্রহণ, জীবিকা অর্জন, চিকিৎসা কিংবা নিছক ভ্রমণের তাগিদে পরিযাণ অপরিহার্য হয়ে উঠছিল। স্বপ্নময় চক্রবর্তী (জন্ম-১৯৫১) তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন পরিযাণকে। তাঁর এইধরনের একটি ছোটোগল্প হল 'আর্সেনিক ভূমি' (*শারদ পরিচয়,* ২০০১)। এ গল্পে একদিকে উঠে এসেছে পরিবেশ সচেতনতা, আর্সেনিক দূষণ বিষয়ে লেখকের অকৃত্রিম উদ্বেগ, যা তাঁর সমসাময়িক 'ফুল ছোঁয়ানো' (*শারদ বর্তমান,* ২০০১)-র মতো ছোটোগল্পেও উঠে এসেছে, অন্যদিকে গল্পটিতে গুরুত্ব পেয়েছে পরিযাণ। আখ্যানে উপস্থিত কালক্রম অনুসারে এ গল্পের পরিযাণ বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী হলেও চরিত্রের দেশে ফিরে আসা কিংবা ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্বায়নের সঙ্গে সংলগ্নতা লাভ করে। নমঃশূদ্র পরিবারের নবকুমার মণ্ডলের সন্তান রামপ্রসাদ মণ্ডল মেধার জোরে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে পাড়ি দিতে পেরেছিল আমেরিকায়। দীর্ঘ সময় পরে সে একবার দেশের বাড়িতে যায়। ততদিনে বদলে গিয়েছে তার ছোটোবেলায় চেনা

পৃথিবীটা। এত দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সম্পর্কের সূত্রগুলিও আলগা হয়ে গিয়েছে স্বভাবতই। এমত অবস্থায় প্রথম বিশ্ব থেকে ফিরে আসা মানুষটি কিছু ডলারের দাক্ষিণ্যে দেশের ভালো করতে চেয়েও পেরে ওঠেন না। তাঁর আত্মীয়রাই তাঁকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। বলা যেতে পারে, দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে স্বজনদের উপকার করার অধিকারও তিনি হারিয়েছেন। এ গল্পের অন্দরে অব্যক্ত উচ্চারণে লেখক তুলে ধরেন তৃতীয় বিশ্বের মেধার বহির্গমনকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে প্রথম বিশ্ব শুধু এগিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, বরং সে হরণ করে নিয়েছে আরও কিছু---মানবিকতা, সম্পর্কের উষ্ণতা ইত্যাদিকেও। এ গল্পে লেখক তাই বার বার উপস্থিত করেন একধরনের তুলনাকে, যে তুলনার দাঁড়িপাল্লায় একদিকে থাকে আমেরিকা, অন্য দিকে ভারত। প্রকৃতপক্ষে এ গল্প এক অনাবাসী ভারতীয় ব্যক্তির মননজাত কথোপকথনে উঠে আসে—

> এদেশের গরম সহ্য হয় না আমার। দুর্গাপুরের বাড়িতে দুটো ঘরে এসি বসানো আছে। বাবা চালাতেন না। আমি এলেই চালাই। বাকিলা যাবার জন্য একটা গাড়ি ভাড়া নিতে হবে। পৃথার বাপের বাড়ি সল্টলেক-এ। ওখানে আমার এক শ্যালক আছে এখন। ওখানেই গেলাম। একটা গাড়ি ভাড়া করে দিতে বললাম। এয়ার কন্ডিশন গাড়ি। ওরা একটা ইন্ডিকা ভাড়া করে দিল। দু'লিটার মিনারেল ওয়াটার নিলাম। আশা করি হয়ে যাবে। ফ্লাস্কে একটু চা-ও দিয়ে দিল অনুরাধা, মানে শ্যালকের বউ।...
>
> সব ভুলে গিয়েছি। গাছেরা নুয়ে পড়েছে। আমগাছ, কাঁঠালগাছ, আর কী সব গাছ। এইসব গাছের নাম জানতাম একদিন। পাখিদের নাম মনে নেই। আকাশে মেঘ। ওগুলো কিউমুলাস আর অল্টোকিউমুলাস। পোস্ট রেইনি-সিজন-ক্লাউডস। শরৎ! শরৎ! অগস্ট মাস তো শরৎ। এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে। সকালবেলায়...কী যেন...কী যেন...। জাল ফেলে মাছ ধরছে জেলে। আমিও পারতাম, কত জাল ফেলেছি জলে। এই জলে এখন কি আমার এলার্জি হবে? গোরুর গাড়ি দেখলাম, ছাগলচরানি বালিকা দেখলাম, আলপথ দিয়ে আলতা রাঙা পায়ে হেঁটে যাওয়া ঘোমটা পরা বউ দেখলাম। সব কিউরিও দৃশ্য। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসি? না, এই গান গাইব না। লজ্জা করে।[২৭]

এ গল্প মনে করায়, প্রথম বিশ্ব যেমন পরিযায়ীদেরকে দিয়েছে অনেককিছু, তেমনি কেড়েও নিয়েছে বহু। স্মৃতি, প্রতিবেশ, ভাবনার ধরন—অনেককিছুকেই। লেখকের নির্মাণে এ গল্পের চরিত্রটি তবু চিন্তাশীল, প্রকৃতপক্ষে এইধরনের বহু চরিত্র তৃতীয় বিশ্বের পরিচিত জগতকে হারিয়েছে নিজেদের অগোচরেই। অনেকেই সচেতনভাবে মুছে ফেলতে চেয়েছে পূর্বপরিচয়কে। হয়ে উঠতে চেয়েছে প্রথম বিশ্বের গর্বিত নাগরিক।

'ঝড়ের পাতা' (*শারদ বর্তমান*, ২০০৫) গল্পটিতে অন্য এক ধরনের পরিযাণের কথা উঠে আসে। এ গল্প ২০০৩ সালে শুরু হওয়া ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে শ্রম তথা শ্রমিকের পরিযাণ ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। বিপুল সংখ্যক দক্ষ কিংবা অদক্ষ শ্রমিক ভারত থেকে পাড়ি দিয়েছিল পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও। ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধের সময়ে সেই নিরীহ শ্রমিকদের অনেকেই দেশে ফিরতে পারেনি। ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কর্মক্ষেত্রে থাকাকালীন তারা অনেকেই আমেরিকার হামলার শিকার হয়। অনেকে নিহত হয়। অনেকে আহত হয়েও কোনোক্রমে বেঁচে থাকে। যুদ্ধের কারণে পরিবারের সঙ্গে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রবল টালমাটাল পরিস্থিতিতে দেশে ফেরাও হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। এইরকম একটি সময়কে নিয়ে 'ঝড়ের পাতা' গল্পটি লেখেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। এ গল্পের চরিত্র সোলেমান হোসেন মণ্ডল ওরফে ছালু মিঞা মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থেকে আট কিলোমিটার দূরের গ্রাম দাউদপুরের বাসিন্দা। কর্মের তাগিদে সে পাড়ি দেয় ইরাকে। সেখানে সে খেজুর কারখানায় কাজ করে। ইতোমধ্যে ইরাকে যুদ্ধ লেগে যায়। বাড়িতে বাবা-মা, স্ত্রী রাবেয়া ওরফে আদু এবং তিন বছরের পুত্র গভীর উৎকণ্ঠায় দিন কাটায়, কারণ সোলেমানের আর কোনো খবর পাওয়া যায় না। শেষে বহুদিন পরে জানা যায়, তাদের কারখানা বোমায় নষ্ট হয়েছে, আহত সোলেমানের ডান হাতটি অপারেশনে কাটা গিয়েছে। সে শ্রমজীবী মানুষের কাজের

সহায় ডানহাতটি হারিয়ে ফেলায় কর্মের সম্ভাবনাও অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে। তবু এত ভয়াবহতার পরেও সে বাড়ি ফিরতে চায় না। একটা মাটির কারখানায় কাজ নেয়। সেখানে তার কাজ হয় পা দিয়ে দলে পিষে মাটি নরম করা। মৃত্যুর সম্ভাবনা এ গল্পে ক্ষুধার আশঙ্কাকে হারিয়ে দিতে পারেনি। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে অঙ্গহীন হয়েও থেকে যায় সোলেমান। অন্যদিকে বহুদূরে পড়ে থাকে তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। এভাবেই বিশ্বায়নের ফলে সস্তা শ্রমের পরিযাণ ঘটেছিল সারা পৃথিবীতে। তাঁর ছোটোগল্পে স্বপ্নময় সেই বাস্তবতাকেই তুলে ধরেন—

> আদুর শ্বশুর চাষি। নিজের ছ'বিঘা জমি। এখনও মাঠে যায়। বছর পঞ্চাশ বয়স হবে। সঙ্গে নেয় স্টিলের টিফিন কৌটো আর ট্রানজিস্টার। ছোট্ট মতন, কানে ছিপি দিয়ে শোনা যায়। আদুর শ্বশুর রাজশাহী শোনে, ঢাকা শোনে। বাড়িতে ফিরে লুঙ্গি পরে হাতে ঘড়িটা লাগায়। এত ফুটুনি ছেলের জন্য। ছেলের নাম ছালু। আদুর হ্যাসবান। ইরাক গেছে। ইরাক থেকে টাকা পাঠায়। সে টাকায় ফুটুনি।[২৮]

বিশ্বায়নের ফলে সংঘটিত পরিযাণ পরিবার থেকে মানুষকে দূরবর্তী করলেও পারিবারিক সচ্ছলতা এনেছিল। স্বপ্নপূরণ হয়েছিল পরিবারের সদস্যদের। যুদ্ধের খবর সেই নিশ্চিন্ততাকে বিঘ্নিত করে—

> বসরা, বাগদাদের পর কিরকুক। জব্বর, খয়রুল আর সোলেমানদের ঘরে টিভি আছে। ওরা সব কাফিস্তায় কাজ করে। এ ছাড়া আরও তিন-চার ঘরে টিভি আছে। ওদের বাড়িতে ভিড়। সন্ধ্যায় খবরের সময় অনেক লোকজন চলে আসে। টিভির পর্দায় ভেঙে পড়া ঘরবাড়ির দিকে চেয়ে থাকে। ব্যস্ত অ্যাম্বুলেন্স, স্ট্রেচারে শোয়ানো মানুষগুলির দিকে ওদের খরদৃষ্টি। ইট পাথরে চাপা পড়া একটা মানুষের হাত বেরিয়ে আছে। কে যেন বলে উটা খয়রুলের হাত না তো? কাফন ঢাকা দেহ থেকে একটা পা বেরিয়ে আছে। কার পা গো? যে মানুষটি ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল, তাকে দেখে কে যেন বলল আমাদের ছালুর মতন না? ধ্বংসস্তূপের সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে এক বৃদ্ধা। একটু আগেই যেখানে ওর নিজের সংসার ছিল।...

তারপর যুদ্ধ থামে। বাগদাদে আমেরিকার সৈন্য মার্চ করে। রামসফিল্ড বক্তৃতা দেয়, বলে সব মিটে গেছে। আমোদিয়া গ্রামের তিন ঘরে রাতের ঘুম নেই। খেজুর কারখানার ওই তিনটি ছেলের কথা কেউ জানে না। কত চিঠি লেখা হয়, লাল বাক্সে ফেলাই শুধু। ইমাম সাহেব বলে, কী করে জানা যাবে? সাদ্দাম জিন্দা আছে কিনা তাই কেউ জানে না তো লেবার......।

যেখানে নরম মাটি মিলে, সেখানেই মূর্তি গড়ে মানুষ। যে মানুষ ভাঙে, সেই মানুষই আবার গড়ে। এমন সুন্দর উট, ঘোড়া, পাখি তৈয়ার হয় যেন রুহ ফুঁকে দিলেই জিন্দা হয়ে যাবে। আমি এখন উখানে মাটির তালের উপর নাচি। সারাদিন নাচি। মাটি লরম করি। সারা পায়ে মাটি লাগে, গায়ে মাটি লাগে। মাটিতে নাচতে নাচতে দেশের কথা ভাবি, তোমার কথা ভাবি আদু।

এখন একটা হাত ফেলে রেখে দেশে কী ভাবে যাব? দেশে গেলে কী খাব? কে খাওয়াবে আমাকে? যার হাত নেই তার ভাত নেই।[২৯]

পরিযায়ী শ্রমিক জীবনের করুণ পরিণতিকে নতুন বিশ্বব্যবস্থার মাঝখানে এভাবেই তুলে ধরেন লেখক।

বিশ্বায়িত পৃথিবীতে পরিযাণের অন্যতম কারণ পর্যটন। আর সেই পর্যটনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে যৌনতার হাতছানি। বিশ্বের বেশ কিছু প্রান্তের মতো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শহরগুলিতে বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যৌন পর্যটন। সেই ক্ষেত্রটিকে সেইসব দেশের সরকারও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে সাহায্য করে চলেছে অবিরত। তবে সেইসঙ্গে এই কারণে সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উদ্বিগ্ন, কারণ এর মাধ্যমেই বিশ্বায়ন ঘটে চলেছে একাধিক যৌন ব্যাধির। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘জননী যন্ত্রণা’ (*শারদ বর্তমান*, ২০০৩) কিংবা ‘ব্লু সি.ডি. নিয়ে একটি গল্প’ (*কৃত্তিবাস*, ২০০৭) ইত্যাদির মতো আখ্যানে উঠে এসেছে এরকমই কিছু উদাহরণ। প্রথম গল্পটিতে

উঠে আসে এক এন.জি.ও কর্মীর এইডস সংক্রান্ত সেমিনার উপলক্ষ্যে কম্বোডিয়াতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। সেখানে উঠে আসে বিশ্বায়িত পৃথিবীর এক অন্য দিক—

> এইডস সংক্রান্ত ওই সেমিনারে এসব নিয়ে কথা হয়েছিল। বলা হচ্ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে বেশ্যাবৃত্তির সামাজিকীকরণ হয়ে যাচ্ছে। থাইল্যান্ডের বেশ কিছু মেয়ে প্রথম যৌবনের কয়েক বছর বেশ্যাবৃত্তি করে। তারপর পরিবারে ফিরে যায়। এতে ওদের বিয়ে হতে সমস্যা হয় না। এই ধরনের বেশ্যাবৃত্তিতে রাষ্ট্রেরও মদত আছে। বিদেশ থেকে হাজারে হাজারে যৌনতালোভী পুরুষরা আসছে। আসলে ডলার আসছে, ডলার। মেয়েদের শরীর বেচা পয়সায় হাইওয়ে, এ.সি. বাস, বেকারভাতাও। বেশ্যাবৃত্তির সামাজিক সম্মতি থাইল্যান্ড ছাড়িয়ে অন্য দেশগুলিতেও ছড়াচ্ছে। এতে এইডস বাড়ছে কিনা এ নিয়ে তর্ক হয়েছিল। কেউ বলেছিল বেশ্যাবৃত্তি যদি বেআইনি না থাকে, গোপনতা না থাকে তাহলে এইডস এর বিরুদ্ধে লড়া সহজ হয়। এতে এইডস বাড়ে না। থাইল্যান্ডের প্রতিনিধি বলেছিল, পাটেয়ার সমুদ্রের ধারের পুলিশের পকেটেও কনডোম রাখা সম্ভব হয়েছে, যদি কোনো ট্যুরিস্টের দরকার পড়ে যায়, পুলিশের কাছে চাইলেই পাওয়া যাবে। কম্বোডিয়াতে কি ক্রমশ থাইল্যান্ড হতে চলেছে? ট্যুরিস্ট স্পটের আশেপাশের সেগুন-সুপারি-নারকেল গাছ ছাড়াও গ্রামগুলির ভিতরে জন্ম নিচ্ছে ডলার প্রত্যাশী ব্রথেল?[৩০]

দ্বিতীয় গল্পটিতে সরাসরি উঠে আসে থাইল্যান্ডের পাটেয়ার ওয়াকার স্ট্রিটের মতো এলাকার কথা, যৌনতা যেখানে পণ্য। দোকানে উপস্থিত নারীদের পছন্দমতো বেছে নিতে পারে খরিদ্দাররা। সেখানেও ক্রেতা হিসাবে অগ্রাধিকার পায় প্রথম বিশ্বের মানুষরা—

> ওদের দেশে এইসব ফুর্তি কিনতে অনেক টাকা, এশিয়ায় সস্তা। ডলার ভাঙালে, পাউন্ড ভাঙালে, ইউরো ভাঙালে একগাদা এশিয়ান টাকা। একটা সুট পরা কালো রং-এর সাহেব ঘাড়ে করে একটা মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা কালো সাহেবের কোঁকড়া চুল ধরে আছে, সাহেবের গলায় দুপাশ থেকে বেরিয়ে বুকের ঝুলে থাকা পা দুটোকে খাবলে ধরে আছে সাহেবের হাত। সাহেব চলেছে। ডান দিকে ওয়াটার গেমস, বাঁ দিকে ডলস হাউস। ডান দিকে সাম্বা সাম্বা বাঁ দিকে তাজমহল। ডানদিকে বুগি বুগি শো তো

> বাঁ দিকে হট রেড শো। হট রেড শো-র বাইরে কিছু ছবি দেখে পছন্দ হ'ল। দুশো ভাট করে টিকিট। এমন কিছু না। একশো কুড়ি টাকায় একশো ভাট হয়। ঢুকে গেলাম। লাল কার্পেট, লালপর্দা, লাল আলো।[৩১]

ছোটোগল্পের অন্দরে এভাবেই বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণের বিভিন্ন মাত্রাকে তুলে ধরেছেন লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

৫.৫॥ **অমর মিত্র**

অমর মিত্র (জন্ম-১৯৫১) বর্তমান সময়ের এক উল্লেখযোগ্য কথাকার। উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচনায় তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৭৪ সাল থেকে তাঁর লেখালিখির সূত্রপাত। প্রথম ছোটোগল্প 'মেলার দিকে ঘর', প্রকাশিত হয়েছিল *একাল* পত্রিকায়।[৩২] সেই হিসাবে ধরতে গেলে প্রায় অর্ধশতক জুড়ে বিস্তৃত সময়ে তাঁর লেখনি এগিয়ে চলেছে। স্বভাবতই এই দীর্ঘ সময়ের একাধিক বৈশিষ্ট্য তাঁর ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিতে এসে পড়েছে। যার অন্যতম হল বিশ্বায়ন।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিযাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে মানুষের স্রোত দেশের ভিতরে এবং অন্য দেশের উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে পূর্বের তুলনায় বেশি পরিমাণে। সেই কারণে বদল এসেছে সামাজিক প্রেক্ষিতেও। আর এ সবই লেখক তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে ধারণ করেছেন। তাঁর এইরকম কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'রেসিপি', 'ভবের হাট', 'সার্কাস', 'পতিগৃহে যাত্রা' (*সেরা ৫০টি গল্প*, দে'জ, ২০১২), 'সপ্তডিঙা' (*শ্রেষ্ঠ গল্প*, করুণা, ২০১২) ইত্যাদি। এই গল্পগুলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে দেশীয় বা আন্তঃদেশীয় পরিযাণের এক বা একাধিক প্রসঙ্গ। 'রেসিপি' (২০১১) গল্পটিতে সমকালীন

রাজনৈতিক একাধিক প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, তৎপূর্বে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড—সবই এ গল্পে ধরা পড়েছে বৃদ্ধ নরেন কুণ্ডুর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে। তাঁর ভাই বরেন চলে গিয়েছে ভিন রাজ্যে, পুনে-তে থাকা ছেলের কাছে। তিনি ছিলেন ইতিপূর্বে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ক্ষমতাবদলের পরে তিনি চলে যান রাজ্যের বাইরে। এ গল্পে বিশ্বায়ন সরাসরি না থাকলেও গল্পের অন্দরে তাকে আবিষ্কার করে নেওয়া যায়। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি ক্রিয়াশীল ছিল বলেই তাঁর ছেলে পুনে-তে গিয়ে জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করেছিল। বরেন নিজেও সেখানে গিয়ে এক শপিং মলে ব্যবসার ব্যবস্থা করে। আর এই সবই সম্ভব হওয়ার পশ্চাতে ছিল বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়া—

> বরেন নেই। রাজ্যেই নেই। ছেলে আছে পুনে, বরেন গেছে সেখানে। পুনেতে নাকি ফ্ল্যাটও কিনেছে বরেন। সঙ্গে এক শপিং মলে ব্যবসার ব্যবস্থাও। কিন্তু এসব কথা তাকেও জানায়নি বরেন। নরেন জেনেছে তাঁর ছেলে আর বউ-এর কথা এই বারান্দায় বসে শুনতে পেয়ে। তাকে কিছু বলতে বারণ করেছে বরেনের বউ শিখা।...বরেন ভেবেছিল ভোটের ফল অনুকূল হলে ফিরবে। কিন্তু তা যখন হয়নি, কী করে ফিরবে? তার নামে পুরোন খুনের মামলাও শুরু করবে এবার প্রশাসন।[৩৩]

'সার্কাস' (২০১১) গল্প জুড়ে উঠে আসে আধুনিক সময়ের এক বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা। যেখানে প্রবাসী তথা কৃতী সন্তানদের বিবাহ হয় জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে। অন্যদিকে দেশে বসবাস করা সাধারণ মানুষের মনে তা সৃষ্টি করে হীনমন্যতা। এ গল্পে কৃতী হওয়ার পশ্চাতেও উঠে আসে বাবা-মায়ের একপ্রকার 'ইনভেস্টমেন্ট'-এর কথা, যা সন্তানকে পরবর্তীকালে পৌঁছে দিয়েছে তাদের স্বপ্নের গন্তব্যে। একমাত্র তাদেরই অধিকার তৈরি হয় রূপকথার মতো বিবাহ করার—

> পাত্র মানে যোগেনের ছেলে বলেছিল পাঁচতারা হোটেলে বিয়ে করতে যাবে। সে থাকে আমেরিকায়। বিয়ের পরই বউ নিয়ে উড়ে যাবে সুইজারল্যান্ড, সেখানে হানিমুন সেরে নিজের দেশে চলে যাবে। হেঁ

হেঁ, এরপর সে ওই দেশের সিটিজেন হয়ে যাবে, তাই ভালো, এদেশে তো শুধু পলিটিক্স, কী খুনোখুনি হচ্ছে বল তুই, আর এদেশে কি মায়না আছে, টাকা দিতে পারবে, পারবে না।[৩৪]

...আসল কথা হল গিয়ে যোগেন তার ছেলের পিছনে ইনভেস্ট করেছে, আমি করিনি। এখন বলছে সব ক্লাসে ফার্স্ট, আসলে ওসব কিছুই না। অনেক খরচা করে তামিলনাড়ুর কোনও জায়গা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়ে এনেছে, তারপর আরও পড়িয়েছে, ফল এখন পাচ্ছে। যত খরচ করেছে সব এক বিয়েতে ফিরে আসছে, আর বাকি যা আসছে সব লাভ। আমিও করতে পারতাম, করিনি। আমরা চিরকাল কলম পেশার ফ্যামিলি, টাকা ব্যাংকে রেখে সুদ খাওয়ার ফ্যামিলি, জমানো টাকা ভেঙে অন্য কোথাও ইনভেস্ট আমাদের বংশে কেউ করেনি, তাই এমন হল।[৩৫]

বিশ্বায়ন পরবর্তী ভারতে মানুষের স্বপ্ন কিংবা আকাঙ্ক্ষার ধরন বদলে গিয়েছিল। দেশে থেকে উপার্জন কিংবা গৃহকেন্দ্রিক ভাবনা ছেড়ে অভিভাবকরা সন্তানদের বিশ্বনাগরিক করে তোলার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের কল্পনার কিংবা আকাঙ্ক্ষার সেই বিশ্ব অবশ্যই মূলত প্রথমবিশ্ব, কিংবা সেই দেশসমূহ, যেখানকার মুদ্রার মূল্য ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় অনেক বেশি। যে দেশে সন্তানরা গেলে বাবা-মা গর্ব করে প্রতিবেশীর কাছে বলতে পারবে, কিংবা প্রতিবেশীর মনে জাগবে ঈর্ষা। সকলেই ছুঁতে চাইবে সেই রূপকথাকে, কিন্তু ছুঁতে পারবে না। এ গল্প সেই কথাই তুলে ধরেছে।

'পতিগৃহে যাত্রা' (২০১০) গল্পটিতেও উঠে এসেছে আর একটি বিবাহপর্ব। সেখানেও এক কন্যার পিতা তাঁর মেয়ের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষ্যে আনন্দ এবং আশঙ্কায় দিন কাটান। তাঁর কন্যা বিবাহের পর বিদেশবাসী হবে। এ গল্প ২০১০ সালের সমকালীন জঙ্গলমহলের কথা তুলে ধরে। একদিকে যখন অশান্ত জঙ্গলমহল ছেড়ে মানুষ গ্রাম শূন্য করে পালাচ্ছে ঘটি বাটি নিয়ে, অন্যদিকে সেই জঙ্গলমহলেরই কৃতী সন্তান সুকেশ দত্তের সুযোগ্য পুত্র কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়

অচিনকুমার বসুর কন্যা তিস্তার। এই বিবাহে একদিকে পিতার মনে প্রশান্তি ডেকে আনে, অন্যদিকে আনে আশঙ্কা।

> সুকেশ দত্ত মশায় গ্রামের স্কুল থেকে দারুণ রেজাল্ট করে কলকাতায় হস্টেলে থেকে বিএসসি., এম এসসি-র পর চাকরি নিয়ে কলকাতা-দিল্লি-মুম্বই-ভুবনেশ্বর করে বেড়াচ্ছেন কত কাল ধরে। তাঁর ছেলে কৃষ্ণেন্দু সেন্ট জেভিয়ার্স, খড়গপুর আই আই টি থেকে আমেরিকায় আড়াই বছর করে দিল্লি-গুরগাঁও।[৩৬]

এ গল্পে উঠে আসা সাধারণ নাগরিকের চরিত্রগুলি পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চায়। জঙ্গলমহলকে ঘিরে অশান্তি তাদের মনে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে। তারা নিজ দেশের, নিজ রাজ্যের এইসব রাজনৈতিক উত্তাপের জগতকে ছাড়িয়ে সন্তানদের পৌঁছে দিতে চায় অন্য কোনো দুনিয়ায়। যেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই, বরং কাজ আছে, যুবকরা যেখানে রাত-দিন এক করে কাজ করে পৌঁছাতে পারে ইপ্সিত অর্থের লক্ষ্যমাত্রায়—

> জিতেন বলে, হ্যাঁ স্যার, খুব পরিশ্রমী, তবে এখন ব্যবসাটা মার খাচ্ছে, গোলমাল চলছে সেই ভোটের পর থেকে, পুলিশও রাস্তা থেকে অল্পবয়সীদের তুলে জেলে ভরে দিচ্ছে, পার্টিতে পার্টিতে লেগেই আছে।
>
> সাবধানে থাকতে বোলো।
>
> সে কী বলি না স্যার, কিন্তু ঘরে বসে তো থাকতে পারে না।
>
> অচিন শুনতে শুনতে যেন নিশ্চিন্তে সিগারেট ধরায়। গুরগাঁও নতুন শহর। ও শহরে এ সব নেই। আছে শুধু কাজ। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলছে। বড় বড় শপিং মল সমস্ত রাত আলো জ্বেলে বসে আছে। ওখানে কোনও ভয় নেই। একটু দূর বটে, কিন্তু উড়ানে গেলে আড়াই ঘণ্টা। ওই সময় জিতেন কি তার মেয়ের বাড়ি পৌঁছতে পারবে? ছ'সাত ঘণ্টা যে লেগেই যায়। আর রাস্তা বন্ধ হলে, পার্টিতে পার্টিতে যুদ্ধ হলে রাস্তায় রাত কেটে যাবে হয়তো।[৩৭]

'সপ্তডিঙা' (*দেশ*, ১৯৯৫) নামক অপেক্ষাকৃত আগে লেখা একটি গল্পেও লেখক অমর মিত্র তুলে ধরেছেন পরিযাণের একাধিক প্রসঙ্গ। এ গল্পের চরিত্র গৌরী এক অবিবাহিত কন্যা, তার বন্ধু

চম্পা আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। সে স্বামীর সঙ্গে থাকে ওড়িশায়। তার সুখী, গতিময় জীবন। তার বিপরীতে গৌরীর জীবনটি বড়োই একঘেয়ে। এ গল্পে চম্পার মুখে উঠে আসে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুখী বর্ণনাসমূহ। আর তার মধ্যে দিয়ে একধরনের পরিযাণ কিংবা পরিযায়ী সফল মানুষের কথা উঠে আসে; কোথাও না যেতে পারা অসহায় গৃহকোণে আবদ্ধ মানুষগুলির মনে জাগায় মুগ্ধতা কিংবা বিস্ময়—

> চম্পা তার স্বামীর ঘর, স্বামী-পুত্র নিয়ে কথা বলতে বলতে কখনও হাসছে, কখনও আত্মমগ্ন হয়ে যাচ্ছে। গৌরী শুনছে যেন দূর দেশের কথা। বাবার দূর সম্পর্কের এক ভাই আমেরিকায় থাকেন, তিনি গতবার মাসখানেকের জন্য এ দেশে ফিরেছিলেন। কী আশ্চর্য! এ বাড়িতে এসেছিলেন। বাবাকে তিনি আমেরিকার গল্প বলছিলেন এই ঘরে বসে। গৌরী, সারি, সুবীর, মায়া সবাই ঘিরে ধরেছিল যেন সেই জীবনকাকাকে। অবাক হয়ে সে দেশের কথা শুনছিল তারা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিল। গৌরী সেই রকম মুগ্ধতায় জড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, সেই বিস্ময়ে।[৩৮]

এভাবেই তাঁর বেশ কিছু ছোটোগল্পে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ কিংবা তার স্বরূপকে অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন লেখক অমর মিত্র।

৫.৬॥ **কিন্নর রায়**

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে কিন্নর রায় (জন্ম-১৯৫৩) এক ব্যতিক্রমী নাম। প্রায় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি লেখালিখির জগতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত। স্বভাবতই তাঁর গল্পের জগতে যে ১৯৯১ পরবর্তী মুক্ত অর্থনীতি কিংবা বিশ্বায়ন তার ছাপ রেখে যাবে তা বলাই বাহুল্য। তবে লেখক কিন্নর রায় বাণিজ্যিক লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। যে কোনোরকম আনুগত্যের তিনি ঘোষিতভাবে বিরোধী। তাঁর লিখিত ছোটোগল্পের বেশিরভাগই প্রকাশিত হয়েছে লিটিল

ম্যাগাজিনের পাতায়। ছোটোগল্পের গঠন সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি অন্য ছোটোগল্পকারদের তুলনায় অনেকাংশে স্বতন্ত্র। প্রথম জীবনে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে একাধিকবার কারাবরণ করা কিন্নর রায় লেখক হিসাবেও অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। তাঁর *দশটি গল্প* (পরশপাথর, ১৪১৬)-এর 'লেখকের কথা' অংশে তিনি জানান—

> এখন বুঝতে পারি সাহিত্য গড়ে ওঠে মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার মধ্যে। বাইরে থেকে ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো ভারে তা সমৃদ্ধ তো হয়ই না, বরং হয়ে দাঁড়ায় ভয়ানক ফাঁসকল। অভিজ্ঞতা, বিপুল অভিজ্ঞতার সঙ্গে চাই অফুরান কল্পনাশক্তি। যে লেখকের কল্পনাশক্তি নেই, তার কিছুই নেই। ঘটিত বাস্তবই কোনো শেষ কথা নয়। বরং যা 'হলেও হতে পারে'—এমন একটা আভাস হয়তো লেখাকে সেই বিপজ্জনক বাঁকের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়, আর তা হয়ে ওঠে আমাদের শিল্পের নিজস্ব গন্ধ। প্রকৃত স্রষ্টার—কবি, লেখক, চলচ্চিত্রকার, পেইন্টার, স্কালপটার বা নাট্যকারের বন্ধু হতে পারে না রাষ্ট্র, মন্ত্রিসভা, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এমনকী পরিবারও তাঁর একচ্ছত্র বন্ধুত্বে বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ এরা—এইসব প্রতিষ্ঠানেরা সকলেই চায় লেখক তাদের হয়ে ভালো ভালো কথা লিখে যাক অনবরত। সবাই মনে মনে ভাবেন লেখক আমার সম্পর্কে শুধুই ভালো ভালো কথা লিখবেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা, নাট্যকার, পেইন্টার, স্কালপটার, গায়ক দিয়ে যাবেন অনর্গল সার্টিফিকেট। বাস্তবে তা কেমন করে হবে? লেখক, চলচ্চিত্রকার তো দেখিয়ে দেবেন রাষ্ট্রের নানা ছিদ্র, ব্যবস্থার অসঙ্গতি। গোপন ঘা। দুর্গন্ধ। ফলে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই প্রকৃত লেখককে, চলচ্চিত্রনির্মাতা বা নাট্যকারদের ছেড়ে কথা বলে না।[৩৯]

এই বক্তব্য থেকে লেখকের অবস্থানকে বুঝে নেওয়া যায়। দেখা যায় তাঁর গল্প লেখার ভাবনাতেও উঠে এসেছে নতুন দিশার ছাপ—

> ভারতীয় আখ্যান রীতির যে চিরাচরিত কথন ভঙ্গি, তা এই ২০১০-এ এসেও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই বৌদ্ধজাতক কাহিনি, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান, পঞ্চতন্ত্র আর

> সবার ওপরে মহাভারত আমাকে লিখতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে আছে রামায়ণ। এইসব মহাগ্রন্থের কাছে আমার ঋণের কোনো শেষ নেই। কাহিনির পেটের মধ্যে কাহিনি, তারও অন্দরমহলে কাহিনিমালা— এগোতে থাকি। তাই ঈশপের গল্প, আলিফ লায়লা, আরব্য রজনীর গল্প, পারস্য উপন্যাস অবাক করে দেয় আজও।[৪০]

কিন্নর রায়ের লেখা গল্পপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে পাঠক মিলিয়ে নিতে পারেন গল্পের বয়নে উপরিউক্ত উদ্ধৃতি কতখানি সুপ্রযুক্ত হয়েছে। ফলে পাঠক তাঁর সমকালের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় হয়ে পড়েন বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র। কখনো তাঁর গল্পে এসে যায় সাংবাদিকের প্রতিবেদনধর্মিতা, কখনো গদ্যের চলনের মাঝখানে ঢুকে পড়ে কবিতা, পাঁচালী, মঙ্গলকাব্য, রূপকথা কিংবা *মহারাষ্ট্রপুরাণ*-এর অংশ। সব মিলিয়ে তাঁর ছোটোগল্পের বাচনভঙ্গী পাঠককে নিয়ে যায় অন্য কোনোখানে।

কিন্নর রায় তাঁর নতুনত্ব নিয়ে যে ছোটোগল্প ১৯৯০-এর দশকে কিংবা তার পরে রচনা করেছেন, তাতে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বায়নের একাধিক লক্ষণ। পণ্য সংস্কৃতি, প্রযুক্তির প্রসার, ব্যক্তি তথা পরিবারসম্পর্কের বদল ইত্যাদি উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। দেশভাগ পরবর্তী বিভিন্ন অনুপুঙ্খ তাঁর গল্পে একাধিকবার উঠে এলেও বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ তাঁর গল্পে তুলনায় কম প্রভাব রেখেছে। তবু তাঁর কয়েকটি গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ প্রসঙ্গ। তাঁর এইধরনের কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'জলদানো' (*শারদীয় গল্পগুচ্ছ*, ১৪১১/২০০৪), 'বডির বরফ' (*দ্য সানডে ইন্ডিয়ান*, ৫ অক্টোবর ২০০৮), 'মরুমায়া' (*নন্দন*, জানুয়ারি ২০০১), 'গুপ্তকথা' (*শারদীয় অনুষ্টুপ*, ২০০০), 'শঙ্খবালা' (*চতুরঙ্গ*, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬) ইত্যাদি।

‘শঙ্খবালা’ গল্পে উঠে এসেছে আরশাদ আলির কথা। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বাসিন্দা আরশাদ ভারতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিশ্রামরত। এ গল্পে উঠে আসে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চিকিৎসা-পরিযাণের বিবরণ—

> ইন্ডিয়া না এলে বোধহয় এত ভালো অপারেশন হত না। ডক্টর এস কে মৈত্র খুব চেষ্টা করেছিলেন পা-টা বাঁচাতে। কিন্তু বোম্বের—নাকি মুম্বাই এখন, শুধুই মুম্বাই—ডক্টর আদবানি বললেন, পা অ্যামপিউট না করলে গোটা বডিতেই ছড়িয়ে পড়বে কার্সিনোমা। সার্জারির পর একটা কোর্স কেমো হয়ে গেছে। মাথার পাতলা হয়ে আসা শাদা চুল মুঠো মুঠো উঠে, যেন উড়ে গেল—প্রায় ন্যাড়া, তেলতেলে হয়ে উঠল সমস্ত মাথা।[৪১]

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে একাধিক দেশ থেকে ভারতে চিকিৎসা-পরিযাণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

‘গুপ্তকথা’ গল্পে উঠে এসেছে ষাটোর্ধ এক বৃদ্ধ দম্পতির কথা। তাঁদের সন্তানদের একজন থাকে বিদেশে। আর একজন কলকাতার সল্টলেকে। নিঃসঙ্গ এই দম্পতির দিন কাটে সন্তানদের সাহচর্যবিহীনভাবে—

> আমার এখন আটষট্টি। আমার স্ত্রী পূরবী আমার থেকে ন-দশ মাসের ছোট। দুজনেরই টুকটাক নানা অসুখ লেগে আছে। মাস গেলে অনেক টাকার ওষুধ খেতে হয়। আমাদের দুই ছেলে। এক মেয়ে। সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ছেলে বহুদিন আমেরিকায় সেটেলড। নামকরা বড় ডাক্তার।
>
> ছোটটি ডাক্তার। তার বাড়ি সল্টলেকে। রাতে খুব সমস্যায় পড়লে ফোনে কথা হয়।[৪২]

বিশ্বায়ন এভাবেই তৃতীয় বিশ্বের স্নেহ-মমতায় নির্মিত সফল মানুষদেরকে পৌঁছে দিয়েছে প্রথম বিশ্বের সব পেয়েছির দেশে। আর তৃতীয় বিশ্বে পড়ে থেকেছেন অনাদৃত বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা। সন্তানের সঙ্গে তাঁদের উষ্ণতাও কমে এসেছে ধীরে ধীরে।

‘মরুমায়া’ গল্পেও এক বৃদ্ধ মানুষের কথা পূর্বোক্ত গল্পের মতোই উঠে এসেছে, যাঁর একাকী জীবন, সন্তান-সন্ততিরা থাকে বহু দূরে—

> নীল আলোমাখা অন্ধকার ভাঙতে ভাঙতে খুব ধীরে কলঘরের দিকে এগোতে থাকে মনিরুল ইসলাম। বাঁ পা সামান্য কমজোরি। কয়েকদিন আগে ফুলেও ছিল। এখন ওষুধ খেয়ে কমেছে। আশি ছোঁয়ার পর কি আর থাকে মানুষের! সুরাইয়া মারা গেছে চার বছর। দু ছেলের এক ছেলে মুম্বাই, আর এক ছেলে দিল্লি। এক মেয়ে। বিয়ে হয়েছে মেটিয়াবুরুজে। জামাই দুবাইয়ে।[৪৩]

প্রকৃতপক্ষে এভাবেই বিশ্বায়নের ঢেউ বৃদ্ধ মানুষদের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সন্তান কিংবা নিকটাত্মীয়দেরকে।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে মা-বাবা কিংবা আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে দূরে---দেশে কিংবা বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে পরবর্তী প্রজন্মগুলি। রোগে-শোকে খুব সহজে তারা ফিরে এসে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু পিতা-মাতা কিংবা পরিজনের মৃত্যুতে হয়তো ফিরতেই হয়। তখন মহাদেশ পার করে আসাটাও খুব সহজ কথা নয়। তাই নিকটাত্মীয়রা তাদের জন্য অপেক্ষা করে মৃতদেহ সংরক্ষণ করে। ‘বডির বরফ’ গল্পে উঠে এসেছে সেরকমই একটি অনুষঙ্গ—

> তাহলে কি ইনজেকশান দিয়ে গেছেন কোনো? বডি বেশিদিন রাখার কথা হলে যেমন করতে হয়। পেটে কোনো স্ট্রং ইনজেকশান। বলতে বলতে সুমিতের মনে পড়ে গেল বাবা প্রায়ই বলতেন প্রথমে পচে ভুঁড়ি আর মুড়ি—মানে মাথা। আজকাল তো এরকম ঘটনা প্রায়ই হয় ছেলে কানাডায়, মেয়ে স্টেটসে, নয়তো বাহারিনে। বাবা কিংবা মা মারা গেছে—ছুটি নিয়ে, অফিসের কাজ মিটিয়ে আসতে আসতে তো বেশ কয়েক ঘণ্টা। হয়তো দিনও পার হয়ে যেতে পারে। তখন তো ভরসা ‘পিস হেভেন’, বরফ ট্রে। ছেলে-মেয়ের হাত ছোঁয়া আগুনের জন্য অপেক্ষা করে শুঁটকি হওয়া। তো মৃতেরা কি আর অপেক্ষা করতে পারে? না কি করা সম্ভব![৪৪]

দেখা যায় এভাবেই মৃত্যু পরবর্তী রীতি প্রথা কিংবা সৎকারপদ্ধতির ক্ষেত্রেও বদল সূচিত করেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ ব্যবস্থা।

'জলদানো' গল্পে লেখক কিন্নর রায় বৃদ্ধা সৌদামিনী মুখোপাধ্যায় চরিত্রটির মাধ্যমে তুলে ধরেন এক প্রতিবাদী পরিবেশকর্মীকে। তিনি একাই বাস করেন আটশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে। তাঁর এলাকায় জলাভূমি ভরাটের অবৈধ প্রয়াস শুরু হলে তিনি একাই রুখে দাঁড়ান তার বিরুদ্ধে। খবরের কাগজে চিঠি লিখে প্রতিবাদ করেন তিনি। এজন্য অনেকের রোষের স্বীকার হলেও তিনি অন্যদিকে অনেক মানুষকে পাশেও পান। গল্পে সেই কাহিনির পাশাপাশি উঠে আসে তাঁর সন্তান-সন্ততিদের পরিযাণের খবর—

> ভোটার লিস্টে অনেক দিনই নাম বাদ গেছে সৌদামিনী মুখোপাধ্যায়ের, স্বামী লেট হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। বড় ছেলে অভীক থাকে বাঙ্গালোরে, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তার বউও তাই, সাউথের মেয়ে। বাঁ নাকে নাকছাবি পরে, খোঁপায় বেল বা জুঁইয়ের মালা, প্রায় সব সময়েই। ছোট—অদীপ, সে থাকে আমেরিকায়, ডাক্তার। তার বউ ওখানকার কলেজে পড়ায়। টেলিফোনে কথা হয় এদের সঙ্গে সপ্তাহে একবার, দু'বার। ইমেল খুললে নাতি—বড় ছেলের ছেলে বাবুসোনার কথা জানা যায়। ছেলেরা সব কিছু করে দিয়ে গেছে এই ফ্ল্যাটের। তাদের নাম নেই ভোটার লিস্টে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই। তার সঙ্গে সঙ্গে বাদ দিয়েছে তাঁর নামটাও। সৌদামিনীর মনে পড়ল। কিন্তু ভোট দেওয়া না দেওয়া তো আমার নিজের নির্বাচন, সেটা আমি ঠিক করব। তাই একা একাই এখানে ওখানে গিয়ে ফর্ম পূরণ করা। নতুন করে তালিকায় নাম তোলান। তার জন্য হ্যাপা কম পোয়াতে হয়নি।[৪৫]

পরিযাণ যে শুধু বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের একা করে দিয়ে যায় তাই নয়, অনেকসময় তাঁদেরকে করে তোলে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বহীনও। এ গল্পে কিছুটা হলেও সেই দিকটিকে তুলে ধরেছেন লেখক কিন্নর রায়।

এভাবেই বিভিন্ন সময়ে লিখিত বেশ কিছু ছোটোগল্পে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ ও তার একাধিক অনুপুঙ্খকে তুলে ধরেছেন লেখক কিন্নর রায়।

৫.৭॥ **সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়**

১৯৯১ সালে ভারতে মুক্ত অর্থনীতিকে গ্রহণ করার পর যে বিশ্বায়ন ঘটেছিল, তাতে পরিযাণ বৃদ্ধি পায়। এইধরনের পরিযাণ শিক্ষা, চিকিৎসা এবং প্রধানত জীবিকা উপার্জনের তাগিদে পরিচালিত হত। বিশ্বায়নের পূর্বে মূলত যে অল্প মাত্রায় পরিযাণ ঘটত, তা ছিল মূলত অন্তর্দেশীয়, অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে তা বেশি পরিমাণে আন্তঃদেশীয় পরিযাণে রূপ নেয়। এর কারণ হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি অথবা ভিসা প্রদানের নীতি শিথিল করার কথা উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ দেশই চাইছিল কীভাবে বিদেশি মুদ্রা উপার্জন করা যায়, অথবা অন্য দেশ থেকে সস্তা শ্রমিক এনে কম খরচে বেশি উৎপাদন করানো যায়। শুধুমাত্র শ্রমিকই নয়, প্রথম বিশ্বের দেশগুলি ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের মেধা সম্পদকে নিজেদের দেশের তুলনায় সস্তায় ব্যবহারে প্রয়াসী হয়েছিল। যে কারণে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে আমেরিকা, ব্রিটেন কিংবা মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা পৃথিবীতেই ভারতীয় মেধা ছড়িয়ে পড়ে। অনাবাসী ভারতীয়ের সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তবে শুধুমাত্র বাইরের দেশেই বিপুল সংখ্যক ভারতীয় চলে গিয়েছিল তা নয়। ভারতের অন্তর্গত রাজ্যগুলিতেও পরিযাণ ঘটছিল দ্রুত। বাণিজ্য কিংবা প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিতে তুলনায় পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি থেকে বহুসংখ্যক মানুষ ভিড় করছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সারা ভারতের বিভিন্ন মেধার অথবা শ্রমপ্রদানকারী মানুষ ভিড় করছিল মুম্বাই, নতুন দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ কিংবা গুজরাটের বিভিন্ন শহরে। কারণ এই শহর কিংবা রাজ্য দেশের অন্য এলাকার

চেয়ে বাণিজ্যে, প্রযুক্তিতে কিংবা শিল্পে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। এর পশ্চাতে যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ ছিল তা নয়, বরং বেশ কিছু পরিমাণে দায়ী ছিল রাজ্যগুলির রাজনৈতিক অবস্থান।

এইরকম পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে কিংবা তার অনতিপরে রচিত বাংলা ছোটোগল্পে উঠে আসছিল বিবিধ ধরনের পরিযাণের টুকরো টুকরো বিবরণ এবং তাকে কেন্দ্র করে মানুষের বদলে যাওয়া প্রতিবেশ কিংবা মননের একাধিক অনুপুঙ্খ। লেখক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় সার্থকভাবে তাঁর বেশ কিছু ছোটোগল্পে এই সময়টিকে তুলে ধরেছেন, যেগুলিতে বিভিন্ন মাত্রার পরিযাণের কথা উঠে এসেছে। এই ধরনের একটি ছোটোগল্প হল 'নিরুদ্দিষ্ট' (*শারদীয় দেশ*, ২০০৪)। এ গল্পের মূল বিষয় কলকাতা থেকে এক বাঙালি ভদ্রলোকের মুম্বাই পাড়ি দেওয়া এবং একটি ডান্স বারের নর্তকীর প্রেমে পড়ে আত্মীয় পরিজন ছেড়ে বরাবরের মতো সেখানেই থেকে যাওয়া। তবে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ঘটে যাওয়ার বেশ কিছু আগে। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে নতুন করে যখন পরিযাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেই সময় একজন নবীন বাঙালি যুবক কর্মসূত্রে মুম্বাইয়ে উপস্থিত হলে সেই ভদ্রলোকের করুণ কাহিনিটি উঠে আসে নবীন যুবকটির বয়ানে। নবীন এই যুবকটি যে জীবিকাসূত্রে মুম্বাইতে হাজির হয় সেটি ছিল বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তিকেন্দ্রিক জীবিকা, যার তাগিদে তাকে মুম্বাইতে হাজির হতে হয়েছিল। গল্পের একেবারে প্রথমে উঠে আসে সেই বর্ণনা—

> গতকাল মুম্বই এসেছি। এখানে আমার প্রথমবার। আমার চাকরিতে ভারতবর্ষের নানান বড় শহরে ঘোরাঘুরি করতে হয়। মুম্বই বাকি ছিল এতদিন।
>
> আমার পার্সোনাল কার্ডে নামের পরে লেখা আছে সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। মোটেই কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নেই আমার। লেগে থেকে এবং দেখে শেখা। পাতি মিস্তিরি। আমাদের কলকাতার

অফিস জাপানের এক বড় কোম্পানির ফটোগ্রাফিক মেশিন, ইন্সট্রুমেন্ট আর কেমিক্যালের ডিলার। আমার কাজ মেশিন ইনস্টল করা, সার্ভিস দেওয়া। মুম্বাইতে আমাদের মেশিনের খুব একটা চল নেই। কীভাবে যেন একটা অর্ডার পেয়ে গেছে অফিস। আমি এসেছি মেশিন বসাতে।[৪৬]

এর পাশাপাশি এ গল্পে উঠে আসে বিশ্বায়িত মুম্বাই নগরী সম্পর্কে লেখকের দর্শন—

নতুন মুম্বই প্ল্যানড সিটি। নগরস্থাপত্য একরকম, এখানকার বাসিন্দারাও এক ধাঁচের হয়ে গেছে। আমেরিকা বা ধনী দেশগুলোয় বোধহয় এমনটা হয়। কিন্তু ওখানে যেটা দেখা যায় না, বাচ্চা কোলে মা ভিখারি, এখানে বড্ড বেশি। কোনও দোকান অথবা রেস্টোরেন্ট থেকে বেরোলেই পিছন পিছন ঘুরছে। এরাও কিন্তু কোনও কথা বলে না। ইশারায় ভিক্ষে চায়।[৪৭]

আমি এখন এক অন্য মুম্বইতে। সরু গলি, টিনের চাল অথবা অ্যাসবেসটাস দেওয়া বাড়ি, ছোট ঘুপচি দোকান, অনুজ্জ্বল পোশাকের মানুষ, উদোম বাচ্চা, খোলা নর্দমা। হামেশাই মুরগি বেড়াল পারাপার করছে রাস্তা। অবিকল বেলেঘাটার খালপাড়ের বস্তি।[৪৮]

শুধু মুম্বই নগরী নয়, সেখানে ডান্স বারের উদ্দাম, বিশ্বায়িত বিনোদনের পণ্য নারীদের অস্তিত্বের সন্ধানও উঠে আসে লেখকের কলমে। তারাও পরিযায়ী, এসেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে—

ভীষণ ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম হল রাতে। প্রদীপবাবু সত্যিই খুব রহস্যজনক মানুষ। কেন আমার পিছনে পড়ে আছেন, কেনই-বা নিয়ে গেলেন লেডিস বার-এ! আবার বলছেন ওখানে ওঁর গোল্ডেন টাইম নষ্ট হয়েছে। বার-এর মেয়েদের দেখে কনফিডেন্টলি বলে দিতে পারছেন, কে কোন রাজ্যের, দেশের... আশ্চর্য লোক। কাল রাতে যতবারই ঘুমে চোখ বুজে এসেছে, মানসপটে দেখা দিয়েছে লেডিস বার-এর ডান্সিং ফ্লোর। স্বপ্নে কিন্তু সেখানে একটাই মেয়ে। শ্যামলা মতন, পরনে ছেঁড়া মলিন ফ্রক। তীব্র আলোর ঝলকানি পড়ছে তার শরীরে। যেন রঙিন বিদ্যুচ্চমক। কান ফাটানো মিউজিক, নাকি ত্রিতাল সহ বজ্রপাত। মেয়েটি আনাড়ি পা ফেলছে, মনে পড়ে যাচ্ছে তার দেশ গাঁয়ের বর্ষাকালের কথা, বন্যার স্মৃতি। কিছুতেই ঠিকঠাক নাচতে পারছে না মেয়েটা। স্বপ্নের মধ্যেই আমার টেনশান হচ্ছে, মেয়েটাকে আমি চিনি, ও থাকত হয়তো বনগাঁয় অথবা বেলেঘাটায়, নাকি জৌগ্রাম...বারবার ভেঙে যায় ঘুম।[৪৯]

‘পাড়ার মেয়ে’ (*শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন*, ২০০৩) গল্পে উঠে এসেছে আর একরকম পরিযাণের কথা। এ গল্পের চরিত্র তীর্থঙ্কর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর কর্মসূত্রে থাকে দিল্লিতে। সেখানে প্রবাসী বাঙালি পরিবারের কন্যা পিউ-এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পিউকে নিয়ে সে বিবাহের পূর্বে কলকাতায় ফেরে পরিবারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। এছাড়াও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তার এককালে ফেলে যাওয়া কলকাতার প্রিয় সব কোণগুলির সঙ্গে পিউ-এর পরিচয় ঘটানো। এ গল্প বনেদি উত্তর কলকাতার মধ্যে থাকা আর এক কলকাতার কথা তুলে ধরে, যে কলকাতার বাসিন্দারা পাকা দালান বাড়ির পাড়ায় পাশাপাশি থাকে কলোনির টালির বাড়িতে মাথা গুঁজে। এ গল্পে সেইরকম একটি কলোনির টালির বাড়ির কন্যা মাতন, যাদের বাড়িতে একদিন তীর্থঙ্করের অবাধ যাতায়াত ছিল, যাকে কিছুটা হলেও স্বপ্ন দেখিয়ে সে কলকাতা ছেড়ে দিল্লিতে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে সে দেখে মাতনদের কলোনি ভেঙে দিয়েছে সরকার, সেখানে কারখানা হবে। ইতিমধ্যে মাতন পাগল হয়ে গিয়েছে। ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে তীর্থঙ্কর আশা করেছিল বন্ধুর বোন মাতন আসবে। কিন্তু তাকে সে দেখতে পায় না।

এ গল্পে পরিযাণ বিভিন্ন মাত্রায় উঠে এসেছে। এককালে কলোনির লোকজন বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা থেকে চলে এসেছিল। সেই পরিযাণের পশ্চাতে ছিল দেশভাগ। বহুকাল পরে সেই শোভাবাজারের দুই ভিন্ন শ্রেণির বাসিন্দার আবার দুই পৃথক উপায়ে পরিযাণ ঘটে। তীর্থঙ্কর জীবিকার কারণে নতুন যুগের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কলকাতা ছেড়ে দিল্লিতে চলে যেতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে মাতনদের পরিবারের কলোনির বাসস্থান সরকার ভেঙে দেয় কারখানা গড়বে বলে। এর ফলে তাদেরকে আবার পরিযায়ী হয়ে পড়তে হয় নতুন করে। এই দুটি পরিযাণের ক্ষেত্রেই মূল কারণ হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় যে পুঁজি জীবিকার সন্ধানে তীর্থঙ্করকে

দিল্লিতে টেনে নিয়ে যায়, সেই পুঁজি ব্যবস্থাই কারখানা গড়তে চাওয়ার কারণে উৎখাত হতে হয় মানুষকে। তবে এ গল্পে দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণির মানুষের পরিণতি আলাদা আলাদা হয়।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে ভারতের যে যে অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তিক্ষেত্র উন্নত হয়েছিল, দিল্লি তার মধ্যে অন্যতম। তাই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন শাখা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া নবীন প্রজন্ম দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেই অঞ্চলগুলিতে ভিড় করতে থাকে। তীর্থঙ্করও সেই প্রজন্মের একজন যুবক। তার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিযাণকে এ গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক—

> বহু রুক্ষ শহর, শুকনো মাঠ, প্রান্তর, খাঁ খাঁ গ্রাম ছেড়ে এসে ট্রেনটা এখন ক্রমশ বিভিন্ন শেডের সবুজের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। দু'পাশে জলা, খেত জমি, ঝোপ, গাঢ় ছায়া সমেত বড় বড় গাছ।
>
> রাজধানী এক্সপ্রেসের ঠুলি পরা জানলা থেকে চোখ সরিয়ে পিউ জিজ্ঞেস করে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ঢুকে গেলাম, না?
>
> পিউয়ের মুখে রোমাঞ্চ। মাথা নেড়ে সায় দিই আমি। পিউ কিশোরী বেলায় এক-দু'বার কলকাতায় এসেছে। কবেকার সেই স্মৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে বাইশ বছরের চোখ। আমার সে সবের বালাই নেই। প্রায় সাড়ে তিন বছর বাদে কলকাতায় ফিরলেও মনে হচ্ছে গতকালই এ রাস্তা দিয়ে দিল্লি গিয়েছি। লাইন ধারে কলাগাছগুলো এরকম ভঙ্গিতেই ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন মঙ্গল কামনা করছিল প্রবাসে পাড়ি দেওয়া সন্তানের।
>
> ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেল থেকেই আমি হোমসিক বলে ধিক্কৃত। ছুটিতে একবার শোভাবাজারের বাড়িতে ফিরলে আর হস্টেলে যেতে চাইতাম না। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ-এর পর চাকরি হল দিল্লিতে। স্বভাবতই মা খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। আদৌ চাকরিটা টিকিয়ে রাখতে পারব কি না! আমি ততদিনে কেরিয়ারের বাস্তব দিকটা বুঝে গিয়েছি। মাকে আশ্বস্ত করেছিলাম এই বলে, এখন ক'বছরের জন্য যাই। শুনেছি কোম্পানি কলকাতায় একটা সেক্টার খুলছে। যে করে হোক বদলি হয়ে চলে আসব।
>
> সেই সেক্টার আজও খোলেনি। তবে ডানকুনির কাছে জমি নেওয়া আছে। কোনওদিন হয়তো খুলতেও পারে। ততদিন পর্যন্ত মা-বাবা থাকবেন কিনা সেটাই বড় ব্যাপার।[৫০]

এ গল্পের আড়ালে আর একধরনের বাস্তবতাকে লেখক তুলে ধরেছেন। তা হল বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে চাকরির সুযোগ বেশি পরিমাণে তৈরি হলেও কলকাতাতে তা হয়নি। পরবর্তী সময়ে হবে কিনা তা নিয়েও অনিশ্চয়তা উঠে এসেছে গল্পে। পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে কলোনি উৎখাত করে কারখানা তৈরির কথা এ গল্পে উঠে এলেও সেই কারখানা শেষপর্যন্ত পরিণতি লাভ করে কিনা, তা জানা যায় না। ডানকুনিতে জমি নেওয়া থাকলেও তীর্থঙ্করের কোম্পানি সেখানে সেক্টার খোলে বলেও দেখা যায় না। ফলে উপার্জনের তাগিদে এ গল্পে বাবা-মা কিংবা চেনা জগতকে ছেড়ে তাকে পরিযায়ী হতে হয় অবধারিত ভাবেই—

> তীর্থদা তুমি নাকি দিল্লি চলে যাচ্ছ?
>
> হ্যাঁ। কেন, তোর কোনও আপত্তি আছে?
>
> দিল্লিতে কী আছে, যা কলকাতায় নেই?
>
> বড় বড় অফিস আছে, প্রচুর কলকারখানা, ভাল চাকরি। এখানে সে সব কিচ্ছু নেই।
>
> তার মানে তুমি সারা জীবন দিল্লিতেই থাকবে?
>
> তাই হয়তো থাকতে হতে পারে।[৫১]

মাতন এবং তীর্থঙ্করের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এভাবেই পরিযাণের কারণটিকে তুলে ধরেন লেখক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

'বসুন্ধরা' (*তথ্যকেন্দ্র শারদ সাহিত্য* ২০০৯) গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন এক স্বামীহারা বৃদ্ধা নারীর কথা, যিনি এক মফসসল এলাকায় স্বামীর বড়ো যত্নে তৈরি করা বাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। তাঁর সন্তানরা থাকেন বহুদূরে। তাঁকে দেখাশোনা করেন কলোনির এক মহিলা। প্রবাসী সন্তানরা বার বার তাঁদের কাছে মাকে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি যান না। স্বামীর শখের বাড়িটি তাঁর মনে যে অনুভূতির জায়গাটি অধিকার করে আছেন, তা থেকে তিনি বিচ্যুত হতে চান না

মৃত্যুর আগে অবধি। এই গল্পেও খুব আলতো করে লেখক পরিযাণকে ছুঁয়ে যান। দেখা যায় বৃদ্ধার সন্তানেরা ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে—

> সুন্দরবন অঞ্চল ভেসে গেছে। কলকাতাও বিধ্বস্ত। প্রাচীন সব গাছ শিকড় উপড়ে পড়ে আছে রাস্তায়। আমার যেমন বহু ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতি আছে, ওদের ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ঝড়ের দাপট তেমন না থাকলেও, কেন ওভাবে ধরাশায়ী হল ওরা? মাটির সঙ্গে শিকড়ের টান কখন যেন আলগা হয়ে গেছে, টের পায়নি। গাছগুলোর পরিণতি দেখে, কেমন একটা ভয় ঘিরে ধরল আমায়। আমি তো এখন একটা গাছেরই মতো। হুইলচেয়ারে শুধু দোতালাটা ঘুরতে পারি। আমারও কি আলগা হয়ে গেছে শিকড়, জীবনের কোন জিনিসটা আঁকড়ে বেঁচে আছি? স্বামী নেই, ছেলেমেয়েরা প্রবাসে, নাতিনাতনির গলা শুনতে পাই ফোনের মাধ্যমে। দৃষ্টি দিয়েও ছুঁতে পারি না ওদের বেদনা, আনন্দ, উচ্ছ্বাস। শিকড় আমারও উদাসীন হয়ে গেছে। মন নাড়া দেওয়া সামান্য কোনও ঘটনাই হয়তো আমাকে উপড়ে ফেলবে।[৫২]
>
> আর্থারাইটিস পঙ্গু করেছে আমায়। বড় ছেলে থাকে আমেরিকার সিয়াটেলে, মেজ ছেলে মুম্বই, মেয়ের বিয়ে হয়েছে বেঙ্গালুরুতে। চাকরিও করে। তিনজনেই আমাকে বলে চলেছে তাদের কাছে গিয়ে থাকতে।[৫৩]

ঘূর্ণিঝড়ের বর্ণনা আর গল্প প্রকাশের সময়কালটি তুলে ধরে আখ্যানের সময়কালকে। তা থেকে উঠে আসে নির্দিষ্ট কালপর্বে বিশ্বায়ন পরবর্তী বিশ্বব্যাপী পরিযাণ কীভাবে মানুষকে একলা করে দিয়েছে। ধীরে ধীরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এইভাবে বেড়ে চলেছে একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা। অধিক উপার্জন কিংবা উন্নত জীবনযাত্রার হাতছানি এভাবেই তাঁদেরকে নিঃস্ব রিক্ত করে ডাক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে। সেইধরনের একাধিক সত্যকেই তাঁর গল্পের বিষয় করে তুলেছেন সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

৫.৮॥ **প্রচেত গুপ্ত**

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে লিখে চলেছেন কথাকার প্রচেত গুপ্ত (জন্ম-১৯৬২)। তাঁর ছোটোগল্পের জগতটি বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর। একদিকে যেমন তিনি হাসির গল্পের স্রষ্টা হিসাবে মুনশিয়ানার ছাপ রেখেছেন, অন্যদিকে প্রেমের গল্প কিংবা ভৌতিক গল্পের অঙ্গনেও তাঁর অবদান নেহাত কম নয়। তাঁর ভাষাভঙ্গি সমকালের লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র। বলা যেতে পারে, দুই দশকে তাঁর গল্পের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ভাষা তিনি স্বকীয়তার সঙ্গে উদ্ভাবন করতে পেরেছেন। সেই ভঙ্গিমার আড়ালে একদিকে যেমন লুকিয়ে থাকে ক্ষুরধার রসবোধ, অন্যদিকে গল্পের মূল সুর ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে। একাধিক গল্পে তাঁর এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। অনেকক্ষেত্রেই আপাতভাবে মজাদার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তাঁর গল্পগুলি শেষপর্যন্ত পৌঁছায় এমন ধরনের শাশ্বত সত্যে, যা মনে পড়ায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শ কিংবা সুকুমার রায়ের আপাত হাসির আড়ালে গভীর জীবনসত্যের উপলব্ধিকে।

প্রচেত গুপ্ত লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন মূলত দু'হাজার সালের কাছাকাছি সময়ে। ততদিনে ভারতে মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত। বিশ্বায়নের প্রভাবসমূহ অর্থনীতিতে কিংবা একাধিক সামাজিক প্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে শুরু করেছে। ফলে তাঁর গল্পে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রভাবগুলি উঠে এসেছে। একদিকে তাঁর ছোটোগল্পে অবধারিতভাবেই উঠে এসেছে প্রযুক্তি ব্যবহারের একাধিক প্রসঙ্গ, মানুষের বদলে যাওয়া মননের জগত, অন্যদিকে উঠে এসেছে পারিবারিক সম্পর্কসমূহের বদল কিংবা পরিযাণ এবং তার প্রভাব। সমকালীন রাজনীতির জগত কিংবা তার বিভিন্ন অনুপুঙ্খ বার বার উঠে এসেছে তাঁর লেখায়।

বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে প্রচেত গুপ্তের একাধিক ছোটোগল্পে। সেই ধরনের পরিযাণ, যা মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্তের জগতকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। মূলত উপার্জন কিংবা পড়াশোনার তাগিদ যে ধরনের পরিযাণের উদ্দেশ্য, তা উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। এইধরনের কয়েকটি ছোটোগল্প, যেগুলিতে কোনো না কোনোভাবে পরিযাণ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, সেগুলি হল তাঁর *প্রচেত গুপ্তের গল্প* (মিত্র ও ঘোষ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮)-এর অন্তর্গত 'বৃষ্টি', 'বৃংহতি', 'এক শনিবার', 'ঝড়ের রাতে', 'স্মৃতি', 'নিতি কেন বৃষ্টি ভালোবাসে না', 'চলে যাচ্ছি' ইত্যাদি এবং *পঞ্চাশটি গল্প* (আনন্দ, অক্টোবর ২০১০) গ্রন্থের অন্তর্গত 'ইমেল বিছানো পথে' কিংবা 'চন্দ্রাহত' ইত্যাদি।

'বৃষ্টি' গল্পের সূত্রপাত কিংবা গল্প বলার ধরনের মধ্যে একধরনের রসবোধকে প্রবিষ্ট করান লেখক প্রচেত গুপ্ত। এ গল্পে শ্রীপর্ণা ও রঞ্জনের দাম্পত্যে মৃদু অশান্তির সূত্রপাত ঘটে শ্রীপর্ণার বৃষ্টিতে ভেজার অধিকার নিয়ে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও নারীর নিজস্ব ইচ্ছার প্রকাশ ঘটানোর স্বাধীনতার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উঠে এসেছে। অন্যদিকে শ্রীপর্ণার বাবার কন্যার প্রতি রাগ এবং জামাতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশের অন্তরালে উঠে এসেছে জামাতার কৃতিত্বের প্রসঙ্গ, যা তার কোম্পানিপ্রদত্ত বিদেশভ্রমণের সুযোগের কারণে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, জামাতা যে কৃতী, তার প্রমাণ হল, সে কোম্পানি থেকে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পায়। এই ঘটনা থেকে একথা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে, বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে প্রথম বিশ্বে পরিযাণের সুযোগ তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে কতখানি গর্বের ছিল—

> আগামী বছর জামাইকে অফিস থেকে বিদেশে পাঠাচ্ছে। গোটা ইউরোপ ট্যুর। লন্ডনে শ্রীপর্ণা গিয়ে মিট করবে। অথচ ছেলের এতটুকু গর্ব নেই। শুধু ছেলের নয়, ছেলের বাপ-মায়েরও নেই। বলছে, 'ও তো আপনাদেরও ছেলে। গর্ব আপনাদের।' আহা ! সব মিলিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি হল সোনার শ্বশুরবাড়ি।[৫৪]

অন্যদিকে 'বৃংহতি' গল্পে দেখা যায় পশু দপ্তরের মন্ত্রী পরমেশ্বর সান্যাল হাতি বিক্রির ঘোষণায় এন আর আই কোটা রাখার কথা ঘোষণা করেন। অর্থাৎ অনাবাসী ভারতীয়রা সেই হাতি কেনার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে। এ গল্পটিও হাসির ছলে লেখা হলেও তার আড়ালে অনাবাসী ভারতীয়দের অধিক ক্রয়ক্ষমতার কারণে দেশে তাঁদের সামাজিক-অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিকভাবে অধিক গুরুত্বের দিকটি মূর্ত হয়ে ওঠে—

> 'গুড, এই তো মাথা খুলছে। এবার লেখো, সেভেন পার্সেন্ট সরিয়ে রাখতে হবে এন আর আই কোটা হিসেবে।'
>
> বিজয় আবার অবাক হল। মুখ তুলে বলল, 'এন আর আই মানে স্যার অনাবাসীদের কথা বলছেন? তারা এখান থেকে হাতির বাচ্চা নিয়ে লন্ডন, আমেরিকায় চলে যাবে!'
>
> 'আহা, যাবে কি যাবে না সেটা তাদের ব্যাপার। আজকাল যেকোনো ব্যাপারে এন আর আই কোটা রাখা একটা নিয়ম। এতে জিনিসের কদর বাড়ে। যে জিনিসের জন্য এন আর আই কোটা নেই, সে জিনিসের কোনো কদর নেই। ক'দিন বাদে দেখবে, বাজারের সবজিওলাও এন আর আই কোটায় আলু, পটল পাশে সরিয়ে রাখছে। চাইলে কিছুই দেবে না। আলু, পটল সরানো থাকলে হাতি সরানো থাকবে না কেন? বল তুমি। নিজের মুখেই বল।'[৫৫]

লক্ষণীয় যে, এ গল্পের উদ্ধৃতিতে 'বাজার' শব্দটি ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে, তার আড়ালে ফুটে উঠেছে লেখকের একরকম বিদ্রূপ, যা নিজ দেশে অনাবাসীদেরকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতাকে প্রকৃতপক্ষে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে আঘাত হেনেছে।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পরিযাণের কারণে আরও বেশি করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে একান্নবর্তী পরিবারের মানুষজন কিংবা পরবর্তী প্রজন্ম। স্বভাবতই পুরানো মানুষজনের মধ্যে তৈরি হয়েছে একপ্রকার শূন্যতাবোধ। 'এক শনিবার' গল্পে পঁয়ষট্টি বছরের

জনার্দনবাবু ও তাঁর স্ত্রী শকুন্তলা দেবী দেশে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিংবা বিদেশে ছড়িয়ে থাকে। জনার্দনবাবু নিজের মৃত্যুর কথা আশঙ্কা করে সবাইকে আসতে বললেও কেউই তাঁর কাছে আসে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই আশঙ্কার আড়ালে ছিল প্রিয়জনদেরকে দেখার কিংবা কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এ গল্পে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা কেউই পূরণ করে না। সকলেই ব্যস্ত থাকে নিজের নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে—

> কণিকা বলল, 'মা, তুমি চিন্তা কোরো না।'... 'বাবার বয়স হয়েছে। বয়স হলে মানুষের মনে এ-রকম একটা ডেথ ফিয়ার আসে।'... 'তুমি এক কাজ কর বাবাকে একটা সিটি স্ক্যান করাও। তারপর সব রিপোর্ট আমাকে মেল করে দাও।'
>
> শকুন্তলাদেবী একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'তুই একবার জামাইকে নিয়ে আসবি নাকি?'
>
> সুদূর বস্টন থেকে কণিকার বিস্মিত গলা ভেসে এল সল্টলেকে।
>
> 'কী বলছ মা! আমরা কেন যাব! বাবার তো কিছুই হয়নি! নার্ভ রিল্যাক্সের ওষুধ খেলে কাল পরশুর মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।' ...
>
> শকুন্তলাদেবী বুঝলেন, আমেরিকা থেকে ওদের আসতে বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বরং অতীশদের আসাটা অনেক সহজ হবে। জলন্ধর থেকে ঘন ঘন প্লেন। অতীশ সব শুনে চিন্তিত গলায় বলল, 'কণি কী বলল?'
>
> 'কণি বলল কিস্সু হয়নি। ... তবু তুই যদি একবার আসিস। বুড়ো মানুষটা দেখতে চাইছে...।'
>
> 'ইমপসিবল। এখন কলকাতা যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না মা। সিরিয়াস কিছু হলে আমি যেতাম। এই মুহূর্তে প্রায় এক কোটি টাকার অর্ডার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। জাহাজের জন্য নাট বল্টু সাপ্লাই। আমি পোর্টব্লেয়ারে যাচ্ছি কালই। তুমি যদি বোঝ নীতিকাকে পাঠাতে পারি। আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়, বাবাকে কাল পরশুর মধ্যে যদি এখানে ফ্লাই করিয়ে আনি। আমার ফার্ম হাউসে কটা

দিন থাকবে। পিয়োর ঘি দেওয়া চাপাটি আর নিজের খেতের ডাল খাবে। ফালতু চিন্তা মাথা থেকে পালাবে।...'

দীপঙ্করের মোবাইল বন্ধ। বাড়িতে সৃজনী ফোন ধরল।... ঘটনা শুনে খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। শকুন্তলাদেবী বিরক্ত গলায় বললেন, 'হাসছিস কেন?' ... 'অ্যাই চুপ কর। হাসবি না। কাল পরশু তিনজনে মিলে চলে আয় তো। নাতনিটাকে অনেকদিন দেখি না।'

সৃজনী আঁতকে উঠল।

'যাব? খেপেছ নাকি মা? এখন যাব কী করে? তোমার ছেলে নতুন নাটক ধরেছে। ... তা ছাড়া টুংরির পরীক্ষা, আমার গানের ক্লাস আছে না?'[৫৬]

'ঝড়ের রাতে' গল্পটিতে উঠে এসেছে মাল্টিন্যাশনাল ব্যাঙ্কে সিস্টেম প্রোগ্রামার শিমুল আর আপাতত বেকার অর্কের প্রেম এবং বিবাহের আখ্যান। এ গল্পে অর্ককে পছন্দ ছিল না শিমুলের পরিবারের। সেইকারণে তাঁরা শিমুলের জন্য এক এন আর আই পাত্রের সন্ধান নিয়ে আসেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরিবারের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করে শিমুল—

মেয়ের বাপ-মায়ের অবশ্য দোষ নেই। হঠাৎই হাতের কাছে লোভনীয় এক পাত্র এসে হাজির হওয়ায় তারা শিমুলের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ছেলের বয়স একটু বেশির দিকে। সেটা কোনো ব্যাপার নয়। ব্যাপার হল, পাত্র প্রবাসী। আমেরিকার ফেমিংহাম শহরে নিজের ব্যবসা। ফেমিংহাম বস্টন থেকে মাত্র এক ঘণ্টার ড্রাইভ। বিরাট গ্রসারি শপ। শুনতে মুদির দোকান মনে হলেও পাত্রবাবুর পয়সাকড়ি অগাধ। তেল, ডাল, নুন থেকে শুরু করে আখের গুড় পর্যন্ত কী না-পাওয়া যায় সেখানে। আসলে ওই ছেলের রয়েছে ফেলে যাওয়া বাংলার প্রতি হাবুডুবু ধরনের প্রেম ! পা বিদেশে মন বাংলায়। নিজের জন্য পাত্রী খুঁজতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল- 'বাঙালি, ঘরোয়া, কমবয়সি, গৃহকর্মে নিপুণা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। রবীন্দ্রসংগীত জানা বাধ্যতামূলক। শাক, ওল, মানকচু, থোড় ইত্যাদি রন্ধন প্রণালীর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তৎসহ বড়ি তৈরিতে পারদর্শিতা থাকলে ভালো হয়।' প্রাচুর্যের কোনো অভাব নেই। পাত্রের নিজের তিনটি গাড়ি এবং একটি ভ্যান রয়েছে। বাড়ির ছাদে সুইমিং পুল। তাতে হট ওয়াটারের ব্যবস্থা। বাগানে টেনিস কোর্ট। ...

শিমুলের মা বললেন, 'ঘর সংসারেই মেয়ের আসল পরিচয়। এখানে তো আর তোকে ঝিয়ের মতো খাটতে হবে না, দু-একটা রান্নাবান্না আর ছেলেপুলে মানুষেই হ্যাপা শেষ। চোখ বুজে রাজি হয়ে যা শিমুল। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।'

'না পাওয়া গেলেই মঙ্গল।'

'অমন করে বলছিস কেন? আমেরিকায় গিয়ে ঘর সংসার পাতবি, এ কী চাট্টিখানি কথা হল? ছেলের নিজের বাড়ি। অতগুলো গাড়ি। ছাদে সুইমিং পুল। গিয়ে টেনিস খেলা শিখে নিবি।'[৫৭]

উদ্ধৃতি থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ গল্পে পরিযাণ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, যে কারণে শিক্ষিতা, কর্মরতা কন্যার নিজস্ব পছন্দের দেশীয় সঙ্গীর বদলে বাবা-মা আমেরিকাপ্রবাসী অধিক বয়সের এক মুদির দোকানদারের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির করে ফেলেন খুব সহজেই—শুধুমাত্র তার অর্থ আছে বলেই। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বিশ্বায়নের নতুন অর্থনীতিতে শিক্ষা, মেধা কিংবা বিবাহের উপযোগী বয়সকে ছাপিয়ে শুধুমাত্র অর্থই পাত্র নির্বাচনের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। আর তার অন্তরালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় পরিযাণ। আর এইসব যুক্তিতেই বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে বহু ভারতীয় বিবাহযোগ্যা নারীকে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা কর্মনিযুক্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বে পরিযায়ী কোনো 'সফল' পুরুষের জীবনসঙ্গিনী হতে বাধ্য করে তাদের পরিবার কিংবা সামাজিক প্রবণতা। তাতে করে একদিকে যেমন সেই নারীকে দেশের মাটি হারাতে হয়, অন্যদিকে সাংঘাতিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে নারীস্বাধীনতার ধারণাটি। নতুন যুগের অর্থনীতি এভাবেই নারীকে আর একবার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করায় প্রয়াসী হয়। লেখক প্রচেত গুপ্ত তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে সেই দিকগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

৫.৯॥ **কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়**

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে ভারতে তথা সারা বিশ্বে পরিযাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্বের তুলনায় দ্রুত হারে। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষের পরিযাণের ধরন ছিল পৃথক পৃথক। নিম্নবিত্ত মানুষের পরিযাণের পরিধি নির্মিত হত শ্রমের প্রকৃতি এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে। মধ্যবিত্ত এবং মূলত উচ্চবিত্ত স্তরের পরিযাণের সামর্থ্য তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। প্রধানত শিক্ষাগ্রহণ, উপার্জন, চিকিৎসা কিংবা ভ্রমণের কারণে পরবর্তী দুই স্তরের মানুষের পরিযাণ পরিচালিত হত।

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে পরিযাণকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা মূলত উচ্চ মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত মানুষের পরিযাণ। যে সময়টিকে তিনি তুলে ধরেছেন, তা অবশ্যই বিশ্বায়ন পরবর্তী, যে সময়ে কৃতিত্ব ও মেধার সঙ্গে পরিযাণকে এক করে দেখা সামাজিক সংখ্যাগুরু মানুষের ধরনে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ মেধার সঙ্গে বিদেশগমন ও উপার্জনের সরাসরি যোগ এর মাধ্যমে কল্পনা করা হত। বিপরীতপক্ষে, দেশের বাজারে উপার্জনের জন্য পড়ে থাকা ব্যক্তিরা লেখাপড়া করলেও তাদেরকে মেধাবী না ভাবার একরকম সামাজিক অভ্যাস চালু হয়ে যায়। লেখক তাঁর 'স্কোর' (*আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়,* ১১ই জুলাই ২০১০) গল্পে তুলে ধরেছেন এই ধরনের অনুপুঙ্খ। এ গল্পে পীযূষ ও মৌপিয়ার দেখা হয়ে যায় ঘটনাচক্রে। তারা দুজনেই কলেজে সহপাঠী ছিল। বর্তমানে দুজনেই জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত। মৌপিয়া একটি বেসরকারি স্কুলে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের পদে সামান্য বেতনে চাকরি করলেও পীযূষ তখনও চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে পারিবারিক বিবাহ প্রচেষ্টায় মৌপিয়াও বহুবার পাত্রপক্ষের সামনে

বসে প্রত্যাখ্যাত। ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যাওয়ায় দু'জনের কথাপ্রসঙ্গে উঠে আসে সহপাঠীদের কথা, যারা কেউ পড়াশোনাসূত্রে, কেউ বা পরিণয়সূত্রে পরিযায়ী হয়ে বিদেশে স্থিত—

> মৌপিয়ার ছোট্ট গোষ্ঠীর বন্ধুদের একেকজনের নাম আমার মনে পড়তে থাকল—পুবালি কেমন আছে রে? তোর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট আছে?
>
> আমার দিকে না তাকিয়ে মৌপিয়া দায়সারা উত্তর দিল—বিয়ের পর আমেরিকায় চলে গিয়েছে। আর কোনও যোগাযোগ নেই।
>
> আজকাল সবাই আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। অর্ণব, কল্যাণ দু'জনেই আমেরিকায়। আঁখিও শুনেছি কী একটা রিসার্চ করতে ফিলাডেলফিয়ায় গিয়েছে। মিতালির কী খবর রে?...
>
> সেদিন নিউ মার্কেটে সৌমিত্র স্যারের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকের কী অসম্ভব মেমরি। আমি প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছিস পীযূষ? কী করছিস আজকাল?
>
> নিশ্চয়ই খুব খুশি হলেন, কৃতী ছাত্রকে দেখে...
>
> নিতান্ত আলগোছা মন্তব্য। কিন্তু মন্তব্যটার একটা শব্দে মারাত্মক বিষাক্ত একটা হুল আছে। হুলটা আমার দুর্বলতম জায়গায় বিঁধে গেল। আমার হাঁটার গতিটা শ্লথ হল। বিষটা আমার শিরা-উপশিরায় ছড়াচ্ছে। ভেতরে যেন একটা ঝড়ের পূর্বাভাস শুনতে পেলাম।
>
> দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলাম, কৃতী আর আমি? ভাল বলেছিস!
>
> কেন? আমেরিকায় না গেলে বুঝি কৃতী হওয়া যায় না?[৫৮]

গল্পের উদ্ধৃত অংশে লেখক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় 'কৃতী'-র যে সমাজ ও নতুন বাজার অর্থনীতিনির্ভর সংজ্ঞাটি তুলে ধরেন, সেই প্রথম বিশ্বগামী পরিযায়ী সাফল্যের বিপরীতে তিনি তুলে ধরেন দেশের অর্থনীতি কিংবা কর্মসংস্থানের বিপরীত চিত্রটি—

> মনের মধ্যে ঝড়টা ততক্ষণে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে। এই ঝড়ের ঝাপটাটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেও ঝড়ের উথাল-পাথালটা সামলাতে না পেরে বলতে থাকলাম, তুই আমাকে দেখে যা ভাবছিস, তা নই। ভাবছিস তো গলায় টাই বেঁধে মস্ত চাকরি করি। আসলে আমি

> একটা ফার্স্ট ক্লাস বেকার। এই সং সেজে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম। লাস্ট তিন বছর আমার এই একটাই কাজ, ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়ানো আর রিজেক্ট হওয়া। গোটা পঞ্চাশেক অ্যাপ্লাই করে ছ'টা ইন্টারভিউ পেয়ে ছ'টাতেই রিজেক্ট। আজকে একটা ভুজিয়াওয়ালার কোম্পানির সেলস একজিকিউটিভের ইন্টারভিউতে, এবার কারা ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে জিজ্ঞেস করল। বলতে না পারতেই মুখের ওপর বলেই দিল...যাকগে।[৫৭]

বিশ্বায়ন প্রকৃতপক্ষে দেশের চাকরির বাজারের প্রকৃতিকে পূর্বের তুলনায় বদল ঘটিয়েছিল। বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রভূত সম্প্রসারণ ঘটলেও কর্মনিযুক্তির হার ছিল হতাশাজনক। জনসংখ্যার নিরিখে তা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। তাই বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক আদবকায়দা কিংবা কেতাদুরস্ত পোশাকের আড়ালে ঢেকে রাখা যায় নি বেকারত্বের দীর্ঘশ্বাসকে। এ গল্পে সেই দিকটিকে অভ্রান্তভাবে তুলে ধরেছেন লেখক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রথম বিশ্বের দিকে ধাবমান সুখী পরিযাণের বিপরীতে তৃতীয় বিশ্বের এ এক হতাশাময় চিত্র।

বিশ্বায়নের ফলে ভারতের এক বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রথম বিশ্ব—মূলত আমেরিকার অধিবাসী হয়েছিল। দেশের সঙ্গে তাদের নতুন করে সম্পর্কসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির কারণে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সোশ্যাল মিডিয়া। অর্কুট কিংবা ফেসবুক-এর মাধ্যমে যেমন এই মানুষদেরকে খুঁজে পেয়েছিল দেশের স্বজন-বান্ধবরা, তেমনি তাদের পোস্ট করা বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বে পরিযায়ী অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের স্বজনরা নিজেদের জীবনযাত্রা কিংবা যাপনের এক তুলনার অবকাশ সৃষ্টি হয়। এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের মনে কখনো তৈরি হয়েছিল একপ্রকার হতাশা, কখনো আবার দেশে থাকতে পারার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল আত্মতুষ্টি। লেখক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'স্ক্র্যাপ' (*দেশ*, ২ নভেম্বর ২০১১) গল্পটিতে তুলে ধরেছেন এইধরনেরই কিছু অনুপুঙ্খ। গল্পটির নামকরণেই বোঝা

যায় এ গল্পে সোশ্যাল মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। গল্পে পুত্র টোটন মা বর্ণালিকে কম্পিউটার খুলে শিখিয়ে দেয় সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার। এর মাধ্যমেই সে খুঁজে পায় স্কুলজীবনের সহপাঠী অবন্তীকে। অবন্তী থাকে ডালাসে। তার ওয়াল থেকে উঠে আসে তার সুখী জীবনের টুকরো ছবি—

> মাউস নাড়িয়ে 'অ্যালবাম' শব্দটার উপর ক্লিক করল টোটন। সব সমেত একশো সাঁইত্রিশটা ছবি আর ভিডিও ক্লিপিং আপলোড করে রেখেছে অবন্তী। সবক'টা ছবির নীচে ছোট ছোট বর্ণনা। সেইসব বর্ণনা জুড়ে জুড়ে বর্ণালীর সামনে একটাই ছবি ফুটে উঠল, অবন্তী অধিকারীর বর্তমান জীবন, যে এখন অবন্তী ব্লেমটন হয়ে গিয়েছে।
>
> অবন্তী ডালাসে সাত বেডরুমের বাড়িটা দু'বছর হল কিনেছে। তার কারণ আগের পাঁচ বেডরুমের বাড়িটা ছোট হচ্ছিল। এই বড় বাড়িটায় অবশ্য দুটো গ্রে হাউন্ড এবং একটা আদুরে বিড়ালকে নিয়ে ওরা কত্তা-গিন্নি দু'জন থাকে। সপ্তাহান্তে চলে যায় আড়াইশো মাইল দূরে ছবির মতো এক খামার বাড়িতে। ছেলে নিউ ইয়র্কে ল পড়ে। মেয়ে ফ্লোরিডাতে বায়োটেকনোলজি। অবন্তীর বিবাহবার্ষিকীর শেষ পার্টিটা হয়েছিল যে হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে, ডালাসে এলে জেনিফার লোপেজ সেই হোটেলেই থাকেন।[৬০]

এ ছবি প্রথম বিশ্বে সফল পরিযায়ী মানুষের সাফল্যের উজ্জ্বল ছবিগুলিকে তুলে ধরে। মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তীকালে যা আরও বেশি করে মানুষের মনে জাগিয়েছিল আমেরিকার স্বপ্নকে। সেইসঙ্গে এই গল্প তুলে ধরে প্রথম বিশ্বে বসবাসকারী প্রবাসী মানুষদের কেনাকাটার অবাধ ক্ষমতার দিকটিকেও। তবু কখনো কখনো তার মধ্যে দিয়েও শোনা যায় প্রবাসী সুখী মানুষজনের দেশের প্রতি স্মৃতিমেদুর স্বর। ক্রেতা সংস্কৃতি যে স্বরকে কোথাও হলেও একেবারে চাপা দিয়ে ফেলতে পারে নি—

> ...আমি এখন হিথরো এয়ারপোর্টে। দু'দিনের জন্য ইনসব্রুকে ব্লেমটন ফাউন্ডেশনের একটা কনফারেন্সে যাচ্ছি। কানেক্টিং ফ্লাইটটা ধরার জন্য দু'ঘন্টা বসে থাকতে হবে। কী বিরক্তিকর বল তো? কয়েকবছর আগেও এরকম এয়ারপোর্টে দু'ঘণ্টা সময় পেলে ডিউটি ফ্রি শপগুলোয় ঘুরে বেড়াতাম। হামলে পড়ে হাবিজাবি জিনিস কিনতাম। এখন আর কিছু ভাল লাগে না রে। বয়স হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। বরং শান্ত হয়ে বসে আই প্যাডে তোকে স্ক্র্যাপটা লিখতে বেশ লাগছে। জানিস, তোর স্ক্র্যাপটা পড়ার পর আমারও কী ভীষণ যে ইচ্ছে করছে, সেই স্কুলের বেঞ্চটায় ফিরে যেতে। দু'বন্ধুতে মিলে পা ছড়িয়ে বসে বিটনুন দিয়ে টোপাকুল খেতে। সত্যি, স্কুল যাওয়ার রাস্তায় ওই কুলগাছটা এখনও আছে কি না কে জানে! পারলে একদিন গিয়ে দেখে আয় না। কুলগাছ, আমাদের স্কুলটা...[৬১]

বস্তুতপক্ষে স্মৃতিকাতরতা এই প্রবাসী মানুষদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ক্রিয়াশীল হতে ব্যর্থ হয় অনেকাংশেই। এ গল্পের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অবন্তী দেশে ফেরেনি, তার হয়ে বর্ণালী একদিন যাত্রা করে তাদের কিশোরীবেলার স্কুল অভিমুখে। অবন্তীকে বিশ্বায়ন অনেক কিছু ক্রয় করার স্বাধীনতা দিলেও স্মৃতির রেখা ধরে ফেরার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে তার বিনিময়ে।

'রূপকথা' (*দেশ*, গল্পসংখ্যা, অক্টোবর ২০১১) গল্পেও লেখক তুলে ধরেছেন বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণের একাধিক মাত্রাকে। এ গল্পে অনিমেষ আর সংযুক্তার পুত্র ঐশিক বিদেশে যাবে। তার আগের রাত্রির উৎকণ্ঠার কথা তুলে ধরেন লেখক। ঐশিক আমেরিকায় গবেষণা করে। কলকাতায় তার জন্য পরিবারের তরফে পাত্রী দেখা হয়। কিন্তু বিবাহের জন্য ঐশিক ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরলেও পাত্রী স্বয়ং বিয়ে ভেঙে দেয়। এর কারণ হিসাবে উঠে আসে ঐশিকের আমেরিকান ভিসার ধরন, যা তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে আমেরিকায় কাজের অনুমতি দেবে না। সুতরাং এ গল্পে দেখা যায় শুধুমাত্র প্রথম বিশ্বে পরিযাণের অধিকারই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্পর্কনির্মাণের একমাত্র চাবিকাঠি হয়ে ওঠে না, কারণ ততদিনে হিসাব আরও জটিল হয়ে পড়েছে—

অথচ বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হল না। ঐশিক কলকাতায় এসে পৌঁছোনোর তিন দিনের মধ্যেই এক পাঁচতারা হোটেলে চার চক্ষু দর্শনের পরই সিদ্ধান্তটা হল। এবং সেটা একতরফা। এরকম যে হতে পারে কল্পনাও করেনি ঐশিক। মকটেলে চুমুক দিয়ে নির্বিকার গলায় রোশনি বলেছিল, অফ লেট আমার মনে হচ্ছে আমরা ঠিক পারফেক্ট ম্যাচ নই। আমাদের ম্যারেড লাইফটা সুখের হবে না। তা ছাড়া তোমার এইচওয়ান-বি ভিসা। তোমার বউ হিসেবে আমি বোধহয় এইচওয়ান-ডি ভিসা পাব। কোনও জব পারমিট থাকবে না...

হতবাক হয়ে গিয়েছিল ঐশিক। ঝিমঝিমে মাথায় বলেছিল, মানে...এতদূর কথা এগিয়ে গিয়েছে! ফ্যামিলি লেভেলে কথা হয়ে গিয়েছে। সব প্রিপারেশন হয়ে গিয়েছে...তোমার সঙ্গে চ্যাটে এতবার কথা বলেছি...

বললাম না, অফ লেট আমার মনে হচ্ছিল। বিয়েটা একটা সারাজীবনের ব্যাপার![৬২]

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে প্রথম বিশ্বে পরিযাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে বদলে গিয়েছিল তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা। বিবাহের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল দ্রুত গতিতে—

প্রস্তাবটা শুনে ঐশিক একটু অবাক হল। মেয়েটা কেমন জানা নেই। হয়তো আর একজন রোশনি। বিয়েটাই বিদেশে যাওয়ার একটা ভিসা। বাবার দুশ্চিন্তার ভারী পর্দার আড়ালে বিদেশ যাওয়ার ঘাঁতঘোঁত সব জানে।[৬৩]

মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তী ভারত থেকে দ্রুত বিপুল সংখ্যক মেধাবী যুবক যুবতী প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ দিয়েছে। তাদের পরিবারগুলি তাদের সূত্রে পরিচিত হয়েছে প্রথম বিশ্বের বৈভবের সঙ্গে। সেই বিপুল সম্পদ আর ঔজ্জ্বল্য তাঁদের মনে এনে দিয়েছে নিজের দেশ সম্পর্কে একধরনের নেতিবাচকতা কিংবা তাচ্ছিল্য। সঠিক অর্থে বললে তা প্রকৃতপক্ষে একধরনের ঘৃণা—

ঐশিক নমস্কার করল। দীপঙ্করবাবু প্রতিনমস্কার না করে বলতে থাকলেন, আমার ছেলে পাঁচ বছর আমেরিকায় আছে। দু'বার ঘুরে এসেছি। গ্রে-হাউন্ডে আমেরিকাটা চষে ফেলেছি। নায়াগ্রা থেকে ডিজনিল্যান্ড। পরেরবার লাস ভেগাস। লাস ভেগাসে অবশ্য ফ্লাইটে গিয়েছিলাম। সেন বাবুকে তাই বলছিলাম চার চারটে টাইম জোন মশাই, অথচ কী ডিসিপ্লিন! একটা দেশ কতটা উন্নত বিন লাদেন অপারেশনের সময় বুঝিয়ে দিল মশাই। বারাক ওবামাকে লাইভ অপারেশন দেখিয়ে দিল। আর আমরা, ছ্যাঃ! এই এয়ারপোর্টটার ছিরি দেখেছেন...সেনবাবুকে তাই বলছিলাম আপনি তো দেশটাকে দেখেননি...আর আমাদের দেশ? এই তো দেখছেন এয়ারপোর্টের ছিরি![৬৪]

লেখক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে একাধিক চরিত্রের মাধ্যমে এভাবেই তুলে ধরেছেন বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণের বিভিন্ন মাত্রাকে। যা প্রকৃতপক্ষে তুলে ধরেছে বিশ্বায়িত ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনোজগতটিকে।

৫.১০॥ **স্মরণজিৎ চক্রবর্তী**

বাংলা ছোটোগল্পের বর্তমান সময়ে এক জনপ্রিয় লেখক স্মরণজিৎ চক্রবর্তী (জন্ম-১৯৭৬) । তাঁর লেখা ছোটোগল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক জীবন, মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত জীবন, প্রযুক্তিনির্ভর তরুণপ্রজন্ম, প্রেম ইত্যাদি বিষয়। স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর বেশ কিছু ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছিল *আনন্দবাজার পত্রিকা*-গোষ্ঠীর *উনিশ-কুড়ি* পত্রিকায়। মূলত সেই ছোটোগল্পগুলিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ—*উনিশ-কুড়ির প্রেম* (নভেম্বর ২০০৮, আনন্দ) এবং *প্রেমের উনিশ-কুড়ি* (নভেম্বর ২০১৬, আনন্দ) ।

উনিশ-কুড়ির প্রেম গ্রন্থটিতে একদিকে যেমন উঠে এসেছে বিশ্বায়ন-প্রভাবিত মূলত নাগরিক জীবন কিংবা তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, অন্যদিকে গ্রন্থটির মূল বিষয় হয়ে

উঠেছে প্রেম। তারই অন্তরালে তরুণ প্রজন্মের জীবনসংগ্রামের একাধিক প্রচেষ্টা ধরা পড়েছে গল্পগুলিতে। এই জীবনসংগ্রামের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে উঠে এসেছে শিক্ষাপ্রচেষ্টা। আবার কখনো কখনো জীবিকার তাগিদে পরিযাণও হয়ে উঠেছে গল্পের অন্যতম বিষয়। বেশ কয়েকটি গল্পে খুঁজে নেওয়া যায় বিশ্বায়ন-পরবর্তী পরিযাণের অনুপুঙ্খ, যা মূলত শিক্ষা এবং জীবিকা উপার্জনের তাগিদে সংঘটিত হয়েছিল। এইধরনের একটি ছোটোগল্প হল 'ভানুসিংহের বিপদাবলী'। এ গল্পে দক্ষিণ কলকাতার একটি স্কুলের ক্লাস ইলেভেনের ইলিনার প্রেমে পড়ে সহপাঠী ভানুসিংহ রায়চৌধুরী ওরফে ভাইকিং। কিন্তু কিছুতেই তার মন টলাতে পারে না। অন্যদিকে এ গল্পে উঠে আসে ইলিনার দাদার বন্ধু সৌম্য বাসুর কথা, সে আই আই টিতে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ফলে গল্পে তৈরি হয় এক ত্রিকোণ। সেই সূত্রে এ গল্পে উঠে আসে পরিযাণের সম্ভাব্য বিবরণ—

> "কাকা, তুমি খরচের খাতায়। ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে টক্কর, পারবে? তার চেয়ে ওয়াক-ওভার দিয়ে দে, নয়তো বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের মতো অবস্থা হবে, বুঝলি। সামনেই ফেস্ট, তুই বরং সেদিকে মন দে।"
>
> ...অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা রূপোলী এরোপ্লেন আকাশের গায়ে সাদা টুথপেস্টের মতো ধোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছে। ভাইকিং সেদিকে তাকিয়ে বলল, "আমিও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব।"
>
> আমি বললাম, "ততদিনে সৌম্য স্টেটসে।"
>
> "আমিও স্টেটসে যাব", ভাইকিং গম্ভীর হয়ে গেছে।
>
> আমি আবার বললাম, "ততদিনে হয়তো সৌম্য কোনও মাল্টিন্যাশনালে ষাট-সত্তর হাজার টাকার চাকরি করছে।"
>
> "আমি আশি-নব্বই হাজার টাকার চাকরি করব", ভাইকিং একেবারে মরিয়া।[৬৫]

এ গল্পের উদ্ধৃতি থেকে উঠে আসে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিংবা সাফল্যের গন্তব্যের কথা, যার আড়ালে উপস্থিত থাকে পরিযাণ। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বে পরিযাণের ছাড়পত্রই তাকে ইপ্সিতলাভে সাহায্য করবে, জিততে সাহায্য করবে সমস্ত প্রতিযোগিতায়।

'র‍্যাগিংয়ের দিনগুলোয় প্রেম' গল্পে উঠে আসে আর একধরনের পরিযাণের কথা। এ গল্পে উঠে আসে একদল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার বিবরণ, যারা শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাড়ি দেয় ভিনরাজ্যে। সেখানে তারা শিকার হয় র‍্যাগিংয়ের। তুলনায় পুরানো ছাত্ররা তাদের উপর নামিয়ে আনে অমানুষিক অত্যাচার। নিরীহ ছাত্রদের এই নিপীড়িত হওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে ভিনরাজ্যে তাদের পড়তে যাওয়ার ঘটনা কিছুপরিমাণ দায়ী, কারণ বাড়ির কাছে পড়ার সুযোগ পেলে এ ঘটনা হয়তো ততখানি নাও ঘটতে পারত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ কম থাকায় বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে দক্ষিণভারতের বিভিন্ন বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এরাজ্যসহ অন্যান্য রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা দলে দলে যেতে শুরু করে। যে কারণে বাড়ি থেকে দূরে থাকা এই ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে সহজেই নেমে আসত অত্যাচার। সেই বিবরণ উঠে এসেছে আলোচ্য গল্পটিতে—

> আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। বাঙ্গালোর শহর থেকে দূরে ছোট্ট পাহাড়ঘেরা এক জায়গায় আমাদের কলেজ। আমাদের ক্যাম্পাসে বয়েজ হস্টেল, গার্লস হস্টেল, সুইমিং পুল, জিমনাশিয়াম, লাইব্রেরি, সবই আছে। দেখলেই মনে হয় ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া কোনও ছবি। এই ছবির মধ্যে আমরা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াই তটস্থ হয়ে। কারণ, ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট মানেই আসতে-যেতে সিনিয়রদের চড়চাপড়, গালিগালাজ খাওয়া। ভয় ধরানো র‍্যাগিং।[৬৬]

পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন খবর থেকে জানা যায় যে, ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরেও বিভিন্নধরনের অত্যাচার নেমে আসে বিভিন্ন রাজ্যে। পরিযাণের এ এক ঋণাত্মক দিক।

'আমাদের পাড়ার স্পাইডারম্যান' গল্পে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে জিমূত কোঙার ওরফে জিকো ওরফে স্পাইডারম্যান প্রেমে পড়ে একান্নবর্তী উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে হৈমন্তী ওরফে হই-এর সঙ্গে। ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্নতার মধ্যে দিয়ে এ গল্পের শেষে স্পাইডারম্যানের একতরফা প্রেম পূর্ণতা পায় না অর্থনৈতিক শ্রেণিগত তফাতের কারণে। অন্যদিকে হৈমন্তী ওরফে হই-এর বিয়ে ঠিক হয় কানাডাবাসী এক এনআরআই পাত্রের সঙ্গে। এ গল্পেও প্রথম বিশ্বে পরিযাণের অধিকারপ্রাপ্তি নির্ণায়ক হয়ে ওঠে সম্পর্কনির্মাণের ক্ষেত্রে—

> "ও তুই জানিস না, না? আসলে হই-রা তো বহুত কনজারভেটিভ, তার মধ্যে ওর নাকি আবার একটা খ্রিস্টান ছেলের সঙ্গে ভাব ছিল। এমনিতেই হই-এর জন্য পাত্র দেখা হচ্ছিল, কিন্তু এই অ্যাফেয়ারের কথা শুনে তো ওদের বাড়িতে ব্যাপক ক্যাচাল। মাইরি এমন চিল্লামেল্লি হয়েছিল না যে আমরা রকে বসেও সব শুনেছিলাম। এখন তো হই প্রায় বন্দি। ওরাও তাড়াহুড়ো করে কানাডা থেকে এক এন আর আই পাত্রর সঙ্গে হই-এর বিয়ে ঠিক করেছে। আমাদের তো সপরিবারে নেমন্তন্ন করেছে। তোদের করেনি?"[৬৭]

বিশ্বায়নের ফলে এভাবেই সারা ভারতে এন.আর.আই পাত্রদের কদর বেড়ে গিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে। অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তি-মননকে অগ্রাহ্য করে, বিশেষত প্রেমের সম্পর্ককে অস্বীকার করে এন.আর.আই পাত্রদের সঙ্গে কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার অমানবিক ঘটনা ক্রমবর্ধমানতা লাভ করেছিল। অন্যদিকে এইধরনের পাত্রদেরও ছিল একধরনের সংকট। তারা কর্মোপলক্ষ্যে বিদেশে থাকতে বাধ্য হলেও সাধারণত নিজ জাতির কিংবা দেশের নারীদেরকে ছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারত না। এই কারণেও এই ধরনের পরিযাণের কারণে একধরনের সংকটের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। স্মরণজিৎ চক্রবর্তী তাঁর গল্পের মাধ্যমে সেই দিকটিকে তুলে ধরেছেন।

৫.১১॥

"দিবসে মজুরী করে রজনীতে গিয়া ঘরে

নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।

নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে

তার বড় কেবা আছে দুখী।।"[৬৮]

সুখী কে, এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠির যক্ষকে যে উত্তর দিয়েছিলেন সেই একই কথা একটু আলাদাভাবে ভবানন্দ মজুন্দারের চাকর দাসুর মুখ দিয়ে বলালেন ভারতচন্দ্র। যুধিষ্ঠিরের উত্তরে নারীর প্রসঙ্গটি না থাকলেও দিনের শেষে অঋণী ব্যক্তিটির চারটি শাকভাত যিনি এগিয়ে দেন, তিনি একজন নারী হওয়াই সম্ভব। মোটের উপর নিজের এলাকায় একটি ছায়াময় গৃহকোণ আর একটি নারীর সাহচর্য ভারতীয় মননে সুখী ব্যক্তির যে সংজ্ঞা নিরূপণ করে রেখেছিল, বিশ্বায়ন তাকে প্রায় সম্পূর্ণত বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র পৃথিবী আজ পরিণত হয়েছে গ্লোবাল ভিলেজে। পুঁজির প্রসার মানুষের পরিযাণকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতচন্দ্রের দাসু বাসু আজও অধিক উপার্জনের তাগিদে দেশান্তরী। যদিও বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মূল্যগত তফাত থাকার কারণে উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল—এই তিনরকম দেশের মানুষের পরিযাণের সামর্থ্য এক নয়। তবে লগ্নিপুঁজির প্রবাহ আন্তর্জাতিক এবং অন্তর্দেশীয়—দুই ধরনের পরিযাণকে যে বৃদ্ধি করেছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তা এই ব্যাপারটিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। প্রান্তিক মানুষের একাংশের হাতেও আজ স্মার্টফোন। এতে করে তার কাজের সম্ভাবনা ও উপার্জন দুই-ই বেড়ে গিয়েছে।

বাংলা ছোটোগল্পে বিশ্বায়ন-পরবর্তী পরিযাণ যেভাবে উঠে এসেছে, তার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক স্তরে এই পরিযাণ ঘটলেও, শ্রেণিভেদে তার প্রকৃতি ছিল

আলাদা। নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ পরিযাণকে অবলম্বন করেছিল মূলত শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের তাগিদে। সেই নিরিখে বলা যায়, এই শ্রেণির পরিযাণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মূলত দেশের অভ্যন্তরে বা প্রাদেশিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে তা কিছু পরিমাণে দেশের বাইরেও পরিচালিত হয়। সাধারণত শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত এলাকা অথবা রাজ্যসমূহ থেকে অধিক উপার্জনের তাগিদে শিল্পোন্নত এলাকা বা রাজ্যসমূহে শ্রমিকদের পরিযাণ পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে বিশ্বায়নের পরে শিল্প অর্থনীতির অগ্রসরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, কৃষিক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি কিংবা উৎপাদন হ্রাসের কারণে বিপুল পরিমাণে কৃষিশ্রমিক দ্রুত নানাবিধ শিল্পে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে যোগ দেওয়ার তাগিদে পরিযাণকে অবলম্বন করে। শিল্পোন্নত রাজ্যগুলিতে গিয়ে দৈনিক নির্ধারিত সময়ের বাইরেও কাজ করে তারা নিজ রাজ্যের তুলনায় অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হয়। বিপরীতপক্ষে তাদের ফেলে আসা পরিবার কিংবা সন্তানাদির সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাদের পরিচর্যা কিংবা শিক্ষাপ্রদানের ব্যাপারটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ পরবর্তী প্রজন্মগুলিকেও সাধারণত কায়িক শ্রমের পথ বেছে নিতে হয় অবধারিতভাবেই। সেই বাস্তবতাতেই বাংলা ছোটোগল্পে উঠে আসা কোনো নিম্নবিত্ত শ্রেণির সন্তান দক্ষিণভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করতে গেলেও পারতপক্ষে তাদের কাউকে দক্ষিণের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে যেতে দেখা যায় নি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যেও পরিযাণ লক্ষ করা গিয়েছিল। তবে তা চাকরি কিংবা শিক্ষাগ্রহণের সূত্রে। কিছু পরিমাণে চিকিৎসাগ্রহণের কারণেও বটে। পরবর্তী সময়ে বিশ্বায়নকালের উপযোগী শিক্ষাগ্রহণের সুবিধা তাদের সন্তানাদিকে দেশের বাইরে কর্মসূত্রে পরিযাণের সুযোগ দেয়। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শ্রেণি উত্তরণের

একরকম সুবিধা তৈরি হয়েছিল, তবে তারও শর্ত ছিল নিজভূমি থেকে অন্যত্রবাস---হয়তো বা অন্য মহাদেশে। ফলে তাদের ক্ষেত্রেও পূর্ব-প্রজন্ম থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি করতে হয়েছিল অবধারিতভাবেই। সেই প্রজন্মের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের স্নেহ-পরিচর্যার বা সান্নিধ্যের সূত্রটি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের কাছে বিশ্বায়নের পূর্বেও পরিযাণ অধরা ছিল না। বিশ্বায়নের ফলে সেই সুযোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে কারণে বিশ্বায়নব্যবস্থার সুফল সবচেয়ে বেশি লাভ করে পূর্বের তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। দেশের গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিদেশের মাটিতেও বিস্তৃত হয় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রকৃত অর্থে তারা হয়ে ওঠে বহুজাতিক। এই নিরিখে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, বিশ্বায়নের ফলাফল তিনটি পৃথক শ্রেণির কাছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছেছিল। বিশ্বায়ন পরবর্তী একাধিক ছোটোগল্পকারের গল্পের বিশ্লেষণ অন্তত আমাদেরকে সেই সত্যে উপনীত করে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, ‘স্বপ্নধারণ’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে’জ, জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা ২৪৫

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৫-২৪৬

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৬

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৮

৬. ‘আত্মজন আপনজন’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৬

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৭৮

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৯

৯. ‘টাওয়ার ডগায় মেঘ’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৯

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২০

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২১

১২. বাগচী, নন্দিতা, ‘লেখকের কথা’, *প্রথম পঁচিশ*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২১

১৩. লেখক-পরিচিতি (ব্লার্ব অংশ), পূর্বোক্ত

১৪. https://nandita-bagchi.weebly.com/ Accessed on 17.05.2022 at 12.20 AM

১৫. বাগচী, নন্দিতা, ‘কালাত্যয়’, *প্রথম পঁচিশ*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২১, পৃষ্ঠা ২২

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯-৩০

১৮. বাগচী, নন্দিতা, ‘স্মৃতিবাসর’, *প্রথম পঁচিশ*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২১, পৃষ্ঠা ৬৯

১৯. ‘চান্দ্রায়ণ’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬

২০. ‘আরোহণ’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৬

২১. ‘সুরভি-অণু’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৩

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৮-১৯৯

২৩. দাস, বিপুল, ‘ভর উঠেছে, আউল বাতাস’, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: অভিযান, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬

২৪. ‘রক্তচন্দন ও কালোমহিষ’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১

২৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, ‘আর্সেনিক ভূমি’, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, মার্চ ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

২৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, ‘ঝড়ের পাতা’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে’জ, এপ্রিল ২০১১, পৃষ্ঠা ১৯৫

২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০১

৩০. ‘জননী যন্ত্রণা’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৬

৩১. ‘ব্লু সি.ডি. নিয়ে একটি গল্প’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২০

৩২. মিত্র, অমর, ‘ভূমিকা’, *২১টি গল্প*, কলকাতা: সৃষ্টিসুখ, ডিসেম্বর ২০১৯

৩৩. মিত্র, অমর, ‘রেসিপি’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে’জ, জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা ৫৩

৩৪. ‘সার্কাস’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭২

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩

৩৬. ‘পতিগৃহে যাত্রা’, পূর্বোক্ত, ১০৯

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১১

৩৮. মিত্র, অমর, 'সপ্তডিঙা', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: করুণা, বইমেলা ২০১২, পৃষ্ঠা ১৬৩

৩৯. রায়, কিন্নর, 'লেখকের কথা', *দশটি গল্প*, কলকাতা: পরশপাথর, ১৪১৬, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত

৪০. রায়, কিন্নর, 'ফায়ারিং স্কোয়াডের পাঁচিলে প্রজাপতি', *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা, দে'জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৭

৪১. রায়, কিন্নর, 'শঙ্খবালা', *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে'জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ২৩৯

৪২. 'গুপ্তকথা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮১

৪৩. 'মরুমায়া', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭

৪৪. রায়, কিন্নর, 'বড়ির বরফ', *দশটি গল্প*, কলকাতা: পরশপাথর, ১৪১৬, পৃষ্ঠা ৫৭

৪৫. রায়, কিন্নর, 'জলদানো', *চন্দ্রাভিসার*, কলকাতা: করুণা, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৭-২৮

৪৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, 'নিরুদ্দিষ্ট', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা ২২

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯

৫০. 'পাড়ার মেয়ে', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯১

৫১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৪

৫২. 'বসুন্ধরা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫৩

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫৪

৫৪. গুপ্ত, প্রচেত, 'বৃষ্টি', *প্রচেত গুপ্তর গল্প*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, শ্রাবণ ১৪২৮, পৃষ্ঠা ৮৬

৫৫. 'বৃংহতি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬

৫৬. 'এক শনিবার', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২২-১২৩

৫৭. 'ঝড়ের রাতে', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৮-১৬৯

৫৮. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, 'স্কোর', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ৪১৫-৪১৬

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৬

৬০. 'স্ক্র্যাপ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮৪

৬১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮৭

৬২. 'রূপকথা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০১

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০৫

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০৮

৬৫. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, 'ভানুসিংহের বিপদাবলী', *উনিশ-কুড়ির প্রেম*, কলকাতা: আনন্দ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২২

৬৬. 'র‍্যাগিংয়ের দিনগুলোয় প্রেম', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮

৬৭. 'আমাদের পাড়ার স্পাইডারম্যান', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪

৬৮. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, 'দাসু-বাসুর খেদ', মানসিংহ অংশ, *অন্নদামঙ্গল, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, কলকাতা: বসুমতী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৪৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বায়ন, পরিবার ও ব্যক্তি সম্পর্কের বদল এবং বাংলা ছোটোগল্প

ভারতে ১৯৯১ পরবর্তী বিশ্বায়ন-ব্যবস্থার প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়েছিল পারিবারিক গঠনের ক্ষেত্রে। বৃহত্তরভাবে তা প্রভাব ফেলেছিল সামাজিক প্রেক্ষিতে। পরিবার কিংবা সমাজের নিরিখে তো বটেই, এছাড়াও এই বৃত্তের বাইরে থাকা মানুষের বৃত্তেও ব্যক্তি সম্পর্কের বদল ঘটিয়েছিল বিশ্বায়ন। উৎপাদন ব্যবস্থার বদল প্রভাবিত করেছিল মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন মাত্রাকে। নির্দিষ্ট এই সময়ে দেখা গিয়েছিল একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, নিউক্লিয়ার পরিবারের রমরমা এবং তারও কিছু পরে নিউক্লিয়ার পরিবারেরও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়া। দ্রুতগতির এই প্রতিযোগিতানির্ভর সময়ে মানবিক সম্পর্কসমূহে জলসিঞ্চন করে সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার পরিবর্তে মানুষ বেশি পরিমাণে মনোযোগী হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে। তারই ফলশ্রুতিতে বিশ্বায়ন-পর্বের পূর্বতন সমাজ প্রচলিত সম্পর্কসমূহের একের পর এক অপমৃত্যু ঘটতে থাকে বিশ্বায়ন-পর্বে। স্বামী-স্ত্রী আর একটি বাচ্চা নিয়ে পৃথক হয়ে যে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি তৈরি হয়েছিল, একটি পর্বে এসে দেখা যায় সেই ‘আধুনিক’ পরিবারভাবনাও পরিত্যক্ত হতে থাকে। আরও বেশি প্রতিযোগিতাপূর্ণ জীবনে পূর্বের তুলনায় অধিকতর সাফল্যের ‘গোল্ড রাশে’ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির একমাত্র সন্তানটি ততদিনে হয়তো বাবা-মা-কে ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে প্রথম বিশ্বের কোনও দেশে। অথবা দেশের অভ্যন্তরে উন্নত কোনও শহরে। এর ফলে একদিকে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ মা-বাবা, অন্যদিকে সন্তানটি হয়ে পড়েছে দূর প্রবাসে একাকী। এই সময়েও পরিবার কিংবা ব্যক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বদল এসেছিল। নতুন প্রজন্মের প্রতিযোগিতাপূর্ণ তীব্র গতির জীবনে পরিত্যক্ত হচ্ছিল ‘বিবাহ’ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ইতোপূর্বে প্রচলিত ধারণাটি। অনেক

বেশি পরিমাণে গড়ে উঠছিল লিভ-ইন সম্পর্কসমূহ। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই সন্তানগ্রহণে অনীহা দেখা দিচ্ছিল। কারণ সন্তানের দায়িত্ববহনে কেউ রাজি ছিল না। অপরপক্ষে উভয়েই কর্মরত—এমন দম্পতিদের মধ্যে তৈরি হচ্ছিল 'লং ডিস্ট্যান্স রিলেশনশিপ'। তা টিকিয়ে রাখাই এক পরীক্ষা হয়ে পড়ছিল উভয় তরফে। প্রযুক্তির সাহচর্যে এই দূরত্ব অপনোদনের প্রচেষ্টা প্রযুক্ত হলেও তা বিশেষ কার্যকরী যে হচ্ছিল এমন নয়। সেইকারণে বিশ্বায়নের প্রাথমিক পর্বে একান্নবর্তী পরিবারব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে সম্পর্কসমূহের মধ্যে যে পরিমাণ শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তা ভিন্ন রূপ ধারণ করে আরও বহুগুণ বেড়ে যায় বিশ্বায়নের পরবর্তী পর্বে।

৬.১॥

বিশ্বায়নের ফলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল। যৌথ পরিবার ভেঙে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির পরিমাণ বেড়ে চলেছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছিল। গবেষক Ellina Samantroy তাঁর একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

> The Indian society is drastically changing as a result of globalization. India traditionally has followed the joint-family system. Contemporary changes are taking place in the institution of family, and the nuclear-family system is increasingly the norm. So far, the concept of single parenthood has not caught on in the Indian culture. However, divorce rates are increasing. Urbanization, at times, has seen changes and this in turn has brought about a lot of changes in the Indian culture. Many marriages are breaking up for many reasons, such as

> modern lifestyles, professional ambitions and unrealistic expectations. Commitment for marriage is disappearing as a result of modernization in India now (*India Today*, 1 August 1998, under section called “Marriages” by Sheela Raval, *Till Whims Do Us Part*: 60-61). In cities, young people are starting to choose their own partners. Arranged marriages, however, are still there. The upper-class and middle-class people of India and the urban Indians have changed a lot in their cultural values as a result of the impact of information technology and media.[১]

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে পড়ার নানাবিধ কারণ ছিল। আধুনিক জীবনযাত্রা, পেশাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অবাস্তব প্রত্যাশা ইত্যাদি ছিল বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। বিবাহ টিকিয়ে রাখার দায়বদ্ধতাও হ্রাস পাচ্ছিল। অন্যদিকে তথ্য-প্রযুক্তি ও অন্যান্য মাধ্যমের প্রভাবে ভারতের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের পাশাপাশি নাগরিক ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়েছিল। ভোগবাদ সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করেছিল—

> Consumerism has permeated and changed the fabric of the contemporary Indian society. The study of families and changes they experience as a system although rich and complex can be very time consuming and expensive, and perhaps best obtained in one family at a time through clinical counters. However, the study of social changes is extensive and often supports the impact of changes in families. Fragmentation of the traditional family network is leading to an erosion of the available support within the immediate and extended family. Migration of younger generations from rural to urban areas and from one urban centre to another as well as transnational migration has resulted in the elderly being left to fend for

> themselves at a time when family support becomes more crucial. With more women joining the workforce system, care of the aged within families has declined. For those who live within extended families, the elderly have to live in harmony with the younger generation that has to face a highly competitive world of globalization. While the nuclear family system is increasingly becoming the norm, modern lifestyles, changing professional and personal expectations are impacting relationships of marriage and commitment. In cities, young people are exploring new relationships which are completely alien to Indian culture. Live-in relationships are increasing in cities and the youngsters are not giving importance to the institution of marriage.[২]

এইভাবে বিশ্বায়নের পণ্য-সংস্কৃতি তথা ভোগবাদ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তাকে পরিবর্তিত করেছিল। অন্যদিকে পরিবার থেকে নারীরা আরও বেশি করে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করার ফলে বয়স্ক সদস্যরা পরিচর্যাবিহীন হয়ে পড়েন। সবমিলিয়ে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে একটি তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সবাইকে যেতে হয়েছিল বা এখনো হয়ে চলেছে। এইরকম একটি ভোগবাদী সময়ে তরুণ প্রজন্ম সম্পর্কের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে পণ্যের প্রতি। তারা পেশাগত কারণে ব্যক্তিগত সম্পর্কসমূহকে অগ্রাহ্য করেছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক গবেষক Ellina Samantroy জানিয়েছেন—

> With heightened consumerism and the lure for a highly materialistic life, the techno-savvy youth value commodities more than relationships. The highly competitive information society makes them more ambitious in order to adapt to the rapid changes. Such a condition makes them ignore personal relationships at the cost of maintaining their professional ethics. While trying to adapt themselves

to the multicultural realities, the youth are somehow quite perplexed about constructing their own identity.[৩]

৬.২॥

বিশ্বায়ন নামক সর্বব্যাপী পরিবর্তনকারী শক্তিটি যেমন অর্থনীতিকে দ্রুত বদলে দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় পূর্বের তুলনায় বহুমাত্রিক বদল এনেছিল, তেমনি এই প্রক্রিয়াটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরগুলিতে অবশ্যম্ভাবী ছাপ রেখে যাচ্ছিল। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা পরিবার ব্যবস্থার পূর্বতন রূপগুলিকে বিভিন্ন দিক থেকে নতুন আকৃতি দিচ্ছিল বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়াটি। যদিও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে বদল ঘটবে, সে কথা নতুন নয়, তবে তা যে রূপ পরিগ্রহ করছিল, সেটি পূর্বের তুলনায় আলাদা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাবে কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস-এর লেখা *কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার* (*The Manifesto of the Communist Party*) (1848)-এর অন্তর্গত একটি নির্দিষ্ট অংশ—

> বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবার প্রথা থেকে তার ভাবালু আবরণকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে নামিয়ে এনেছে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে।[৪]

সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিটি যে বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়াটি ক্রিয়াশীল থাকাকালীন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক, তা অস্বীকার করা যায় না। সর্বোপরি দেখা যায়, শুধু অর্থনীতিতেই নয়, এই বদলসমূহ ছাপ রেখে যাচ্ছিল সাহিত্যেও। সাহিত্যিকরা সচেতনভাবেই নতুন অর্থনীতি দ্বারা পুনর্গঠিত বিশ্বব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ ধরে রাখছিলেন তাঁদের লিখিত সাহিত্যে।

বিশ্বায়ন-সংলগ্ন সময়পর্বে যে সাহিত্যিকরা লেখালিখি করছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগের লেখাতেই স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে এই নতুন অর্থনীতিনির্ভর সময়। সেই ছাপ কেমন, তা অবশ্যই বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই প্রক্রিয়ার আপাত সুফলের দিকগুলির পাশাপাশি সুদূরপ্রসারী কুফল কিংবা নেতিবাচক প্রভাবের দিকগুলিও এই পর্বের সাহিত্যিকদের লেখায় উঠে আসছিল। বর্তমান অধ্যায়ে ব্যক্তি কিংবা পরিবারসম্পর্কের নিরিখে সেই বদলগুলিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য একাধিক ছোটোগল্পকারের গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে নিতে চাওয়া হয়েছে সেই বদলের অভিমুখগুলিকে।

৬.৩॥ **স্বপ্নময় চক্রবর্তী**

স্বপ্নময় চক্রবর্তী (জন্ম-১৯৫১)-র ছোটোগল্পের জগতটিতে অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে পড়েছে বিশ্বায়নের প্রভাব। বিশ্বায়ন মানুষের মূল্যবোধের সরণ ঘটিয়েছিল। উৎপাদনব্যবস্থায় বদল আসার ফলে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল পূর্বেকার পরিবারব্যবস্থা। সময়বিশেষে ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিসরগুলিতেও এর প্রভাব এসে পড়ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন এর অন্যতম একটি কারণ হিসাবে উপস্থিত থাকলে আর একটি কারণ ছিল পরিযাণ। দেশের অভ্যন্তরে কিংবা দেশের বাইরে এইধরনের পরিযাণ ঘটার কারণে সম্পর্কের সমীকরণগুলি বদলে যাচ্ছিল খুব দ্রুত। অন্যদিকে প্রযুক্তির বহুল প্রয়োগ গৃহজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিলেও কর্মে মানবনির্ভরতা কমে যাওয়ার কারণে কর্মজগতটিও যান্ত্রিক এবং বেশ কিছু পরিমাণে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছিল। শুধুমাত্র বৃহত্তর সামাজিক-পারিবারিক পরিসরেই নয়, দাম্পত্যের মতো ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পালাবদল দেখা যাচ্ছিল। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে এই দিকগুলিকে অসামান্য

দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর এইরকম একটি ছোটোগল্প হল 'যন্ত্রপাতি'। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে শারদ *বসুমতী* পত্রিকায়। সময়কালের নিরিখে দেখা যায় ভারতে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার মাত্র বছর চারেক পরেই এই গল্পটি লিখিত হচ্ছে। তাই এ গল্পে উঠে এসেছে মানুষের গৃহস্থালি কীভাবে দ্রুত যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠছে, সেই দিকটি। একটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির কথা এ গল্পে উঠে এসেছে। প্রদীপ, পৃথা এবং তাদের শিশুসন্তানটিকে নিয়ে এ গল্প অগ্রসর হয়েছে। গল্পের স্তরে স্তরে লেখক তুলে ধরেছেন একের পর এক যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত গৃহে স্বাচ্ছন্দ্যনির্মাণের প্রচেষ্টাসমূহকে। কিন্তু তারই অভ্যন্তরে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যে দিয়ে যতটুকু সম্পর্ক জীবিত ছিল—সেই পরিসরটি। এ গল্পে দেখা যায় প্রদীপ এবং পৃথা পরস্পরকে ভারমুক্ত রাখবে বলে পরিবারে একের পর এক যন্ত্র কিনে আনছে। কিন্তু ভারবহনের মধ্যে দিয়ে একধরনের পারস্পরিক নৈকট্য যে সৃষ্টি হতো, সেই কথাটি ভুলে যাচ্ছিল তারা। মাথাধরার ক্লান্তি অপনোদনের জন্য যে প্রদীপ পৃথার কোলে মাথা রাখার মধ্যে দিয়ে সম্পর্কের উষ্ণতা লাভ করত, সেই সম্পর্কই খানিকটা শীতল হয়ে পড়ে, যখন প্রদীপ বাজার থেকে একটি মাথা টেপার মেশিন কিনে আনে—

> পর পর ক'দিন ভীষণ মাথা ধরেছিল। পৃথা কোলের উপর প্রদীপের মাথাটা নিয়ে টিপে দিতে দিতে বলেছিল, থাক বরং আমাদের সোনার কাঁথা-টাথা আমিই পালটাব। আবার হঠাৎ হঠাৎ কখন নাইট ডিউটি পড়ে যাবে তখন আবার বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। তুমি বরং ঘুমিয়ো। প্রদীপ বলল, তা কি হয় নাকি। দু'জনের মেয়ে। যা কিছু কষ্ট-টষ্ট ফিফটি ফিফটি ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এ কথা ভাবতে ভাবতে প্রদীপের মনে হল পৃথার কোলে মাথা রেখে ওকে দিয়ে এভাবে মাথা টেপানোটা কি ঠিক হচ্ছে? এবং মাথা যখন আছে যখন-তখন ধরতেই পারে। প্রদীপ পরদিনই একটা মাথা টেপার মেশিন কিনে নিয়ে এসেছিল। ভাইব্রেটার। প্লাগে লাগিয়ে দিলেই কাঁপতে থাকে, কাঁপতেই থাকে। একটু চায়ের জল

চাপিয়ে আসি কিংবা গ্যাসটা অফ করে আসি বলে থেমে যায় না। কাঁপতেই থাকে। রেগুলেটার আছে। বাড়ানো যায়, কমানো যায়...।[৫]

এ গল্পে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে যন্ত্রপাতির ব্যবহার। তা কিছুটা প্রদীপের সুবিধার জন্য কেনা, কিছুটা পৃথার। আর এইভাবে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত কমতে থাকে দুটি মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা। অন্যদিকে তারা দু'জনেই ধীরে ধীরে এক একটি যন্ত্রের মধ্যে এক একটি সত্তাকে কল্পনা করতে থাকে। জনবিরল পরিবারে তারা আপন আপন যন্ত্রের সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে যায়। এক একটি যন্ত্রের নামকরণ করে তারা। শেষপর্যন্ত এ গল্পের শেষে যন্ত্রের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মানবিক পরিসরটিকে পুনরুদ্ধার করার একরকম প্রচেষ্টা চালান লেখক।

'আর্সেনিক ভূমি' (শারদ *পরিচয়*, ২০০১) গল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি তথা পরিবার সম্পর্কের ভিন্ন কিছু বদলের দিক তুলে ধরেছেন লেখক। এ গল্পে একদিকে আছে শিক্ষার মাধ্যমে অন্ত্যজবর্ণের মানুষের শ্রেণি-উত্তরণের কাহিনি, অন্যদিকে এ গল্পের ঘটনাপ্রবাহ কিংবা সম্পর্কের সমীকরণের নির্মিতিতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে পরিযাণ। নমঃশূদ্র জাতির নবকুমার মণ্ডলের ছেলে রামপ্রসাদ মণ্ডল মেধার পরিচয়ে পাড়ি দেয় সুদূর আমেরিকায়। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের পেশা তাকে দেয় সম্মান এবং অর্থ। বিদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়ে প্রায় তিনদশক পরে দেশে ফিরে ঊনষাট বছরের রামপ্রসাদ মণ্ডল আবিষ্কার করে যে, পারিবারিক সম্পর্কসূত্রগুলিকে সে হারিয়ে ফেলেছে। তার সমবয়সীদের অনেকেই চলে গিয়েছে ভিন্ন এলাকায়। তার বংশের মানুষ রয়েছে চরম কষ্টে। বন্ধুরাও প্রায় তাই। তার উপরে তাদের এলাকাটি হয়ে পড়ে আর্সেনিকপ্রবণ। জলপানের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় মৃত্যুর দিকে। এমতাবস্থায় আমেরিকা থেকে আসা রামপ্রসাদের মনে হয়, কিছু অর্থসাহায্যের মাধ্যমে সে এদের দিতে পারে পরিশুদ্ধ জল, বদল

ঘটাতে পারে এদের অবস্থার, কিন্তু সে আবিষ্কার করে যে, এতদিনে সে স্বজনের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার হারিয়েছে। শেষপর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আশাহত হৃদয়ে সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়—

> স্কুলটাকে দেখি। বাথরুমের বাজে গন্ধটা আসছে। চারিদিক মলিন। দেয়াল নোংরা, সিমেন্ট উঠে গেছে। ইটও বেরিয়ে পড়েছে। স্কুলটার জন্য কিছু করতে ইচ্ছা করল। এক হাজার ডলার দিয়ে দিলে বোধহয় কিছুটা সংস্কার হয়।...[৬]

বিশ্বায়ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানবিক সম্পর্কসমূহকে অস্বীকার করে চলেছে। মানুষকে বিশ্বাস করতে অভ্যাস করিয়েছে যে, অর্থের মাধ্যমে সব কিছু সমাধান করা সম্ভব। সেই বিশ্বাসের একপ্রকার বৈপরীত্যকে তুলে ধরেছেন লেখক। পৃথিবীর সব মানুষই যে এইভাবে ভাবেন না, সেই বাস্তবটিও উঠে এসেছে এই গল্পে—

> আমি এখনও আমার নিজের ঘরে যাইনি। ওখানে যাচ্ছি। চল্লিশ বছর পর বাড়ি যাচ্ছি। তবে বেশিক্ষণ থাকব না। ফেরার সময় স্কুলে নামব। কথা আছে।
>
> হেডস্যার বললেন, চল্লিশ বছরে প্রথম যাচ্ছেন? ইতিমধ্যে যাননি?
>
> আমি মাথা নাড়াই।
>
> —খবর-টবর রাখেন তো?
>
> আমি বলি আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এক কাকা মারা গিয়েছিলেন খবর পেয়েছি। খুড়তুতো ভাইদের খবর জানি না। আমি আমার ভিটেটা একটু দেখব, দেখতে ইচ্ছে করছে।
>
> —তা হলে ওসব কিছু জানেন না।
>
> —ওসব মানে?
>
> —গেলেই দেখতে পাবেন।
>
> একথা বলেই চুপ করে গেলেন হেডস্যার।[৭]

বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মহাশয় বিদেশফেরত চরিত্রটিকে প্রকৃতপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছেন বেশ কিছু কঠোর সত্যের মুখোমুখি। মানবিক সম্পর্কের বন্ধনগুলিকে শুধুমাত্র আভিজাত্যের তীব্র অহংকার দ্বারা যে রক্ষা করা সম্ভব নয়, তা এ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে—

> অন্যান্য ঘর থেকেও সবাই এসে গেছে। বউ, ঝি, বাচ্চারা। ওরা সবাই আমার রক্তসম্পর্কের পরিজন, অথচ ওদের কারওরই নাম জানি না। আমি ওদের কারুর কারুর দাদা কারুর জেঠু। কারুর ভাসুর, কারুর দাদু। আমি কোনও বাচ্চার চুলে বিলি কেটে দিতে যাই, ওরা মাথা সরিয়ে নেয়। কোনও বাচ্চার থুতনি ধরে আদর করতে যাই, ওরা মুখ সরিয়ে নেয়।...
>
> আর্সেনিক আস্তে আস্তে মারে। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বিশুদ্ধ জল, জীবাণুহীন জল কি আমার আত্মাকে আস্তে আস্তে মেরেছে?...[৮]

বিশ্বায়ন তার অনেক অনেক আপাত সুবিধার আড়ালে মানুষের অন্তরাত্মাকে এইভাবেই নিধন করেছে। তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে অনেক দূরে। আত্মজনের পরিধিকে অতিক্রম করে ভুলিয়েছে ভাববিনিময়ের গোপন মানবিক রহস্যকেও—

> জয়নাল জিজ্ঞাসা করছে আমায়, বল তো কী বাজাচ্ছি? জয়নাল বাজিয়ে চলেছে। আমি জয়নালের দিকে তাকিয়ে আছি। ও বাজাচ্ছে। কথা বেরিয়ে আসছে ওর ঢাক থেকে। নিবিড়, গভীর কোনও কথা। কিন্তু কী কথা বুঝতে পারছি না। এতদিনে কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে গেছে অনেক। আমি ওর বাজনার বোল বুঝতে পারতাম, এখন পারছি না।[৯]

এ গল্পে দেখা যায় দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি সম্পর্কের উষ্ণতা হারিয়ে সম্পর্কগুলিকে মৃত্যুর শীতলতার দিকে চালিত করেছে। দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের পরিসর থেকে বহুদূরে চলে যাওয়া অধুনা প্রথম বিশ্বের নাগরিক রামপ্রসাদ কিংবা তার অর্জিত ডলারের উষ্ণতা আজ আর প্রাণের সঞ্চার করতে পারে না মৃত সব সম্পর্কের শবদেহগুলিতে। গল্পের শেষে তাই সে ব্যর্থ মন নিয়ে ফিরে যায় প্রথম বিশ্বের নিরাপদ আশ্রয়ে।

'মোবাইল সোনা' (শারদীয় *আজকাল*, ২০০৫) গল্পে লেখক একদিকে তুলে ধরেন প্রযুক্তির দ্বারা মানুষকে প্রতিস্থাপিত করার কাহিনি, অন্যদিকে এ গল্পের অন্তরে শায়িত থাকে ব্যক্তি তথা পরিবার সম্পর্কের বদল। এ গল্পের অগ্রগতিতে উঠে আসে এক বৃদ্ধাশ্রমের বিবরণ, যেখানে অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে থাকেন কমলিনী মিত্র। তাঁর ছেড়ে আসা পরিবারে ছেলে-বউমা-নাতি-নাতনি—সবাই থাকা সত্ত্বেও তিনি বৃদ্ধাশ্রমে চলে আসতে বাধ্য হন। নিজেকে সংসারের 'বাড়তি' একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিলেন না তিনি। সেই সঙ্গে ছেলে সৌম্যকান্ত মিত্র ওরফে বাবলুর সংসারের যে পরিচয়টি পাওয়া যায়, সেটিও এই নির্দিষ্ট সময়দ্বারা বহুখণ্ডে বিভক্ত। সে মেয়েকে রেখেছে দিল্লির হস্টেলে, ছেলেকে নরেন্দ্রপুর মিশনে। সে যখন কাজে কর্মে বাইরে যায়, তার নতুন বউও সঙ্গে যায়। পরিবারের এইরকম গঠনের কারণে প্রতিটি মানুষই মানসিকভাবে দূরবর্তী হয়ে পড়তে বাধ্য। এ গল্পেও তাই ঘটেছে। তবু বৃদ্ধাশ্রমের রবিবারের রুটিনের ফাঁকে কমলিনীর মনে পড়ে তাঁর ফেলে আসা গৃহকোণটির কথা। কিন্তু সেই পরিবার থেকে তিনি এবং তাঁরা পরিত্যক্ত। তবু হৃদয় কাছে চায় আত্মজকে। কিন্তু তা হয় না। মানুষের বদলে জায়গা করে নেয় যান্ত্রিকতা—

> সাদা সাদা ইডলির গা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পাশের বাটিতে সম্বর। সেখানেও ধোঁয়া। কারিপাতার গন্ধ। নীচের অফিসঘরে টেলিফোন। রবিবার সকালে অনেকের ফোন আসে। অনেকে ফোন করেন। রবিবারই তো ছেলে, জামাই, বউমা, নাতিনাতনিরা বাড়িতে থাকে। একজন ফোনে জিজ্ঞাসা করছেন বাড়িতে, কী টিফিন হচ্ছে? লুচি? তারপর কিছুক্ষণ নিচুস্বরে কথা, ফোনটা যখন ছাড়লেন, চোখে জল।... বাবলু কোটের পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বার করল। বলল, মা, এটা তোমার জন্য এনেছি। আর নীচে নেমে আমার ফোন ধরতে হবে না, ফোনটা তোমার কাছেই থাকবে। মানে তোমার কাছেই থাকব আমি।[১০]

ব্যস্ত জীবন কিংবা ক্রমবর্ধমান উপার্জনমুখিতা গৃহপরিসরের মানবিক সম্পর্কগুলির মৃত্যু ঘটিয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও অর্থের প্রতিযোগিতায় সঁপে দিতে বদ্ধপরিকর বাবা-মা তাদেরকে চ্যুত করেছে পারিবারিক আশ্রয়ের নিরাপত্তা কিংবা পূর্ববর্তী প্রজন্মের উষ্ণ সাহচর্য থেকে। তাই এসময় পরিবার এক নতুন রূপ নিয়েছে, যেখানে বৃদ্ধা মা বৃদ্ধাশ্রমে, নাতি-নাতনি হস্টেলে, সন্তান কিংবা তার স্ত্রীও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে বাস করে। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে এটাই হয়তো হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক, আর তাকেই এ গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

৬.৪॥ **অমর মিত্র**

অমর মিত্র (জন্ম-১৯৫১) বর্তমান সময়ের বাংলা ছোটোগল্পে এক উল্লেখযোগ্য নাম। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি তাঁর 'গাঁওবুড়ো' (১৯৭৭) নামক ছোটোগল্পের জন্য আমেরিকার 'ও' হেনরি' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর 'গাঁওবুড়ো ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থটি 'দি ওল্ড ম্যান অফ কুসুমপুর' নামে অনুবাদ করেন অনীশ গুপ্ত। আমেরিকার একটি পত্রিকা 'দ্য কমন'-এ প্রকাশিত হয় অনূদিত গল্পটি। তারপর এই পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।[১১]

অমর মিত্রের দীর্ঘ কথাযাত্রায় স্থান করে নিয়েছে বিশ্বায়নের একাধিক অনুপুঙ্খ। একদিকে বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তিনির্ভরতার একাধিক মাত্রা যেমন তাঁর ছোটোগল্পের অংশ হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তাঁর ছোটোগল্পে জায়গা করে নিয়েছে চিকিৎসাপরিষেবাক্ষেত্রের খুঁটিনাটি। সেইসঙ্গে তাঁর গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি তথা পরিবার সম্পর্কের বদলের একাধিক দিক। তাঁর *শ্রেষ্ঠ গল্প* (২য় সংস্করণ ২০১২, করুণা প্রকাশনী)-এর বেশ কয়েকটি ছোটোগল্পে এই বদলের দিকগুলিকে অনায়াসেই খুঁজে নেওয়া যায়। এরকমই একটি গল্প 'উড়োমেঘ' (শারদীয়

প্রতিক্ষণ, ১৯৯৩)। ভারতে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার মাত্র দু'বছর পরে প্রকাশিত এই ছোটোগল্পটি পাঠকের সামনে বিশ্বায়নের একাধিক চিহ্নকে হাজির করে। কেবল টিভির প্রসার, বিদেশি চ্যানেলের আগমন, বদলে যাওয়া বিনোদন কিংবা একান্নবর্তী পরিবার থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটবাসী জনগণ, জনজীবনে বিদেশি পণ্যের মাত্রাধিক্য প্রভাব ইত্যাদি বিষয়কে এ গল্পে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। এ গল্পে উঠে আসে পণ্যসংস্কৃতির টুকরো টুকরো চিত্র। আবির এবং মালা যে ফ্ল্যাটে বাস করে সেই ফ্ল্যাটেরই উপরতলায় বাস করে সন্দীপ ও নন্দিনী। তাদের জীবনযাত্রা আবির ও মালার পরিবার থেকে অনেক আলাদা। তাদের ঘরে রয়েছে ভিসিপি, কেবল কানেকশন কিংবা কালার টিভি। নিত্যনতুন পণ্য কিনবার ক্ষমতা। অন্যদিকে আবির-মালার সংসারে দূরদর্শননির্ভর সাদা-কালো টিভি। একঘেয়ে বিনোদন। স্বল্প আর্থিক ক্ষমতার আবির তার স্ত্রীর জন্য কিনে ফেলতে পারে না বিশ্বায়নের জোয়ারে ভারতীয় বাজারে বন্যার মতো ঢুকে পড়া বিদেশি পণ্যসমূহ কিংবা আধুনিক সুবিধাপ্রদানকারী প্রযুক্তি। আর প্রধানত এই কারণেই 'উপরতলার' মতো জীবননির্বাহ করতে না পারা মালার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে স্বামী আবিরের। সেখানে অনুঘটক হিসাবে ভূমিকা পালন করতে থাকে দ্রুত প্রসারণশীল আধুনিক প্রযুক্তি—

> মালা আবিরকে বলল, কেবল নেবে আমাদের বাড়িতে?
>
> অবাক হয়ে গেল আবির, কেবল মানে?
>
> কেবল টিভি, ডিশ অ্যানটেনায় দেখায়, পৃথিবীর সব দেশের চ্যানেল।
>
> মালার কথায় আবির আরো অবাক হয়, এ পাড়ায় এসেছে নাকি ওসব?
>
> বাইরে গিয়ে দেখে এস। মালা সবজান্তার মতো পরামর্শ দেয় আবিরকে।
>
> আবির আরো আরো অবাক হয়েছে। বাইরে গিয়ে কী দেখবে? ডিশ অ্যানটেনা? সে তো অনেক উঁচুবাড়ির মাথায় থাকে। ইদানীং তার দশতলা অফিসবাড়ির নতলা থেকে দেখতে পাচ্ছে কাছেপিঠের মাথা উঁচু

খোপ খোপ আকাশ ধরা বাড়িগুলির মাথায় উলটানো ব্যাঙের ছাতার মতো অ্যানটেনা বসানো। ওগুলো নাকি আকাশ থেকে ছবি ধরছে সর্বক্ষণ। এক-একটার দাম? শুনে চমকে গিয়েছিল আবির। অত টাকা! তার কলিগ বুঝিয়েছিল আসলে ওটা ব্যবসার পারপাসে বসানো হয়। একটা ডিশ অ্যানটেনা বসাতে পারলে পুরো এলাকার টিভিতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় অন্য দেশের টিভির প্রোগ্রাম, নাচগান। তবে হ্যাঁ, কানেকশান নিতে হবে।

আবির জিজ্ঞাসা করে, ডিশ-অ্যানটেনা তো থাকে ছাদে, বাইরে গিয়ে কী দেখব?

মালা হেসে ফেলেছে তার অজ্ঞতায়, ডিশ দেখবে কেন? দেখবে তার, কেবল টিভির তার, অনাথবাবু লেনে একটা ছেলে খুলেছে কেবল টিভি, বাড়িতে বাড়িতে কানেকশান দিচ্ছে।

এমনি? আবির কেমন বিহ্বলতায় ভরে যায় যেন, আকাশ থেকে ধরা বিদেশী টিভির ছবি ঘরে। পৃথিবী এত ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার ঘর আর বিলেতের ঘরে কোনো তফাত থাকল না।

এমনি কেন দেবে? নিতে হবে, পাঁচশ টাকা ইনস্টলেশন চার্জ, তারপর মাসে মাসে মাত্র একশ। তাতেই সারাদিন টিভি চলবে, সারারাত্তিরও।[১২]

দেখা যায়, এ গল্পে প্রযুক্তিকে গ্রহণ করাকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় স্বামী-স্ত্রীর মনান্তর। গল্পের শেষে সেই মনান্তরের একপ্রকার অবসান দেখালেও সারা গল্প জুড়ে বিশ্বায়ন-বাহিত পণ্যসংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মননের একাধিক প্রকাশকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। টিভি-কেন্দ্রিক বিনোদন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরকে করে তুলেছে নির্বাক। সেখানে একমাত্র সবাক 'টিভি' নামক বিনোদন প্রদানকারী যন্ত্রটি—

টিভি তো মালার অভ্যেস। টিভি চলছে ঘরে, তার সামনে কিংবা আড়ালে, তাতেই যেন মালার টিভি দেখা হয়ে যায়। টেলিভিশন সম্পৃক্ততা তার এমন ঘন গভীর। টেলিভিশন চললেই হবে। সামনে ছবি আর শব্দ থাকলেই হল, সে তখন টিভির দিকে পিছন ফিরেও কথা বলতে পারে আবিরের সঙ্গে। অথবা টিউনিং করতে করতে আধঘণ্টা সময়ও কাটিয়ে দিতে পারে। এসব করতে করতে, আবিরের সঙ্গে কথা

> বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল হতে সে আবিরকে ধমকাতেও পারে, একটু চুপ কর না, সিরিয়ালটা দেখতে দেবে তো।[১৩]

শুধুমাত্র কেবল টিভি নয়, তার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে খুলে যাওয়া আন্তর্জাতিক পণ্যের দুনিয়াটি হাতছানি দিতে থাকে মধ্যবিত্ত পরিবারের মালাকে। উপরতলার বাসিন্দা সন্দীপ-নন্দিনীর কেবল টিভির বিজ্ঞাপন থেকে সে আকৃষ্ট হয় ফরাসী ব্র্যান্ডের সাবানের প্রতি। আবির সেই সাবান তাকে এনে দিতে গড়িমসি করায় তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে দেখা যায়। এভাবেই দাম্পত্যসম্পর্কের অভ্যন্তরেও ফাটল ধরায় পণ্যসংস্কৃতি। শুধু আবির-মালার দাম্পত্যসম্পর্কই নয়, প্রযুক্তির মালিকানার অহঙ্কারে ফাটল ধরে নন্দিনী এবং মালার বন্ধুত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রটিতেও। অন্যদিকে এই পণ্যদুনিয়ার উপর অধিকার কিংবা অনধিকার নিয়ন্ত্রণ করে বাহ্যিক পরিবেশে কোনো ব্যক্তি মানুষের সামাজিক অবস্থানটিকেও—

> আবির কথা বলল না। ননীর কাছে সে গোনাগুনতি কয়েকবার মাছ কিনেছে। সে হল অভিজাত মৎস্য ব্যবসায়ী। তার কাছে যেতে হলে ঘরে রঙিন টেলিভিশন রিমোট কন্ট্রোলে যার ছবি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, ভিসিপি, কেবল-কানেকশান এসব তো থাকতেই হবে। যে মাছ বাজারে আর কারোর কাছে নেই, তা আছে ননীর কাছে, পাবদা, ডিম ভরা জ্যান্ত কালো ট্যাংরা, নীলচে টাটকা বাগদা, বড় মৌরলা, পুঁটি, পার্শে, গলদা, ভেটকি থেকে পাকা রুই তো থাকেই। যেমন ভালো মাছ, তার দামও তেমন। দেখতে ইচ্ছা করে, কিনবার সাহসও হয় না।[১৪]

এ গল্পে এইভাবে উঠে আসে ব্যক্তিসম্পর্কের বদলের এক সার্বিক চিত্র।

'বালিকামঞ্জরী' (শারদীয় *বারোমাস,* ১৯৯৫) ছোটোগল্পটিতেও উঠে আসে বিশ্বায়নপরবর্তী সময়ের একাধিক চিত্র। এই গল্পটিকে পরে ২০১২ সালে 'পিঙ্কি-বুলি' নামক নাটকে রূপান্তরিত করেন 'সায়ক' নাট্যগোষ্ঠীর মেঘনাদ ভট্টাচার্য।[১৫] এ গল্পে উঠে আসে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়া

বালিকা পিঙ্কি আর তার বাড়িতে কাজ করা তারই প্রায় সমবয়সী বুলির কথা। দুই বালিকাচরিত্রের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে আলাদা দুই সমাজের কথা তুলে ধরেছেন গল্পকার। বিশ্বায়নপরবর্তী সময়ে ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের রমরমার দিকটি এ গল্পে যেমন উঠে এসেছে, তেমনি তা কীভাবে শ্রেণীচরিত্র নির্মাণ করে দুই সমবয়সী বালিকার মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে, সেই কথা উঠে এসেছে এ গল্পে।

'ব্ল্যাকম্যাজিক' (*দিশা সাহিত্য*, ১৯৯৯) গল্পেও লেখক অমর মিত্র সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন বিশ্বায়নের পণ্যসংস্কৃতির প্রাবল্যকে। ব্ল্যাকম্যাজিক শব্দটির অর্থ কালাজাদু বা কৃষ্ণ-জাদু। এ সম্পর্কে জানা যায়—

> Black magic has traditionally referred to the use of supernatural powers or magic for evil and selfish purposes; or magic associated with the devil or other evil spirits. It is also sometimes referred to as the "left-hand path", (its right-hand path counterpart being benevolent white magic). In modern times, some find that the definition of black magic has been convoluted by people who define magic or ritualistic practices that they disapprove of as black magic.[১৬]

এ গল্পে 'কৃষ্ণ-জাদু'-র জাদুকর হিসাবে বিশ্বায়ন নামক ব্যবস্থাটিই মূর্ত হয়ে ওঠে। গল্পে দেখা যায় রিনি ও নিলয়ের কিশোর পুত্র সবুজ পণ্যসংস্কৃতিদ্বারা আক্রান্ত বা প্রভাবিত। সে বাজারে গেলেই সমস্ত জিনিসের সঙ্গে ফ্রিতে কী পাওয়া যায় তা খোঁজে। এভাবেই সে একদিন একধরনের তেল কিনে সঙ্গে ফ্রি হিসাবে পায় হেয়ার ডাই 'ব্ল্যাকম্যাজিক'। মধ্যচল্লিশের নিলয় এই পণ্যসংস্কৃতির বিরোধী হলেও স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তার মাথার সাদা হয়ে যাওয়া চুলে সেই হেয়ার ডাই প্রয়োগ করে কৃত্রিম তারুণ্য ফিরে পায়। কিন্তু এ গল্প এখানেই শেষ নয়। পণ্যসংস্কৃতি

মানুষকে শৃঙ্খলের মতো বেঁধে রাখে। তাই নিজে কৃত্রিম তারুণ্য লাভ করে স্ত্রীর জন্য যৌনতা উদ্রেককারী বহুমূল্য রাতপোশাক কিনে আনে নিলয়। সঙ্গে ফ্রিতে পায় বডি ক্রিম, যা নারীশরীরে মাখার জন্য দেওয়া হয়েছে। এ গল্পে পণ্যসংস্কৃতির তাড়নায় মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের ভাঙনকে তুলে ধরেছেন লেখক। তাই রিনি স্বামীর উদ্দাম কামনায় কিনে আনা সেই রাতপোশাক পরতে সম্মত হয় না। ফেলে আসা নতুন যৌবনের উদ্দামতার দিনগুলিকে বিশেষ পণ্যের মাধ্যমে নতুন করে ফিরে পেতে চাইলেও ব্যর্থ হয় নিলয়। তার স্ত্রীর এতদিনকার জীবনধারা স্বাগত জানাতে পারে না পণ্যদুনিয়ার এই আবাহনকে। একদিকে ভোগবাদী সংস্কৃতি, অন্যদিকে সনাতন মূল্যবোধ— এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে দুই নৌকায় পা রাখার মতো অবস্থা হয় রিনির। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দীর্ণ হয়ে একদিন সে বাথরুমের নির্জনতায় বক্ষে মালিশ করে ফ্রিতে পাওয়া সেই বডি ক্রিম। কিন্তু সে যা কল্পনা করেছিল তা হয় না। স্বামী নিলয়ের বদলে তার কিশোর পুত্র সবুজ মায়ের গায়ের সেই ক্রিমের গন্ধে উদ্বেল হয়ে উঠলে বিবেকের দংশনে দগ্ধ হতে থাকে রিনি—

> রিনি চুপ করে থাকে। তার কানে কানে নিলয় বলে যাচ্ছে প্রথম বয়সের কথা। এসব কথা এখন আর শোনা হয় না, বলা হয় না, শুনতেও তেমন ইচ্ছে হয় না, বলতেও না। জীবনের ওই কৌতূহল, ওই বিস্ময় কবে কেটে গেছে। এখন চুলে জাদুবর্ণের ছোঁয়া নিয়ে, আবার স্বচ্ছ রাত্রিবাস, সুগন্ধী ক্রিম দিয়ে হারিয়ে যাওয়া উত্তাপ ফিরে পেতে চাইছে নিলয়, আর রিনিও বোধহয়।...
>
> নিলয় তবু ডাকে, সাড়ে আটশো টাকার পোশাক, দেখবে না তা কেমন? টাকার তো দাম আছে। টাকাটা তো ফেলে দেওয়ার নয়। অবহেলার নয়। টাকার বিনিময়ে সে প্রায় ফুরিয়ে আসা বিস্ময়ের কলস আবার পূর্ণ করে দিতে চাইছে। অনেক দিন বিষণ্ণ হয়ে ছিল নিলয়। যে বয়সে পৌঁছেছে সেই বয়স বিষাদের। সেই বিষাদকে হারিয়ে ফেলার ক্ষমতাও ছিল না যেন তার। সেই ক্ষমতা এনে দিয়েছে সবুজ আর রিনি। ব্ল্যাকম্যাজিক। সেই ম্যাজিকে সব সংকোচ ভেঙে গিয়ে জেগে উঠেছে অদ্ভুত এক উল্লাস।...

> রিনি চুপচাপ। সে যেন কিছুই শোনে না, কিছুই বোঝে না। রিনি যেন কবে দেখেছিল একটি ছবির বই, যাতে ছিল বিপুল বক্ষের ভারে নত যুবতির শরীর। সিলিকন বক্ষ ছিল তা। নগ্ন যুবতির বিপুল স্তনভার দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করেছিল রিনি। নিলয় কি তাকে সেই সিলিকন বক্ষের নারী করে তুলতে চাইছে? এরপর হয়তো এনে দেবে সেই ইনজেকশান---বুকের সমস্ত গ্রন্থি স্ফীত হয়ে উঠবে। নিলয়ও হয়ে উঠবে সেই দানব সদৃশ, যে দলিত করেছিল সিলিকন-বক্ষের নারীকে। নিলয় কি তাই চায়? নিলয় নয়, কৃষ্ণবর্ণের জাদু। নাই চাইতেই যে ঘরে এসে পৌঁছেছে কোনও বিনিময় ছাড়াই।...
>
> ওরে সবুজ থাম। রিনি আর্তনাদ করে ওঠে। সে আর পারছিল না। এতক্ষণে টের পাচ্ছে এ কাঁঠালিচাঁপার সুবাস নয়, এ যেন সাপিনীর গায়ের গন্ধ। মিলন পিয়াসী সাপিনীর শরীর থেকে যে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সেই গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘর। সবুজ চেনে না। চেনে না সবজে, চেনে না বলেই উল্লাসে মেতে উঠেছে। নাকি চেনে, কিন্তু জানে না এ কীসের গন্ধ! হায় রে সবুজ![১৭]

এ গল্পে অর্থের প্রাধান্য ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে মূল্যবোধকে অবদমিত করে। পণ্যসংস্কৃতির বিপুল বিস্তার সনাতন জীবনধারা কিংবা মূল্যবোধের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ব্যক্তিসম্পর্কের বদল ঘটিয়েছে। ছোটোগল্পকার অমর মিত্র সার্থকভাবে তা তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পের মাধ্যমে।

৬.৫॥ **তৃপ্তি সান্ত্রা**

অখণ্ড ভারতবর্ষের রাজশাহী নিবাসী সুরেশচন্দ্র সান্ত্রা ও বেলা সান্ত্রার ছোটো মেয়ে তৃপ্তি সান্ত্রার জন্ম ১৯৫৬ সালে মালদহে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। পেশায় শিক্ষিকা। চারটি কবিতার বই, দুটি অনুবাদ গ্রন্থ, দুটি উপন্যাস (*চিরকুট, চুড়েইল*) এবং তিনটি গল্পগ্রন্থের (*অষ্টমীটোলা, ১০টি গল্প, রাত রোয়াকে, বুদ্বুদ যাপনের ২৫ আখ্যান*) বাইরে একটি কলাম সংকলন ‘ছোপছোপ কাটাকুটি’। লিটল ম্যাগাজিন ও বাণিজ্য পত্রিকা দুই কাগজেই লেখেন। ২০০৩ সালে ‘কবিতা

পাক্ষিক পুরস্কার', ২০০৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর 'ইলা চন্দ স্মৃতি পুরস্কার', ২০১৭ সালে 'গল্পমেলা পুরস্কার' পেয়েছেন।[১৮]

তৃপ্তি সান্ত্রা মূলত ২০০০ সাল পরবর্তী ছোটোগল্পকার। ফলে বিশ্বায়ন ব্যবস্থা যে তাঁর ছোটোগল্পে অবধারিত ভাবে ছাপ রেখে গিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। তিনি তাঁর *অষ্টমীটোলা ও ৫০টি গল্প* নামক গ্রন্থের 'লেখকের কথা' অংশে জানিয়েছেন—

> এরই মাঝে একবিংশ এলো—বিশ্বায়নের পৃথিবীতে আঘাত এসে পড়ল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমতার ওপর। শহরেও ভাঙন। ক্ষমতার দাপ—উন্নয়নের জন্য উচ্ছেদ। ভিটেমাটি নেই। পুরো শহরটাই বাজার—শপিং কমপ্লেক্স। হাইরাইজ দাপটে তলিয়ে গেল সাবেকী বসতবাটী। হাইরোড, রাস্তা, গলি—সবই বাজারের। হাতের মুঠোয় দুনিয়া, বাজার। আমার ধান পান গান ছড়িয়ে গেছে উন্নত বিশ্বের কোণে কোণে—ভাবলে কী রকম অরগ্যাজম্ হয়, না? কিন্তু এখনও রাস্তা পেরোলে জাতি, জেলা পেরোলে ধর্ম, রাজ্য পেরোলে মাতৃভাষা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হই।দেশ পেরিয়ে বিদেশে যখন, একমাত্র তখনই আমরা ভারতীয়।
>
> বিশ্বায়নের থাবার নিচে ছিন্নভিন্ন নদীকূলের মানুষ। নদীও মৃতপ্রায়। সর্বগ্রাসী প্লাবনের মুখে দাঁড়িয়ে কিছু অক্ষর নিয়ে নোয়ার নৌকায় উঠে পড়ার প্রয়াস আমার। আমাদের। নতুন পৃথিবী পুরোনো পাঠক্রম। এই পরিবর্তিত অবস্থায় কেমন আছে মেয়েরা? দামাল বাজার তাদের টেনে বের করেছে পথে। কাজের বাজার লড়িয়ে দিয়েছে নারী পুরুষকে। সংঘাত অনিবার্য। এইসব চাপে তাপে কেমন আমাদের প্রেম, জীবন, যৌবন যাপন! সংঘাত কি মানুষ মানুষীর—নাকি বিপন্নগ্রহের লোভী মানুষের সঙ্গে সর্বগ্রাসী বাজারের? আগুন আর জলের লড়াই?[১৯]

তাঁর এই লেখা থেকেই অনেকখানি বোঝা যায় বিশ্বায়ন সম্পর্কে তিনি কেমনভাবে ভাবছেন।

বিশ্বায়ন বদলে দিয়েছিল মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের সূত্রগুলিকে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারী-পুরুষের বিভিন্ন মাত্রার সম্পর্কসমূহ যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, বুর্জোয়া ব্যবস্থা সেই

সম্পর্কসমূহের বদল ঘটায়। বুর্জোয়া ব্যবস্থার হাত ধরে অগ্রসর হওয়া অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন উপার্জনের জগতে নারী-পুরুষের ভেদাভেদটি আরও স্পষ্ট করে তোলে। উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত পরিযাণ দ্রুত বদল ঘটায় পরিবার ব্যবস্থার। সম্পর্কসমূহের মধ্যেও এর প্রভাব এসে পড়ে। নারী-পুরুষকেন্দ্রিক সম্পর্কে প্রেমের মতো অনুভূতিগুলিও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে বিশ্ববাজারের কেনাবেচার দুনিয়ায় অংশগ্রহণের নিরিখে। বলাই বাহুল্য যে, বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিও এই নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপাদান হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি দেখা যায় উপার্জনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী শিক্ষিত নারী সম্প্রদায়কে। ছোটোগল্পকার তৃপ্তি সান্ত্রার একাধিক গল্পে উঠে আসে কর্মরতা নারীর নিজস্ব পরিসরের অভিজ্ঞতা এবং তার অবস্থান সাপেক্ষ অন্যান্য মানুষের আচার ব্যবহারের দিকগুলি। সেইসঙ্গে পুঁজি ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যক্তিমানুষের বদলে যাওয়া মূল্যবোধ সম্পর্কসমূহের উপর কেমন প্রভাব তৈরি করছে তাও তাঁর গল্পের অন্যতম অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। এরকমই একটি ছোটোগল্প হল ‘অনুবাদক’ (*অষ্টমীটোলা ও ৫০টি গল্প/ নতুনপথ এইসময়,* ২০১৬ শরৎ)। আমাদের আলোচ্য সময়পর্বের কিছু পরে লেখা এই ছোটোগল্পে লেখিকা আপাত প্রগতিশীল নারী-ভাবনাকে অস্বীকার করে নারীর নিজস্ব স্বরকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর নির্মিত ‘মিশি’ নামক চরিত্রের প্রশ্নের মুখে পড়েছে জীবনশৈলি শিক্ষা কিংবা মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স প্রসঙ্গটি। গল্পটি শুরু হয় টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত খবরের বিষয়কে অবলম্বন করে। গল্পের অগ্রগতিতে দেখা যায় ‘শক্তি’ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নারীবিষয়ক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্কুলের কয়েকজন শিক্ষিকা, কয়েকজন কর্মী ছাত্রীদের একত্রিত হতে। সেখানে নারীর উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে মিশি বুঝতে পারে ‘পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে, ভাবনাচিন্তা পাল্টাচ্ছে না’। তাই মেয়েদেরকে নিয়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামের কথায় সে পাল্টা প্রশ্ন তোলে কেন ছেলেদেরকে নিয়ে এইধরনের সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা

হবে না ? গল্পের অন্দরে দেখা যায় এই প্রশ্নের অভিঘাতে অন্যান্য নারী সদস্যরা অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সামাজিকভাবে নির্মিত নারীবিষয়ক মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে মিশি। সে নারীর স্বাধীন অবস্থানের প্রশ্নে বিবাহের সঙ্গে যৌনতাকে আলাদা করে দেখতে চায়—

> মিশি বলে—মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের চাপটা কোথা থেকে আসে ? না উঠতি বয়সের মেয়ে কিছু করে ফেলবে...মানে যারা একটু মাটির কাছাকাছি মানুষ, বা শুধু তাঁদের কথাই বলব কেন, অভিভাবকহীন ছোটো পরিবারের মেয়ে—যৌবন বয়স—যদি কিছু ঘটে যায়—তাই বিয়ে দেওয়া বা বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে বলে, তাড়াহুড়ো করা। তো আমি বলতে চাই, শুধুমাত্র Sex-এর জন্য কেউ বিয়ে করবে না। বিয়ে করার জন্যই বিয়ে করবে।
>
> ঘরে যেন বজ্রপাত হল। সবাই সমস্বরে বলে—মানে ?
>
> —মানে?
>
> —যদি জিজ্ঞাসা কর বিয়ের কোনও বয়স থাকা উচিত কিনা, আমি বলছি না। তার মানে এই নয় যে আমি মনে করি যে যে বয়সে সে বিয়ে করবে ছাব্বিশ, আঠাশ বা বত্রিশ বছরে একটা মেয়ের সেক্স লাইফ শুরু হবে। সি ক্যান হ্যাভ সেক্স লাইফ। বিয়ের জন্য বিয়ে করবে, সেক্স করার জন্য বিয়ে করবে না।[২০]

বলাই বাহুল্য যে বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে নারীর এই দৃপ্ত উচ্চারণ কিংবা ভিন্ন ভাবনাগত পরিসর এই পর্বের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে। যেখানে নারীকে সমাজনির্মিত মূল্যবোধের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে এনে বাঁচতে শেখার পাঠ দেওয়া হয়। পরবর্তী আলোচ্য 'চাঁদের বারান্দায়' (*অষ্টমীটোলা ও ৫০টি গল্প/ উত্তরবঙ্গ সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১০) নামক ছোটোগল্পে লেখিকা এক ভিন্নতর বাস্তব প্রেক্ষিতকে তুলে ধরেন। এই গল্পে একদিকে উঠে আসে বিশ্বায়ন পরবর্তী পণ্যায়িত চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুপুঙ্খ, অন্যদিকে সেই পরিষেবাকে আশ্রয় করে

বেড়ে ওঠা মানুষের মূল্যবোধের বদল। এই গল্পে দেখা যায় আধুনিক দুনিয়ায় বাণিজ্য অর্থনীতির হাত ধরে সবকিছুই প্যাকেজ সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। হানিমুন থেকে হার্ট অপারেশন, নাইটক্লাবে যাওয়ার ছাড়পত্র থেকে মোবাইল ফোনে কথা বলার স্বাধীনতা—সবকিছুর জন্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে নানা ধরনের প্যাকেজের লোভনীয় সব অফার। সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার আশ্বাস মানুষকে আর ভরসা দিতে পারছে না, তার বদলে কর্পোরেট চিকিৎসাব্যবস্থার ঝাঁ চকচকে পরিষেবা ক্ষেত্রটি প্রায় বিনা প্রয়োজনে প্যাকেজের অফারের হাতছানিতে মানুষকে রোগীতে পরিণত করছে। শুধু চিকিৎসা নয়, চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক পরিষেবার অর্থও প্যাকেজের অন্তর্গত। অর্থাৎ হসপিট্যালের বেডভাড়া, খাবার, ওষুধ, স্যালাইন—সবই। বিপুল খরচের দৌলতে দুই-তিনদিনের এলাহি আয়োজনের প্রাচুর্যে বসবাস করেন রোগীরা। তাঁদের বাড়ির মানুষরাও এই পরিষেবা তাঁদেরকে দিতে পারেন না। ফলে এই অর্থ-নির্মিত পৃথিবী থেকে সেই মাটির পৃথিবীতে ফিরতে কি তাঁদের মন চায় ? সেই প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গল্পটির নিরিখে—

> দিলু স্বাভাবিকভাবেই বলছে তবু মঞ্জুর মনে হয় একটু কি খোঁচা ছিল কোথাও! ঔপনিবেশিক মানসিকতায় সরকারি ব্যবস্থায় বিশ্বাস, চট করে পাল্টাতে না চাওয়া—প্রাইমারি বিদ্যালয়, হাসপাতাল, রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা, বাংলামাধ্যম পাবলিক স্কুলের পক্ষে চিরদিন গলাফাটানো নিখিল মঞ্জু ডিপার্টমেন্টের অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি—প্লাস্টির প্যাকেজটা না করতে পারেনি। কতটা প্রয়োজন, আদৌ প্রয়োজন কি না, না বুঝেই প্যাকেজে ঢুকে পড়েছে।...
>
> কাচের ঘরে মহাকাশচারীর মতো পেশেন্টরা। নিখিল কাচের বাটিতে স্যুপ খাচ্ছিল ধীরে ধীরে। অপারেশনের ধকল শেষে ক্লান্ত কিন্তু সারা হাসপাতাল জুড়ে বিভিন্ন পোশাকের নানারকম রিসেপশন, অ্যাটেন্ড্যান্স, সিকিউরিটি, আয়া, ডায়েটিশিয়ান, সিস্টার এবং ডাক্তারদের ছত্রছায়ায় বেশ নিশ্চিন্ত দেখায় ওকে।...

> সাদা মেঝে, সাদা ঘর, সাদা যন্ত্র, সাদা পোশাক, সাদা ছাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মঞ্জুর ভয় করতে থাকে। অ্যাপোলো হাসপাতাল যেন মহাশূন্যে এক মহাকাশযান। অপারেশনের পর বাহাত্তর ঘণ্টা ওয়াচ, পরিষেবা, বাহাত্তর ঘণ্টার প্যাকেজিং। শুধু মেডিকেল প্যাকেজ নয়, হেলথ প্যাকেজ, স্কিন- প্যাকেজ, ওয়েডিং-প্যাকেজ, হানিমুন-প্যাকেজ—চব্বিশ, ছত্রিশ বাহাত্তর অথবা একশো কুড়ি ঘণ্টার ধামাকা। তারপর? ...
>
> খুব মন দিয়ে স্যুপ খাচ্ছে নিখিল। চাঁদের বারান্দায় বসে এরকম অপার্থিব স্যুপ খাওয়া যায়। মঞ্জু চন্দ্রাহত দেখে। রিলিজ হতে কারো চব্বিশ ঘণ্টা কারো আটচল্লিশ ঘণ্টা। তার আগে কেউই কাদাপাড়া পেরিয়ে নিজেদের পৃথিবীতে ফিরতে চায় না।[২১]

দেখা যায় কর্পোরেট ব্যবস্থার ক্ষণিকের স্বর্গসুখ ছেড়ে কেউই ব্যক্তি কিংবা পরিবারের ছায়ায় ফিরতে চায় না। যদি ফেরে—একরকম বাধ্য হয়েই।

'আনফ্রেন্ড' (*অষ্টমীটোলা ও ৫০টি গল্প/ উত্তরবঙ্গ সংবাদ*, শারদাঞ্জলি, ১৪২৪, ২০১৭) গল্পটি আমাদের আলোচ্য সময়পর্বের কিছু পরে রচিত হলেও গল্পটিতে লেখিকা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন ভারতে বিশ্বায়নের প্রায় সিকি শতাব্দী পরের একটি সময়ের মানুষের স্মার্টফোন-নির্ভর জীবনে ভালোলাগা-মন্দলাগার দিকগুলিকে। ভার্চুয়াল জীবনে ভালো থাকার প্রতিযোগিতায় ব্যক্তি-সম্পর্কগুলিকে ভুলতে থাকা মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতায় কখন যেন অস্বীকার করে বসে সম্পর্কের নৈকট্যকেও। গল্পটি আমাদেরকে সরাসরি নিয়ে দাঁড় করায় বাজার-সম্পর্কের বাস্তবতায়। যেখানে বন্ধু হয়ে ওঠে বন্ধুর প্রতিযোগী, পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি নয়, সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে যোগ্যতমের উদ্বর্তন। মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত যখন এই যোগ্যতমের উদ্বর্তনে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, তখনো নিম্নবিত্তের মধ্যে সামান্যতম হলেও মূল্যবোধের অবশেষ লক্ষ করা যায়। গল্পের চরিত্র পরমা তার বন্ধু অদিতির সঙ্গে কেনাকাটার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সে অদিতিকে হারাতে চায়, আর এই হারিয়ে দেওয়ার খেলায় কখন যেন হারিয়ে যায় বেঁচে থাকার

অনুভূতিসমূহ। কোনও মহৎ প্রেরণার অংশীদার হয়ে নয়, বরং টুকরো টুকরো সুখানুভূতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় এইসময়ের মানুষ। তাই আমরা দেখি অদিতির সামনে দিয়ে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বড়ো ইলিশ মাছটি কিনে নেয় পরমা, এবং তার এই 'জয়'-এর খবরটি স্বামীকে দিতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে সে। অন্যদিকে তার কাজের মেয়ে মামণি জানায় একটি লোক অর্থের স্বল্পতায় একটি শোলমাছ কিনতে পারেনি দেখে সেও সেই মাছটি কেনা থেকে বিরত থেকেছে। ফলে একই গল্পে মূল্যবোধের দুটি পিঠকে লেখিকা তুলে ধরেছেন পাশাপাশি—

> রাস্তার উপর খোলা বাজার। সন্ধে হতে হতেই ভালো মাছ আসে। প্রচুর দাম। কিন্তু পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উবে যায়। কাছেই ডাক্তার পাড়া। দাম দরের ব্যাপার নেই। ক্রিম বাজার। ক্রিমেরও রকমফের আছে। ওই যে টার্টেল শার্ট, রে-ব্যান চশমা ওই যে ফেডেড কালো কোট উকিল ঘুরছে দু-হাজারি ইলিশের কাছাকাছি, এরা বড়োজোর চারশো টাকা কাটা কাতলার বা পাঁচশো টাকা কেজি চারশো গ্রাম ইলিশের খদ্দের হতে পারে। আর একগুচ্ছ সস্তা সিন্থেটিক ছাপা, ছায়ামেয়ে তেলাপিয়া, বাটার উপরে ঝুঁকে! পরমা তাদের দিকে তাকায় না। মাছের সঙ্গে সঙ্গে তার টার্গেট, লেগিংসের উপর কুর্তি পরা অদিতি।
>
> কলেজ থেকে ফেরার পথে এই বাজারটা একবার ঘুরে যায় পরমা। প্রয়োজন যে খুব তা নয় তবে ওই এখন হয়েছে তার শপিং ম্যানিয়া। গুচ্ছের কেনার বাতিক। ফেসবুকের দৌলতে এত এত শপিং উইন্ডোর খোঁজ, এত এত ইনফরমেশন আর অফার। অনলাইন শপিং-এর এত সুবিধা! অনলাইন কেন, শপিং করতে কলকাতায় যাও, মল মেট্রো আর বিগবাজার চষে ফেলো—সে এক অপার্থিব আনন্দ। ...
>
> পরমা রাগতে চাইছে না। একটা মায়া খেলাতে চাইছে মুখে। মামণির মুখের মতো নিষ্পাপ মায়া! আচ্ছা, ভার্চুয়াল জগতের এইসব খেলা আর থ্রিলিং ম্যাজিকগুলো ওই মামণি আর মাছ কিনতে না পারা খদ্দেরদের আয়ত্তে আসে যদি। যেন ষষ্ঠীতলায় মানত করছে পরমা—'হোক হোক মামণি, তোদেরও এমন ডিজিট্যাল জগৎ হোক--হাতে হাতে স্মার্টফোন হোক—নেট হোক—মাছ হাতে, ফুল হাতে, মহার্ঘ সুরা হাতে ছবি তোলার অশরীরী ঘোর হোক—হাজারটা লাইক দেব আমি আর শেয়ার করব একশোবার'।[২২]

এই গল্পে বিশ্বায়ন পরবর্তী ভোগবাদী এবং প্রযুক্তিনির্ভর সামাজিকমাধ্যম-বিহারী চরিত্রসমূহের আচরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। তাঁর এই ধরনের আরও কয়েকটি গল্প হল— ‘রোগা হতে যাওয়া’, ‘মুনলাইট শপিং’, ‘ডেলি প্যাসেঞ্জার’, ‘র‍্যাশ’, ‘দহনবেলা’ ইত্যাদি।

৬.৬॥ **সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়**

লেখক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১শে জানুয়ারি ১৯৬১, হুগলির উত্তরপাড়ায়। পিতৃপুরুষ বিহারে প্রবাসী। মাতৃবংশ বাংলাদেশের দিনাজপুরে। স্কুল-কলেজের পাঠ উত্তরপাড়ায়। এ ছাড়াও ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এখন একটি ফটো প্রিন্টিং সংস্থার কারিগরি বিভাগের প্রধান। ছাত্রজীবনে লেখালিখির শুরু। *দেশ* পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর বৃহত্তর পাঠক মহলে সমাদর লাভ। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনার জন্য ১৯৯৯ সালে ‘আনন্দ স্নোসেম শারদ অর্ঘ্য’, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনার জন্য ২০০২ সালে ‘আনন্দ স্নোসেম পুরস্কার’, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ছোটোগল্প রচনার জন্য ২০০৩-এ ‘আনন্দ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স শারদ অর্ঘ্য’ এবং শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প রচনার জন্য ২০০৬ সালে ‘ডেটল-আনন্দবাজার শারদ অর্ঘ্য’ পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া ১৯৯৭-এ পেয়েছেন ‘গল্পমেলা পুরস্কার’। ২০০১ সালে ‘সাহিত্য সেতু পুরস্কার’, ২০০৫ সালে বাংলা আকাদেমি থেকে ‘সুতপা রায়চৌধুরী স্মারক পুরস্কার’, ২০০৭-এ ‘শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ স্মারক পুরস্কার’, ২০১১ সালে ‘তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সম্মান’, ২০১৪ সালে ‘গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার’-এ তিনি ভূষিত হয়েছেন।[২৩]

লেখকের পরিচিতি থেকে অনেকখানি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়, তিনি কোন সময়ে লেখা শুরু করেছেন, কিংবা কোন সময় জুড়ে তিনি লেখালিখি করেছেন বা করছেন। যে পুরস্কারগুলিতে তিনি সম্মানিত হয়েছেন, সেই পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থাগুলির নাম সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে, মুক্ত অর্থনীতির প্রভাবে তারাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে সাহিত্যজগতের পৃষ্ঠপোষণা করেছে তাদেরই কেউ কেউ। যাই হোক, যে সময়টিকে অতিক্রম করে লেখক তাঁর সাহিত্যযাত্রাটি করেছেন, সেই সময়ের অভিঘাত যে তাঁর লেখায় প্রভাব রেখে যাবে, তা খুবই প্রার্থিত ঘটনা। ফলে বিশ্বায়ন তার অভিঘাতসমূহকে ধারণ করে যে তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে হাজির হয়েছে তা উদাহরণসহ তুলে ধরা যায়।

বিশ্বায়ন সারা বিশ্বে পুঁজিতে ভর করে মূলত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তার প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিস্তৃত করেছে। সাধারণ মানুষের কাছে এই নতুন যুগে তাই ইংরেজি ভাষামাধ্যম বিত্তশালী হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রযুক্তি। মানুষ তার সন্তানদেরকে নতুন যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে এই দুই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সফল হওয়ার পরে দেখা গেল এই শিক্ষার উপযোগিতা নির্দিষ্ট স্থাননির্ভর। তাই অবধারিতভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হল পরিযাণ। তৃতীয় বিশ্বের যুব সম্প্রদায় শিক্ষান্তে পাড়ি দিল প্রথম বিশ্বের স্বপ্নের জগতে। পিছনে পড়ে রইল পিতা-মাতা-আত্মীয়স্বজন কিংবা দেশ। অর্থই হয়ে উঠল আত্মীয়। ব্যক্তি মানুষ কিংবা পারিবারিক সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রে অবধারিতভাবেই দেখা দিল পরিবর্তন। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক ছোটোগল্পে এই বদলের দিকগুলি ধরা পড়েছে। এই ধরনের একটি ছোটোগল্প হল 'সংশোধন' (*গল্প ৫১*) । এই গল্পে উঠে এসেছে সত্তর ছুঁই ছুঁই হরেন পাল আর নিখিল সেনগুপ্তের কথা। সংসার কিংবা সমাজে তাঁরা আজ পরিত্যক্ত। কিন্তু এঁরাই একদিন সমাজ-সংসারকে গড়েছিলেন। এঁদের সন্তানদের অনেকেই লেখাপড়া শিখে

বিদেশে সেটেলড। কেউ পুরানো জায়গা-জমি প্রোমোটারের হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে ফ্ল্যাট পেয়ে তাতে বসবাস করেন। বর্তমান সময়ের কাছ থেকে অবজ্ঞা পেয়ে তাঁরা স্মৃতির পুরানো সময়ের কথা ভেবে আর আলোচনা করে বাঁচেন। শেষপর্যন্ত এই গল্পটি একধরনের জাদুবাস্তবতার দিকে যাত্রা করে, যেখানে একদল বৃদ্ধ মানুষ ঘড়িকে পিছিয়ে দিয়ে সমাজের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এটিই গল্পের মূল উপজীব্য নয়, বরং তার স্তরে স্তরে উঠে এসেছে পরিবার কিংবা ব্যক্তি সম্পর্কের বদলজনিত বিভিন্ন দিক—

নিখিলবাবুর দুই সন্তান। দু-জনেই অনেকদিন থেকে দূরে, ছেলে পরিবার নিয়ে আমেরিকায়। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন দিল্লিতে। নিখিলবাবুর দুই ভাই। প্রোমোটারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন পৈতৃক বাড়ি। ভাই যেহেতু চেন্নাইয়ে সেটেলড, টাকার বিনিময়ে নিজের গোটা অংশ ছেড়ে দিয়েছে।

নিখিলবাবু পেয়েছেন একটা হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট, আর কিছু টাকা।...

প্রচুর আত্মীয়স্বজন আছে আমার। কেউ খোঁজখবর করে না। কেন করবে? আমি কি কোনোদিন তাদের ভালোমন্দর খোঁজ নিয়েছি সেভাবে ! নিজের পরিবারটাকেই ধ্যানজ্ঞান করেছি চিরকাল। ছেলেমেয়েকে প্রথম থেকেই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়েছি, যাতে এই পোড়া রাজ্যে থাকতে না হয়। ছেলে তো সুযোগ পেয়ে দেশটাই ছেড়ে দিল। আমার এই নিঃসঙ্গতার জন্য আমিই দায়ী।

...আমি যাতে নিজেকে একা বা বিচ্ছিন্ন না ভাবি, সেই জন্য ভাই-বোন অলটারনেটিভ ডে-তে আমাকে ফোন করে। কথা হয় খুব সামান্যই এবং একই কথা—টাইমে খাওয়া দাওয়া করেছ তো ? শরীর কেমন? কোনো ওষুধ খেতে ভুলে যাওনি? আজ ওখানে ওয়েদার কেমন...ব্যাস এখানেই শেষ। একসঙ্গে থাকলে তবে না অনেক প্রসঙ্গের জন্ম হয়। ছেলেমেয়ে, জামাই, বউমা তো বটেই নাতি-নাতনিরাও মনে করে ফোনে আমার জন্মদিনে উইশ করে। মনে কিন্তু ওরা করে না, রিমাইন্ডার দেওয়া থাকে মোবাইলে। যন্ত্র ওদের মনে করায়। সম্পর্কটা একেবারেই যান্ত্রিক হয়ে গেছে।[২৪]

এই ধরনেরই আর একটি গল্প ‘সংরক্ষক’ (*গল্প ৫১*)। এই গল্পেও অবধারিতভাবে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন-সৃষ্ট পরিযাণের কথা। গল্পটি ভিন্নতর এক মূল্যবোধকে সামনে আনে। বিশ্বায়ন পর্বটিকে যারা আন্দাজ করতে পেরেছিল কিংবা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদেরকে এই নতুন দুনিয়ার উপযোগী করে তুলতে পেরেছিল, তারা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিল উচ্চ আয়ের মানুষ। আর এই গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পারা মানুষের দল নতুন এই অর্থনৈতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে পিছিয়ে পড়ছিল জীবনযুদ্ধে। অথচ প্রথম শ্রেণিটির মানুষজন যখন মানবিক দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়ে পড়ছিল স্বভাবতই, তখন জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষের দ্বিতীয় দলটি সেই দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসছিল। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এই গল্পটিতে দেখিয়েছেন যে ‘দ্বিতীয়’ শ্রেণির এই মানুষদের কেউ কেউ ‘সংরক্ষক’ হয়ে ওঠেন। এই গল্প তাই শেষপর্যন্ত এক আশাবাদের কথা বলে। তবু অবশ্যম্ভাবী ভাবে এই গল্পে উঠে আসে ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা পরিবার সম্পর্কের বদলের একাধিক দিক—

> আমি বহুজাতিক এক কেমিক্যাল কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার। চেন্নাইয়ে পোস্টিং। সেখানে আমার দেড় হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট এবং সাড়ে আট লাখের গাড়ি। ব্যাচেলার ডিগ্রি পেয়েই চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম রাজ্যের বাইরে। কলকাতাতেও কিছু অফার ছিল, বেতন বড়ই কম। দুটো কোম্পানির চাকরি ছেড়ে, ভিনরাজ্য ঘুরে এখন আমি চেন্নাইয়ে সেটেলড। বদলির ব্যাপার নেই। বিভিন্ন শহরে ট্যুর করতে হয়। আসতে হয় কলকাতাতেও। এলে ভবানীপুরে কোম্পানির গেস্ট হাউসে থাকি। আমার পুরোনো বাড়িতে আসি না। ...
>
> চেন্নাইয়ে বসেই হাওড়ার বাড়িটা কিনলাম। কেনার পর এলাম এই প্রথমবার। এত দিন তালা মারা ছিল। ...

আমার কথার পিঠে মধু বলেছিল, "আমরা কেউই আর ওখানে গিয়ে থাকতে পারব না।জাস্ট আ ফোন কল অ্যাওয়ে জীবনের সব সুযোগ-সুবিধেয় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, যা তোমার ওই ক্ষীরেরতলায় কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়।...

রাস্তাঘাটে চেনা লোকেদের এড়াচ্ছি। একবার মুখোমুখি হয়ে গেলে কথা শেষ হতে চাইবে না। বিশেষ করে আমি সেই সব ছোটোবেলার বন্ধুদের এড়াতে চাই, যারা জীবনে ব্যর্থ হয়েছে।[২৫]

বিশ্বায়ন যে পরিবারসম্পর্ক কিংবা পরিবার-ব্যবস্থার বদল ঘটিয়েছে তা অনস্বীকার্য। ছোটোগল্পকার সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে অসামান্য দক্ষতায় সেই বদলে যাওয়া পরিবারের রূপটিকে ধরেছেন। সেইরকমই আর একটি ছোটোগল্প হল 'খোলস' (*গল্প ৫১*)। বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করার ফলে দেশগুলির মধ্যে পরিযান বেড়েছে বিভিন্নভাবে। একদিকে যেমন লগ্নিপুঁজির প্রবাহ বেড়েছে, তেমনি শিক্ষা কিংবা কর্মসংস্থানের তাগিদে পরিযাণ বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলস্বরূপ পরিবারব্যবস্থারও বদল হয়ে পড়েছে অবশ্যম্ভাবী। একই পরিবারের সদস্যদের একই ছাদের তলায় বাস করবার রীতি এর ফলে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে। বরং দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন অক্ষাংশে ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষুদ্র পরিবারের সদস্যরা—

ডাক্তার রায় কখনো বেঙ্গালুরু, কখনো বা মুম্বাইয়ের প্রাইভেট হসপিটালে। এর মধ্যে এক ছেলে, এক মেয়ে পড়াশোনা করে বড়ো হয়ে গেল। ছেলে কানাডায় পিএইচ.ডি. করছে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে মুম্বাইতে, চাকরি করে ওখানকারই একটা অ্যাড এজেন্সিতে। পঞ্চাশ পার হওয়ার পর কলকাতার প্রাইভেট হসপিটালে জয়েন করলেন ডাক্তার অপূর্ব রায়।[২৬]

উদ্ধৃতিটি থেকে বেশ বোঝা যায় পরিবার ব্যবস্থাতেও এসে আছড়ে পড়েছে বিশ্বায়নের ঢেউ। আর তারই অভিঘাত মানুষগুলিকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে তুলেছে ভিন্ন ভিন্ন সব দেশের উপকূলে। সুকান্ত

গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের ধারায় এইরকম আরও কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'স্বপ্ন যখন অপরাধী', 'অঙ্গারিত', 'ইহাদের কথা', 'মায়েরা' ইত্যাদি।

৬.৭॥ **প্রচেত গুপ্ত**

বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় কথাকার প্রচেত গুপ্ত (জন্ম-১৯৬২) তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক কিংবা পরিবার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বদলের বিভিন্ন মাত্রাসমূহকে। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে পড়ছিল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পালটে যাচ্ছিল পরিবারের গঠন। একদিকে যেমন দ্রুত ভাঙছিল একান্নবর্তী পরিবার, অন্যদিকে উচ্চমানের জীবনযাত্রা বজায় রাখার তাগিদে এবং তার পাশাপাশি ইতিমধ্যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা নারীসমাজ পূর্বের তুলনায় দ্রুত উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণ করছিল। সেই কারণে ইতিপূর্বে পরিবারের প্রচলিত গঠনটির ক্ষেত্রেও বদল দেখা যাচ্ছিল। উপার্জনের তাগিদে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির বাবা-মা যখন প্রতিনিয়ত বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তখন তাঁদের গৃহে সৃষ্টি হচ্ছিল এক ধরনের শূন্যতা। একটি বা দুটি সন্তানকে তখন আর দেখার লোক হচ্ছিল না সেভাবে। কারণ ততদিনে ছিঁড়ে গিয়েছে একান্নবর্তী পরিবারের সম্পর্কসূত্রগুলি। এমত পরিস্থিতিতে সন্তানদের দেখভালের জন্য কিংবা দৈনন্দিন ন্যূনতম পারিবারিক কার্যনির্বাহের জন্য অর্থের বিনিময়ে লোক রাখতে হচ্ছিল উচ্চবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে। অন্যদিকে এটিও বাস্তব যে, নিম্ন অর্থনৈতিক স্তরের যে মহিলাটিকে (সাধারণত) বাড়ির কাজের জন্য রাখা হচ্ছিল, তার বাড়িতেও দেখা দিচ্ছিল শূন্যতা, অথবা তাকে নিজগৃহে এবং মালিকের গৃহে— উভয়ক্ষেত্রেই গৃহকর্ম করতে হচ্ছিল। স্বভাবতই তার কাজের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ

বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে একথা মানতেই হয় যে, এতদিনের পারিশ্রমিকবিহীন গৃহকর্মের পরিবর্তে অন্যের গৃহে কাজের পরিবর্তে কিছুটা হলেও অর্থের মুখ দেখেছিল তারা। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির সন্তানরা লেখাপড়া কিংবা উপার্জনের তাগিদে প্রবাসী হয়ে পড়ায়, তাদের বাড়ির মানুষজনদের দেখাশোনার ভার অর্থের বিনিময়ে হলেও ধীরে ধীরে এসে পড়েছিল নিম্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষদের উপর। প্রচেত গুপ্তের ছোটোগল্পে এইধরনের বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। তাঁর এই ধরনের একটি ছোটোগল্প হল 'সখী' (*দেশ*, ১৭ই মে, ২০০৫)। এ গল্পে লেখক দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের দুই নারীর কথা তুলে ধরেছেন। সুপর্ণা উচ্চমধ্যবিত্ত এবং সে কর্পোরেট সংস্থায় চাকুরিরতা নারী। অন্যদিকে তারই একসময়ের সহপাঠী শান্তি অবস্থা বৈগুণ্যে নিম্নবিত্ত অর্থনৈতিক স্তরের বাসিন্দা। ঘটনাচক্রে সুপর্ণার ব্যস্ত জগতে সংসার সামলাতে একজন কাজের লোকের প্রয়োজন দেখা দিলে তার মায়ের মারফত কাজের জন্য তার কাছে আসে শান্তি, গল্পে যে নিজেকে পরিচয় দেয় 'বাতাসির মা' নামে। হয়তো এটাও একটি বাস্তব, যে কাজের লোকেদের, বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিনামে পরিচিত হতে নেই। শান্তি তাই হয়ে যায় বাতাসির মা। কিন্তু এককালের সহপাঠীকে চিনতে পারে সুপর্ণা। তার মনে অস্বস্তি দেখা দেয় সহপাঠীকে কাজের লোক হিসাবে রাখতে। তাই একদিন মেয়ের জ্বর উপলক্ষ্যে কাজে আসতে দেরি হওয়ায় সুপর্ণা শান্তিকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়। এইভাবে সে নিজের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেলেও শান্তির কথা ভুলে যায় না, বরং গল্পের শেষে লেখক কর্পোরেট অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুপর্ণাকে হাজির করেন শান্তির টিনের ঘরে। গল্পের মূল আখ্যানের পরিণতি এরকম হলেও এ গল্পের অন্তরে থাকে আরও কিছু ঘটনাপ্রবাহ। এ গল্পে দেখা যায় চাকুরিরত দম্পতি নির্মল-সুপর্ণার একমাত্র কন্যাসন্তান মিমি পড়াশোনার কারণে পুনে-তে বসবাস করে। নির্মলের বৃদ্ধ বাবা তাদের সঙ্গে একত্রে বাস করলেও তাঁকে সারাদিন

দেখাশোনার কেউ থাকে না। সেইকারণেই একটি কাজের লোক এই বাড়িটিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রচেত গুপ্ত এ গল্পে যে সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন, তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে নাগরিক মধ্যবিত্ত-জীবনের অন্যতম সমস্যা। একদিকে অর্থনৈতিক কারণে একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে গিয়েছে, অন্যদিকে পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহণের ফলে দ্রুত জনসংখ্যা কমে গিয়েছে। আবার সেইরকম পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষা কিংবা কর্মের তাগিদে প্রবাসী হয়ে পড়লে স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্তের গৃহের বাসিন্দার সংখ্যা কমে গিয়েছে দ্রুত। এর ফলে পরিবারের ন্যূনতম পরিষেবা বজায় রাখতে বাইরে থেকে অর্থের বিনিময়ে মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে প্রবাসী সন্তানটির ক্ষেত্রে গড়ে উঠছে আলাদা একটি জগৎ—যা আর বাবা-মা কিংবা পরিচিত আত্মীয়বৃত্তের মানুষজনকে নিয়ে নয়। এইভাবে পরিবার কিংবা ব্যক্তিসম্পর্কের বদলগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে—

> তুমি কেমন আছ? পড়াশোনা কেমন চলছে?
>
> 'ওমা, কেমন আছি তো পরশুদিনই বললাম! ভুলে গেলে নাকি? ঠিক আছে, আবার বলছি। তোমাদের ছেড়ে খুব খারাপ আছি। যাকে বলে ভেরি ব্যাড। আবার নতুন পড়াশোনা, আড্ডা, হস্টেল লাইফ নিয়ে দারুণ আছি। একেবারে ভেরি গুড বলতে পারো। সব মিলিয়ে গুড-ব্যাড আছি। হি হি। তোমার মেলে একটা লিস্ট পাঠিয়েছি, আজই দেখে নেবে। জিনিসগুলো কিনে রাখবে।[২৭]

এ গল্পের সমাপ্তিতে লেখক একরকম আশাবাদের দিকে পাঠকমনকে আকৃষ্ট করলেও ব্যক্তিসম্পর্কের বদলগুলি চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

'আহা! আজি এ বসন্তে'[২৮] (*প্রতিদিন রোববার,* ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০০৯) গল্পটির মধ্যে লেখক একধরনের হাস্যরসকে প্রবাহিত করলেও তার অন্তরালে ব্যক্তিসম্পর্কের বদলের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দিতি নামক চরিত্রটির জন্য পাত্র স্থির করেন তার মেজমামিমা। পাত্র ইঞ্জিনিয়ার,

খুব তাড়াতাড়ি সে চলে যাবে পেনসিলভেনিয়াতে। তার আগে বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা তার অভিভাবকদের। অন্যদিকে দিতি প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ ভোম্বলের সঙ্গে। ফলে, সে এই প্রস্তাবে দ্বিধায় পড়ে। ভোম্বলকে সে পুরো ঘটনা জানায়। কিন্তু তারই প্রায় সমবয়সী ভোম্বল তাৎক্ষণিকভাবে দিতির বিবাহের প্রস্তাবে রাজি না হলে দিতি খুবই ক্ষুব্ধ হয়। সে এতদিনের প্রেমের সম্পর্ককে খুব দ্রুত অস্বীকার করে ইঞ্জিনিয়ার পাত্রকে বিবাহ করতে সম্মত হয়ে যায়। মনে গড়ে তোলে বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন। এ গল্প হাসির আড়ালে প্রেমের বলিদানকে তুলে ধরে। অর্থ, প্রতিপত্তি আর প্রথম বিশ্বে যাওয়ার হাতছানি একটি স্বাভাবিক প্রেমের অপমৃত্যু ঘটায়। বদলে যায় দু'জন ব্যক্তির মধ্যেকার এতদিনের সম্পর্ক। তৃতীয় ব্যক্তির জয়লাভ সেখানে বিশ্বায়নব্যবস্থার আশীর্বাদেই ঘটে যেতে দেখা যায়।

'ইমেল বিছানো পথে'[২৯] (*কথা সাহিত্য* শারদীয়া ১৪১৪) ছোটোগল্পটিতেও যে পরিবারটির কথা উঠে আসে, সেটি পৃথিবীর দুই প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কিছু মানুষকে নিয়ে গঠিত। আর এই পরিযাণ সম্ভব হয়েছিল বিশ্বায়নব্যবস্থার জন্য। শিবনাথবাবু আর বাসবীদেবীর পুত্র সূর্য আমেরিকায় শিক্ষকতা করে। সে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে বেজিং-এর মেয়ে সুচিয়ং-এর সঙ্গে। তাদের দাম্পত্যে একটি কন্যা সন্তানও এসেছে। তবে শিবনাথবাবু কিংবা বাসবীদেবী—কেউই সুচিয়ং কিংবা তাদের কন্যাকে সরাসরি দেখেন নি। আমেরিকা থেকে পাঠানো ছবিতে তাদেরকে দেখেছেন। যোগাযোগ বলতে টেলিফোন আর ইমেল। মনে রাখা দরকার এ গল্প ২০০৭ সালের, বর্তমান সময়ের মতো দ্রুত গতির ইন্টারনেট কিংবা ভিডিও কলের সুবিধা তখনো এত সুলভ ছিল না। ফলে ভারতীয় ঠাকুরদার নাতনি আমেরিকায় বেড়ে উঠতে থাকলেও তাকে সক্রিয় অবস্থায় দেখার সুযোগও তাঁরা পাননি। এ গল্পের নিরিখে দেখা যায়, বিশ্বায়নের কারণে ছেলে আমেরিকায় গিয়ে চিনদেশের মেয়েকে বিবাহ করার কারণে এক আন্তর্জাতিক পরিবার গড়ে

উঠলেও ঠাকুরদা-ঠাকুরমা তাঁদের আত্মজের কন্যাকে স্পর্শ করার অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। পরিবারে একত্রবাসের কারণে চোখের সামনে উত্তরসূরির দৈনিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করার যে স্বাদ, তা থেকে তাঁরা অনেক দূরে বাস করেন। অনেক অর্থ কিংবা প্রতিপত্তির আড়ালে বিশ্বায়ন এভাবেই হয়তো কেড়ে নিয়েছে ব্যক্তি কিংবা পরিবার সম্পর্কের অন্তর্গত নৈকট্যজনিত উষ্ণতাকে।

৬.৮॥ **কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়**

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৬৪) বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় ছোটোগল্পকার। তিনি মূলত *আনন্দবাজার পত্রিকা*-গোষ্ঠীর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন। *দেশ, উনিশ-কুড়ি, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা* ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একুশ শতকের প্রথম দশকে লিখতে শুরু করেন। ছোটোগল্পের পাশাপাশি একাধিক উপন্যাসও তিনি রচনা করেছে। তাঁর লেখা থেকে কয়েকটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে।[৩০] তাঁর ছোটোগল্পে উঠে এসেছে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন, কৈশোরের প্রেম, কর্পোরেট জগতের বিভিন্ন অনুপুঙ্খ কিংবা প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক জীবনযাত্রা। এর পাশাপাশি বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণ হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটোগল্পের অন্যতম বিষয়। আধুনিক চিকিৎসাপরিষেবাক্ষেত্রের একাধিক বর্ণনা তাঁর ছোটোগল্পে খুঁজে পাওয়া যায়। আর এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে একজন ছোটোগল্পকার হিসাবে তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন মানুষের মননের জগতটিকে।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে বিনোদনব্যবস্থার দ্রুত বদলের কারণে লাভজনক এই ক্ষেত্রটিতে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মূলত মেট্রো শহরগুলিতে বার, নাইটক্লাব ইত্যাদি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতের বাণিজ্যনগরী মুম্বাইতে তৈরি হয় এইধরনের বহু বার,

যাতে কাজ করত অগণিত বার ডান্সার। শুধু তাই নয়, এই ইন্ডাস্ট্রিকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন জুটত। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মূলত নারীদের একটি অংশ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯৮০-র দশক থেকে গড়ে ওঠা এই বার-গুলির উপরে মহারাষ্ট্র সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর আর পাটিলের উদ্যোগে ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর ফলে প্রায় সাতশো বার বন্ধ হয়ে যায়। কর্মহীন হয়ে পড়েন পঁচাত্তর হাজার বার ডান্সার এবং আরও প্রায় পঁচাত্তর হাজার সহযোগী বিভিন্নস্তরের কর্মী। যে বার ডান্সাররা অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিবার ও সন্তানাদি পালন করতেন, তাঁরা চরম বিপদে পড়েন।[৩১] কর্মহীন হয়ে পড়ে অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় ফিরে এসে বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা খুঁজলেও তাঁদের পূর্ব পরিচয় সমাজের তির্যক মনোভাবকে এড়িয়ে এগোনোর ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হয়েছিল। এই ডান্স বার সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় রচনা করেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ছোটোগল্প 'নাচ' (*সানন্দা*, ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৬)। এই গল্পে উঠে আসে অন্তরা ওরফে জিনিয়া নামের এক বার ডান্সারের কথা, যে মুম্বাইয়ে ডান্স বার সংকটের সময়ে কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে সে নিজ এলাকায় একটি নাচের স্কুল খুলে জীবিকা উপার্জনের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার পূর্ব পরিচয়। মুম্বাইয়ে তাকে চিনত এমন এক খদ্দের কলকাতায় তাকে দেখে ফেলে। এরপর তার যাতায়াত শুরু হয় অন্তরার ফ্ল্যাটে, একটি বিশেষ গানে নাচার আবেদন নিয়ে। কিন্তু অন্তরার পক্ষে লোকটির সেই অনুরোধ রাখা সম্ভব ছিল না। সে ভদ্র মধ্যবিত্ত পল্লীতে বাস করার ইচ্ছায় পূর্ব পরিচিতিকে গোপন করে নতুন জীবিকায় মনোনিবেশ করতে চাইছিল। এই আশায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় লোকটি এবং এলাকারই কিছু রকে বসা তরুণ। তারা সরাসরি অন্তরার সঙ্গে পেরে না উঠে শেষপর্যন্ত মধুচক্র চালানোর অপবাদে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অন্তরার ফ্ল্যাটে হানা দেয়। তবে এই গল্পের শেষে এক অন্য আশাবাদকে তুলে ধরতে চেয়েছেন

লেখক, যেখানে মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীরা অন্তরার পরিচয় জানার পর তাকে প্রত্যাখ্যান করার বদলে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তার লড়াইয়ের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে। পূর্বেকার সমাজপ্রচলিত মূল্যবোধ থেকে যা অনেকাংশেই আলাদা। এ গল্পে লেখক স্বামীপরিত্যক্তা এক নারীকে কন্যাসহ মাথা উঁচু করে বাঁচার লড়াইতে রত অবস্থায় তুলে ধরেছেন, সেই সঙ্গে বার ডান্সারদের জীবনের করুণ দিকটিকে দেখাতে চেয়েছেন। এ গল্পে ভালোবাসার টানে যে প্রদীপকে বিবাহ করে অন্তরা ঘর ছেড়েছিল, সেই প্রদীপ অন্তরাকে শিশুকন্যাসহ মুম্বাইতে ফেলে রেখে দুবাইতে পাড়ি দেয়। নিজের এবং কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদে বার ডান্সারের পেশাকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল অন্তরা।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে পূর্বতন পরিবারব্যবস্থা। নাগরিক এবং ক্ষুদ্র পরিবারগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের পূর্বের প্রজন্মগুলির থেকে অনেকাংশেই পৃথক। ভোগবাদ কোথাও যেন পারিবারিক সুস্থিতিকে টলিয়ে দিয়ে অগ্রসর হতে চেয়েছে অধিক উপার্জনের লক্ষ্যমাত্রার দিকে। এই কারণে মানুষের অবসরের সময়গুলিকেও সে বিক্রি করে দিতে চেয়েছে। পরিবার কিংবা সন্তানাদির জন্যেও বরাদ্দ রাখেনি কোনো সময়। কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন এইধরনের বিষয়গুলিকে। সেইরকম একটি ছোটোগল্প হল 'শীলা' (*সানন্দা,* পার্বণী ২০১২)। এ গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে ২০০৭-২০০৯ সময়কালে চলা আমেরিকার রিসেশন[৩২]। যার প্রভাব এসে পড়েছিল ভারতীয় আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলির উপরেও। যেগুলি বেশ খানিকটা নির্ভরশীল ছিল আমেরিকা থেকে আউটসোর্স করা কাজের উপরে। এ গল্পে সেইরকম একটি কোম্পানি 'ক্যাডমিয়াম সলিউশনস'-এর কর্মী চল্লিশোর্ধ্ব সুমন বসুর সংসার স্ত্রী মধুছন্দা আর কন্যা ঝুমকিকে নিয়ে। ধীরে ধীরে রিসেশনের প্রভাবে কর্মচ্যুতির ভয় গ্রাস করতে থাকে সুমনকে। এর প্রভাব পড়ে তাদের দাম্পত্যে।

সারাদিনের পর গভীর রাত্রিতেও ল্যাপটপে কাজ করতে করতে স্ত্রীকে আর সময় দেওয়া হয় না সুমনের। সে আসক্ত হয়ে পড়ে নীল ছবিতে। তার বদ্ধজীবন আর কর্মজগতের চাপ তার এতদিনের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে ভেঙেচুরে নিষিদ্ধ জীবনের দিকে নিয়ে যেতে চায়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে বডি ম্যাসাজের বিজ্ঞাপনের ফোন নম্বরে ফোন করে সে শীলা নাম্নী এক নিষিদ্ধ জগতের নারীর সন্ধান পায়। সে চেষ্টা করে পরিবারকে এড়িয়ে শীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে। সেই টানে সে পৌঁছায় একটি বার-এ। বার-এর টেবিলে এক অজানা চরিত্রের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। যে সুমনকে শোনায় দ্বৈপায়ন আর অপরূপার নিঃসন্তান দাম্পত্যের করুণ কাহিনি। শেষপর্যন্ত যা সমাপ্ত হয়েছিল অপরূপার আত্মহত্যার মাধ্যমে। এই কাহিনি শুনে মধ্যবিত্ত সুখী জীবন থেকে বেপথু হতে চলা সুমন ফিরে চলে বাড়িতে, তার মেয়ে ঝুমকির জন্মদিনে। পূর্বের আলোচ্য ছোটোগল্পটির মতো এ গল্পেও লেখক এক আশাবাদের কথা তুলে ধরেন গল্পের পরিণতিতে। তবু তার মধ্যে দিয়ে গল্পটিতে উঠে আসে ব্যক্তি তথা পরিবারসম্পর্কের বদলে যাওয়ার অনুপুঙ্খসমূহ—

> মধুছন্দা চোখ বন্ধ করল। কপালের কাছে হাত জোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকল, সুমনের বিদেশি ক্লায়েন্টের সলিউশনটা যেন ঠিকঠাক হয়ে যায়।...
>
> ল্যাপটপটা কোলে নিয়ে সোফায় বসেছিল সুমন। চোখটা ছিল বেডরুমের দরজার দিকে। দরজাটা বন্ধ। কিন্তু দরজার তোলার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা। সেটা নিভে যেতেই নিশ্চিন্ত হল সুমন। মধুছন্দা শুয়ে পড়েছে।
>
> এটা দেখেই তৎপর হয়ে উঠল সুমন। বেডরুম সংলগ্ন একটা ছোট স্টাডি আছে। তার টেবিলের ড্রয়ারে আছে সুমনের পাস বই, চেক বই থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর। ড্রয়ারটাতে চাবি দেওয়া থাকে। চাবি খুলে ড্রয়ারটা ঘাঁটতে থাকল সুমন। গাদাগুচ্ছের কাগজের তলা থেকে সুমন বার করে আনল একটা সিডি।

বহুকাল আগে এ ধরনের ব্লু ফিল্মের সিডি বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আদান-প্রদান হত। কালের স্রোতে এসব দেখার আগ্রহ ঘুমিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার যেন সেটা জেগে উঠেছে। শরীরে একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়েছে শীলা। সেই স্ফুলিঙ্গ এখন আগুন হয়ে শরীরের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলছে।

ল্যাপটপের ক্যাডিতে সিডিটা পুরে ভলিউমটা মিউট করে দিল সুমন। কোলের ওপর ল্যাপটপের স্ক্রিন। সেখানে শুরু হল পুরুষ নারীর শরীর নিষ্পেষণের আদিম খেলা। ক্রমশ শরীরটা শক্ত হতে থাকল সুমনের। স্ক্রিনের ওপর সাদা চামড়ার মেয়েটা যেন চিৎকার করে বলছে, "কাম অন...কাম অন সুমন...লাভ মি...কিস মি...নাইট ইজ স্টিল ইয়ং।"

একটু পরেই এক ধরনের ক্লান্তি এল সুমনের শরীরে। আসলে শরীরের ভেতরটা যে আগুন ছারখার করে দিচ্ছে তা এই নীল ছবি দেখে মিটবে না। চাই শীলার মতো একটা রক্তমাংসের নারী। আর কিছু টাকা এবং একবুক সাহস।

তিনটে জিনিসের মধ্যে মধ্যের জিনিসটা তেমন হয়তো সমস্যা নয়। সুমনের একটা অ্যাকাউন্টের খোঁজ এখনও মধুছন্দা জানে না। প্রথম জিনিসটারও একটা হদিস পাওয়া গিয়েছে, শীলা। দশটা সংখ্যার মোবাইল নম্বরটা লিখে রেখেছে মানি ব্যাগে। দরকার শুধু শেষ জিনিসটার। সাহস, একবারের জন্য দরকার ম্যাড়ম্যাড়ে ঘুণ ধরা মধ্যবিত্ত নীতিবোধটা চুরমার করে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শীলার কাছে পৌঁছে যাওয়ার সাহস। আর সেখানেই একটা খচখচানি। কিছুতেই যে নীতিবোধের জগদ্দল পাহাড়টা ছুড়ে ফেলা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বেডরুমের দরজাটা খুলে গেল। সুমন তাড়াতাড়ি ল্যাপটপে ডালাটা বন্ধ করে দরজার দিকে তাকাল। মধুছন্দা! অসহ্য লাগছে এখন এই বেঢপ শরীরের মহিলাটার দিকে তাকাতে।[৩৩]

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হলেও এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ব্যক্তিমনের মূল্যবোধের টানাপোড়েন কিংবা বদলে যাওয়া ব্যক্তিসম্পর্ক।

'ভয়' (*সানন্দা*, পুজো ১৪১৯) গল্পটিতে ব্যক্তি তথা পরিবারসম্পর্কের আর একধরনের বদল পরিলক্ষিত হয়। এ গল্পে সৌমিত্র আর কুমকুমের সংসার ছেলে তাতানকে নিয়ে। কুমকুম

সাধারণ মানসিকতার নারী হলেও সৌমিত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সে স্ত্রীকে নিয়ে বড়োলোক বন্ধু শ্যাম ও অন্বেষার বিবাহবার্ষিকীর পার্টিতে যায়। সেখানে ঢালাও পানাহারের ব্যবস্থা। অন্যদিকে সৌমিত্র-কুমকুমের পুত্র তাতান একাই পড়ে থাকে বাড়িতে। সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য পড়ে থাকে তার জন্য। অনুষ্ঠান বাড়িতে আর এক অবস্থা। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা পানাহারে মত্ত থাকলেও বাড়ির শিশু মিকাই অনাদৃতভাবে একটি ঘরে বসে থাকে। তার সঙ্গী হয় কুমকুম। বেশ কিছুক্ষণ শিশুটির সঙ্গে সময় কাটানোর পর তারা বাড়িতে ফিরে আসে। পরের দিন শিশুটির মধ্যে একরকম ট্রমার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার এত সংকটের মুহূর্তে বাবা কিংবা মা—কেউই তাদের অফিস ফেলে কাজের লোকের কাছে থাকা শিশুটির কাছে আসতে পারে না। পরিবারটি শিশুটির ট্রমার পশ্চাতে অলৌকিক প্রভাবের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করলেও বোঝা যায়, অনাদৃত শিশুটি কোনো এক ফাঁকে তার বাবার মোবাইলে রাখা চাইল্ড পর্নের ভিডিয়ো দেখে ফেলায় তার মনে ট্রমার সৃষ্টি হয়েছে। এ গল্পে উঠে আসে উচ্চবিত্ত পরিবারে শিশুর একাকীত্বের একাধিক অনুপুঙ্খ—

> মিকাইয়ের খাটের এক কোনায় এসে আলগোছে বসল কুমকুম। কাচের দেওয়াল জোড়া ক্যাবিনেটটা দেখে একটা অবাস্তব প্রশ্ন করল, "এত খেলনা, সব তোমার?"
>
> "হুম! কিন্তু সব লক করা আছে, চাবি মাম্মার কাছে।"
>
> কুমকুমের খারাপ লাগল। এত দামি দামি লোভনীয় খেলনা তা হলে শুধু সাজিয়ে রাখার জন্য? ওগুলো ছোঁয়া যায় না? এই ব্যাপারে কুমকুমের তাতানকে ভাগ্যবান মনে হল। সংখ্যায়, মূল্যে এর এক শতাংশ খেলনাও তাতানের নেই। কিন্তু হাতগোনা যে ক'টা আছে সেগুলো নিয়ে যথেষ্ট খেলার অধিকার তাতানের আছে। ... ঘরে আরও চোখ বুলিয়ে মিকাইয়ের টেবিলে একটা মোবাইল পর্যন্ত দেখতে পেল কুমকুম।
>
> "তোমার মোবাইলও আছে?"
>
> "ওটা পাপার। আমি গেম খেলার জন্য নিয়ে এসেছি। পোকেম্যান খেলছিলাম। সববার আমিই জিতে গিয়েছি। বোরড হয়ে গিয়েছি। চলো আন্টি। আমরা অন্য কিছু খেলি।"

"কী খেলব?" আনমনা হয়ে কুমকুমের গলা থেকে বেরিয়ে এল, সব খেলনা তো তালা বন্ধ।"

"খেলনা লাগবে না। আমরা চু চু চিতা খেলব।"...[৩৪]

সম্পদের বাহুল্যই যে মানুষের একাকীত্বকে অপসারণ করতে পারে না, এ গল্পে লেখক সেই দিকটিকে আর একবার মনে করিয়ে দেন। সেই একাকীত্ব যে কতখানি বেপথু হয়ে ভয়াবহ পরিণতিতে পৌঁছে যেতে পারে, সেই দৃষ্টান্তই উঠে আসে এ গল্পে—

শ্যাম ঘুমোচ্ছে। টেবলে মোবাইলটা। অন্বেষা মোবাইলে খুঁজতে থাকল কাল মিকাই কী গান শুনছিল। গান নয়, ঘাঁটতে ঘাঁটতে অন্বেষা পেয়ে গেল কিছু ভিডিও। জঘন্য চাইল্ড পর্নোগ্রাফির ভিডিও। একেবারে বিকৃত রুচির, হার্ড কোর। শ্যামকে ঝাঁকিয়ে তুলল অন্বেষা। চোখের সামনে মোবাইলের ভিডিওটা নাড়িয়ে কৈফিয়ত চাইল, "এটা কী?"

চটকা ভাঙা ঘুম নিয়ে শ্যাম বলল, "দেখছ? ওফ কী আজকাল হয় না। শিবাজির কালেকশন আছে বটে। কাল পার্টির মধ্যেই ব্লু-টুথ দিয়ে ফাইলগুলো ট্রান্সফার করেছে।"

"ভুলে গিয়েছ মিকাইয়ের কী হয়েছে?" চিৎকার করল অন্বেষা, "এইসব ছবি ও দেখেছে। আমি ভাবতেই পারছি না...সাংঘাতিক ট্রমা...তুকতাক কে করেছে তোমার মোটা মাথায় ঢুকেছে কি?"[৩৫]

এ গল্প পাঠকের সামনে ব্যক্তি তথা পরিবার সম্পর্কের বদলের ভয়াবহতাকে তুলে ধরে। একদিকে এইধরনের পরিবারগুলি পূর্বপ্রজন্মের সংস্পর্শহীন। তাঁদের যে সাহচর্য শিশুর শূন্যতাকে ভরিয়ে রাখতে পারত তা না থাকার ফলে শিশুর মনে বিভিন্ন বিকৃতি বাসা বাঁধছে। অন্যদিকে শিশুর সাহচর্য-শূন্যতাকে ভরাতে খেলনা কিংবা প্রযুক্তি দিয়ে যে চেষ্টা চলছে তা অন্তঃসারশূন্য এবং ক্ষতিকর। এই ভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি তথা পরিবারসম্পর্কের বদলগুলিকে লেখক তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৬.৯॥ সুকান্তি দত্ত

ছোটোগল্পকার সুকান্তি দত্ত (জন্ম-১৯৬৫) তাঁর একাধিক গল্পে দেখিয়েছেন কীভাবে বিশ্বায়ন দ্রুত পূর্বতন উৎপাদনব্যবস্থাসমূহকে বদলে দিয়েছিল, যার ফলে পরিবর্তিত হচ্ছিল সমাজ এবং সামাজিক মূল্যবোধ। আর যেহেতু সেই সমাজ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত, তাই আরও আগে ঘটে গিয়েছিল ব্যক্তি মানুষের বদল। বিশ্ব থেকে ঘরের নিভৃত কোণ পর্যন্ত যেভাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ক্রিয়াশীল হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় পরিবার ও ব্যক্তি সম্পর্কের দ্রুত বদল ঘটে চলেছিল। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছিল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এই ক্ষুদ্র পরিবারগুলি প্রায়শই শহর বা সংলগ্ন এলাকায় ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিচ্ছিল। তাতে একদিকে যেমন পারিবারিক মূল্যবোধের বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটছিল, পাশাপাশি খুব দ্রুত গৃহীত হচ্ছিল ভোগবাদী পণ্যসংস্কৃতি। এই পরিসরের মানুষদের বেড়ানোর জায়গা হয়ে উঠছিল নতুন তৈরি হওয়া শপিং মলের সুখী পরিবেশ। তবে সমস্ত বয়সের মানুষের কাছে এই বদলে যাওয়া সংস্কৃতি সমানভাবে গৃহীত হয় নি। বিশ্বায়নের সংস্কৃতিকে দ্রুত গ্রহণ করে নিয়েছিল তরুণ প্রজন্ম। মধ্যবয়সীরা সাধারণভাবে ছিলেন দ্বিধান্বিত, আর প্রবীণরা এই প্রক্রিয়া থেকে অনেকাংশে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। মূলত এই পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল মধ্যবিত্ত সমাজে। যেখান থেকে উচ্চবিত্ত জীবনের হাতছানিতে পরিবার ভেঙে তরুণ প্রজন্ম বেরিয়ে এসে জীবন জীবিকার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক জায়গায় বাস করতে চাইছিল। তাদের মননের গভীরে মূল্যবোধেরও সাংঘাতিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তারা পণ্য করতে শিখে গিয়েছিল মানবিক অনুভূতিকে। শোককে চাপা দিতে শিখেছিল অর্থের বিনিময়ে। উন্নতির পশ্চাতে তাদের দৌড় ছিল অন্তহীন। সুকান্তি দত্ত তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে এই বদলগুলিকে সার্থকভাবে দেখিয়েছেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি হল 'লেবুপাতার ঘ্রাণ', 'খোলা চিঠি, ঊষসীকে', 'পর্নোগ্রাফির দিনরাত', 'হত্যাকাণ্ডের

আনুপূর্ব', 'পরমা, তোমার জন্যে', 'সাবান-সুন্দরীদের কোরাস', 'গল্প@ফেসবুক' ইত্যাদি। এই গল্পগুলিতে যেমন পরিবার সম্পর্কের বদল দেখানো হয়েছে, তার পাশাপাশি কয়েকটিতে উঠে এসেছে পরিবারের অন্তর্গত কিংবা পরিবার নিরপেক্ষ ব্যক্তি সম্পর্কের বদলের একাধিক দিক। শুধু সম্পর্কই নয়, ঘটে গিয়েছে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন। দ্রুত পালটে যাওয়া দাম্পত্য সম্পর্ক কিংবা সমলিঙ্গের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব সেই দিকগুলিকেই ইঙ্গিত করে। এইপ্রসঙ্গে বলা যায় উদারীকরণ কিংবা বিশ্বায়ন ব্যক্তি স্বাধীনতার যে আপাত প্রসার ঘটিয়েছিল তার ফলে পূর্বতন সমাজস্বীকৃত সম্পর্কের বাইরেও দেখা গিয়েছিল সম্পর্কের নানান মাত্রা। পরিবারসম্পর্ক আর মূল্যবোধের পরিবর্তন কীভাবে ঘটেছে তার উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে 'লেবুপাতার ঘ্রাণ' গল্পটি—

> বীথি বেঁচে থাকাকালীনই পঞ্চাশে পা দেওয়ার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার চোখের সামনে সব কিছু কত দ্রুত পালটে যাচ্ছে। সেদিনের এই কলোনিতে টাইমকলের জল এল, তারপর বছর দশেক হল দুটো মিনিবাসের রুট, একটা সি টি সি'র রুট, সকাল সন্ধ্যার দুটো কলেজ, মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল। পাড়ার দোকানেও কত অচেনা মুখের ভিড়। সবচেয়ে অস্বস্তি লাগত চেনা মানুষেরা যেন চোখের সামনে কেমন পালটে গেল। তার বন্ধুরা যারা একসময় তাদের মতে সিনেমায় নোংরা নাচ-গান-দৃশ্যের সমালোচনায় মুখর ছিল, তারাও এখন দিব্যি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সব কিছু ফেলে টিভির সামনে বসে সেইসব নাচ-গান উপভোগ করে।...
>
> প্রিয়নাথ জীবনে কোনোদিন মদ কী জিনিস জানেননি, জানবার আগ্রহ ছিল না বিন্দুমাত্র আর এখন মাঝেমধ্যেই তার এই বাড়িতে রাতে দোতলার ঘরে ওরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদের আসর বসায়। তা থাক, জীবন তো ওদের। বউমা বয়কাট চুল আর হাতকাটা নাইটি পরে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। প্রথম প্রথম চোখে একটু ধাক্কা লাগলেও এখন সয়ে গেছে। মাঝরাতে স্টিরিয়োতে ওরা ভিনদেশি বাজনা শোনে—এসবই প্রিয়নাথের চেনাজানা পৃথিবী থেকে অনেক দূরের, যে-কোনো ভিনগ্রহ থেকে উড়ে আসা একদল প্রাণীর মধ্যে তিনি এক আদিম মানুষ।[৩৬]

এ গল্পের অন্দরে স্থান করে নেয় পরিবর্তিত মূল্যবোধ, যা এক নির্দিষ্ট সময়দ্বারা নির্মিত। নাগরিক পরিষেবার বদল যেমন তার মধ্যে অন্যতম, তেমনি পূর্বপ্রজন্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বিনোদন কিংবা গৃহাভ্যন্তরের পোশাক পরবার রীতিতেও সেই সময়ের ছাপ স্পষ্টভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়।

'খোলা চিঠি, ঊষসীকে' (*মল্লার*, ২০০৫) গল্পটিতে ব্যক্তিসম্পর্কের আর এক ধরনের বদলের কথা উঠে আসে। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে পরিবারব্যবস্থার বদল ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির মাত্রাগুলিও পরিবর্তিত হয়েছে। নিজস্ব এলাকা কিংবা আত্মীয়বৃত্তের বাইরে অন্য ভূগোলে চলে যাওয়া নর-নারী সামাজিক কিংবা আইনি বিবাহের পদ্ধতি এড়িয়ে কিংবা সেই পদ্ধতিসমূহে আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে এগুলির বাইরে কোনো তথাকথিত বন্ধন ছাড়াই একত্রবাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এমন নয় যে এইধরনের উদাহরণ বাংলা ছোটোগল্পে বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ে আসেনি। তবে একথা বলাই যায়, যে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি কিংবা তাকেও অস্বীকার করে আইনি কিংবা প্রথাসিদ্ধ বিবাহের বাইরে গিয়ে মানব-মানবীর একত্রবাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা পাচ্ছে। এই সম্পর্কগুলির মধ্যে থেকেও যাতে মানুষ আইনি রক্ষাকবচ পেতে পারে, সেজন্য দেশের আইনব্যবস্থাও সক্রিয় হয়েছে। যাইহোক, আলোচ্য গল্পের নিরিখে দেখা যায় গল্পকার সুকান্তি দত্ত তাঁর ছোটোগল্পে সেই দিকটিকে তুলে ধরেছেন—

> যাক সে-কথা, এবার স্পষ্ট করে বলি তোমায়, বউ নেই আমার, মানে বিয়ে হয়েছিল বটে কিন্তু সম্পর্ক টেকেনি। তবে বান্ধবী জুটেছে বিস্তর। এখন বছর তিন এক বান্ধবীর সঙ্গে থাকি। হেমা, হিমাচলের মেয়ে, বাচ্চা নিয়ে একাই থাকত দিল্লির ময়ূরবিহারে, এখন আমি এসে জুটেছি। বাইরে এলে ও মাঝে মাঝে আসে আমার সঙ্গে, তবে নাচের স্কুলের দিদিমণি, তাই সবসময় পেরে ওঠে না। সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে পারছি না, এখনও পর্যন্ত বনিবনায় আমাদের অসুবিধা নেই কোনো, তবে বন্ধুত্ব আর দাম্পত্য যে এক নয়, সে তো জানো তুমি।[৩৭]

এ গল্পের সূত্রে দেখা যায় বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে নতুন ধরনের এক পরিবারব্যবস্থা তৈরি হতে শুরু করেছে।

'পর্নোগ্রাফির দিনরাত' (*সৃষ্টির একুশশতক*, উৎসব সংখ্যা, ২০০৬) গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে পরিবারব্যবস্থার ভাঙন এবং তার ফলে একাকী হয়ে পড়া ব্যক্তিসত্তার আত্মদহনের যন্ত্রণা। এ গল্পের মূল পুরুষচরিত্রটি স্ত্রী তুলিকা আর পুত্রসন্তানকে নিয়ে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কথা না ভেবে গৃহবাসী পরিবার থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা হয়। আরও বেশি স্বাধীনতা, আরও বেশি ভোগের হাতছানি তাকে পরিচালিত করে। কিন্তু সুখী ফ্ল্যাটবাড়ির দেওয়ালের মধ্যেও ওঠে দেওয়াল। স্ত্রীর সঙ্গে তৈরি হয় শারীরিক-মানসিক দূরত্ব। উত্তর চল্লিশের ব্যক্তিটি আসক্ত হয়ে পড়ে পর্নোগ্রাফিতে। তাতেও কি মৃত্যু হয় তার মননের জগতটির? এ গল্প সে কথা বলে না। বরং এক অন্তর্লীন দহনে দগ্ধ হতে থাকে মানুষটির অভ্যন্তরীণ সত্তা। মনে পড়ে তার ফেলে আসা সম্পর্কগুলির কথা—

> একটা শীর্ণ হাত দেখতে পাও। ধরতে চেষ্টা করো, পারো না। নীল পোকাগুলো অবশ করে দিয়েছে তোমার হাত। যেদিন ওদের দু'জনকে ফেলে চলে এলে, সেদিনের কথা অস্পষ্ট ছবি হয়ে ভাসে। মা-র চোখে জল, বাবা নির্বাক। ওরা যেন বিশ্বাস করতে পারে না একমাত্র ছেলে, বউমা, নাতি ওদের দু-জনকে এভাবে ফেলে চলে যেতে পারে।...
>
> শীর্ণ হাতটা কাঁপে, 'খোকা' বলে ডাক দেয় বুঝি, অথচ ছুঁতে পার না তুমি। বাবা-মার সঙ্গে একসঙ্গে থাকা সম্ভব ছিল না কি? তুমি ভাবো কী করে সম্ভব? পুরোনো বাড়ি ভেঙে নিজের মনমতো করে নিতে চেয়েছিলে, বাবা রাজি নয় কিছুতেই, বললে---তোমার অনেক টাকা, জানি তুমি রাজপ্রাসাদ বানাতে পারো, কিন্তু এতগুলো বছর কাটালাম কুঁড়েঘরে---আমরা চোখ বুজি, তারপর না-হয় তুমি---

তাহলে কী করে সম্ভব? তা ছাড়া ছেলের স্কুল, ভালো স্কুলে পড়াতে গেলে ওখান থেকে কী করে আর---গভীর রাতের ক্লাব থেকে, বার থেকে টলতে টলতে কী করে ফেরা যাবে বুড়োবুড়ির ওই বটছায়ে। কলকাতায় কত মজা ! থরে থরে সাজানো সেসব মজার কথা ভাবতে হল তোমায়।

প্রণাম করলে তুমি, মা কাঁপা গলায়, চোখ মুছে বলল, সুখে থাকো। বাবা কিছু বলল না, শুধু মাথায় হাত ছুঁইয়ে রাখল কিছুক্ষণ, তারপর দীর্ঘশ্বাস !

পেটের ভেতর তোমাদের পুরে গাড়ি ছাড়ে, পেছনে ধুলো ওড়ে, ধুলোর ভেতরে কাঁপা-কাঁপা শীর্ণ দুটি হাত।[৩৮]

এ গল্পে অসম্ভব দক্ষতায় গল্পকার তুলে ধরেছেন ভেঙে যাওয়া পরিবার সম্পর্ক এবং তার পাশাপাশি ব্যক্তিসম্পর্কের ভাঙনের একাধিক মাত্রাকে। দেখা যায় এই সার্বিক মূল্যবোধজনিত পরিবর্তন কিংবা ভাঙন পরিচালিত হয়েছে পুঁজিনির্ভর পণ্যসংস্কৃতির দ্বারা। পূর্বেকার পরিবারব্যবস্থা যে মূল্যবোধ কিংবা আশ্রয়কে ধরে রেখেছিল, পণ্যসংস্কৃতি তাকে তছনছ করে দিয়েছে এ গল্পে।

'পরমা, তোমার জন্যে' গল্পটি ব্যক্তি সম্পর্কের আর এক নতুন মাত্রা তুলে ধরে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা অশেষ মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি। গল্পের সূত্রপাত থেকেই তাঁকে দ্বিধান্বিত দেখতে পাওয়া যায় 'ভ্যালেন্টাইন ডে'-তে স্ত্রী রঞ্জনাকে তিনি কী উপহার দেবেন তাই নিয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বয়সগত পার্থক্য অনেকটাই। পার্থক্য মননগতও। দুজনের পছন্দ অপছন্দ অনেক আলাদা। আলাদা জীবনবোধও। আর তাই দ্বিতীয় স্ত্রীর 'ভ্যালেন্টাইন ডে'-র উপহার শেষ পর্যন্ত স্থির হয় প্রথমপক্ষের কিশোরী কন্যার পরামর্শে। মূল্যবোধের তফাতে দাম্পত্যের সুরটি কেটে যেতে দেখা যায়—

তার (অশেষ) প্রথম যৌবনে 'ভ্যালেন্টাইন ডে' বলে কিছু পালন করার রেওয়াজ ছিল না। তা বলে মন দেওয়া-নেওয়া কম ছিল এমন তো নয়। দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজো, এসবই কমবয়েসি ছেলেমেয়েদের কাছে প্রেমের উৎসব তখন...

তবে তখন তো আজকের অনেক কিছুই ছিল না, ইন্টারনেট থেকে শপিং মল—কত কিছুই নতুন এখন ! কিন্তু তা বলে যৌবন শেষ করে এখন ভ্যালেন্টাইন ডে পালন ! অথচ কিছুই করার নেই তার, রঞ্জনাকে ভালোবাসা দেখাতেই হবে ! আর রঞ্জনার ধারণা যত বেশি দামের উপহার তত বেশি ভালোবাসা ! তুমি ভালোবাসো অথচ খরচ করতে পারো না, তা-লে ফোটো ! ফুটে যাও ! বউ হোক বা বান্ধবী—প্রেমিকা, কত খসাচ্ছে তাতেই ঠিক হবে তোমার ভালোবাসার ওজন ।[৩৯]

গল্পের নিরিখে দেখা যায় শুধুমাত্র প্রেমের উৎসবের দিনগুলিই পালটে যায়নি, বরং তা হয়ে উঠেছে পণ্যসংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একদিকে যেমন প্রজন্মের তফাতে মূল্যবোধ কিংবা ভালোলাগার পরিবর্তন হয়ে উঠেছে এ গল্পের অন্যতম বিষয়, তেমনি এ গল্পে গুরুত্ব পেয়েছে মানব-মানবীর মননগত দূরত্বের একাধিক মাত্রা।

৬.১০॥ **তিলোত্তমা মজুমদার**

বর্তমান সময়ের এক শক্তিশালী কথাকার তিলোত্তমা মজুমদার (জন্ম-১৯৬৬)। উত্তরবঙ্গে তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। পড়াশোনা কলকাতায়।[৪০] পরবর্তী সময়ে লেখালিখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। তাঁর কথাসাহিত্যের একটি সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গ ও তার জনজীবন। তা সত্ত্বেও নাগরিক জীবন তাঁর কলমে উঠে এসেছে সার্থকভাবেই। উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী বদলের একাধিক দিক কিংবা ব্যক্তিসম্পর্কের বিভিন্ন মাত্রা। তাঁর ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় উঠে এসেছে প্রজন্মান্তরে পালটে যাওয়া মূল্যবোধ কিংবা পণ্যসংস্কৃতিকে গ্রহণ-বর্জনের তারতম্য। অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের মাত্রাগত পরিবর্তন। এইরকমই একটি ছোটোগল্প হল 'শর' (*সানন্দা*, ১৫ই এপ্রিল, ২০১১)। এ গল্পে উঠে আসে যামিনী দাম ও শুভায়ন সরকারের কথা। তারা দুই আলাদা নরনারী। দুজনেই পৃথক দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ। দুজনেরই দাম্পত্য অসুখী। শুভায়নের

স্ত্রী মিতালী কিংবা যামিনীর স্বামী কল্লোল এঁদের প্রতি অত্যন্ত অসংবেদনশীল। একদিকে শুভায়নের কবিতা লেখা কিংবা পড়ার অভ্যাস মিতালীর পছন্দ হয় না, পছন্দ হয় না তার জীবনবোধ, অন্যদিকে যামিনীর এনজিও-তে চাকরি করা কিংবা এস্রাজ বাজানোর শখ পছন্দ হয় না কল্লোলের। জীবনের একটি পর্বে এসে যামিনী কিংবা শুভায়ন আবিষ্কার করে যে, তারা তাদের দাম্পত্য জীবনে একনিষ্ঠ এবং অনুগত থাকলেও তাদের স্বামী কিংবা স্ত্রীরা তাদের যথার্থ সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী নন। এরকমই একটি সময়ে বিমানে যাত্রাকালীন ঊনচল্লিশ বছর বয়সী যামিনীর সঙ্গে আলাপ হয় ঊনপঞ্চাশ বছরের শুভায়নের। উপলক্ষ্য শুভায়নের অসুস্থতা। ধীরে ধীরে তারা আবিষ্কার করে, এতদিন তারা বাস করে এসেছে ভুল সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনীদের সঙ্গে। অন্যদিকে যামিনী এবং শুভায়নের পছন্দ কিংবা ভালোলাগাগুলি মিলে যেতে থাকে। আর এইভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে এক অন্যরকম সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই সম্পর্কের সামাজিক নাম 'বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক' হলেও প্রকৃত অর্থে তার মধ্যেই আশ্রয় খুঁজে পায় তারা। আর এই আখ্যানের মধ্যে দিয়ে পাঠক দেখেন, কীভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পালটে যেতে থাকে ব্যক্তিসম্পর্ক—

> মাইগ্রেনের ব্যথাসমেত অধিবেশনে যোগ দিতে গেল যামিনী। শুভায়ন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সোজা এল তার আপিসে। কাজে ব্যস্ত ছিল। মিতালীর ফোন এল। 'কখন ফিরছ?'
>
> শুভায়ন বলল, 'এখনই কী করে বলি! কেন? কী হল?'
>
> 'সুরমার সঙ্গে তোমার মা আবার ঝগড়া বাধিয়েছেন। চোর বলেছেন ওকে। ও কান্নাকাটি করছে। বলছে থাকবে না আর।"...
>
> 'আচ্ছা আমি বাড়িতে যাই, তারপর দেখছি। তুমি সুরমাকে একটু শান্ত করো।'
>
> 'শান্ত করো, শান্ত করো। তোমার আর কী। অফিসের নাম করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াও। মেয়েদের স্কুল-কলেজ, গাড়ির ড্রাইভার, ট্যাক্স, ব্যাঙ্ক, বারোয়ারি পুজোর চাঁদা, আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ থেকে অন্নপ্রাশন, বাড়ির কাজের লোক, তোমার মা—সব হ্যাপা আমার ঘাড়ে।'

> মিতালী ফোন রেখে দিল। শুভায়ন কপাল টিপে বসে রইল কিছুক্ষণ। মিতালীর কথার জবাব সে দিতে পারত। বলতে পারত, আমি অফিসের নাম করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই বলেই তোমরা গাড়ি চাপতে পারো, বাইশশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটে থাকতে পারো, মেয়েদের নামী স্কুল-কলেজে পড়াতে পারো, দশ হাজার টাকার শাড়ি, হিরের গয়না, সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া-মিশর ভ্রমণ করতে পারো...! বলতে পারত সে, কিন্তু বলল না। টের পেল, ব্যথাটা একটু একটু করে ফিরে আসছে।[৪১]

এ গল্পে এইভাবে বারে বারে উঠে আসে দাম্পত্যের কথোপকথন। শুভায়নের ভাবনার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়, যখন মানুষ ভোগবাদী জীবনের পশ্চাতে দৌড়াতে গিয়ে মানসিক শান্তি-স্থিতিকে হারিয়ে ফেলছে। সমস্যার ভারে জর্জরিত হয়ে হাসতে ভুলে যাচ্ছে। আর সেই কারণেই এ গল্পে উঠে আসে লাফিং ক্লাবের বর্ণনা। এই বর্ণনা একেবারে অভ্রান্তভাবে চিহ্নিত করে দেয় সেই সময়টিকে, যে সময়ে মানুষের স্বাভাবিক ভাবে হাসার ক্ষমতা চলে গিয়ে হাসিটাও হয়ে উঠেছে পণ্য—

> সল্ট লেক পল্লির উদ্যানগুলি বসন্তে বিমুখ করে না কারওকে। শুভায়ন সরকার যখন দ্বাদশ পাক দিচ্ছে, তখন তার মাথায় পড়ল একটি রুদ্রপলাশের ফুল। নাট্যকার দীনেশ অধিকারী ঘটনাচক্রে সেই মুহূর্তে শুভায়নের পাশে পাশে হাঁটছিলেন। রুদ্রপলাশের বাসন্তী কৌতুকে তিনি হা হা রবে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই হাসির প্রতিধ্বনি উঠল অল্প দূরে। সমবেত সেই হাসি সৈনিকদের ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপের মতো। তা শুনে দীনেশ অধিকারী গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'লাফিং ক্লাব! ছ্যাঃ! হাসি নিয়েও ব্যবসা করতে ছাড়ল না মানুষ! হা হা হা হো হো হো—মনের ব্যায়াম হচ্ছে! ধুর ধুর![৪২]

প্রকৃতপক্ষে, হাসির উপযুক্ত আবেগের অভাব তৈরি হয়েছিল বলেই নির্দিষ্ট এই সময়ে লাফিং ক্লাবের এত রমরমা সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে তা প্রাকৃতিক হাসির অভাবকেই চিহ্নিত করে।

বিশ্বায়ন ব্যবস্থা সারা বিশ্বব্যাপী পরিযাণকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। এরফলে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে আকাশপথ পরিবহণ। ফলস্বরূপ এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে বহু মানুষের কর্মসংস্থান

হয়েছে পূর্বের তুলনায় বেশ বেশি পরিমাণে। বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে ভারতেও এই প্রবণতা লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পায়। বদলে যায় বিশ্বায়ন-পূর্বেকার কর্মনিযুক্তির ধরন। তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর ‘সিল্যুয়েট’[৪৩] (২০০১) গল্পটিতে তুলে ধরেছেন সেইরকম একটি জগতকে। যে জগতে উপস্থিত হয়েছে পাইলট, কেবিন ক্রু, গ্রাউন্ড অফিসার, এয়ার হোস্টেস প্রভৃতি পেশার মানুষ। এদের অনেকেই বাড়ি থেকে বহুদূরে কর্মরত। এ গল্প যখন লিখিত হচ্ছে, সেই ২০০১ সালে ভারতের টেলি যোগাযোগব্যবস্থা দুই দশক পরবর্তী সময়ের মতো এতখানি উন্নত হয়নি। এ গল্পে সেই বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়েছে। উঠে এসেছে, শুধুমাত্র চাকরির কারণে পরিবার থেকে বহুদূরে কেমনভাবে কাটাচ্ছে তরুণ-তরুণীরা। পাশাপাশি আখ্যানে ধরা পড়েছে তাদের প্রতিযোগিতাপূর্ণ জীবন, যে জীবনে প্রেমের স্বাভাবিক মাধুর্য ছোঁয়া রেখে যেতে ভয় পায়। এ গল্পের চরিত্র দিশা একজন গ্রাউন্ড অফিসার। সে ভালোবাসে পাইলট বরুণ শেঠিকে। সেইকারণে উলটোদিকের ফ্ল্যাটে থাকা এক যুবকের তার প্রতি একতরফা প্রেমকে সে পায়ে দলে পিষে ফেলতেও দ্বিধা করে না। গল্পের শেষে দেখা যায়, বরুণ শেঠি অন্য এক বাঙালি মেয়ের প্রেমে আসক্ত, অন্যদিকে দিশার প্রতি প্রেমে পড়া যুবকটিও আত্মহত্যা করে। এ গল্পের অন্তরে বয়ে চলেছে এক ব্যস্ত এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ সময়ধারা, যা মানুষের মানবিক অনুভূতিগুলিকে অবদমিত করে রাখে, ব্যক্তিসম্পর্কের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে অস্বীকার করে।

‘অনুচ্চারিত’ (জুন ২০০৭) গল্পটিতে লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার এনেছেন এমন এক পরিবারের কথা, যেখানে বাবা নিরুদ্দেশ। মা অরুন্ধতী একাই তাঁর দুই সন্তানকে (কন্যা-পুত্র) নিয়ে থাকেন। এ গল্পে উঠে আসে একজন নারী হিসাবে অরুন্ধতীর ব্যক্তিত্বময়ী, সচেতন ও আত্মবলদর্পী অবস্থান। এ গল্পে তবু পূর্বপ্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শাশুড়ি সর্বদা নাতি-নাতনিদের কাছে বলে বেড়ান যে, তাদের মায়ের জন্যই তাদের বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গিয়েছেন। অন্যদিকে

শাশুড়ির এইরকম অবস্থান সত্ত্বেও অরুন্ধতী তাঁর দায়িত্ব নেওয়া থেকে চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি সবই করে চলেন, তবু তিনি কিশোরী কন্যা মণির তরফ থেকে বিদ্বেষের শিকার হন। মণি বিশ্বাস করতে থাকে যে, তার মায়ের জন্যই তার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন। শেষপর্যন্ত গল্পের শেষে তার বিদ্বেষ রূপ নেয় মায়ের প্রতি প্রাণঘাতী আক্রমণের। কাহিনির এই পর্বে পৌঁছে মা তাঁর সন্তানদের জানান, তাদের পিতা নিরুদ্দেশ নন, তিনি তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র সংসার পেতেছেন। ইতিপূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার আখ্যান বাংলা সাহিত্যে কম উঠে আসেনি, কিন্তু তিলোত্তমা দেখালেন একজন অভিভাবক হিসাবে সেইরকম একজন নারী কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি এ গল্পে তুলে ধরেছেন সন্তানের সঙ্গে মায়ের, পিতার সঙ্গে মাতার সম্পর্কগুলি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। মায়ের মমতাকে কীভাবে ব্যবহার করেছে সন্তানের পণ্যবিলাস, যা একান্তই নির্দিষ্ট সময়ের অভিঘাত। যা উঠে আসে দুই সন্তানের কথোপকথনে—

'মায়ের চামচা তো তুই! যা চাস তাই দেয়।'

'আমি কিছুই চাই না।'

'সাইকেল চাইলি, পেয়ে গেলি। যে সে নয়। দামি সাইকেল!'

'তোকেও তো স্কুটি দিয়েছে। সাইকেলটা তো জরুরি ছিল। দরকার না থাকলে আমি কিছু চাই না।'

'আমারও স্কুটি দরকার। দেবে না তো কী করবে? আমি কি লোকের গা সেঁটে ঘামতে ঘামতে কলেজ যাব? অত টাকা রোজগার করে, একটা স্কুটি কিনতে কী রে? কিন্তু মা আমাকে সহ্য করতে পারে না। তোকে কিছু বলে না, কিন্তু আমার সঙ্গে সারাক্ষণ টিকটিক।'

'...মা'র দোষেই বাবা চলে গেছে। তার দায় মাকেই নিতে হবে। আমাদের জন্ম দিয়েছে, খেতে-পরতে দেবে না? একটা স্কুটি কিনে দিয়েছে বলেই পেট ক্যাটের মতো হয়ে যাব নাকি? বশংবদ বেড়াল?

মা রাগ করলে করবে। আমার যা ভাল লাগে আমি করব না? একটাই তো জীবন! এই দিনগুলো ফিরে পাব আর? ... আরে, মা নিজের দায়িত্ব পালন করছে। আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করব কোন যুক্তিতে?'

'বায়োলজি জানিস না? জন্ম শুধু মা দেয়নি, বাবাও দিয়েছে। আমাদের ক্লাসে আদিত্য শ্রীবাস্তবের বাবা-মা ডাইভোর্স নিয়েছে। কিন্তু কেউই আদিকে ছেড়ে যায়নি। ও এখন মা'র সঙ্গে থাকে, কিন্তু উইক এন্ড বাবার সঙ্গে কাটায়। বাবা-মা ফাইট করলে বাচ্চা ছেড়ে পালাবে?'[৪৪]

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে পারিবারিক গঠন, পারিবারিক সদস্যদের আচরণ, পণ্য-সংস্কৃতি এবং মানুষের বদলে যাওয়া মননের জগতকে এভাবেই তাঁর ছোটোগল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার।

৬.১১॥ তৃষ্ণা বসাক

তৃষ্ণা বসাক (জন্ম-১৯৭০) বর্তমান সময়ের বাংলা ছোটোগল্পের জগতে একটি পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর পরিচয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আগেই দেওয়া হয়েছে, তাই পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে তিনি তুলে ধরেছেন বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিবার এবং ব্যক্তিসম্পর্কের বদলসমূহকে। তাঁর *ছায়াযাপন* (২০০৯, একুশশতক) *দশটি গল্প* (পৌষ, ১৪১৭, পরশপাথর), *নির্বাচিত পঁচিশটি গল্প* (২০১৪, একুশশতক) কিংবা *গল্প ৪৯* (কৃতি, ২০১৯) গ্রন্থের একাধিক ছোটোগল্পে এই বিশেষ দিকটি তিনি তুলে ধরেছেন অনায়াস দক্ষতায়। সেইসঙ্গে তাঁর ভাবনায় নিজের রচিত ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়েছে। তাঁর *দশটি গল্প*-এর 'লেখকের কথা' অংশে উঠে এসেছে তারই টুকরো ছবি—

বেলি ডান্স করতে পারো?' একটি সদা তৎপর শিশু, খেলতে খেলতে আচমকা ছুড়ল এ প্রশ্ন, বেশ নিরীহ মুখেই। স্বীকার করতে হল, না, পারি না। শুধু বেলি ডান্স কেন, জগতের কোনো মনোহারিণী, চিত্তচমৎকারী বিদ্যাই তো জানা নেই। আর সেসব কিছু জানি না বলেই লিখি। এবং ভরসার কথা, যাঁরা

এসব লেখা পড়েন তাঁরাও ওইসব রসের সন্ধান পাননি বলেই পড়েন। আর, লেখক আর পাঠকের মাঝখানে, যা থাকে, সেই কথাবস্তুটির তো আরও ঝাড়া হাত-পা। অন্তত কাউকে কোথাও পৌঁছে দেওয়ার দায় তার নেই। বরঞ্চ, পাঠককে যত আঘাটায়, বিপদ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিতেই তার আনন্দ।[৪৫]

নিজের গল্প সম্পর্কে লেখিকার এই স্বীকারোক্তি একদিকে যেমন তাঁর গল্পের গঠনটি পাঠকের সামনে তুলে ধরে, অন্যদিকে তা প্রতিনিধিত্ব করে বিশ্বায়নকালের ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যের।

বিশ্বায়নপর্বে মানুষের মধ্যেকার ব্যক্তিসম্পর্কের বদল কিংবা পরিবার সম্পর্কের বদলের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল এই সময়ের উৎপাদনব্যবস্থা কিংবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। এইধরনের পরিবর্তন শুধুমাত্র পূর্বতন সমাজব্যবস্থাকেই বদলে দিয়েছিল তাই নয়, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, অনুভূতি কিংবা ভাবনার জগতটিকেও তা পরিবর্তন করেছিল বহুল পরিমাণে। 'যেভাবে যেতে হয়' (*গল্পসরণি* ১৪১৫) গল্পের একাধিক অংশে ফুটে উঠেছে ব্যক্তিসম্পর্কের বদল। সুমিতা আর পরাগ ছেড়ে যেতে চায় তাদের এতদিনের একান্নবর্তী পারিবারিক গৃহকোণ ছেড়ে অন্য কোনো ঠিকানায়। যদিও এই বাড়ি ছেড়ে তাদের পৌঁছানো হয় না ঝকঝকে কোনো ফ্ল্যাটবাড়ির পরিসরে, তবু তাদের মনে জাগরূক থাকে সেই আকাঙ্ক্ষাটি। তারা না চলে যেতে পারলেও তাদের কন্যা বিবাহের পরে ছেড়ে যেতে সক্ষম হয় একান্নবর্তী পরিবারের চেনা পরিসরটি। এরফলে এ গল্পে কন্যার প্রতি মায়ের একধরনের ঈর্ষাও ফুটে ওঠে। যে সুযোগ যে জীবনভর পায়নি, নিজের কন্যা সেই প্রার্থিত স্থানে পৌঁছানোয় প্রকট হয়ে পড়ে মায়ের মনোভাবটি। অন্যদিকে এ গল্পের চরিত্রদের মননে যৌথ পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কল্পনা জাল বুনে চলেছে নিরন্তর—

> মধ্যরাত অব্দি জেগে জল্পনা করেছে সুমিতা আর পরাগ, একটি শিশুর দু-পাশে সাবধানে শুয়ে, কেউ কারও দিকে না তাকিয়ে মশারির আকাশে যে যার নিজস্ব কুসুমগুলি ফুটিয়ে গেছে। পরাগ বলেছে, যাদবপুর, বাঁশদ্রোণী কি বাইপাসের ওনারশিপ ফ্ল্যাটের কথা, সোনারপুরে তাদের কর্মচারী সংগঠনের সমবায় বাসভূমি, এমনকী কলকাতা ছেড়ে লোভনীয় কোনো চাকরি নিয়ে চেন্নাই, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর কিংবা আরও দূরে যেখানে নিয়োগপত্রের একচ্ছত্রে সংস্থা তাদের থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।[৪৬]

এ গল্পে উঠে এসেছে একটি পরিবারের সম্পর্কগুলির বদলে যাওয়ার কথা—

> বাড়িটা কিন্তু এমন ছিল না বরাবর। আলাদা আলাদা নাম ছিল সম্পর্কগুলোর, সম্পৃক্ত ডাকখোঁজ। দু-পেয়ে, হাত দিয়ে ভাত মেখে খাওয়া প্রাণী সব। একই টেবিলে বাড়া ভাত। শেষে দু-মুঠো কম পড়লে শাশুড়ি-বউয়ে গল্প করে পুষিয়ে নিত। কবে, ঠিক কবে যে চিড় ধরেছিল, ওরা বোঝেনি। হঠাৎ একদিন সেই চিড়টা একটা অতিকায় হাঁ-মুখ হয়ে গেল আর সেখান থেকে গলগল করে বেরিয়ে এল লাভাস্রোত। ওদের পুরোনো জীবনকে উপড়ে ফেলে বোনা হল অন্যতর জীবন। ওদের প্রতিরোধ আর অবসাদ উপেক্ষা করে সে জীবন নিজেকে বাড়িয়ে নিয়ে চলল।[৪৭]

এ গল্পে লেখিকা প্রাধান্য দিয়েছেন পরিবার সম্পর্কের বদলের একাধিক মাত্রাকে। অন্যদিকে ‘খেলা’ (*আমি উদিতা,* ফেব্রুয়ারি ২০১০) গল্পটিতে উঠে আসে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে নর-নারীর বদলে যাওয়া ব্যক্তি-সম্পর্কের কাহিনি। এ গল্পের চরিত্র বছর তেইশের অপরাজিতা কাজ করে একটি পত্রিকায়। সেই কাজের সূত্রে সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রয়োজনে সে অবাঞ্ছিতভাবে জড়িয়ে পড়ে ঋজিপ্রসাদ নামক বছর সাতষট্টির এক শিল্পীর সঙ্গে। ভ্যালেন্টাইন ডে’র সন্ধ্যায় প্রেমিক দীপ-এর সঙ্গে দেখা করার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ঋজিপ্রসাদের যৌন আহ্বানকে সে এড়িয়ে যেতে পারেনা নিছকই নিজের পত্রিকার কাজটি বজায় রাখার তাগিদে। এ গল্পের শেষে দেখা যায় অপেক্ষারত প্রেমিকের কথা জোর করে সরিয়ে রেখে বাড়ির পথে এগোয় অপরাজিতা। প্রেমের অনুভূতির মাধুর্যকে এ গল্পে ঢেকে দিয়েছে বদলে যাওয়া অর্থব্যবস্থার প্রবল পরাক্রম।

একদিকে যে বাণিজ্য সংস্কৃতি মহিমময় করে তোলে ১৪ই ফেব্রুয়ারি দিনটিকে, অন্যদিকে সেই সংস্কৃতিই জীবনানন্দের ভাষায় বলতে গেলে 'নারীকেও নিয়ে যায়'। প্রেমদিবসের প্রেক্ষাপটে এ গল্প তাই পৌঁছে যায় প্রেমহীনতার গন্তব্যে—

> মেপলের পাতাগুলো কি সত্যিই অত লাল? ঝিরিঝিরি তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছে একটা মেয়ে। তার অপেক্ষায় শান্ত ফায়ারপ্লেস...একটা গিফট শপের পাশ দিয়ে অটোটা যায়। লাল রঙের বিশাল প্লাস্টিকের হার্ট দিয়ে সাজানো দোকানটা। কী অলৌকিক লাগে।
>
> এঃ হে। আজ তো ভ্যালেন্টাইন ডে। দীপের জন্যে কিছু কেনা হল না। একঝলক ঘড়ির দিকে তাকায় অপরাজিতা। পৌনে ন-টা। দীপের তো দাঁড়াবার কথা সাড়ে সাতটায়।... হঠাৎ ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠল অপরাজিতা এই অভ্যেসের, অভ্যেসের দাসত্বের ওপর। কেন, এত রাতেও দীপের সঙ্গে দেখা করতেই হবে তাকে। তার ওপর কোনো গিফট কেনা হয়নি, খালি হাতে? দীপই বা কেন দাঁড়িয়ে থাকবে? কেউ কি এমন বোকা বোকা করে এখন? ক্লান্তি এসে গ্রাস করে সহসা।[৪৮]

এ গল্পে ভ্যালেন্টাইন ডে, প্লাস্টিকের হার্ট ইত্যাদি শব্দাবলি কৃত্রিম এক সময়ে অনুভূতির বাণিজ্যনির্ভর প্রকাশকে তুলে ধরে। যে জগতের পণ্য ছাড়া ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো কঠিন হয়ে পড়ে এই সময়ের প্রজন্মের কাছে।

'মাতৃপুরাণ' গল্পটিতেও উঠে এসেছে ব্যক্তিসম্পর্কের বদল। যান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন জগতে মানুষের সম্পর্কগুলিও যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ গল্পে ঘটেছে তারই বহিঃপ্রকাশ—

> ইন্টারনেটের ঘটকালিতে তাদের এই ডটকম বিয়ে। আর ওই ডটটা বসবি তো বস তাদের দু'জনের মাঝখানে। অস্পষ্ট থেকে ক্রমে স্পষ্ট, বিন্দু থেকে ক্রমশ অনতিক্রম্য একটা গোলক। মাঝে মাঝে মনে হয় গোটা পৃথিবীটাই—তাদের দু'জনের মাঝখানে। অথচ বছরে একটা বড়, দুটো ছোট ট্যুর সব যথাযথ। প্রায় প্রতি রাতেই নন্দিতা যখন ওর ল্যাপটপে কাজ করে মোবাইল বেজে ওঠে। পাশের ঘর থেকে সন্দীপ 'আসব? হবে?' প্রথম প্রথম নিজেকে সম্ভ্রান্ত যৌনকর্মীর মতো মনে হলেও পরে ভেবে দেখে এই

তো বেশ। সম্পর্কের মধ্যে আবেগের ঘনত্ব তার আরও খারাপ লাগত। পেশাদার শরীরকর্মটি চুকে যাওয়ার পরও কাজ করে নন্দিতা। তখনও ওর মোবাইল চালু।...

শীত পড়ার মুখে এক সন্ধেয় মাথা টিপটিপ, গা ম্যাজম্যাজ নিয়ে ফিরল নন্দিতা। অনেক, অনেক বছর পর হল তার। ধুম জ্বর। পাশের ঘর থেকে সন্দীপ মোবাইলে যখন জানতে চাইল 'আসব? হবে?' তখন অর্ধচেতন অবস্থাতেও ওকে ডাকল, হয়তো নিজের এই উত্তাপটুকু দিয়ে কাউকে জ্বালাতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ওর সমস্ত শরীরে আকীর্ণ হয়েও একটু চমকাল না সন্দীপ। শুধু কাজ সেরে চলে যাওয়ার পর, নিয়ম ভেঙে আরও একবার ঘরে এল। প্যারাসিটামল খাওয়াতে। বিনা প্রতিবাদে বড়ি গিলে নিল নন্দিতা। শুধু মনে হচ্ছিল প্যারাসিটামল না হয়ে যদি বিশল্যকরণী হত।[৪৯]

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে মানুষের প্রযুক্তিনির্ভরতা এতখানি বেড়ে গিয়েছে যে, সম্পর্কিত মানুষ হয়ে পড়েছে গৌণ। সামান্য সময়ের ন্যূনতম চাহিদার নিবৃত্তির পরেই মানুষের সাহচর্য সরিয়ে রেখে আবার যন্ত্রের জগতে বুঁদ হয়ে পড়ছে এই সময়ের মানুষ। প্রযুক্তির যান্ত্রিকতা মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও এইভাবে দ্রুত চারিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে কোথাও হয়তো লেখিকা সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন ক্ষীণভাবে বেঁচে থাকা একটুখানি মানবতাকে। আর তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে এইভাবেই বিশ্বায়নকালের ব্যক্তি কিংবা পরিবারসম্পর্কসমূহকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসহ তুলে ধরেছেন লেখিকা তৃষ্ণা বসাক।

৬.১২॥ **বিনোদ ঘোষাল**

বিনোদ ঘোষাল (জন্ম-১৯৭৬) বর্তমান সময়ের এক উল্লেখযোগ্য তরুণ কথাকার। তাঁর একাধিক ছোটোগল্প গ্রন্থে স্থান করে নিয়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ের নানা অনুপুঙ্খ। একদিকে প্রযুক্তিনির্ভর জীবন, মানুষে মানুষে ক্রমাগত বেড়ে চলা দূরত্ব, কর্পোরেট জগতের প্রতিযোগিতা,

অন্যদিকে এসবের মধ্যে ভাঙতে থাকা ব্যক্তি কিংবা পরিবার সম্পর্ক হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটোগল্পের বিষয় আশয়। বাংলা ছোটোগল্পের বর্তমান সময়ে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করলেও তাঁর ছোটোগল্পে আবিষ্কার করে নেওয়া যায় একধরনের জীবনবোধ, যা এই সময়ের নিরিখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমে ব্যর্থ কিশোর, প্রথম বিশ্বে পাড়ি দেওয়া কোনো কৃতী সন্তানের তৃতীয় বিশ্বের গৃহকোণে পড়ে থাকা বৃদ্ধ পিতার মতো চরিত্রদেরকে তিনি একসুতোয় বেঁধে কাছে আনেন, তৈরি করেন মানবীয় সম্পর্কের এক নতুন সমীকরণ। পাঠক লক্ষ করেন কাহিনির আড়ালে ধীরে ধীরে কখন যেন গড়ে উঠছে এতদিনকার পরিবারের সংজ্ঞার বহির্ভূত আর একধরনের পরিবার, যা মানবিক সম্পর্কসূত্রে গাঁথা। এইধরনের একটি ছোটোগল্প হল ‘দুজন’। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় *উনিশ কুড়ি* পত্রিকায়। এ গল্পে দুটি চরিত্রের দেখা মেলে—বছর সতেরোর তূণীর, যে কিনা রেললাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে এসেছিল, আর তাকে শেষমুহূর্তে বাঁচিয়ে দেওয়া ষাটোর্ধ এক ভদ্রলোক। বস্তুতপক্ষে তিনিও আত্মহত্যা করতেই এসেছিলেন। লেখক এ গল্পে মৃত্যুকামী দুই ভিন্ন বয়সের মানুষকে একে অপরের কারণে বাঁচার আগ্রহের সঞ্চার ঘটতে দেখান। যে ভালোবাসায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে মৃত্যুর দিকে তূণীর ধেয়ে যাচ্ছিল, তার ভিন্ন অর্থ ধরা দেয় তার কাছে। সে বুঝতে পারে ভালোবাসা টাকা-পয়সা-গাড়ি-বাড়ির প্রতিযোগিতায় বিকিয়ে যাওয়ার মতো কোনো পণ্য নয়, বরং কাউকে না পেয়ে সারাজীবনের অপেক্ষা কিংবা সারাজীবন ধরে তাকে ভুলতে চাওয়ার চেষ্টার নামও ভালোবাসা। অন্যদিকে সফল পুত্র, গাড়ি, বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স থাকা বৃদ্ধ মানুষটি তাঁর জীবনের গভীর শূন্যস্থান পূরণ করতে না পারার যন্ত্রণাদীর্ণ যে জীবনটিকে শেষ করে দিতে বাড়ি থেকে দূরের এক রেল স্টেশনে এসেছিলেন, তিনিও এক কিশোরকে বাঁচিয়ে যেন অনুভব করেন তাঁর নিজের পুত্রকে। এ গল্পে দুটি মানুষ যেন পরস্পরের পিতা এবং পুত্রকে খুঁজে পাওয়ার অনুভূতিতে পৌঁছায়। লেখক তাঁর একাধিক গল্পে বিশ্বায়িত পৃথিবীর ছড়িয়ে

যাওয়া, পিষে যাওয়া সম্পর্কগুলিকে কুড়িয়ে যেন গড়ে তোলেন নতুন এক পরিবারব্যবস্থা, যেখানে কেউই রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, মানবিক সম্পর্কে সংলগ্ন। এ গল্প তাই 'পরিবার'-এর নতুন সংজ্ঞার সন্ধানে প্রয়াসী—

> "আমি একসময় একটা সরকারি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলাম। রোজগার যে ভালোই ছিল, বুঝতেই পারছ। আমার একমাত্র ছেলে সঞ্জয়। ছোট্ট থেকে থেকে ও যা-যা চেয়েছে, দিয়েছি। পড়াশোনায় দারুণ শার্প। অনেক ডিগ্রি পেয়ে কানাডায় চলে গেল। অবশ্য যাবার কথাই ছিল। এত ভালো কেরিয়ার, কত সুযোগ ওখানে! তোমার চেয়ে বয়স বেশ খানিকটা বেশি। কিন্তু গড়নটা তোমার মতোই", বলে তূণীরের মাথায় আলতো হাত রেখেই সরিয়ে নিলেন। আবছা অন্ধকারেও ওর চোখটাকে দেখার চেষ্টা করছিল তূণীর।
>
> "ওখানেই থাকে?"
>
> "হ্যাঁ-হ্যাঁ, কী-ই বা করবে এখানে এসে, লোডশেডিং, মশা, নোংরা রাজনীতি, পলিউশন, ট্রাফিক জ্যাম। ওখানে মেমসাহেব বিয়ে করেছে। গত বছর একটা মেয়ে হয়েছে। এক্কেবারে পুতুলের মতো আমার নাতনি। পোস্টে একটা ফোটো পাঠিয়েছিল।"
>
> "ওরা একেবারেই কি আসে না?"
>
> "সময় পায় না। কোনো কিছুর সময় পায় না ওরা। খুব ব্যস্ত"...
>
> "আপনি... মানে পুরোপুরি একা এখন!"
>
> পুরোপুরি না। একজন কাজের লোক। একটা বাড়ি। খানিকটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স। আর কিছু সহৃদয় প্রতিবেশী...অনেকেই আছে," [৫০]

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পূর্বেকার চেনা পৃথিবীকে যেভাবে বদলে দিয়েছিল, লেখক এভাবেই তাঁর গল্পে তা তুলে ধরেন।

'খেলনাবাটি' গল্পে উঠে এসেছে দাম্পত্যসম্পর্কের বদলের দিকটি। প্রযুক্তিনির্ভর এবং উপার্জনের প্রতিযোগিতাময় জীবনে ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিসম্পর্ক কীভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে, লেখক

এ গল্পে সেই কথা বলেন। শুধু তাই নয়, এ গল্পে উঠে আসে বাবা-মা ও সন্তানের চিরন্তন সম্পর্কের বদলে যাওয়ার বিবিধ মাত্রা—

> পরের মাসের মাঝামাঝি একটা পিংক কালারের ল্যাপটপ গিফট করেছিল অতনু। ওর প্রমোশন হয়েছিল। স্যালারি হাইক। আই শ্যাল গো টু দ্য টপ, দ্য টপ, দ্য টপ। আরও ব্যস্ততা। শুধু মানসিক নয়, দুজনের শারীরিক যোগাযোগটাও কমে যাচ্ছিল দিনে দিনে। কথাকে জোর করে ল্যাপটপ কী করে অপারেট করতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিল অতনু। কথা বুঝতে পারত এই সব গ্যাজেট দিয়ে আসলে অতনু নিজে রেহাই পেতে চায়। বেশ তাই হোক। ফেসবুক, স্কাইপি, দেশ-বিদেশের হাজার খানেক বন্ধু কিছুদিনের মধ্যেই কথার প্রোফাইলে। কেউ শাহরুখ, কেউ টম ক্রুজ, কারও প্রোফাইলে আবার শুধুই দুই চোখ কিংবা ঠোঁট। বিচিত্র এক জগৎ! এরা কি সবাই কথার মতোই একা? রাত্রে একেকদিন এমনও হত কথা আর অতনু একই খাটের দু-প্রান্তে মুখোমুখি বসে যে যার ল্যাপটপে। অতনু কঠিন কোনো প্রোজেক্টের কাজে আর কথা চ্যাটিং-এ। নিঃশব্দ ঘরটায় শুধু কি-বোর্ডের খুটখাট শব্দ। আঙুলে আঙুলে কথা হচ্ছে বহু দূরের কোনও বন্ধুর সঙ্গে আর সব থেকে কাছের মানুষটা বিছানার ওপ্রান্তে।
>
> আচ্ছা অতনু, আমরা কেমন হয়ে গেলাম তাই না?
>
> কেমন হয়ে গেলাম? স্ক্রিনে চোখ রেখেই পালটা প্রশ্ন ছিল অতনুর।
>
> তুমি নিজে কিছু ফিল কর না? আমরা কত দিন হয়ে গেল কেউ কারোর সঙ্গে থাকি না। শুধু এই ... এইগুলোই রয়েছে আমাদের লাইফে। বলতে বলতে নিজের ল্যাপিটা দু-হাতে তুলে ধরে বিছানার ওপরেই আছড়ে ফেলেছিল কথা। একটু চমকে উঠেছিল অতনু। হোয়াট হ্যাপেন্ড? এত একসাইটেড হয়ে পড়ছ কেন?
>
> আমাকে সত্যি সত্যি আর একটুও ভালোবাস না তুমি, আমি জানি। এত তাড়াতাড়ি পুরোনো হয়ে গেলাম এই গ্যাজেটগুলোর মতো! গলা বুজে এসেছিল কথার।...
>
> ভুট্টিরও খেলনা বেড়েছে অনেক। টয় ট্রেন থেকে জেট প্লেন, টেডি বিয়র, বার্বি-অনেক অনেক কিছু। তবু আড়াই বছরের অপদার্থ মেয়েটা এত খেলনা পেয়েও সারাদিন একা ভুলে থাকতে পারে না। খেলতে

খেলতে হঠাৎ হঠাৎ মাম্মাহ ... বাব্বাহ বলে কাঁদতে শুরু করে দেয়। ঘুমের মধ্যেও ফুঁপিয়ে ওঠে একেক রাত্রে।[৫১]

এ গল্পে দেখা যায় বিশ্বায়নের পণ্য-সংস্কৃতি এবং মানুষের মধ্যেকার যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি ঘটলেও বিপরীত দিকে দ্রুত হ্রাস পেয়েছে বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন সম্পর্কের মানুষের মধ্যে হৃদয়ের যোগাযোগ কিংবা উষ্ণতা।

পুঁজিনির্ভর অর্থব্যবস্থা নারীকে করে তুলেছিল পণ্য। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে নারী পূর্বের তুলনায় আরও বেশি করে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছিল। একদিকে যেমন নারীপাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে বেড়ে চলেছিল যৌনপল্লি, এসকর্ট সার্ভিসের মতো ব্যবসা। বিশ্বায়নের ফলে দ্রুত অবলুপ্ত হয়ে চলেছিল গ্রাম কিংবা মফসসলকেন্দ্রিক সংস্কৃতি কিংবা মূল্যবোধ। নগরায়ণের দ্রুতগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বায়নের উলটোপিঠে বাড়ছিল কর্মহীনতা, দারিদ্র্য। পুরানো পেশার মানুষজন কর্মহীন হচ্ছিল। এর পাশাপাশি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল নতুন অর্থনীতির উপজাত কিছু পেশার রমরমা। যার মধ্যে অন্যতম ছিল এসকর্ট সার্ভিসের মতো ক্ষেত্রগুলি। লেখক বিনোদ ঘোষাল তাঁর ‘জন্মদিন’-এর মতো গল্পকে নির্মাণ করেছেন এরই পটভূমিতে। এ গল্পের পল্লবী ওরফে রেশমি কীভাবে মফসসলের জীবন থেকে উঠে এসে এসকর্ট সার্ভিসে যোগ দেয়, সেই কাহিনিই গল্পের মাধ্যমে উঠে এসেছে। পল্লবীর বাবা লোকাল সিনেমা হলের লাইটম্যান ছিলেন। নতুন অর্থনীতির জোয়ারে টিকতে না পেরে সিনেমা হল ভেঙে ফ্ল্যাট তৈরি শুরু হলে কর্মহীন হয়ে পড়েন তিনি। কিশোরী পল্লবী জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে গিয়ে মিশে যায় পঙ্কিল স্রোতে। এতে দ্রুত অর্থের মুখ দেখলেও সে হয়ে পড়ে একাকী। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কটিও হয়ে পড়ে মৃত—

একদিন খবরের কাগজে চোখে পড়ল, নিবিড় আনন্দ, প্রেমের উষ্ণতা অনুভব করুন হাই প্রোফাইল মহিলাদের সঙ্গে। ১০০% নিরাপদ। মহিলাদের রেজিস্ট্রেশন ফ্রি। কল করুন এই নাম্বারে ...। সটান গিয়ে যোগাযোগ করলাম। নিজের নামটাও পালটে ফেললাম আমি। পল্লবী নামটা দিয়েছিল বাবা। আমি নিজের নাম দিলাম রেশমি। একটা অদ্ভুত জগৎ এই এসকর্ট সার্ভিস। মিডল ক্লাসের টিপিক্যাল পাপ পাপ ভাবটা প্রাণপণে রবার দিয়ে মুছে ফেলে সত্যি সত্যিই রেশমি হয়ে উঠলাম আমি, খুব তাড়াতাড়ি। অন্তত বিশ্বাস করতাম আমি আর পল্লবী নই।

অচেনা অজানা কত টাইপের পুরুষের সঙ্গে শরীর দিয়ে মিশতে মিশতে একসময় আমি বুঝতে পারলাম পৃথিবীতে সব থেকে সোজা শব্দ হল ভালোবাসা। আর দশটা-পাঁচটা সরকারি কেরানি জীবনের মতোই পুরুষের আদর বড়ো একঘেয়ে, ক্লান্তিকর।...

পুরোনো ভাড়াবাড়িটা ছেড়ে স্টেশন রোডের সামনে একটা বাড়ির নীচের তলায় ভাড়া চলে এসেছিলাম। তিনটে ঘর, আমার পারসোনাল ঘরের খুব দরকার ছিল। যখন তখন ফোন আসত ক্লায়েন্টের, এজেন্টের। তা ছাড়া ঘরে ফার্নিচার বাড়ছিল। টিভি, ফ্রিজ, ডিভিডি, কুলার। আরও একটা ব্যাপার, বাবা যদিও অনেকদিন ধরেই আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিল, খুব প্রয়োজন না হলে কথাও বলত না। আমিও বলতাম না তেমন দরকার ছাড়া। তবু বাবার সামনাসামনি হতে আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি হত। কখনও আমার দিকে মোটা চশমার ভিতর দিয়ে তাকালেও কেমন যেন ছাঁৎ করে উঠত ভিতরটা। বাবা কি বুঝত কিছু? ঠিক বুঝতে পারতাম না। তবে আমার মনে হতো বাবা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার কি খারাপ লাগত? ...লাগত আবার লাগতও না। তবে আমি আরও আরও অনেক টাকা রোজগারের কথা ভাবছিলাম। নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করালেই আমি বুঝতে পারতাম অনেক অ-নে-ক টাকা অর্জন করার জন্য আমি জন্মেছি। অনেক টাকা। সব দুঃখ, না পাওয়াকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মতো টাকা। এত সুন্দর শরীর আমার![৫২]

এ গল্পে মূল্যবোধের দ্রুত ভাঙন দেখিয়েছেন লেখক। তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বদলিয়ে গিয়েছে ব্যক্তিসম্পর্কের মাত্রাগুলি। পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসিয়ে অর্থকে দ্রুত করায়ত্ত করতে পারলেও মানুষ

অতখানি দ্রুতগতিতে তার মন কিংবা মূল্যবোধকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে অভিযোজন ঘটাতে পারেনি। সেইকারণেই মানুষের সম্পর্কের মধ্যে গড়ে উঠেছে যান্ত্রিকতা কিংবা নৈঃশব্দের পাঁচিল। সামগ্রিকভাবে যার প্রভাব পড়েছে ব্যক্তি তথা পরিবার সম্পর্কের ক্ষেত্রে। লেখক বিনোদ ঘোষাল সার্থকভাবে তাঁর ছোটোগল্পে সেই দিকটি তুলে ধরেছেন।

৬.১৩॥

বিশ্বায়নের কারণে সামগ্রিকভাবে পণ্য-সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। মানুষের মধ্যে সন্তুষ্ট মনোভাবের দ্রুত বিলয় দেখা গিয়েছিল। সম্পদ বৃদ্ধির হাতছানি মানুষকে সরিয়ে এনেছিল পূর্বতন মূল্যবোধ থেকে। অধিক উপার্জনের তাগিদে গ্রাম কিংবা মফসসল থেকে ভিড় জমছিল শহর কিংবা শহরতলির উপকণ্ঠে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে কিংবা দেশের বাইরে পরিযাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একান্নবর্তী পরিবার দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। এমনকি কেরিয়ারের তাগিদে ইতোমধ্যে সৃষ্ট নিউক্লিয়ার পরিবারের ক্ষেত্রেও ভাঙন দেখা গিয়েছিল। মানুষের অবসর সময় কিংবা যৌথ বিনোদনের পরিসর সংকুচিত হয়ে বিনোদনের ক্ষেত্রটিও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। একাজে সহায় হয়ে উঠেছিল প্রযুক্তি। অন্যদিকে প্রযুক্তিনির্ভরতার আধিক্যের ফলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। তরুণ প্রজন্ম বিশ্বায়ন-ব্যবস্থাকে দ্রুত গ্রহণ করার ফলে পূর্বপ্রজন্মের সঙ্গে তাদের মানসিক দূরত্বের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই এসময়ের বেশ কিছু ছোটোগল্পে বৃদ্ধাশ্রমের কথা উঠে আসতে দেখা যায়। বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবারের ভাঙনের ফলে পূর্বপ্রজন্মের দেখভাল করার সময় ছিল না পরবর্তী প্রজন্মের। এছাড়া তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও পরিপূর্ণতার অভাব দেখা গিয়েছিল। এই সময়কালে শিশুদের জগতটিও দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল পূর্বের তুলনায়।

তাদের খেলার মাঠ কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে সাহচর্যের পরিসর একেবারে কমে গিয়ে তার বদলে হাতে উঠে এসেছিল নিত্যনতুন প্রযুক্তি। সেগুলির প্রভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কাছে বিষময় হয়ে পড়ছিল। সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন মাত্রায় পরিবার কিংবা ব্যক্তিসম্পর্কের ক্ষেত্রে এভাবেই বদল দেখা গিয়েছিল, যা ধরা পড়েছে সমকালীন বাংলা ছোটোগল্পের পরিসরে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. Samantroy, Ellina. 'Globalization, Technology and Changing Youth Culture in India: A Sociological Perspective'. *GLOBALIZATION and SOCIAL CHANGE*. Ellina Samantroy, Indu Upadhyay (Ed.), Jaipur: Rawat Publications, 2012, pp. 137

২. Ibid, pp. 137-138

৩. ibid, p. 138

৪. মার্ক্স, কার্ল, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার*, কলকাতা: মনীষা, নভেম্বর ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৩১

৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'যন্ত্রপাতি', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪

৬. 'আর্সেনিক ভূমি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০

১০. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'মোবাইল সোনা', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ২১-২২

১১. https://www.banglanews24.com/art-literature/news/bd/922674.details Accessed on 23.04.2022 at 2.08 AM

১২. মিত্র, অমর, 'উড়োমেঘ', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: করুণা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৪৫

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৬

১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫০

১৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Pinki_Buli Accessed on 23.04.2022 at 3.31 am

১৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Black_magic Accessed on 23.04.2022 at 3.48 am

১৭. মিত্র, অমর, 'ব্ল্যাকম্যাজিক', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: করুণা, ২০১২, পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৬

১৮. সান্ত্রা, তৃপ্তি, 'লেখক পরিচিতি', *অষ্টমীটোলা ও ৫০টি গল্প*, কলকাতা: পুনশ্চ, ২০১৯

১৯. 'লেখকের কথা', তৃপ্তি সান্ত্রা, *অষ্টমীটোলা ও ৫০টি গল্প*, কলকাতা: পুনশ্চ, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৭-৮

২০. 'অনুবাদক', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪

২১. 'চাঁদের বারান্দায়', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৭-২২৯

২২. 'আনফ্রেন্ড', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩০-২৩৫

২৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, 'লেখক পরিচিতি', *গল্প ৫১*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০১৭

২৪. 'সংশোধন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮-১৩২

২৫. 'সংরক্ষক', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫০৮-৫১০

২৬. 'খোলস', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩৩

২৭. গুপ্ত, প্রচেত, 'সখী', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা, আনন্দ, জুলাই ২০১৭, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫

২৮. 'আহা! আজি এ বসন্তে', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০১

২৯. 'ইমেল বিছানো পথে'' পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬২

৩০. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৬

৩১. https://www.thequint.com/podcast/podcast-what-you-need-to-know-maharashtra- ban-dance-bars#read-more Accessed on 24.04.2022 at 11.30 pm

৩২. https://www.britannica.com/topic/great-recession Accessed on 24.04.2022 at 11.51 pm

৩৩. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, ‘শীলা’, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ২২০-২২১

৩৪. ‘ভয়’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪০

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫০

৩৬. দত্ত, সুকান্তি, ‘লেবুপাতার ঘ্রাণ’, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা, অভিযান: জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ২৯-৩০

৩৭. ‘খোলা চিঠি, ঊষসীকে’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯২

৩৮. ‘পর্নোগ্রাফির দিনরাত’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮

৩৯. ‘পরমা, তোমার জন্যে’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬০-১৬১

৪০. মজুমদার, তিলোত্তমা, লেখক পরিচিতি (ব্লার্ব), *গল্প সংগ্রহ*, কলকাতা: আনন্দ, এপ্রিল ২০২০

৪১. মজুমদার, তিলোত্তমা, ‘শর’, *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: আনন্দ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা ৪৬৯-৪৭০

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭২

৪৩. মজুমদার, তিলোত্তমা, ‘সিল্যুয়েট’, *ঋ*, কলকাতা: আনন্দ, জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা ১২১

৪৪. মজুমদার, তিলোত্তমা, ‘অনুচ্চারিত’, *গল্প সংগ্রহ*, কলকাতা: আনন্দ, এপ্রিল ২০২০, পৃষ্ঠা ৩-৪

৪৫. বসাক, তৃষ্ণা, ‘লেখকের কথা’, *দশটি গল্প*, কলকাতা: পরশপাথর, পৌষ ১৪১৭

৪৬. বসাক, তৃষ্ণা, ‘যেভাবে যেতে হয়’, *দশটি গল্প*, কলকাতা: পরশপাথর, পৌষ ১৪১৭, পৃষ্ঠা ৯

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১

৪৮. বসাক, তৃষ্ণা, ‘খেলা’, *দশটি গল্প*, কলকাতা: পরশপাথর, পৌষ ১৪১৭, পৃষ্ঠা ৩১-৩২

৪৯. বসাক, তৃষ্ণা, ‘মাতৃপুরাণ’, *ছায়াযাপন*, কলকাতা: একুশ শতক, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬

৫০. ঘোষাল, বিনোদ, ‘দুজন’, *নতুন গল্প ২৫*, কলকাতা: অভিযান, জুন ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৮

৫১. ‘খেলনাবাটি’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৯

৫২. ‘জন্মদিন’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫০-২৫১

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বায়ন: বিবিধ

বিশ্বায়ন ব্যাপারটি ঠিক কী, তার উত্তর এক কথায় দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ম্যানফ্রেড বি. স্টিগার-এর *Globalization: A Very Short Introduction* (Great Britain, Oxford University Press, 2020) গ্রন্থের ১৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায় একটি চিত্রের সাহায্যে তিনি বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ছবির নাম: 'The globalization scholars and the elephant'. ছবিতে দেখা যাচ্ছে ছয় জন ব্যক্তি একটি হাতির শরীরের বিভিন্ন অংশকে স্পর্শ করে প্রকৃতপক্ষে পুরো হাতিটিকে বুঝতে চাইছে। কেউ ধরেছে হাতির শুঁড়, কেউ দাঁত, কেউ লেজ ইত্যাদি। হাতিটির গায়ের বিভিন্ন অংশে লেখা রয়েছে 'politics', 'Culture', 'environment', 'economics', 'religion', 'ideology' ইত্যাদি শব্দাবলি। সামগ্রিকভাবে এই হাতিটি যদি বিশ্বায়নকে বোঝায়, তাহলে তার এক-একটি দিক হল উপরিউক্ত শব্দগুলি। এ থেকে বিশ্বায়নের পরিধি সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

পূর্বোক্ত গ্রন্থে বিশ্বায়ন কী, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে Manfred B. Stegar জানাচ্ছেন—

> The earliest appearance of the term 'globalization' in the English language can be traced back to the 1930s. But it was not until the 1990s that the concept took the world by storm. The new buzzword captured the increasingly interconnected nature of social life on our planet and foregrounded the global integration of markets turbocharged by the ICT revolution. Three decades on, globalization has remained a hot topic that has recently been subjected to growing criticism—especially from the resurgent national populist forces around the world.[১]

এই বক্তব্যে বিশ্বায়নের কারণে সারা পৃথিবীতে বাজারের একীভবন ঘটানোর পশ্চাতে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার এক বড়ো অবদানের কথা বলেছেন স্টিগার। তবে তথ্য-প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের সম্পর্কটি পারস্পরিক। তা বিশ্বায়নের অগ্রসরণে যেমন ধনাত্মক অনুঘটকের কাজ করেছিল, তেমনই বিশ্বায়নের ফলে এই ক্ষেত্রটিরও প্রসার ঘটেছিল।

বিশ্বায়নের কারণে সারা পৃথিবীতে বাজারের বিস্তার ঘটেছিল। 'বাজার' নামক ব্যবস্থাটির বহুরকম রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, বা এখনো হয়ে চলেছে। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের একাধিক অধ্যায়ে পুঁজির বা বাজার ব্যবস্থার প্রসারের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্বায়নের বাজার ব্যবস্থার অগ্রগতির কারণে ও তার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব বাংলা ছোটোগল্পে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেই দিকটি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়ে বিশ্বায়নের বিবিধরকম প্রভাব বাংলা ছোটোগল্পে কীভাবে এসে পড়েছিল সেই দিকগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে।

৭.১॥

বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিতে বিশ্বায়নের পুঁজি-পরিচালিত বাজার ব্যবস্থার একাধিক অনুপুঙ্খ প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে উঠে এসেছে বিজ্ঞাপন-নির্ভর সময়, পণ্যায়ন, যান্ত্রিকতা। অন্যদিকে একাধিক ছোটোগল্পে দেখা গিয়েছে বিশ্বায়ন মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে যেমন পণ্যে পরিণত করেছে, তেমনই গোটা মানুষকেও পরিণত করেছে পণ্যে। একাধিক ছোটোগল্পে তাই উঠে এসেছে পৃথিবী-জোড়া নারী পাচার কিংবা নারী মাংসের বাজারের কথা। আবার বিশ্বায়নের আগ্রাসনের প্রতিবাদে দেশে বিভিন্ন বিরোধী আদর্শের উদ্ভব ঘটেছে, যা মূলত পুঁজির পক্ষ নেওয়া রাষ্ট্রশক্তিকে

বারে বারে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে। এর বিপরীতে তাদের উপরেও নেমে এসেছে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন। কোনো কোনো গল্পকার তাঁর গল্পে লোকসংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব কীভাবে এসে পড়েছে, তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পূর্বের পরিবারব্যবস্থা ভেঙে পড়া, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের বাসস্থান হিসাবে ফ্ল্যাটনির্ভরতা বৃদ্ধি, মাতৃভাষা-মাধ্যম বিদ্যালয়ের অপমৃত্যু, ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের দ্রুত সম্প্রসারণ, নগরায়ণ, পুরানো পেশার মৃত্যু, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া, গ্রাম কিংবা মফসসলের সংস্কৃতির পরিবর্তন, ভোগবাদের সম্প্রসারণ, স্থানীয় লোকজ-সংস্কৃতির পণ্যায়ন, বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে ক্ষুদ্র পুঁজির লড়াই কিংবা মানুষের ক্রমবর্ধমান একাকীত্ব—এই সবকিছুই হয়ে উঠেছে এই নির্দিষ্ট সময়পর্বের ছোটোগল্পের বিষয়-আশয়। এই অধ্যায়ে নির্বাচিত কয়েকজন ছোটোগল্পকারের গল্পের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই দিকগুলিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭.২॥ **বসন্ত লস্কর**

বর্তমান সময়ের এক জরুরি কথাকার হলেন বসন্ত লস্কর (জন্ম-১৯৪৭)। ইন্দ্রাণী লস্কর ছদ্মনামে লেখক বসন্ত লস্কর তাঁর *ঢাক* (পরশপাথর, বৈশাখ ২০০৯) নামক গল্পগ্রন্থের একাধিক ছোটোগল্পে বিশ্বায়নের বিভিন্ন মাত্রাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এইধরনের একটি ছোটোগল্প হল ‘কুইনের ফটোগ্রাফ—একটি ফ্যান্টাসি’। বিশ্বায়নের পণ্যসংস্কৃতি সামাজিকভাবে কতখানি শিকড় বিস্তার করেছে, এ গল্প তারই অনুপুঙ্খ তুলে ধরে। মাত্র ন-মাস বয়সের শিশু ‘কুইন’-এর ছবি দেখে পছন্দ হয়ে যায় একটি বিখ্যাত অ্যাড এজেন্সির আর্ট ডিরেক্টরের। শিশুটির মামা সেই প্রস্তাব নিয়ে আসে তার বাবা-মায়ের কাছে। বাবা প্রত্যূষ কলেজের অধ্যাপক, মা চন্দ্রানী গৃহবধূ। দাদার

আনা প্রস্তাবে চন্দ্রানী রাজি হলেও প্রত্যূষের মন সায় দেয় না। সে এই পণ্য সংস্কৃতির বিরোধী। তাই সে চায় না মাত্র ন-মাস বয়সের শিশুর হাসিকান্নাকে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে। কিন্তু সেই ভাবনায় প্রথম বিরোধিতা আসে শিশুটির মায়ের কাছ থেকে। সে চলতি হাওয়ার পন্থী। শিশুটি 'স্টার' হয়ে উঠুক—এই বাসনা তার মধ্যে ক্রিয়াশীল। শেষপর্যন্ত শিশুটির বাবা-মায়ের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে মা তার শিশুটিকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। অ্যাড এজেন্সির শুটিং সেখানেই হবে। এরপর নির্দিষ্ট দিনে অ্যাড এজেন্সির লোকেরা আসে। তারা ছবি তোলার প্রয়োজনে ইচ্ছামতো শিশুটিকে কখনো কাঁদায়, কখনো হাসানোর চেষ্টা করে। কাঁদাতে পারলেও হাসাতে তারা পারে না। শেষ পর্যন্ত প্রত্যূষ খরগোশের ভঙ্গি করে তাকে হাসানোর চেষ্টা করে। আর এইভাবে এই কয়েকদিনে সে পণ্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়—

> প্রত্যূষ গুছিয়ে বসার পর, মেজোমামা শুরু করে। শেষ করার আগেই আঁতকে ওঠে প্রত্যূষ, 'না- না, কুইনের ছবি বিক্রি করব, এ আবার হয় নাকি? ওইটুকু বাচ্চা—ওর হাসি কান্না—না-না, মেজদা—ছিঃ, কুইনের হাসিকান্না বাজারে বিক্রি হবে? কোথায় যাচ্ছি আমরা?' বউয়ের মুখের দিকে সমর্থনের আশায় তাকায়। চন্দ্রানী হামলে পড়ে, 'কী হয়েছে? ক্ষতি কী হয়েছে? তোমার মেয়ের ছবি হোর্ডিংয়ে থাকবে, কাগজে, টিভিতে—উঃ! মেজদা আমি ভাবতেও পারছি না। কী পাবলিসিটি!'
>
> বউকে ধমকে ওঠে প্রত্যূষ, 'তোমাকে পারতেও হবে না! মেজদা, আপনি না করে দিন।'
>
> 'জান ওরা কত টাকা দেবে? মাত্র কয়েকটা ফটোর জন্যে...'
>
> মেজদাকে থামিয়ে দেয় প্রত্যূষ, 'ছিঃ ছিঃ, ওইটুকু মেয়ের কান্না-হাসি বিক্রি করে টাকা! এর মর্‍্যাল দিকটাও একবার ভাবুন!'
>
> 'কীসের কী মর্‍্যাল দিক? না মেজদা, তুই বলে দে আমরা রাজি। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্রোডাক্টের গায়ে আমার মেয়ের ছবি, ভাবা যায়!'

'না মেজদা, আমরা রাজি নই, আপনি না করে দিন।'

চন্দ্রানী ফ্যাঁস করে ওঠে, 'আমরা আমরা করছ কেন? বল তুমি রাজি নও।' [২]

'যা বলছ সবই যে রাগের কথা তুমি জান। কিন্তু চাঁদনী, কেন বুঝছ না। পৃথিবীতে একদল লোক আছে তারা কোনো কিছুই পবিত্র থাকতে দেবে না। আমাদের বাচ্চাদের হাসি কান্নাটুকুও না।'[৩]

বিশ্বায়ন প্রকৃতপক্ষে এইভাবে মানুষের মূল্যবোধের জগতে হানা দিয়েছিল। প্রক্রিয়াটি বাহ্যিক জাঁকজমক সহকারে একটি বড়ো অংশের মানুষকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল তার পণ্যসংস্কৃতির প্রতি। পারিবারিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রত্যূষের মতো শাশ্বত চেতনার মানুষেরা পরিবারে কিংবা সমাজে কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। অনেক চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত এই ধরনের মানুষেরা পরাজিত হচ্ছিল—

মিত্রের আনা কাশ্মীরি কার্পেটে চারপাশে জড়ানো খেলনা, মাঝখানে বার্বিডল বুকে নিয়ে কুইন বসেছে। চন্দ্রানী ফিসফিস করে, 'ওমা, একটুও ঘাবড়ে যাচ্ছে না দেখেছ?'

'ওকে এবার একটু কাঁদাতে হবে যে! যাও রিঙ্কি, ওর কাছ থেকে বার্বিটাকে কেড়ে নাও!'

ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে কুইন। ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক। প্রত্যূষের বুকে লাগে। ''দারুণ! ইকসেলেন্ট! আপনার মেয়ে তো মশাই মডেল হয়েই জন্মেছে।' আনন্দের আতিশয্যে প্রত্যূষের কাঁধে চাপড় মারেন ভদ্রলোক।[৪]

এ গল্পে এভাবেই একটি শিশুকে কাঁদায়-কিংবা হাসায় বিশ্বায়নের পণ্যসংস্কৃতি। প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর মানুষকেই পুঁজি তার ইচ্ছামতো আচরণ করায়। গল্পে প্রকৃতপক্ষে এই সত্য উঠে আসে যে, পণ্যসংস্কৃতি মানুষকে কাঁদাতে পারলেও হাসাতে পারে না। সেই ক্ষমতা তার নেই। বা সেই পণ্যসংস্কৃতি মানুষের কল্পনার জগতকে ততক্ষণই প্রশ্রয় দেয়, যতক্ষণ তার মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে। অন্যদিকে 'ফ্যান্টাসি' প্রকৃতপক্ষে একধরনের চিন্তা, যা বাস্তবে ঘটে না। এ গল্পে একধরনের কল্পনার জগৎ নির্মাণ করে শিশুর শৈশবের বিনিময়ে তার মা প্রকৃতপক্ষে পেতে চায়

সেইরকম কোনও কিছু, যা সে নিজে কল্পনা করত বা পেতে চাইত। মা নিজের অবদমিত বাসনা-কল্পনাকে এইভাবে চরিতার্থ করতে চাইলেও পুঁজি প্রকৃতপক্ষে যে শিশুর কল্পনার জগতটিকে ভেঙে দেয়, তা শিশুটির থামতে না চাওয়া কান্নার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এইভাবে গল্পটি একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

৭.৩॥ **শচীন দাশ**

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে এক অন্য ধারার গল্পকার শচীন দাশ। সাহিত্যে এম.এ শচীন দাশ (১৯৫০-২০১৬)-এর লেখালেখি শুরু সাতের দশকের গোড়ায়। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'কালি ও কলম' পত্রিকায়। প্রথম পুরস্কৃত গল্প 'চোখ'। গল্পটি কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। শচীন দাশের প্রকাশিত ছোটোগল্পের সংখ্যা প্রায় ছ'শো। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ, *কলকাতার দিকে, লখিন্দর, মধ্যরাতের কাব্য, নির্বাচিত কুড়ি, পঞ্চাশটি গল্প, বাদাভূমির গল্প* ও *সাহিত্যের সেরা গল্প* নিয়ে মোট আটটি। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *যুদ্ধযাত্রা, লাশ ভাইস্যা যায়, অন্ধনদীর উপাখ্যান, নদীতরঙ্গের আয়না, নুন দরিয়া, নদী হয়ে যায়, জল-জঙ্গলের রয়ানি, আকালুদ্দি ও এক নদী* প্রভৃতি।

লেখক শচীন দাশ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত কথা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য ২০০৯-এ 'শান্তি সাহা পুরস্কার'। ওই বছরেই উপন্যাসে 'শৈবভারতী' পুরস্কার, ২০১৩ সালে গল্পে সামগ্রিক অবদানের জন্য 'মহাদিগন্ত' পুরস্কার, 'চোখ' গল্পের জন্য বিভূতিভূষণ স্মৃতি পুরস্কার ও নানাবিধ সম্মাননা।[৫]

সাতের দশকের শুরু থেকে একুশ শতকের প্রায় দেড় দশক পর্যন্ত শচীন দাসের ছোটোগল্প লেখার যাত্রাপথে অবধারিতভাবেই এসে পড়েছিল বিশ্বায়নের প্রভাব। তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে সেই প্রভাবগুলিকে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। এইধরনের কয়েকটি ছোটোগল্প হল— 'হননের আয়োজন', 'ফেরার পথ', 'পোড়া গাছ', 'নাগরের দিনরাত', 'আলো অন্ধকার', 'নীল কাঁকড়া', 'বিশ্বায়ন' ইত্যাদি।

'নাগরের দিনরাত' (*এবং মুশায়েরা*, ২০০৬) গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে বেড়ে চলা পণ্যসংস্কৃতির প্রভাব। সেই সূত্রে এ গল্পে উঠে এসেছে 'যৌনতা'-র পণ্য হয়ে ওঠার এক ভিন্ন দিক। এ গল্পে বস্তিতে বাস করা একজন যুবক আর্য ভালোবাসে ঝিল্লিকে। কিন্তু সেই ভালোবাসা সে ব্যক্ত করতে পারে না। কারণ সে একজন পুরুষ যৌনকর্মী। সারাদিন উচ্চকোটির বাসিন্দা মধ্যবয়সী থেকে প্রৌঢ়া, এমনকি ষাটোর্ধ মহিলা ক্রেতাদেরকে সন্তুষ্ট করার বার্তা নিয়ে তার মোবাইল বাজতেই থাকে। এমনকি এই কাজে তার বিশ্রাম নেওয়ার সময় পর্যন্ত থাকে না। তার সমস্ত সময় কিংবা শারীরিক ক্ষমতা অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয় একদল মানুষ। এজন্য তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না সুস্থ কোনো সম্পর্ক গড়ে তোলা। বস্তির পরিচিত জগৎ ছেড়ে তাকে ফ্ল্যাট নিয়ে চলে যেতে হয় অন্যত্র। এমনকি সে তার মায়ের সন্দেহের চোখে পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত পণ্য-পৃথিবীর এই প্রবল শোষণ সহ্য করতে না পেরে একদিন আবর্জনাময় খালে ফেলে দেয় তার মোবাইল ফোনটিকে—

> খাল পেরোতেই, খালের এপারে আচমকা একসময় ভূমির ব্যান্ড : বারান্দায়...রোদ্দুর...। চমকে উঠে মুখ তুলতেই আর্য আবিষ্কার করল তার পকেটেই। আর্য হাত বাড়ায়। এবং বাড়িয়ে একপাশে সরে গিয়ে হালকা একটু পুশ করতেই 'আমি আরাম কেদারায় শুয়ে'-র জায়গাটা যেন মুহূর্তেই কোথাও ছিনতাই হয়ে যায়।[৬]

যে বাজার সংস্কৃতি মানুষের অবসর কেড়ে নিয়ে তাকে কেবলই পণ্যে পরিণত করেছে, এ গল্পে লেখক সেই বাজারকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন—

> বাজার বোঝো? বাজার!
>
> বাজার! মানে... আর্য ইতস্তত করে।
>
> আর ওই তখনই ধনেশ, না না আমি চেতলা কিংবা কালীঘাট বাজারের কথা বলছি না। বলছি...আচ্ছা, কথাটা সরাসরিই বলে ফেলি। তোমার সবই ঠিক আছে, শুধু ওই আর্ট অব প্লেইংটা আরও রপ্ত করতে হবে। মানে খেলার কথা বলছি আরকি। যে যত ভালো খেলবে তারই তত বাজার উঠবে। কাজেই ওই খেলাটাই হল আসল। বাৎস্যায়ণের নাম শুনেছ?...
>
> একটু থেমে বলল আবার, যাক গে- শোনো এখন। খেলাটা তোমায় শিখতেই হবে। ওই যে কুলকার্ণি, ভাটনগর আর সিং থেকে ব্যানার্জী, চ্যাটার্জী, গুহ ও গুপ্তাদের হ্যান্ডেল করেছ, ওরা সবাইই এক একজন পাক্কা খেলুড়ে। তা ওই খেলুড়েদের সঙ্গে খেলতে গেলে তোমাকেও কিন্তু লড়তে হবে। না হলে বাজার থাকবে না। কাম অন আর্য, কাম অন-...
>
> এসো, এসো এ ঘরে। মার্কো কখনও তোমাকে বাজে কথা বলবে না। এসো-
>
> হিড়হিড় করে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়েই এরপর ডি-ভি-ডি। সুইচ অন করতেই তখন তাতে খেলা। কত কত যে খেলা। ওপরে নীচে, পাশে ও কাছে। শরীরে শুধু শরীরেরই যোগ।[৭]

লেখকের কলমে এ গল্পে 'বাজার' শব্দটি বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

'নীল কাঁকড়া' (শারদীয় *আজকাল*, ১৪১৮) গল্পে মূলত ধরা পড়েছে সুন্দরবন সন্নিহিত এলাকায় কাঁকড়ার ব্যবসাকে কেন্দ্র করে নরনারীর সম্পর্কের খতিয়ান। কিন্তু তারই আড়াল থেকে এ গল্পে কাঁকড়ার ব্যবসা কেমন করে বিশ্বায়িত হয়ে পড়েছে, সেই দিকটিকেও তুলে ধরেছেন লেখক। সেইসঙ্গে কীভাবে প্রান্তিক অঞ্চলে সাধারণ কাঁকড়া ব্যবসায়ীদের হাতে মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি সুলভ হয়ে উঠেছে, তাও দেখিয়েছেন লেখক—

> এদেশে নোনাজলে কাঁকড়া হয় প্রচুর। নদীনালা খালবিলে যেমন ঘুরে বেড়ায় তেমনি চাষও হয় আবার ভেড়িতে। দিন দিন এর চাহিদা বাড়ছে। বিদেশে রপ্তানি হয়। এদেশের হোটেল, রেস্তোরাঁয়ও তার প্রচণ্ড কদর। চাহিদা তাই আকাশচুম্বী। আগে নিলাম হত। কুড়িতে বিক্রি হত। কিন্তু এখন আর তা নেই। কিলো হিসেবে বিক্রি হয়। এই ন্যাজাটের বাজারেই তো ইদানিং কিলো দরে বিকোচ্ছে কাঁকড়া। আড়তে আড়তে তাই মোবাইলের ছড়াছড়ি। মোবাইলে মোবাইলে কথা চালাচালি। কলকাতার সঙ্গে কথা হয়। দর ওঠানামার খবরাখবর দেয়। খবর নেয়। কোন কাঁকড়ার কত দর উঠছে। কোন কাঁকড়া কীভাবে সমাদর পাচ্ছে। সব খবরই ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত নোনা হাওয়ার জলজঙ্গলে।[৮]

এভাবেই লেখক দেখান যে, কীভাবে প্রান্তিক মানুষের জগতেও এসে লেগেছে বিশ্বায়নের ছোঁয়া।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে বিপন্ন হয়েছে নারীসমাজ। একদিকে যেমন নারীর ব্যক্তিসত্তা প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রগুলি বিস্তার লাভ করেছে, তার পাশাপাশি প্রান্তিক শ্রেণীর নারীরা আরও বেশি করে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ সারা ভারতে কিংবা সারা পৃথিবীতে পণ্যসংস্কৃতি বিস্তারলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নারীমাংসের চাহিদা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। সেই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে বেড়েছে নারীপাচার। ভারতে এর অন্যতম কারণ হিসাবে উঠে এসেছে কন্যাভ্রূণ হত্যা, যা পরোক্ষে নারীপাচারের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। লেখক শচীন দাশ তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন এই নারীপাচারের কথা। 'হননের আয়োজন', 'ফেরার পথ', 'পোড়া গাছ', 'আলো অন্ধকার'[৯] ইত্যাদি গল্পে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে গ্রামবাংলার দরিদ্র পরিবারগুলি থেকে বিয়ের প্রলোভনে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক অথবা অভিভাবকহীন মেয়েরা পাচার হয়ে চলেছে। 'হননের আয়োজন' গল্পে উঠে আসে ময়না নামের একটি মেয়ের কথা, যে চব্বিশ পরগনার ভেড়ি অঞ্চল থেকে স্থানীয় দালাল মারফৎ উত্তরপ্রদেশের মথুরায় পাচার হয়ে যায়। এরপর বেশ কিছুদিন ধরে ধর্ষিত হওয়ার পর সে পালিয়ে ফিরে আসে সেই ভেড়ি অঞ্চলেই।

কিন্তু বাঁচতে পারে না সে। তাকে খুন হতে হয় সেই পাচারকারীদের হাতেই। ‘ফেরার পথ’ গল্পে উঠে আসে নারীপাচার চক্রের কথা। যারা গ্রামে গঞ্জে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ে করে ভিনরাজ্যে পাচার করে দেয় টাকার বিনিময়ে। এ গল্পে উঠে আসে নয়ন নামক এক যুবকের কথা, যার পেশাই হল বিবাহ করা এবং সদ্যবিবাহিতা বধূটিকে দালালদের হাতে বিক্রির জন্য তুলে দেওয়া। এ গল্পে সেই চক্রটির ধরা পড়ার উপক্রম হলেও সদ্য বিবাহিত বধূটি বেঁকে বসে, সে জানায় পাচারকারী যুবকটির সঙ্গেই যেতে চায় সে। অর্থাৎ নারী কতখানি অসহায় হলে এইরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তা লেখক এই গল্পে তুলে ধরেছেন। ‘পোড়া গাছ’ গল্পেও লেখক তুলে ধরেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা এলাকা থেকে বিবাহের মাধ্যমে নারীপাচারের বিবরণ। আস্তিক নামের এক যুবককে পাচারকারীরা বিবাহের পাত্র হিসাবে বারংবার বিবাহ দেয় এবং সদ্যবিবাহিত বধূদের আস্তিক তুলে দেয় পাচারকারীদের হাতে। একসময় যুবকটি আর এই কাজ করতে না চাইলেও সে বেরিয়ে আসতে পারে না পাচারকারীদের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার ভয়ে। ‘আলো-অন্ধকার’ (*কালপ্রতিমা সাহিত্যপত্র,* অক্টোবর ২০০১) গল্পেও উঠে এসেছে একই ধরনের নারীপাচারের গল্প। এ গল্পে কামাল নামের এক যুবক পাচারকারীদের হয়ে গ্রামের মেয়েদেরকে প্ররোচনা দিয়ে বের করে আনে। বিবাহের অছিলায় তাদের পাচার করে দেয় একের পর এক। গল্পে কিশোরী কন্যা তাহিরাকে পাচার করে দেওয়ার ছক কষে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যায় সে। এইভাবেই একের পর এক গল্পে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে নারীপাচারের মতো অপরাধকে তুলে ধরেছেন লেখক। তুলে ধরেছেন সেই পরিস্থিতি কিংবা দারিদ্র্যের জগতকে, যেখানে মেয়েরা সহজেই সচ্ছলতার ভাবী স্বপ্নে ভুলে পা রাখে অজানা জগতে। যেখান থেকে বেশিরভাগজনই আর কখনও ফিরে আসতে পারে না।

বাংলা ১৪১১ সালে *বিভাব* পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল শচীন দাশের লেখা ছোটোগল্প ‘বিশ্বায়ন’। এ গল্পের নামকরণটিই যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনই এর অন্দরে বিশ্বায়ন সম্পর্কে লেখকের ধারণার একটি খতিয়ান যেন উঠে আসে। এ গল্পের চরিত্র নীলেশরঞ্জন বসু অফিসে চাকরি করার পাশাপাশি কবিতা লেখেন। তাঁর স্ত্রী রিক্তা ব্যাপারটি পছন্দ করেন না। পৈতৃক বাড়িতে জীবনের বাহান্নটি বছর অতিক্রম করা নীলেশবাবুর বাড়িতে একদিন পাড়ার প্রোমোটার আসে। তাঁর চারকাঠা জমির উপরে থাকা বাড়িটি ভেঙে ফ্ল্যাট তৈরি করার প্রস্তাব দেয় সে। প্রথমে ভদ্রলোক রাজি হন না। এরপর প্রথমে কখনও বিলিতি পানীয়ের বোতল দিয়ে, কখনো তাঁর কবিতার বইয়ের প্রশংসা করে, কখনও বা কঠোর মনোভাব দেখিয়ে তাঁকে বশে আনতে চেষ্টা করে প্রোমোটারটি। আর এইকাজে তাকে সাহায্য করে নীলেশবাবুরই স্ত্রী রিক্তা। শেষপর্যন্ত ঘরে-বাইরের চাপের কাছে মাথা নত করে তাদের প্রস্তাবে বাধ্য হতে হয় নীলেশবাবুকে। ফ্ল্যাট তৈরি হয়। বাড়ির বাসিন্দা থেকে তাঁরা ফ্ল্যাটের বাসিন্দায় পরিণত হন। আর কবিতা লেখেন না নীলেশবাবু। যে স্ত্রী কবিতা পছন্দ করত না, সেই একদিন আবার কবিতা লিখতে অনুরোধ করে তাঁকে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত নীলেশবাবু জানান, কবিতা তাঁকে ছেড়ে গিয়েছে। এ গল্পে শুধু এটুকুই লেখকের বক্তব্য নয়, তিনি দেখান, বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়াটি কীভাবে মানুষের জীবনবোধ কিংবা মূল্যবোধকে দ্রুত পরিবর্তন করে দেয়। এর আগ্রাসী সংস্কৃতির বাইরে যদিও বা দু-একজন মানুষ অবস্থান করেন, তবে বাকিরা তাঁদেরকে পারিপার্শ্বিক চাপে ফেলে শিকারে পরিণত করে। এ গল্পে তাই নীলেশবাবুর অনুভূতিগুলিকে শেষপর্যন্ত একে একে নিহত হতে দেখা যায়। সেই সঙ্গে এ গল্পে বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উঠে আসে পুরানো বাড়িঘর ভেঙে ফ্ল্যাটবাড়ির বিস্তার, প্রোমোটিং, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি মানুষের অন্তর্গত মূল্যবোধের একাধিক পরিবর্তন—

...ভবেশবাবুর ভাগ্নে প্রোমোটারি করে জানো তো?

—তা জানি।

—তা হলে! এবারে দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফ্যালো—

আমি চুপ। রিক্তার চোখ জোড়া দেখি আবারও সরু হয়ে উঠছে। কিন্তু কিছু বলে ওঠার আগেই যেন আমার গলা থেকে বেরিয়ে এল: তার মানে! তুমি কি এ-বাড়ি প্রোমোটারের হাতে তুলে দিতে বলছ?

—না দিয়ে কী করবে শুনি? বাড়িটার চারপাশে তাকিয়ে দেখেছ! এখানে ভাঙা ওখানে ফাটা। বর্ষায় ছাদ চুঁইয়ে জলও তো পড়ে মাঝেমধ্যে।

—তা, এ বাড়ি কি আজকের! এখানে আমার দাদুর জীবন কেটেছে, বাবার জীবন পার হয়েছে এবং এখন আমি...

রিক্তা মাথা নাড়ল প্রাণপণে, তারপর বলল: সে-জন্যই তো বলছি, এই বাড়ি আর এভাবে রাখা যায় না। তা ছাড়া তোমার আশেপাশে তাকিয়ে দেখেছ! চারদিকে সব ঝাঁ-চকচকে বাড়ি। তিনতলা, চারতলা। না না, তুমি ভবেশবাবুর ভাগ্নের সঙ্গে কথাটা সেরেই ফ্যালো। পরিষ্কার চার কাঠা জমি আছে। দুটো ফ্ল্যাট চাইবে। আর তিন লক্ষ ক্যাশ। পুনাইয়ের বিয়েটা তা হলে ঢাকঢোল পিটিয়ে করা যাবে।

পুনাই আমার একমাত্র মেয়ে। এই ফাল্গুনে এবার সাতে পড়বে। তার মানে খুব কম বয়সে হলেও এখনো আরো বছর পনেরো-ষোলো। তা ততদিনে ওই টাকায় ঢাক-ঢোল পেটানো যাবে তো? বাজারের যা অবস্থা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এর ওপর প্রায়ই শুনছি রিটায়ারমেন্টের বয়স, ৬০ থেকে ৫৮ হচ্ছে। লিভ স্যালারি মাস তিনেক কমছে। আর পেনশন ফক্কা।[১০]

বিশ্বায়ন মানুষের অন্তর্গত একাধিক আবেগের মৃত্যু ঘটতে বাধ্য করেছিল। পাশাপাশি সরকারি চাকরির নিরাপত্তাও কমছিল দ্রুত হারে। যা ছিল আসলে পুঁজিপরিচালিত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে মানুষের জীবনধারা চালিত হয়েছিল লোভ-দ্বারা পরিচালিত এক অন্ধকারময় নেতিবাচকতার দিকে—

কয়েকটা মাস পর।

> এক সকালে আমাদের বাড়ির সামনে একটা ম্যাটাডোর এসে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই তাতে খাট, ড্রেসিং টেবল ও বিছানা। সঙ্গে ছেলেমেয়ে-সহ আমরা চারজন। সেই যে যাওয়া, ফিরে আসা আবার এক বছরের মাথায়। তখন আমাদের পুরোনো বাড়ির জায়গাটায় ঝাঁ-চকচকে এক ফ্ল্যাটবাড়ি। আর ওই বাড়িরই দোতলায় মুখোমুখি দরজার দু-দুটো ফ্ল্যাট আর দরজা খুলেই ভেতরে তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু তা পুনাইয়ের জন্য নয়। অতঃপর খাট এল। পরদা হল। সোফা বসল। সোফার ওপর চার ব্লেডের পাখা। আর সে-পাখার তলায় রিক্তা। রিক্তা হাসছে। রিক্তা গাইছে। আশেপাশে কত মানুষ। টিভি চলছে। ফ্রিজ চলছে। এ-ঘরের সঙ্গে ও-ঘরের পরিচয়। এ-ঘরের সঙ্গে ও-ঘরের বউ-বিনিময়। এ-বিছানা ছেড়ে ও-বিছানায় স্বাদ পালটানো। গভীর রাতে টলতে টলতে বাড়ি ফেরা।[১১]

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আঁচড়ে এইভাবেই বিশ্বায়নের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন লেখক শচীন দাশ। আর শুধু এ গল্পেই নয়, তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে নানান বৈশিষ্ট্যে এভাবেই বার বার খুঁজে পাওয়া যায় বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়াটিকে।

৭.৪॥ **নলিনী বেরা**

বর্তমান সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যে নলিনী বেরা এক ব্যতিক্রমী নাম। তাঁর উপন্যাস কিংবা ছোটোগল্পে বার বার উঠে এসেছে ওড়িশা সন্নিহিত মেদিনীপুর জেলার কথ্যভাষা, আখ্যান, পুরাকথা ইত্যাদি। তারই অন্তরালে উঠে এসেছে আধুনিক সময়, রাজনৈতিক ঘটনাবলি, রাষ্ট্র বনাম সাধারণ মানুষের লড়াই ইত্যাদি প্রসঙ্গ। সব মিলিয়ে এক চলমান সময় ধরা পড়েছে তাঁর কথনবিশ্বে।

নলিনী বেরা ১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তের কাছাকাছি সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভুঁইঞা-ভূমিজ-সাঁওতাল-লোধা-কামহার-কুমহার অধ্যুষিত ‘বাছুর খোঁয়াড়’ গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রোহিণী গ্রামের ‘চৌধুরানী রুক্মিণী দেবী হাইস্কুল’

থেকে বিজ্ঞানে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেন। মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও কলকাতায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়াশোনা। ডবলিউ বি সি এস পরীক্ষায় ‘এ’ গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আধিকারিক। বেশ কিছুদিন কলকাতা পৌরনিগমের বিচারক ছিলেন। কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবনের শুরু হলেও গদ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা। প্রথম গল্প ‘বাবার স্মৃতি’ সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় উনিশশো ঊনআশিতে প্রকাশিত। প্রথম উপন্যাস *ভাসান*। প্রথম ছোটোগল্পের বই *এই এই লোকগুলো*। ২০০৮ সালে *শবরচরিত* উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ‘বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার’ লাভ করেন তিনি।[১২] *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা* উপন্যাসের জন্য লাভ করেন ১৪২৫ বঙ্গাব্দের আনন্দ পুরস্কার।[১৩]

লেখক নলিনী বেরার ছোটোগল্পে বার বার উঠে এসেছে তাঁর মেদিনীপুরের গ্রাম, গ্রামের মানুষ কিংবা সম্পর্কসমূহ। বেশ কিছু গল্পে উঠে এসেছে জঙ্গলমহলের উপদ্রুত সময়, মাওবাদী কিংবা যৌথ বাহিনীর লড়াই, আর তার মধ্যে পড়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের দুরবস্থার কথা। অন্যদিকে এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে কয়েকটি গল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে বিশ্বায়নের একাধিক লক্ষণসমূহ। তাঁর এইধরনের কয়েকটি ছোটোগল্প হল ‘কুসুমতলা’, ‘অঙ্গনওয়াড়ি’, ‘হারমোনিয়াম’ কিংবা ‘এক মিনিটের নীরবতা’ ইত্যাদি।

‘কুসুমতলা’ গল্পে ধরা পড়েছে হাওড়ার একটি এলাকার কথা। পূর্বেকার স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে গল্পের চরিত্রের কথনে উঠে আসে বিশ্বায়ন সেখানে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে সেই দিকটি। অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রভূত বিস্তারের পরেও যে মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মনের কোনো পরিবর্তন হয় নি, সেই দিকটিও গল্পে উঠে এসেছে। অন্যদিকে এ গল্পে ধরা পড়েছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের

বিস্তার কিংবা দ্রুত গড়ে ওঠা শপিং মলের কথা, যেগুলি কিনা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নেরই এক একটি চিহ্ন—

> এই তো ক'বছর আগেও খুরুট রোডের ধারে কচুরিপানা ভরতি পুকুরটার পানা সরিয়ে জলের মাঝখানে প্যান্ডেল খাটিয়ে 'কমলে কামিনী' বানিয়ে 'খুরুট ক্লাব'-এর ছেলেরাই সরস্বতী পুজো করত। সরস্বতীর ভাসানে ক্লাবের সদস্যরাই মাথায় কুঁচি দেওয়া পাগড়ি আর সাদা 'ইউনিফর্ম' পরে সাইড্রাম-বিড্রাম-বিউগল বাজিয়ে 'প্রসেশন' করত। পনরই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারি করত। এখনও সেসব আছে, তবে সে-পুকুরটা আর নেই। তার জায়গায় গড়ে উঠেছে বড় বড় স্কাইক্র্যাপার। শপিং মল-বিগবাজার-ইন্টারনেট-বিউটিপার্লার। নোকিয়া-স্যামসুঙ-মোটোরোলা-এস এম এস-পার্ক প্লাজা। তার মধ্যেও আমাদের মঙ্গলবার আছে। মঙ্গলবার-মঙ্গলবার আমরা আমিষ খাই না।[১৪]

জলাভূমি ধ্বংস করে পরিবেশ রক্ষার প্রসঙ্গকে চাপা দিয়ে বিশ্বায়নের ফলে এইভাবেই দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল আবাসন শিল্প কিংবা বাজারের বিভিন্ন রূপসমূহ। এতৎসত্ত্বেও পাশাপাশি পুরানো সংস্কারকেও বজায় রেখেছিল মানুষ। ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের প্রসার ঘটেছিল। বদলে গিয়েছিল মানুষের আদব-কায়দা—

> বাড়ি থেকে অফিস বেরোনর সময় গলির মুখটায় রোজ রোজ দেখা হয়ে যায় অঞ্জনের ৩-৪ বছরের মেয়েটার সঙ্গে। লাল ইউনিফর্ম পরা। গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস। তার পুল-কার আসে সকাল ৯টায়। আমারও। আমাদের প্রতিবেশী অঞ্জন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ার। তার ওইটুকু মেয়ে দেখা হলেই আমাকে "হাই" "হ্যালো" বলে, স্কুলে যাবার সময় রোজ "টা টা"। আমিও। তার পুল-কারের পিছনে হিন্দিতে লেখা—"মেরা ভারত মহান"।[১৫]

> গাড়িটা কিড স্ট্রিট হয়ে ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের দিকে ঢুকে গেল। 'যমুনা সিনেমা' আর সে যমুনা নেই। সেখানে হাল ফ্যাসানের মস্ত বড় শপিং মল ! কোত্থেকে গান এসে গেল—"ও নীল যমুনার জল— !"[১৬]

অন্যদিকে এ গল্পে লেখক কয়েকটি আঁচড়ে তুলে ধরেছেন বিশ্বায়নের একাধিক অগ্রগতির দিকগুলিকে—

> নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই অত্যুৎসাহে, বলতে কী সেই কুসুমগাছের টানেই বেরিয়ে পড়লাম। হাওড়া থেকে খড়গপুর, ট্রেনে। খড়গপুর থেকে রোহিণী, বাসে। রাস্তাঘাট কত বদলে গেছে, আরও বদলাচ্ছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে-সিক্স ছ'লেন না আট লেন হয়েছে। ঢল নেমেছে বিশ্বায়নের—যেমন শহরে তেমন গ্রামেও। বিদ্যুৎ, সোলার বিদ্যুৎ, মোড়ে মোড়ে এস. টি. ডি. বুথ, ছাদে ছাদে অ্যান্টেনা, ঘরে ঘরে কেবল লাইন, এফ. এম. মাঠে-ঘাটে সাব মার্শাল, বড় বড় হোর্ডিং, প্রায় প্রত্যেকের গলায় বুক-পকেটে 'কারে' 'কারে' ঝুলছে সেল-ফোন। কখনও "সারে জাঁহাসে অচ্ছা", কখনও টিয়া-হরিয়াল-বুলবুলির কলতান, কোকিলস্বর, কখনও শতজল ঝর্নার উচ্ছ্বাস, কখনও বা বাঘের ডাক, বিড়ালের ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্, ভোরের চিড়িয়াখানা... আরও কত কী 'ব্যান্ড' শুনতে শুনতে, বিশেষত ট্রেনে, আমার খুবই মনে হচ্ছিল—এরা যেন এক 'কর্পোরেট', ট্রেন চড়ে যাচ্ছে, ট্রেন থেকে ঝুপ ঝুপ নেমেই সংস্থার গেটে গলায়-বুকে ঝোলানো পাঞ্চিং কার্ডটা পাঞ্চ করেই ঢুকে পড়বে, এত ব্যস্ততা ! ট্রেন থামলে কে কী করল—অত খেয়াল রাখিনি, ট্রেন থেকে নেমেই রোহিণীর বাস ধরলাম।[১৭]

পুরানো সময়কে কিংবা সময়ের চিহ্নাবলিকে দ্রুত মুছে ফেলে গ্রাম-শহরকে বদলাতে বদলাতে পুঁজি আর প্রযুক্তির বিশাল বিশাল ঢেউ নিয়ে বিশ্বায়ন এইভাবেই অগ্রসর হয়ে চলেছিল। প্রাকৃতিক অনুপুঙ্খগুলিকে বিনাশ করে সেগুলিকে প্রযুক্তির কৃত্রিমতায় সজীব করতে চেয়েছিল বিশ্বায়ন।

'অঙ্গনওয়াড়ি' গল্পটির প্রথমেই লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর হাতেও পৌঁছে গিয়েছে মোবাইল ফোন। অন্যদিকে এ গল্পে অন্যতম বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে জঙ্গলমহলের গ্রামে মাওবাদী অধ্যুষণের কথা। যা থেকে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে নির্দিষ্ট একটি সময়কালকে—

> বাইরের উঠোনে সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে হরিহর হাঁক দিল, "এস!"

ঘরের ভিতর ভ্যানিটি ব্যাগে এটা-ওটা, মায় নিজের মোবাইল ফোনটা গুছিয়ে নিতে নিতে অনিতা উত্তর করল, হ্যাঁ, যাই।"[১৮]

একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে গ্রামের সাধারণ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর ব্যাগে 'মোবাইল ফোন'-এর উপস্থিতি আমাদেরকে বিশ্বায়নের অভিঘাত সম্পর্কে আর একবার অবহিত করে তোলে। অন্যদিকে এই সময়েই রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের বৃদ্ধির দিকটিও উঠে আসে, যা ছিল বিশ্বায়নের আর একপ্রকারের প্রতিক্রিয়া—

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, মাস তিন-চার ধরেই এতদ অঞ্চলে মাওবাদীরা তাদের মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলতে তৎপর। লালগড়-ঝাড়গ্রাম ছেড়ে মাওবাদী স্কোয়াড-সদস্যরা যেমন নয়াগ্রাম-গোপীবল্লভপুর-সাঁকরাইলে ঢুকছে, তেমনই ওড়িশা বা ঝাড়খণ্ড থেকেও নয়াগ্রাম-গোপীবল্লভপুরে ঢুকে পড়ে বড়সড় হামলা চালানোর ফন্দি আঁটছে।[১৯]

'হারমোনিয়াম' গল্পে আরও বেশি বিস্তারসহ জায়গা করে নিয়েছে জঙ্গলমহল, মাওবাদী অধ্যুষণ কিংবা যৌথবাহিনীর সঙ্গে তাদের লড়াইয়ের কথা। এর পাশাপাশি নিরপরাধ গ্রামবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের একাধিক ঘটনা উঠে আসে গল্পে। সন্ত্রস্ত এই গ্রামীণ জীবনের পাশাপাশি এ গল্পে উঠে এসেছে মোবাইল ফোনের বিস্তারের দিকটি, যা অত্যন্ত সচেতনভাবেই তুলে ধরেছেন লেখক। এর মাধ্যমে গ্রামের মানুষের সঙ্গে দূরে থাকা মানুষদের একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। তবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ঘটলে যে কোনো প্রযুক্তিই মানুষকে ভয় থেকে মুক্ত করতে পারে না, সেই সত্যটিও উঠে এসেছে এই গল্পে—

আমাদের গ্রামে এখন একটা আধটা নয়, ফোন আছে চল্লিশ-পঞ্চাশটা। তাও আবার যে সে ফোন তো নয়, রীতিমত 'সেলফোন'। অর্থাৎ মোবাইল ফোন।

বিদ্যুৎ নেই, তাই ল্যান্ড-ফোনের প্রশ্নও নেই। অন্ধকার সান্ধ্য রজনীতে ঝোপে ঝাড়ে এখন যত না জোনাকীর আলো জ্বলে, তার চাইতে সেলফোনের আলোই জ্বলে বেশি। মানুষ যত না ঘরের লোকের সঙ্গে কথা বলে, কানে মোবাইল চেপে তার চেয়েও বেশি কথা বলে বাইরের লোকের সঙ্গে।[২০]

কেটে গেল এই ফোনটা কিন্তু সচল হল আরেকটা। বলেছি, গ্রামে তো গ্রামে, আমাদের ঘরেই মোবাইল ফোন আছে চার পাঁচটা ! একটা হারাধনের, একটা ছোটকাকার বড় ছেলে হাড়িরাম বা রমেশের, আরেকটা বড়দার, চতুর্থটা মেজোকাকার ছেলে হেমন্তের, সর্বশেষে যতদূর খবর পেয়েছি আমার ন'কাকার মেয়ে ক্লাস সিক্স-সেভেনের পঞ্চমীও একটা কিনে ফেলেছে। এখন গ্রামে-গঞ্জে যেন ফোন কেনার হিড়িক পড়েছে ! 'এয়ারটেল' 'ভোদাফোন' 'বি-এস-এন-এল'—...

"এই যে একটু আগে হারাধনের ফোনে একটা গুলির আওয়াজ শুনলাম যার জন্য আমাদের টোঙের গোলা পায়রাগুলোও ডানা ঝাপটিয়ে ভদভদিয়ে উড়ে গেল মনে হল। তারপরে ফোনটাও কেটে গেল। কিছুই বুঝতে পারছি না, ফোনেও আর ধরা যাচ্ছে না। হারাধন, সনাতন ভালো আছে তো ?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। মনে হয় ফোনটা হাতে ধরে ছোটকাকা হারাধন সনাতনের খোঁজখবর নিতে গেলেন।[২১]

মনে পড়ে গেল, আমাদের ছোটকাকার ছোটছেলে সমরেশের বউও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী না ? ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত হয়ে ছোটকাকাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করলাম। কোথায় ছোটকাকা ? ফোন তো 'সুইচড অফ' ! সেই যে ধরে নিয়ে গেল রমেশকে, তারপর রমেশের কী হল—কোনকিছুই তো জানতে পারছি না ! খালি 'সুইচড অফ' আর 'সুইচড অফ' ! সবার ফোনই কী এখন সশস্ত্রকারীদের হেফাজতে ? নাকি গ্রামে আর হাস্কিং মেশিনও চলছে না, বাজছে না 'মাইক', জলসেচের ক্রির্লোস্কার মেশিনের জেনারেটারও অকেজো—চার্জ-ই নেই, একদম লো ব্যাটারি, মোবাইল চালু থাকবে কী করে ? নাকি 'টাওয়ার' নেই ?[২২]

বিশ্বায়নের বিস্তারের ফলে প্রযুক্তি কিংবা প্রযুক্তি-পণ্য একেবারে গ্রামের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেলেও ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় পরিষেবা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল, সেই দিকটি এ গল্পে ধরা

পড়েছে। তাই বলা যেতে পারে, বিশ্বায়ন পুঁজির বিস্তারের পক্ষে যতখানি সুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল, মানুষের উন্নয়ন ততখানি ঘটেনি। সেই বৈপরীত্যগুলিকেই লেখক নলিনী বেরা তাঁর একাধিক ছোটোগল্পের বিষয় কিংবা অনুপুঙ্খে প্রকাশ করেছেন।

৭.৫॥ সৈকত রক্ষিত

সৈকত রক্ষিত (জন্ম-১৯৫৪) বর্তমান বাংলা ছোটোগল্পের জগতে এক ব্যতিক্রমী নাম। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি সেই স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৮৩-তে প্রকাশিত *আকরিক* উপন্যাস থেকে তিনি স্বতন্ত্র এক উপন্যাস-ভাষার প্রবর্তন করেন। আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনই আখ্যায়িত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *হাড়িক, অক্ষৌহিণী, ধূলা উড়ানি, বৃংহণ, সিঁদুরে কাজলে, মদনভেরি, সিরকাবাদ* ইত্যাদি।

১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিকাশ মন্ত্রক থেকে প্রতিভাবান তরুণ লেখক হিসাবে ফেলোশিপপ্রাপ্ত। তিনি বর্তমানে পুরুলিয়া সংস্কৃতি কেন্দ্রের পক্ষে সৃজন উৎসবের মাধ্যমে লোকশিল্পীদের সংগঠিত ও উজ্জীবিত করার কাজে রত। ইতিমধ্যে তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার' সহ একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননায় সম্মানিত।[২৩]

লেখক সৈকত রক্ষিত স্বতন্ত্র তাঁর ছোটোগল্প নির্মাণের ক্ষেত্রটিতেও। তিন দশকের বেশি সময়ে তিনি পঞ্চাশটির কাছাকাছি ছোটোগল্প রচনা করেছেন। তাঁর ছোটোগল্পের জগতে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে পুরুলিয়ার জনজীবন। সমাজের একেবারে প্রান্তিক এবং বিভিন্ন পেশার মানুষজন অবিকৃতভাবে উঠে এসেছে তাঁর ছোটোগল্পে। যমপট শিল্পী, মুখোশ শিল্পী, পাথর খাদানের শ্রমিক কিংবা ডাইনি প্রথার বলি হওয়া নারী হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটোগল্পের বিষয়

আশয়। তাঁর ছোটোগল্পের জগতটি বেশিরভাগ সময়েই সীমাবদ্ধ থেকেছে পুরুলিয়া জেলাকে কেন্দ্র করে। পাঠ অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যেতে পারে, নাগরিক জীবনকে একপ্রকার অস্বীকার করে, নাগরিক সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে বহুদূরের প্রান্তিক মানুষের কথা নিয়ে তাঁর ছোটোগল্পের জগৎ আর তাদেরই যথার্থ রূপায়ণে তিনি হয়ে উঠেছেন পূর্বসূরি সতীনাথ ভাদুড়ীর সৃষ্ট ধারাটির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

নিজের লেখা ছোটোগল্প সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> এতদিন ধরে চলে আসা বাংলা গল্পের যা প্যাটার্ন, আমি সেই চিরাচরিত ধারা মানিনি। মানতে পারিনি। সেখানে আখ্যান-অংশকেই গুরুত্বপূর্ণ রূপে মেলে ধরা হয়, আর পারিপার্শ্বিকতাকে অর্থাৎ অ্যাম্বিয়েনস বা এনভাইরনমেন্টকে অপরিলক্ষিতই রেখে দেওয়া হয়। আমি কি গল্প কি উপন্যাস, উভয়ক্ষেত্রে, ঠিক তার বিপরীত মেথডকেই আমার স্টাইল অফ রাইটিং করেছি। মানুষ কী করছে তার বিচার করতে গেলে আগে দেখতে হবে সে কেন করছে, কোন অবস্থায়, কোন পরিবেশে তা করছে। গল্পে আখ্যান অংশের চেয়ে তার পরিবেশের গুরুত্ব আমার কাছে অনেকখানি। তাতে একদিকে যেমন ঘটনার সত্যতা প্রতিষ্ঠা পায়, তেমনি গল্পের প্রেক্ষিতটি পাঠকের মনোভূমিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তার রেশ সহজে কাটে না।
>
> পরিবেশের কথা বলতে গেলে, স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে অর্থনৈতিক জীবন, যা সমাজ একজন মানুষকে তার নির্দিষ্ট অবস্থান জানিয়ে দেয়। শ্রেণি অবস্থান থেকেই মানুষের মধ্যে আসে শ্রেণি সচেতনতা। আসে শ্রেণি বিদ্রোহও। আমার বিভিন্ন গল্পে জীবন প্রান্তিকতায় পৌঁছে যায়, বিদ্রোহের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর গড়ে ওঠে। কিন্তু তারপরও আমি বলব, আমি মোটেই ‘দেখিয়ে দেওয়া’ বা ‘ঘটিয়ে দেওয়া’ বিদ্রোহের লেখক নই।[২৪]

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে তিনি একাধিক ছোটোগল্প রচনা করলেও খুব সচেতনভাবেই হয়তো তিনি বর্জন করেছেন এর লক্ষণগুলিকে। কারণ জনসমাজের যে অংশকে নিয়ে তিনি লেখেন, তারা বিশ্বায়নের পণ্যভুবন কিংবা ক্রেতাসংস্কৃতি থেকে বহুদূরে বাস করে। অরণ্য কিংবা পাহাড়সংলগ্ন

এলাকা বা একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের যে ভূগোলে তারা থাকে, সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনটুকুই হয়ে ওঠে তাদের পরম প্রার্থিত। সেইকারণে তাঁর লেখায় বিশ্বায়নজাত বিলাসদ্রব্যের কথাও উঠে এসেছে প্রায় না আসার মতো করে। অন্যদিকে তাঁর গল্পের জনগোষ্ঠীদের ব্যবহৃত প্রযুক্তিও বেশ প্রাচীন সময়ের, সেই জগতেও সেভাবে লাগেনি বিশ্বায়নের ছোঁয়া। কোথাও কি লেখক এইভাবে দেখাতে চাইলেন যে, পুঁজিচালিত পৃথিবীর বাইরেও আর একটি পৃথিবী থাকে, যে পৃথিবী পণ্যায়নের জগতটি সম্পর্কে নিস্পৃহ এবং উদাসীন? বা তাদের ক্রয়ক্ষমতা এতই সীমিত যে, বিশ্বায়নের পক্ষে তাদের পাশে পৌঁছানোর ব্যয়টুকুও নির্বাহ হবে না? হয়তো তাই। আর সেইকারণেই বিশ্বায়নের মূলত নগরকেন্দ্রিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রটি থেকে তাঁর ছোটোগল্পগুলি দূরত্ব বজায় রেখেছে। এতৎসত্ত্বেও তাঁর খুব স্বল্প দু-একটি ছোটোগল্পে দেখা যায় বিশ্বায়নের ছোঁয়া। *পর্বান্তর* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'মুখোশ' নামক ছোটোগল্পটিতে উঠে এসেছে তারই অনুপুঙ্খ। গল্পটিতে তিনি পুরুলিয়ার ডুমৈরডি গ্রামের ছৌ-মুখোশ-শিল্পী ভীমা সূত্রধরের কথা তুলে ধরেছেন। চল্লিশ বছর ধরে সে মুখোশ তৈরি করে আসছে। তবে বর্তমানে অর্থনৈতিক মন্দায় পড়ে সে। বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তার ছোটো শিশু কন্যাটি অপয়া। তাকে হত্যার চেষ্টা করেও তার মায়ের হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত ভীমা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে এ গল্পে ছৌ-মুখোশ-শিল্পীদের অর্থনৈতিক মন্দার কারণ হিসাবে উঠে আসে বিশ্বায়নের প্রভাব—

> ভীমা আরেকটু বুঝিয়ে বলে, ছো-নাচের প্রতি গ্রামবাসীদের এখন আর আগের মতো আকর্ষণ নেই। একটা সময় এই ছো-নাচ ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে বড় বিনোদন এবং চর্চার জিনিস। কিন্তু এখন তার চেয়েও আকর্ষণীয় বস্তু তারা পেয়েছে—টিভি, ভিডিও। এই আমদানিকৃত 'নব্য সংস্কৃতি'কে পেয়ে নিজেদের সংস্কৃতিকে তারা অসভ্য ভাবতে শুরু করেছে। গোটা গায়ে, ভুঁড়িতে ছাই মেখে শিব সেজে আসরে আসা, উল্লম্ফন দেওয়া এসব নিয়ে তারা নিজেরাই এখন অনেকে হাসাহাসি করে। তাই চর্চার

অভাবে, উৎসাহী যুবকের অভাবে, কিছু কিছু পুরোনো ছৌ-নৃত্যপার্টি মরে যাচ্ছে। নতুন কোনো দলও গড়ে উঠছে না। পাশাপাশি এটাও দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের মানুষের এই ঝোঁকটি ধরে প্রায় সমস্ত দলই এখন 'আধুনিক' হয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতার নামে মানুষ যা চাইছে তাই পরিবেশন করছে। যেমন, পালা চলাকালীন আচমকা নৃত্যরতা অপ্সরার আবির্ভাব—বোম্বের চিত্রাভিনেত্রীর নকল করে শরীর দুলিয়ে নাচ, লৌকিক বাদ্য-বাজনার বদলে সুদৃশ্য সিন্থেসাইজারের ব্যবহার, মহাদেবের ত্রিশূলে বিদ্যুতের চমক, চালচিত্র সমেত দশভুজাকে এবং তার হাতের অস্তরগুলিকে বিচিত্র আলো দিয়ে সাজিয়ে, গাদাগুচ্ছের তারে জড়িয়ে, ধীরগতিতে তাকে পিছন থেকে ঠেলে ঠেলে আসরে আনা, জ্যান্ত ছাগল বলি দিয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা—সবই এখন ছো-নাচের অঙ্গীভূত। এমনকি 'লাল ঝান্ডাধারী রামের' মুখ দিয়ে সরাসরি দলীয় রাজনীতির ভাষণও দেওয়ানো হয়। এসব মুখোশশিল্পী হিসেবে রাখালেরও অজানা নয়, তবু সে না হেসে পারে না।

'দু-একলোক আমাকে এমনও বলেছে যে তুমরাই তো করিকর? দুর্গা-ফুর্গার মুখের কাটিনগুলাকে ইবার পালটাও। সিনিমার হিরোইনদের পারা করে দাও। দেখবে কেমন জমবেক!'[২৫]

এভাবেই লেখক তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন স্থানিক সংস্কৃতির উপরে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতির আধিপত্যের ফলে স্থানিক সংস্কৃতির অবলুপ্তির দিকটি। বিশ্বায়ন-ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে সারা পৃথিবীতেই এই কাজটি করেছিল। ফলে একদিকে সাংস্কৃতিক অবলুপ্তি অন্যদিকে সেই সংস্কৃতি-কর্মীদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা নেমে এসেছিল স্বাভাবিক কারণেই। আর সেই অর্থনৈতিক মন্দার কারণকে চিনতে না পেরে অদৃষ্টনির্ভর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তার খারাপ ভাগ্যের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে হত্যা করতে গিয়েছে নিজের ঔরসজাত সন্তানকেই।

'চাঁদমারি' গল্পটিতে উঠে এসেছে পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পুলিশবাহিনীর শুটিং প্র্যাকটিস-এর কাহিনি। এ গল্পে ধরা পড়েছে মাওবাদী সমস্যা, গ্রামীণ মানুষের অবস্থা কিংবা রাষ্ট্রশক্তির অবস্থানের একাধিক প্রসঙ্গ। গল্পের অনুপুঙ্খ থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় এ গল্পের

আখ্যানকাল ২০০৯-২০১১ সালের মধ্যবর্তী কোনো সময়, যখন জঙ্গলমহল উত্তপ্ত। মাওবাদী আর যৌথ বাহিনীর সংঘর্ষে গ্রামীণ জনজীবন সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে লেখা এই গল্প সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তির কারণে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল মুক্ত অর্থনীতি তথা বিশ্বায়নকে। আর সেই পুঁজিনির্ভর ব্যবস্থার ঢেউ রাষ্ট্রশক্তিকে বাধ্য করেছিল দরিদ্র মানুষের জমি কেড়ে পুঁজির মালিক কিংবা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা জারি রাখতে। তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠলেই সারা ভারত জুড়ে রাষ্ট্রশক্তি নিজের বাহিনী নিয়ে নেমে পড়েছিল নিজেরই দেশের জনগণকে নিষ্পেষিত করতে। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এ গল্পে তাই দেখা যায় বিপুল সমারোহে এক প্রত্যন্ত গ্রামে পুলিশবাহিনী শুটিং প্র্যাকটিস করে। তাদের প্র্যাকটিসের শেষে পড়ে থাকা বিপুল পরিমাণ গুলির খোল কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ভুখা জনগণ। সেগুলি ধাতবমূল্যে বিক্রি করে তারা কিনবে চাল। তাতে তাদের ক্ষুধানিবৃত্তি হবে। এইভাবে লেখক এ গল্পে তুলে ধরেছেন পুঁজির পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রশক্তির একপ্রকার সমালোচনা, যা বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে—

> যদিও শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং আর্থসামাজিক ব্যবস্থার নিরিখে পিছিয়ে পড়া দক্ষিণবঙ্গের এই জেলাগুলিতে শুধু অঘটনই ঘটে, আর যাবতীয় যা ঘটনা তা ঘটে তিলোত্তমা নগরীতে। এখানে খরা এবং জলাভাব হয়, ওখানে তা নিয়ে 'সন্তোষজনক' আলোচনা হয়। টেবিলে টেবিলে মন্ত্রী খান কোল্ডড্রিংকস, প্যাকেজড ওয়াটার। ওখানে পরিবেশদূষণ নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের সেমিনার হয়, কিন্তু যত স্পঞ্জ আয়রন কারখানা ঠেলে, ব্যাটন মেরে, লুদ-লাদ বসিয়ে দেওয়া হয় এখানেই। এই কোমরভাঙা জেলাগুলিতে। বিশেষ করে পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায়।[২৬]

বিশ্বায়নের সুফলের সিংহভাগ বরাবরই কেন্দ্রীভূত থেকেছে শহরকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে মুনাফা অর্জনের বেশ কিছু কেন্দ্র, কল-কারখানা ইত্যাদিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা বর্জিত গ্রামাঞ্চলে। অর্থাৎ গ্রামভারতকে ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করেছে নাগরিক ভারত। এর বিনিময়ে তারা পেয়েছে কেবলই বঞ্চনা। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সামান্যতম প্রচেষ্টা দেখলেই রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করেছে তার অস্ত্রের শাসন। লেখক তাই লিখেছেন—

> আসলে, শহর থেকে অনবরত বুলেট ছুটে আসছে গ্রামের দিকে। লক্ষ্যচ্যুত হয়ে তা বারে বারে নিশানা করছে ওই স্থবির হয়ে যাওয়া টিলাটিকেই। আর তাই গ্রামে গ্রামে এই ক্ষোভ। যত পরিবর্তনই আসুক না কেন, রাবণ-রাজ থেকে আমাদের মুক্তি নেই। আর মুক্তি নেই বলেই, তলে তলে গড়ে উঠতে থাকে বাঁশের কেল্লা। জন্ম নেয় তিতুমির।[২৭]

একরকম বিদ্রোহের সুর লেখকের ভাষায় প্রকাশিত হলেও সেই বিদ্রোহ সবসময় ফেটে পড়ার মতো তাপ সংগ্রহ করতে পারে না, বরং তার চেয়েও বেশি শক্তিধর হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের ক্ষুধার আগুন—

> যে-ই না ফায়ারিং বন্ধের ডাক দেওয়া হল, এমনি তুমুল হই-রই! আর গুলির চেয়েও যেন প্রবলগতিতে, পঙ্গপালের মতো ছুটে যেতে লাগল অসংখ্য কাল-কালো বাচ্চার দল। প্রবল উল্লাস নিয়ে, পড়িমরি করে, তারা ছুটতে থাকে চাঁদমারির পিছনে, টিলার দিকে। হাড়-পাঁজরা বেরনো বুড়োরাও ঢুকে গেছে সেই দলে। টপাটপ মাটি থেকে তারা যে-যার মতো তুলে নিচ্ছে ফেটে যাওয়া গুলির খোলগুলি।...
>
> তবু অন্যবারের চেয়ে খুব কম গুলির খোল পায়নি টিরা। দৌড়তে দৌড়তে ঘরে আসে। মাকে দেখায়। তার মা-ই হাটমশলার দোকানে গিয়ে এই খোলগুলির বিনিময়ে যখন যা পারে নেয়। নুন-তেল মরিচ। চাল নিলে কতটুকুই-বা চাল পাওয়া যেতে পারে এই ক-টা খোলের বিনিময়ে? হিসেব অনুযায়ী, সীসা হলে ‘দু-ঝুঁক’ অর্থাৎ দ্বিগুণ ওজনের চাল পাবে। পিতল দিলে পাবে ‘তিন-ঝুঁক’ ওজনের। আড়াই

শো গ্রাম পিতলে সাড়ে সাতশো গ্রাম চাল। গুলির খোল দিয়ে গ্রামের সবাই আদিম এই 'বারটার সিস্টেম'কে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। বন্দুকরাজ জিন্দাবাদ।[২৮]

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে পুঁজিকে রক্ষা করার এবং প্রসার ঘটানোর রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়াস এবং তার বিপরীতে সাধারণ জনগণের প্রকৃত অবস্থার চিত্র এইভাবে উঠে এসেছে লেখক সৈকত রক্ষিতের ছোটোগল্পে।

৭.৬॥ রামকুমার মুখোপাধ্যায়

রামকুমার মুখোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৫৬) বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিতে এক প্রথিতযশা ছোটোগল্পকার। তাঁর একাধিক উপন্যাসেও তিনি সেই স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর *চারণে প্রান্তরে, ভাঙা নীড়ের ডানা, মিছিলের পরে, দুখে কেওড়া, ভবদীয় নঙ্গরচন্দ্র, কথার কথা, ধনপতির সিংহলযাত্রা* প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর *গল্পসমগ্র* (মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪১৯/ জানুয়ারি ২০১৩) নামক গ্রন্থের একাধিক ছোটোগল্পে উঠে এসেছে গ্রামসমাজের কথা। তাঁর কথায়—

ঘর ও পথ, সংসার ও বৈরাগ্য, জীবন ও মৃত্যু কেমন যেন জড়াজড়ি থাকে। কে যে কবে ঘর বাঁধে আর কবে ছাড়ে, কে কখন প্রাণ দেয় আর কখন কাড়ে তারও হিসেব মেলে না সময়ে সময়ে। এ-জীবনেরই কিছু কথা তিন-সাড়ে তিন দশকের এই সব গল্পে।[২৯]

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর *গল্পসমগ্র*-এর ষাটটি গল্পে উঠে এসেছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, বর্ধমান কিংবা কলকাতার একাধিক কাহিনি কিংবা প্রসঙ্গ। গল্পের কথনভঙ্গিতে স্থান করে নিয়েছে

ছোটোবেলায় শোনা রূপকথা, কথকতা কিংবা ব্রতকথার ছোঁয়া। সেইসঙ্গেই তাঁর গল্পের ভুবনে জায়গা করে নিয়েছে কিছু নাগরিক গল্পও।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে তাঁর কথাযাত্রার কিছু অংশ বিশ্বায়ন দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছে, তা খুঁজে নেওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তাঁর লেখা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটি সম্পর্কেও এই কথা প্রাসঙ্গিক। 'পরিক্রমা' (১৯৯৪, *বারোমাস*) কিংবা 'ধ্বংসস্তূপে প্রেমালাপ' (১৯৯৯, *বারোমাস*)-এর মতো ছোটোগল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের প্রভাব। দুটি গল্পই বেশ দীর্ঘ, একাধিক চরিত্র কিংবা ঘটনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সেগুলি। 'পরিক্রমা' গল্পে উঠে আসে নবীনগঞ্জের শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর তার পরিবারের কথা। মেয়ের বিয়ের জন্য যারা একদিন পনেরো বিঘে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল, এককালে তাদের ছেলেরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়। নাতিরা ছড়িয়ে পড়ে সিঙ্গাপুর, আমেরিকায় বা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। এ গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে পরিযাণের কথা—

> কার্তিকের ভাই স্বপনের চিঠি এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। চিঠি নিয়ে কামারপাড়ায় যায় বুড়ি। স্বপনের জাহাজ ফিরছে। বম্বে আসবে। বম্বেতে জেঠাইমার ঘরে তিনদিন থাকবে। তারপর উড়োজাহাজে কলকাতা। কলকাতাতে মেজোজেঠার ওখানে কদিন কাটাবে। সেখান থেকে আরামবাগ। আরামবাগ থেকে গাঁয়ে ফিরবে স্বপন। স্বপন পুরো বছরটা কাটাবে নবীনগঞ্জে। বুড়ি বলে, স্বপন যখন জাহাজে ফিরবে, ওর সঙ্গে চলে যাবে। বাসে করে আরামবাগ। মাধোর ওখানে কদিন কাটিয়ে কলকাতা। কলকাতা থেকে বম্বে। বম্বে থেকে স্বপনের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে ময়নার কাছে। বালিশগুলোর ওয়াড় করা শুধু বাকি। কামারপাড়ার তিনু কবে আরামবাগ যাবে সে খবর নিতে গেছে বুড়ি।[৩০]

'ধ্বংসস্তূপে প্রেমালাপ' গল্পে আর একভাবে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের অভিঘাত। এ গল্পের সূত্রপাত ঘটে ল্যান্সডাউন পদ্মপুকুর রোডে একটি বহুতল ফ্ল্যাট ভেঙে পড়ার সংবাদ দিয়ে। একটি ফ্ল্যাট ভেঙে পড়লে তার সূত্র ধরে কী কী ঘটতে পারে তা নিখুঁতভাবে এ গল্পে তুলে ধরেন লেখক।

সেইসঙ্গে উঠে আসে নাগরিক জীবনের অসহায়তা। ধরা পড়ে অন্তঃসারশূন্য সুখী সব প্রতিশ্রুতির কথা, যা নাগরিকদেরকে আকৃষ্ট করে এনে তুলেছিল এই ফ্ল্যাটে। ধরা পড়ে পুঁজিনিয়ন্ত্রিত এক সময় যা কিনা খুব গভীরভাবে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবান্বিত—

> ...তাহলে ভূমিকম্প নয়? পাঁচ বছরের সিদ্ধার্থ অ্যাপার্টমেন্ট ধসে গেল?
>
> প্রোমোটার বলেছিল—তিন পুরুষ এই বহুতলের দিকে ফিরে দেখতে হবে না।
>
> ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছিল—চতুর্থ প্রজন্মের কারিগরিতে এই বহুতলের নির্মাণ।
>
> অভয় দিয়েছিল সাইট ম্যানেজার—এ বাড়ি আগুনে পোড়ে না, ঝড়ে নড়ে না, ভূকম্পে ফাটে না।
>
> প্রোমোটার বলেছিল—তিন পা ফেললে ছেলের ইস্কুল।
>
> ইঞ্জিনিয়ার শুনিয়েছিল—দু পা ফেললে থানা।
>
> সাইট ম্যানেজার আঙুল তুলে দেখিয়েছিল—এক পা ফেললে প্রাইভেট হসপিট্যাল।
>
> প্রোমোটার বুঝিয়েছিল—এটা রাজস্থানের এক নম্বর মার্বেল।
>
> ইঞ্জিনিয়ার শুনিয়েছিল—কলকাতার কোনো প্রোমোটার এতো মোটা গেজের লোহা দেবে না।
>
> সাইট ম্যানেজার হেসেছিল—মারুতি হাজার কি, হেলিকপ্টার ঢুকে যাবে এই গ্যারেজে।[৩১]

এ গল্পে পুঁজি নাগরিক সুবিধাবলির হাতছানি দিয়ে যে পরিবারগুলিকে ডেকে এনেছিল, ফ্ল্যাটটি ভেঙে পড়ার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে পড়ে। এইভাবে রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পে পুঁজিনির্ভর ব্যবস্থার এক সমালোচনার সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

৭.৭॥ **মুর্শিদ এ এম**

মুর্শিদ এ এম (জন্ম-১৯৫৬) বর্তমান সময়ের এক ভিন্ন ধারার কথাকার। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে জীববিজ্ঞানের স্নাতক। বিভিন্ন ছোটো বড়ো পত্রিকায় এ পর্যন্ত

তাঁর দেড়শোর বেশি ছোটোগল্প ও তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রখ্যাত পত্রিকা *হাওয়া ৪৯*-এর সহযোগী সম্পাদক। সম্মানিত হয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কার, যথা—‘গল্পমেলা পুরস্কার’, ‘প্রবজ্যা সাহিত্য সম্মাননা’, ‘লোকসখা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বর্ষসেরা সাহিত্যিক সম্মান’ ইত্যাদি। জীবিকার ব্যাপারে উদাসীন এই লেখক শিক্ষকতা থেকে অটোচালনা সবেতেই ছিলেন স্বচ্ছন্দ। বর্তমানে তিনি পুস্তক ব্যবসা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত।[৩২]

লেখক মুর্শিদ এ এম এর গল্পের কথনরীতি ভিন্ন প্রকৃতির। সেই কারণেই হয়তো সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *জাড়কাঁটা*-র মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে লিখেছেন—

> মুর্শিদের লেখা পড়তে পড়তে তার গদ্যের ভেতর থেকে আমি সঙ্গীতের স্বাদ পাই। গদ্যের গায়ে বোঝার মতো সে সঙ্গীত নয়। এ যে আপনা আপনি ফুটে ওঠা গান! সাধারণ গ্রামীণ শব্দগুলোকে সে অমোঘভাবে প্রয়োগ করেছে। তা থেকে আপনা আপনি কবিতা উঠে আসছে। কে বলবে—এটি তার প্রথম গ্রন্থ! মনে হয় নির্জনে অনেকদিনের রেওয়াজের পর কোনো শিল্পী প্রথম প্রকাশ্যে গাইতে বসেছেন।...
>
> সে লেখে নিরন্ন, সাধারণ, নিরুপায় মানুষের কথা। এদের সে আতিপাতি করে জানে। তার গল্পে কোনো ‘সময়’ সেভাবে নেই। তার গল্প যেকোনো যুগের হতে পারে। বরং তার গল্পে আছে ‘সম্পর্ক’। সে সম্পর্ক চিরকালের। ভাইয়ে ভাইয়ে, ছেলেতে বাবাতে, মানুষে পশুতে, আকাশে বাতাসে।[৩৩]

সার্থকভাবেই লেখকের কথনরীতিকে কিংবা তিনি যাঁদেরকে নিয়ে লেখেন, সেই বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

যে সময়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর লেখক-জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কথাকার মুর্শিদ এ এম, সেই সময়ের একাংশ বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তাঁর কয়েকটি ছোটোগল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের ছাপ। এইধরনের একটি ছোটোগল্প ‘নীলরঙা তেল’ (মূল গ্রন্থ: *ফাউ ও ফেরেশতা*, ১৯৯৭)। এ গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের ফলে বদলে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থার কথা। এ গল্পে

সাবিত্রী নস্করের কন্যা করুণাময়ী নস্কর প্রিপারেটরি টু-তে পড়ে ইংরেজিমাধ্যম স্কুল ‘গোল্ডেন চাইল্ড’-এ। তার বাবা প্রাণকৃষ্ণ নস্কর মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর ঠাকুরদা অখিল নস্কর ও মা সাবিত্রীর তত্ত্বাবধানে সে বড়ো হতে থাকে। একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবারটি সন্তানকে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের আশায় ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ভর্তি করে, কিন্তু সেখানে তার রেজাল্ট আশানুরূপ হয় না। সেই কারণে ‘গার্জেন কল’ হয় তার। এর মাধ্যমে উঠে আসে কীভাবে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে গ্রামে-গঞ্জেও দ্রুত তৈরি হচ্ছিল ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়। সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষও আর ভরসা রাখতে পারছিল না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপরে। ফলে তারাও আর্থিক টানাটানির মধ্যেও সন্তানদেরকে ইংরেজিমাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতে চাইছিল। তবে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল। কারণ বাড়ি থেকে সাহায্য করার মতো শিক্ষিত মানুষ তাদের পরিবারে ছিল না। অন্যদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি জনমানসে গড়ে উঠেছিল এক ধরনের তাচ্ছিল্য—

> যারা এসেছে, তাদের তো বেজায় শাবাস দিলে। ইংরেজিতে কী সব কথা। শুধু আমার করুণার জন্যে দুজন বাপ-মার সুমুখে, ডেকে নিয়ে বল্ল—এরকম পড়াশোনা করলে ইস্কুলে আর রাখবে না। এখানে থাকতে গেলে ভালোমতো পড়াশোনা করে আসতে হবে।
>
> তা করুণা কি পারে না? আমি তো বাড়িতে যা যা ধরি, সব পারে। আমি যে পড়ানোর কসুর করিনি মা।
>
> তোমার পড়ানোয় হবে নাকি? বলেছিলুম যে কথা। ধমক মারলে শুনে। দুটো ভালো আন্টি রাখতে বললে। টাকা না খরচ করলে লেখাপড়া কি এমনি এমনি? যদি না রাখতে পারি তো ওই চট বগলে করে মাটিতে বসা প্রাইমারি ইস্কুলে যেতে বললে। আমাদের নাকি ওই-ই ভালো।
>
> করুণা তাহলে এখানে পড়তে পারবে না? আমাদের মেয়েরা যুগ্যি নয়—প্রশ্নটা করতে গিয়েও থমকে গেল অখিল নস্কর। কাকেই বা করবে?[৩৪]

উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায়, নতুন অর্থনীতিতে টাকা না খরচ করলে লেখাপড়া এমনি এমনি আর হয় না—এই সত্য সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। অন্যদিকে শিক্ষা পণ্যে পরিণত হওয়ার ফলে সেই পণ্যের ক্রেতা হিসাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ খুব একটা স্বস্তিতে ছিল না, তবু তারা প্রাণপণে নতুন এই বিপণন ব্যবস্থায় অংশ নিতে চাইছিল। আবার সমাজে ইংরেজিমাধ্যম আর 'চট বগলে করে মাটিতে বসা প্রাইমারি ইস্কুল'-এর মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল শ্রেণিগত তফাত। আর এইসবেরই পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল বিশ্বায়ন ব্যবস্থা।

'মুখোমুখি ব্রজনাথ' (*কালি ও কলম*, এপ্রিল ২০১০) গল্পটিতে উঠে আসে ব্রজনাথ দাস নামক একজন লেখকের মনোজগতের বিবরণ। লেখক মুর্শিদ এ গল্পে একজন লেখকের মনের বিভিন্ন কোণগুলিকে সন্ধান করে দেখতে চেয়েছেন তাঁর ভাবনা-কল্পনা-তিক্ততার উপাদানগুলিকে। তুলে ধরতে চেয়েছেন একজন লেখকের নারী-সম্পর্কিত ভাবনাসমূহ। আর এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনায় লেগেছে বিশ্বায়নের ছোঁয়া—

> —শুধু আমাকে কেন দুষছ বন্ধু? কে লম্পট নয়! সুযোগ পেলেই তৎক্ষণাৎ সদ্ব্যবহার করে ফেলে যে, সে কি কম লম্পট! আমাকে যে-সমস্ত পজিশন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সেগুলোতে কামড়াকামড়ি করে কেউ হোল্ড করেনি? তারা তো বড়ো বড়ো মানুষ। সাধারণের মতো তারা যদি লোভ-লালসায় কাতর হয়—আমি কোথাকার হরিদাস!
>
> —তাই বলে মেয়েদের শরীরে হাত দেবে?
>
> —মেয়েদের শরীর বলা যায়? ওটা হল গ্লোবালাইজেশনের কমোডিটি। ইয়েস। দেয়ার ড্রেসকোড, দেয়ার একসপোসড বিহেভ কল এভরিবডি টু ইউস ইট। টু গ্র্যাব ইট অ্যান্ড ক্যাপচার ইট ব্রুটালি!
>
> —কিন্তু তুমি সাধারণ মানুষ নও, তুমি একজন লেখক। সবাই মন্দ বলে তুমিও মন্দ হয়ে যাবে? তোমার একটা সামাজিক দায়বোধ থাকবে না?

—দায়বোধ, দায়বদ্ধতা, হাঃ। ওই শব্দটা কেমন যেন পচা দুর্গন্ধময় মনে হয়। যারা কোনোদিনই দায়বদ্ধ ছিলেন না তাঁরা আজ কেমন রাষ্ট্রযন্ত্রের তাঁবেদার হয়ে নিরীহ মানুষ খুনের সাফাই গাইছেন! দেখছ না? আর যাঁরা দায়বদ্ধতার কথা শিরা ফুলিয়ে বলতেন, তাদের কুম্ভীরাশ্রু এবং মিউ মিউ, কম ইন্টারেস্টিং নয়![৩৫]

বিশ্বায়ন নারীকে কীভাবে দেখে তা এ গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক। সেইসঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রযন্ত্রের অবস্থানের দিকটিকেও।

অন্যদিকে 'বীজ' (*সিঙ্গুসারস,* অক্টোবর ২০১১) গল্পে ধর্মীয় আচার আর বিশ্বায়নের প্রভাবকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন লেখক। এ গল্প গড়ে ওঠে ইসলাম ধর্মাবলম্বী এক নিঃসন্তান দম্পতির একটি শিশুকে দত্তক লাভ করার আনন্দ অনুষ্ঠানকে ঘিরে। সেই উপলক্ষ্যে বাড়িতে সমাগম হয় বহু মানুষের। আর এরই ফাঁকে উঠে আসে তরিকা বেওয়া নামক একটি নারী চরিত্রের কথা, যার মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন ধর্মীয় সংস্কৃতি কীভাবে বিশ্বায়নের মুখোমুখি হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গকে—

তরিকা বেওয়ার পোশাকের বিবর্তন এসেছে কিছুদিন হল। তিনি যেখানে যান একটা কালো চাদরে ঊর্ধ্বাংশ জড়িয়ে বেরোন। শুধু তরিকাই নন, অনেক মহিলাই এখন তরিকা বেওয়ার মতোই চালচলনে অভ্যস্ত হয়েছেন। তরিকা নিজধর্মকে যে গুরুত্ব দেন, তা বোঝাই যায়। তবে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কারণে তাঁর কিছুটা কোণঠাসা দশা। ঠিক কোণঠাসা না হলেও, অ্যাডজাস্টমেন্টের সমস্যা বলা বোধহয় ঠিক। যেমন ঘরে দিবারাত টিভি চলা। এটা চোখের পক্ষে, মনের পক্ষে লেখাপড়ার ক্ষতির পক্ষে যত না, তার চাইতে তরিকা বেওয়ার কাছে এ বস্তুটি নিষিদ্ধ। অপবিত্র। কোনো ছবিই যখন রাখা চলে না ঘরে, তখন চলমান চিত্র অবশ্যই বিপজ্জনক। কিন্তু সেসব চাপিয়ে দেয়া আইন। কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান এ-নিয়ে আছে বলে কেউ জানে না। তাই তরিকাও কখনো-সখনো বসে পড়েন বইকী বোকাবাক্সের সামনে। তারপর তাতে চাঁদবণিক বা মনসার পালা চলতে থাকে। তরিকা বেওয়া দেখতে দেখতে তন্ময়

> হয়ে যান—সনকার পুরুষটি এমন নিষ্ঠুর। অথচ বেহুলার আত্মত্যাগ দেখো। দেখবে কী, পর্দায় যখনই মনসার উদয় হয় তখন তরিকার হয় বিপদ। ঠাকুরের মুখ তিনি দর্শন করেন কী করে! তার ইমান নষ্ট হয়ে যায় না কি! তখন তরিকা মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন। আবার মনসা অন্তর্হিত হলে তিনি পুনরায় টিভিতে মনোযোগ দিতে পারেন।[৩৬]

বিশ্বায়ন তার বয়ে আনা প্রযুক্তি কিংবা বিনোদনব্যবস্থার মাধ্যমে এইভাবেই ধীরে ধীরে ভাঙন ধরাচ্ছিল ধর্মীয় রীতিনীতি, মূল্যবোধ কিংবা ধর্মীয় সংস্কৃতিতে। লেখক সার্থকভাবেই তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন এই বিষয়টিকে। সার্বিকভাবে তাঁর ছোটোগল্পের জগতে এভাবেই উঠে এসেছে বিশ্বায়ন-প্রভাবিত সময়।

৭.৮॥ **শুভংকর গুহ**

লেখক শুভংকর গুহ (জন্ম-১৯৫৬) বাংলা ছোটোগল্পের ভিন্নধারার একজন লেখক। তাঁর জন্ম ২ মার্চ কলকাতায়। শৈশব ও কিশোরজীবন কেটেছে আগ্রা, মথুরা, লখনউ, কানপুর, এলাহাবাদ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। পিতা কাজ করতেন সামরিক বাহিনীতে। তাই সামরিক বাহিনীর সংস্কৃতি ও অনুশাসন তাঁর জীবনে একসময় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টসের স্নাতক। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা কারুকৃৎ-এর শিল্পনির্দেশক হিসেবে দীর্ঘসময় কাজ করছেন।

১৯৮০ থেকে লেখালেখি শুরু। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকাতে নিরন্তর লিখে চলেছেন। প্রধানত ছোটোগল্প নিয়েই কাজ করেন। প্রায় দেড়শোটি গল্প ও কয়েকটি উপন্যাস বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম *বিয়োর*।[৩৭]

তাঁর বেশ কিছু গল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকটি ছোটোগল্প হল ‘ঋতু-বদলের মরসুম’, ‘কাহার কথা’, ‘ঘরে ফেরার দিন’ ইত্যাদি। শেষোক্ত গল্পটিতে জাদু-বাস্তবতার একরকম ব্যবহার করেছেন লেখক। তার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের একাধিক অনুপুঙ্খ। ২০০৪-এ প্রকাশিত এই গল্পটিতে (*কথারূপ* পত্রিকা) দেখা যায় গ্রাম কীভাবে ধীরে ধীরে শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে প্রোমোটারদের বাড়বাড়ন্ত। এই নগরায়ণ কিংবা পরিবেশ ধ্বংসের অগ্রসরণ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের এক একটি লক্ষণ—

> গাছগুলো সব লোপাট হল। জলাশয়গুলি বিলীন হয়ে সূর্যতোরণ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, সোনারতরী, সাগরবেলা, ব্লু-হরাইজন কত রকম ন্যাকামোপনা। প্রমোটারিরাজ-এর দাপট তল্লাটের নাভিশ্বাস তুলেছে। আর বেশিদিন নয়, আর কয়েকদিন পরেই এ শহর-প্রান্তর, তন্দুরি-তাপে নেত্য করবে। ইতিমধ্যে আমার ফতুয়াটি ঘামে ভিজে জলপোনা হয়েছে। গুমোট। হাওয়াহীন।[৩৮]

> ফিঙেকোটা নামটি বেমামান হয়ে যাচ্ছে। রুটের বাস ঢুকে পড়েছে। যোগাযোগের ব্যবস্থা পোক্ত হচ্ছে। নতুন নতুন মানুষ ঢুকে পড়ছে বসবাসের জন্য। পঞ্চায়েতি আমেজটি ভগ্নাংশের মতন ঝুলছে। বছর কয়েক হল ফিঙেকোটা পৌরসভার জুরিসডিকশনে, শহুরে ছাপছোপ লাগতে শুরু করেছে। যথেচ্ছ প্রমোটারি কালচার চলছে। কয়েকটি জলাশয় নিমেষেই কংক্রিটের সীমাবদ্ধ ব্যারিকেড। বহুতল মার্কেট আর বাসখানা, মাল্টিকমপ্লেক্সের রূপ নিচ্ছে। বস্ত্রালয়, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্, ব্রডব্যান্ড, পার্লার এইসব কিছুর ধাক্কায় ভয় হচ্ছে কবে যে ফিঙে নামটি উড়ে গিয়ে শুধু ‘কোটা’-টি পড়ে থাকবে। এই ঝিম দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে নানান গলিপথ, মাঠ, জংলা ঝোপগুলি ও জলাশয়গুলি কত দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তাই ভাবছিলাম।[৩৯]

খুব অল্প কথায়, কয়েকটিমাত্র পরিচয়জ্ঞাপক শব্দে বিশ্বায়নের একাধিক চিহ্ন যেমন পরিবেশ ধ্বংস করে আবাসন গড়ে ওঠা, প্রোমোটার-রাজ ইত্যাদির উল্লেখের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটির অগ্রগতির দিকটিকে এই গল্পে অব্যর্থভাবে তুলে ধরেন লেখক শুভংকর গুহ। সেইসঙ্গে মানুষের সম্পর্কসূত্রের

বদল কিংবা বদলে যাওয়া খাদ্যাভ্যাসকেও এ গল্পে তুলে ধরেন তিনি। আর এইভাবে পাঠকের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে একটি সময়পর্ব। সমালোচক বিপ্লব মাজী শুভংকর গুহ-এর *পঞ্চাশটি গল্প*-এর ভূমিকাসূচক 'বাঙলা ছোট গল্পে মায়াবী-বাস্তবতার জগৎ' শীর্ষক সমালোচনায় সার্থকভাবেই লেখেন যে—

> এ-গল্পে গল্পকারের প্রকৃতি ও পরিবেশভাবনার যেমন পরিচয় পাই, অন্ধকার ভারতবর্ষের বুকে একটুকরো সাইনিং ইন্ডিয়ার ছবি পাই। সেই সঙ্গে প্রমোটারি রাজ বা রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পরিবেশ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ভয়াবহ চিত্র। সেইসঙ্গে সাইনিং ইন্ডিয়ার অমানবিক ছবি যেখানে পিতা পুত্রের জীবনযাপনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।[৪০]

বিশ্বায়ন প্রকৃতপক্ষে প্রজন্মভেদে মনোজগতে কিংবা জীবনযাপনে বিপুল পরিমাণ তফাতের সৃষ্টি করেছিল।

'কাহার কথা' গল্পে দেখা যায় একটি নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত একদল মানুষ বিশ্বায়নের প্রভাবে পেশা বদল করে কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন পেশায়। পূর্বোক্ত পেশাটির মৃত্যু ঘটে এইভাবে। গল্পে শীতল নামক এক ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যে কিনা আগে পালকি বইত, তাকে অন্য পেশায় দেখা যায় বর্তমানে। এদিকে গ্রামের প্রভাবশালী পরিবার 'জানা'-দের মেজকর্তার শখ ময়ুরপঙ্খি পালকি চড়ার। সেটি আর বহুদিন ব্যবহার হয় না। গাছের ছায়ায় পড়ে নষ্ট হয়। ততদিনে রাস্তায় টাটা সুমো এসে গিয়েছে। তবু মেজকর্তার শখ পূরণে অন্য কাহারদেরকে ডেকে আনতে যায় শীতল। দেখে ততদিনে সবাই অন্য পেশায় চলে গিয়েছে। কেউ আর পালকি বইতে রাজি হয় না। এইভাবে এ গল্পে বিশ্বায়নের অগ্রগতির ফলে পুরানো পেশার মৃত্যুকে তুলে ধরেন লেখক—

হেঁইয়া ... হেঁই ... আহা বছর দুয়েক আগেও ভেসে যেত ঠা-ঠা দুপুরে অথবা রাত গড়ালে ভোরের আলোয় চাদর জড়িয়ে উদয়পুরের মাঠ ভেঙে। তারপরে, এ গ্রাম সেই গাঁ টপকে গভীর উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যেত সেই যান। নানান নাম ডুলি-পালকি আর আকারে বড়ো ডিজাইন মানে, লতাপাতার বাহার থাকলে নানান চৌখুপ্পি ভরাট রঙিন ময়ূরপঙ্খি। কিন্তু দিনবদল হল, মারুতি ভ্যান ... পিরাইভেট ... চেপেচুপে সতেরোটা মাথা নিয়ে এখন সুমো। মজুরি পোষায় না, তেল মোবিলের যান প্রথম প্রহরে মুরগি চোর শেয়ালের থেকেও দ্রুতগামী, সুতরাং কাঁধ থেকে নামিয়ে সেই বাহকের দলের সবাই জুটে গেল মালবাহী মোটরযানের খালাসির কাজে, হেলপারির, আর শীতলের মতন কয়েকজন ক্ষেতমজুরের কাজটা পাকা করে ফেলল। ডুলি রইল গাছের ছায়ায়, গোলচালায়। কাঠে পচন ধরল, রঙ চটে গেল। উইপোকা ধরল। খোলটা মাটি হল। শীতলকে এখন আর মখমলি, সার্টিন কাপড় কেনার জন্য সুদে ঋণও নিতে হয় না। বড়োই নিশ্চিন্ত সে।[৪১]

এ গল্পে শুধু একটি পেশার অপমৃত্যুই নয়, বরং লেখক তুলে ধরেছেন ক্রীড়া জগতের বিশ্বায়নের কথাও—খুব সামান্য আঁচড়ে। সেখানে গ্রামীণ খেলাধুলো নয়, বিশ্বায়নের পুঁজির দাপটে প্রথম বিশ্বের ক্রীড়া-সংস্কৃতিরও বিশ্বায়ন লক্ষ করা যায়। অন্তত টিভির সম্প্রসারণের ফলে তা আরও বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছিল—

আলুক্ষেতের অদূরেই স্কুলের খেলার মাঠে কোমরে গামছা জড়িয়ে, ময়লা ঢ্যাঙাস বারমুডা ঢল ঢল করে উইকেট ব্যাট হাতে নিয়ে ফিরে গেল শচীন, সৌরভ, মারভিন ডিলান, মাইকেল বিভান, হেনরি ওলোঙ্গার দল। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে ওই খেলোয়াড় দলের একজন কয়েকটা আলু শূন্যে আকাশে ছুঁড়ে দিল।[৪২]

এভাবেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল গ্রামীণ খেলাধুলোর সংস্কৃতি, আর নতুন যুগের খেলার মাঠেও এসে গিয়েছিল বিশ্বায়নের দাপট। আর শুধু খেলাই নয়, গল্পের শেষে লেখক দেখান কী আগ্রাসনের সঙ্গে গ্রাম-গঞ্জের বাজারেও ঢুকে পড়েছে বিশ্বায়ন—

> শুধু উদয়পুর কেন—চক্করপুর, ডায়নান, অযোধ্যা, সোনাটিকড়ি, গণেশপুর, কেটেদল, রণজিতপাটি, তেঁতুলিয়া ও রাউতখানায় সস্তায় বিকোচ্ছে নেদারল্যান্ডের চাল, জাপানের আটা, ডেনমার্কের ডিম-দুধ ও আমেরিকার ওষুধ এবং পৃথিবীর নানান দেশের নানান কিছু। গ্রামে এখন চাষি নেই, পালকি নেই, নেই ভীমদেবতার উৎসব।[৪৩]

এভাবেই লেখক শুভংকর গুহ তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন বিশ্বায়নের বিভিন্ন মাত্রাকে। যার মাধ্যমে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে গ্রামে-গঞ্জের পূর্বেকার পেশাসমূহ, যাপিত জীবন কিংবা সংস্কৃতি।

৭.৯॥ **আফসার আমেদ**

তিন দশকের বেশি সময় ধরে আফসার আমেদ ছোটোগল্প লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প রচনায় তিনি একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু গ্রাম নগর ছাপিয়ে পরিবার ও ব্যক্তির অন্তরঙ্গ স্পর্শ নিয়ে এসেছে। গল্পগ্রন্থ *প্রেমে অপ্রেমে একটি বছর*- এর জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'সোমেন চন্দ স্মারক পুরস্কার' পেয়েছেন **১৯৯৮** সালে। 'অর্থহীন কথা বলার নির্ভরতা' গল্পটির জন্য **১৯৯৯** সালে 'কথা পুরস্কার' দেওয়া হয় তাঁকে। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ *শ্রেষ্ঠগল্প, আফসার আমেদের ছোটগল্প, আমার সময় আমার গল্প, খুনের অন্দরমহল* পাঠকধন্য হয়েছে।[৪৪]

আফসার আমেদের জন্ম **১৯৫৯** সালে হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামে। প্রায় তিন দশক জুড়ে তাঁর লেখালেখি। মুসলমান সমাজ তাঁর লেখায় প্রামাণিকতার সত্যে ও আখ্যানশিল্পের সজীবতায় সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে সংযোজন ঘটিয়েছে। অন্যান্য লেখায় তিনি সম্প্রদায়ের গণ্ডি পেরিয়েই যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। *ঘরগেরস্তি*

(১৯৮২) উপন্যাস দিয়ে তাঁর প্রথম প্রবেশ। সাড়া জাগায় *সানু আলির নিজের জমি* (১৯৮৯) বিবি ও কিসসা সিরিজের উপন্যাসে তিনি উপন্যাসের নতুন ধরনের সন্ধান করেছেন। *বিবির মিথ্যা তালাক* ও *তালাকের বিবি* এবং *হলুদ পাখির কিসসা* (১৯৯৫) পাঠকধন্য হয়েছে। *মেটিয়াবুরুজে কিসসা* (২০০৩) একটি হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস। *সেই নিখোঁজ মানুষটা* (২০১১) সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

২০১০ সালে রাজ্য সরকারের 'বঙ্কিম স্মৃতিপুরস্কার' পেয়েছেন তিনি *হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিসসা* (২০০৭) উপন্যাসের জন্য। ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে তিনি ফেলোশিপ (১৯৯৫) পেয়েছেন। অন্যান্য পুরস্কার অনুবাদে 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' (২০০০), 'সোপান পুরস্কার' (১৯৯৩), 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার' (১৯৯৭), 'মঞ্জুষ দাশগুপ্ত পুরস্কার' (২০০৪), 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী পুরস্কার' (২০০৬), 'নতুন গতি পুরস্কার' (২০০৮), 'লোককৃতি পুরস্কার' (২০০৭) ও 'ইসক্রা পুরস্কার' (২০০৯)। তাঁর *ধানজ্যোৎস্না* উপন্যাস অবলম্বনে বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন 'আমার ভুবন' (২০০২) কাহিনিচিত্র করেছেন।[৪৫]

যে সময়ের মধ্যে দিয়ে আফসার আমেদের কথাযাত্রা, খুব সংগতভাবেই তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে এসে পড়েছে বিশ্বায়নের প্রভাব। তাঁর এইরকম কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'প্রবাসের রূপক', 'সাড়ে বারোটায় রান্না শেষ হচ্ছে', 'রাত কত হল?', 'সন্ধ্যার মেঘমালা' কিংবা 'এলাটিং বেলাটিং সই লো...' ইত্যাদি।

'প্রবাসের রূপক' (*বারোমাস*, শারদীয় ১৯৯৬) নামক ছোটোগল্পে উঠে এসেছে সুমন ও অজেয়ার সংসারের কথা। এ গল্পের চরিত্র সুমন ধর্মতলায় নামী টিভি কোম্পানি 'রজনী'-র

অফিসে চাকরি করে। তার কাজ মূলত মেকানিক এর। সেইকাজে সে বাধ্য হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের ক্রেতার বাড়িতে সার্ভিসিং-এর কাজে যেতে। এ গল্পে একদিকে তার দাম্পত্যজীবন, অন্যদিকে তার কাজের জগতটি যেমন উঠে এসেছে, তেমনই বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে বিনোদন-প্রযুক্তির সম্প্রসারণের দিকটিও গল্পের মাধ্যমে ধরা পড়েছে—

> প্রথমের দিকে মার্কেট রিসার্চ করল কোম্পানি। কলকাতার স্বল্প আয়ের মানুষজনই টিভি দেখে। দশ-বারো বছর আগে টিভি কেনাটা যাদের কাছে স্বপ্ন ছিল, তাদের কাছে ইতিমধ্যে টিভি পৌঁছে গেছে। আর একটা স্বপ্নপূরণ করা যায়, যা রঙিন বড় টিভির সঙ্গে দেয়া হয় রিমোট কন্ট্রোল, তা যদি এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় মধ্যবিত্তের একটা বড় মার্কেট স্বপ্নপূরণের এই প্রতীক দিয়ে ধরা যাবে। এবং তার সঙ্গে রঙিন টিভির হুবহু মডেল আনতে হবে, সাদা কালোতে, পোর্টেবলে। আরো বাজার ধরার জন্য আর একটা জরুরি কাজ হবে, যারা নিম্নবিত্ত, যাদের রেডিও একমাত্র মনোরঞ্জনের মাধ্যম হয়েই আছে, তাদের কাছে এই কোম্পানির টিভির খবর পৌঁছে দেওয়া হোক। কেননা তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ টিভি ক্রয়ক্ষমতার আওতায় চলে আসবে অনতিবিলম্বে। রেডিওতে টিভির বিজ্ঞাপন বেশি বাজুক।
>
> ব্যস, দ্বিতীয় বছরেই মার্কেট ধরে ফেলল 'রজনী'। এ রাজ্যে টিভি বিক্রির এগার শতাংশ মার্কেট, 'রজনী'র। বিজ্ঞাপনে প্রযুক্তিগত সুবিধার কথা প্রচার করা হয়েছে, তেমনি টিভিতে প্রযুক্ত হয়েছে। কম ভোল্টেজে যাতে টিভি ফুলস্ক্রিন দেয়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইন্ডোর অ্যান্টেনাকে টিভি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, টিভি ও অ্যান্টেনা একই জায়গায় রাখার অসুবিধা হয়ে থাকে, সে কারণে। অ্যান্টেনার সঙ্গে টিভির সংযোগ রাখতে বেলুন সিস্টেম করা হয়েছে, যাতে সহজে লাগানো পরানো যায়। সার্ভিসিং-এর সুবিধে গুরুত্বের সঙ্গে রক্ষা করে 'রজনী'। এক বছর গ্যারেণ্টি পিরিয়ডে, টিভির কোনো কিছু খারাপ হলে দায়িত্ব কোম্পানির। কাস্টমার কমপ্লেন করলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া চাই। এখন তো আবার কোম্পানি কর্ডলেস ফোন, পেজার এবং রঙিন টিভি তৈরি করছে।[৪৬]

সাধারণ মানুষের স্বপ্নকে কাজে লাগিয়ে পুঁজি-পরিচালিত বিশ্বায়নব্যবস্থা কীভাবে অগ্রসর হয়, পুঁজির সম্প্রসারণে কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকে, কীভাবেই বা তাদেরকে ক্রেতায় রূপান্তরিত করার দিকে নিয়ে যায়—সেই দিকগুলি এই গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'সাড়ে বারোটায় রান্না শেষ হচ্ছে' (*কালি ও কলম*, এপ্রিল ২০০৫) গল্পটিতে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন-প্রভাবিত এমন এক সময়, যে সময়টিতে মানুষ অত্যন্ত বেশি পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এ গল্পে তাই দেখা যায় পাশের বাড়িতে পুড়ে মরার জন্য কেউ গায়ে কেরোসিন ঢাললেও কারও কিছু আসে যায় না। এ গল্পের চরিত্র রূপঙ্কর এমনই এক মানুষ। স্ত্রী মহুয়া আর কন্যা হিমিকে নিয়ে তার সংসার। পাশের বাড়ির অনন্তের স্ত্রী মিষ্টি গায়ে আগুন দিলেও সে নির্লিপ্ত থেকে সিনেমার সিডি চালিয়ে দেয়। সিনেমা দেখে। বাইরের কোনো উত্তেজনাই তাকে টলাতে পারে না। হৃদয়ে কোনো রেখাপাত করে না। একসময় তার কন্যাও এসে তার পাশে বসে পড়ে সিনেমা দেখতে। সঙ্গে এসে যোগ দেয় স্ত্রী মহুয়া কিংবা কাজের লোক আরতিও। এ গল্প প্রকৃতপক্ষে তুলে ধরেছে সেই সময়কে, আত্মকেন্দ্রিকতা যখন স্বাভাবিকতা লাভ করেছে। বিনোদনের প্রযুক্তি ডুবিয়ে রেখেছে মানুষের সমস্ত চেতনা কিংবা অনুভূতিকে। রূপঙ্কর সেই রকমই একটি চরিত্র—

> ওয়াঙ্কার ওয়াইয়ের 'ইন দ্য মুড ফর লাভ' সিনেমার সিডিটা আছে। বরং চালানো যেতে পারে। বেশ মন দিয়ে দেখা যেতে পারে ফিলমটা। বাইরে তখন হুটারের শব্দ, অ্যাম্বুলেন্স এসেছে। তার মানে মিষ্টিকে এখনো বাঁচাবার চেষ্টা চলছে। এর পরে হাসপাতালের ইমারজেন্সি। ডাক্তারদের তৎপরতা। মহুয়া-হিমি কেউই ফেরেনি। কটা বাজে ? মোবাইলটা হাতে তুলে নিয়ে সময় দেখে রূপঙ্কর। আটটা পঁচিশ। মোবাইলটা হাতে কেঁপে ওঠে। কে ফোন ওঠে ? কে ফোন করল ? বন্ধু অনিন্দ্য ফোন করেছে। মোবাইলটা কাঁপতেই থাকে। ফোন সে ধরবে না। যতসব বাজে কথায় যেতে হত। ইচ্ছে করছিল না সাতসকালে মনের তৃপ্তি হারিয়ে ফেলতে। মহুয়া-হিমির অনুপস্থিতিতে অসন্তোষ-অনুভব তৈরি হচ্ছিল না

তার। কেন না তার ঘুম থেকে উঠবার নির্ধারিত সময়ের আগে সে উঠেছে, সেহেতু মহুয়া ও হিমির সঙ্গে নির্ধারিত প্রাপ্য দৈনন্দিন আসেনি, এখন বাঁচা তার একা একা নিজের কাছে বাঁচা। হয়তো ঘুমের বিকল্পে বাঁচা। হয়তো ঘুমও।[৪৭]

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিমানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল, এ গল্প তারই পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। মানুষের মৃত্যুও আর কাউকে বিচলিত করে না। মৃত্যুকে পাশে রেখে অত্যন্ত স্বাভাবিকতার সঙ্গে সবাই দৈনন্দিন কাজ করে যায়। মননগতভাবে এক শূন্যতার দিকে যাত্রাকে তুলে ধরেন লেখক—

আর কথা নয়। কথা হারিয়েও যায়। ছবি দেখার মগ্নতা চলে আসে। আরতি ফিরে যাচ্ছে রান্নাঘরে মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে ফিরে আসছে ঘরের ভিতর। আসরটা জমে উঠছে। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। মহুয়া আরেক প্রস্থ চা খেতে চাইল। রূপঙ্করও খাবে। হিমিকে দেওয়া হয়েছে হরলিকস। আরতিকে দিয়ে ভালো করে আদা পেঁয়াজ লঙ্কা তেল দিয়ে মুড়ি মাখতে বলা হল। মহুয়ার অনুরোধে ছবিটা আবার প্রথম থেকে চালানো হয়েছে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরের খবর মাঝে মাঝে পাচ্ছে আরতি। একটু আগে খবর এসেছে মিষ্টি মারা গেছে। মারা যাওয়ার জন্য পুড়েছিল মিষ্টি। এটা এখন আর নতুন খবর নয়। সময় বয়ে যাচ্ছে। সময়ের গর্ভে বাঁচার নতুন প্রাণতা ভরে উঠছে। আরতি মুড়ি মেখে আনলে, তাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বলা হয়। দরজাটা আবজে দেয় আরতি। ছিটকিনি এঁটে দেবে কিনা শুধিয়েছিল, তার দরকার নেই।[৪৮]

এইভাবে খুব দ্রুত ‘পুরানো’ হয়ে যায় একটি মৃত্যুর ‘খবর’। মানুষ আবার সন্ধান করে নতুন উত্তেজনার উপাদান। এই নাগরিক নির্লিপ্ততা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন ব্যবস্থারই ফসল।

‘রাত কত হল’ (*নতুন গতি*, ঈদ সংখ্যা ২০০৮) গল্পটিও এক অস্থির সময়কে তুলে ধরে, যে সময়ে মানুষের মন বিপর্যস্ত, অনেক সচ্ছলতা সত্ত্বেও মানুষের ঘুম আসে না। অন্যদিকে এ

গল্পে উঠে আসে প্রযুক্তি যেভাবে মানুষের বিশ্রামের সময়টিকেও অধিকার করে জুড়ে থাকে সেই অনুপুঙ্খ—

> বোধহয় ঘুমের মধ্যেই আছি। মোবাইলে গুপি-বাঘার রিংটোন তীব্র বাজছে। ঘুম ভেঙে গেছে, হতচকিত আমি। নাসিমা অ্যান্টি-ডিপ্রেশনের ওষুধ খেয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছে পাশটিতে। প্রথমে মনে হল কোনও বিপদে পড়েছি, তা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। রিংটোন কি ভয়ংকর ! আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। যুদ্ধ নয়, এবার বুঝতে পারলাম মোবাইল বাজছে। নাসিমাকে ডিঙিয়ে নীচে নামতে হবে, নীচে নামার জন্য মশারি তুলে ড্রেসিং টেবিলটার কাছে যেতে হবে, যেখানে মোবাইলটা একরাশ আলো নিয়ে ভয়ংকর রকম বাজছে। রাত কত হল ? দেওয়াল ঘড়িতে দেখলাম আড়াইটে। রাতে কখনও আমি মোবাইলের সুইচ স্টপ করি না।[৪৯]

প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের সহজলভ্যতা এভাবেই মানুষের নিভৃতি কিংবা বিশ্রামের অবসরকে কেড়ে নিতে শুরু করেছিল।

'সন্ধ্যার মেঘমালা' (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩০ আগস্ট ২০০৯) গল্পে ধরা পড়েছে শোভান ও আফসানার অসুখী দাম্পত্যের কাহিনি। শোভানের প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামীহারা তরুণী আফসানাকে সে বিবাহ করে। তাদের মধ্যেকার বয়সগত ব্যবধান অনেকখানি। এ গল্পে দেখা যায় আফসানা শোভানের প্রথমপক্ষের কন্যা তেরো বছরের নেহার প্রাইভেট টিউটর মনোদীপের সঙ্গে একরকমের সম্পর্ক গড়ে তোলে, আর এর মাধ্যম হয়ে ওঠে মোবাইল ফোন। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পর্কের সূত্রসমূহকে প্রযুক্তি যে নতুন মাত্রায় উপনীত করতে সাহায্য করেছে, তা এই গল্পে উঠে এসেছে—

> গায়ের কাছের বাড়িটার এক তলার ছাদে মোবাইলে কথা বলছে মনোদীপ, অল্পবয়সি যুবক। চমৎকার। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কলকাতায় ভালো চাকরি করছে। সপ্তাহে এক দিন রবিবার শোভানের মেয়ে

নেহাকে ইংরেজি পড়ায়। মনোদীপের ইংরেজি পড়ানো শখ, ভালো পড়ায়। তাই তার বাড়িতে মনোদীপের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত আছে। মনোদীপের মোবাইলের স্পিকার খোলা, যার সঙ্গে কথা বলছে মনোদীপ, তার কণ্ঠস্বর খুব চেনা লাগল শোভনের। অব্যর্থ চেনা, এ কণ্ঠস্বর তারই দ্বিতীয় পক্ষের অল্পবয়সি স্ত্রী আফসানার। আফসানা চমৎকার মেয়ে। সে মনোদীপের সঙ্গে যা সব কথা বলছে, সব শুনতে পায় শোভান। প্রেমালাপের কণ্ঠস্বর। বেশ ভালো প্রেম জমাতে পারেও। কী ভাবে মনোদীপের বাইকের পেছনে চড়ে কোমর জড়িয়ে ঘুরে বেড়াবে, রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করিয়ে ফুচকা খাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রেমালাপ।[৫০]

প্রযুক্তিনির্ভর এক সময়ে মানুষের চিরাচরিত সম্পর্কসূত্রগুলি আলগা হয়ে এসেছিল। স্বপ্নের মধ্যেও নিহিত ছিল বিশ্বায়নের পণ্যসংস্কৃতি। তাই প্রেমের অনুষঙ্গে উঠে আসে 'বাইক'-এর প্রসঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে এ স্বপ্ন নির্মাণ করেছিল বিজ্ঞাপনের জগৎ। প্রযুক্তির এত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের মনোজগতের শূন্যতাই শেষপর্যন্ত গল্পে ধরা পড়ে—

তারপর আফসানা বিছানায় রাখা তার নিজের মোবাইলটার দিকে তাকায় একদৃষ্টে। আর ডান হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নেয়। এ হাত ও হাত করে খেলে খানিকটা। তারপর মোবাইলটা দুহাতে জড়িয়ে বুকের কাছে নিয়ে হুহু করে কেঁদে ফেলে। বাঁধভাঙা তার অশ্রুপাত হয়। আফসানা কেন কাঁদছে, সে শুধু আফসানাই জানে, শোভান জানে না, কিছুই জানে না। শোভান ফ্যালফ্যাল চোখে আফসানার অসহায়তা শুধু দেখে, দেখেই যায়। নিশ্চিন্ততার পৃথিবীতে সে এক জন নির্বোধ। শোভান অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালাবার কথা বলতে জানে না। সে কিছু জানে না, সে তার প্রয়োজনে আফসানাকে সংগ্রহ করেছে মাত্র।[৫১]

শোভান ও আফসানার দাম্পত্যে বয়সগত ব্যবধানের কারণে তৈরি হয় মানসিক দূরত্ব। সেই দূরত্বকে অপনোদন করতে শোভান পারে না। ফলে সেই শূন্যতায় স্থান করে নেয় প্রযুক্তি। তার

মাধ্যমে আফসানা কোথাও যেন চেষ্টা করে তার মানসিক শূন্যতাকে ভরিয়ে নেওয়ার। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে তার সেই শূন্যতা অপনোদিত হয় না।

‘এলাটিং বেলাটিং সই লো’ (*বারোমাস,* শারদীয় ২০০৯) গল্পে উঠে এসেছে ইসলামি সমাজের এক নারীর অবরোধকে অস্বীকার করার কাহিনি। এ গল্পে হাসিনা একটি অল্পবয়সী মেধাবী ছাত্রী। উচ্চমাধ্যমিকে সতেরো র‍্যাঙ্ক করলেও তার দ্রুত বিবাহ হয়ে যায় কুয়েত প্রবাসী এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। কদম্বগাছির শ্বশুরবাড়িতে বাস করা হাসিনা বোরখায় আবৃত হয়ে একটি কম্পিউটার সেন্টারে শ্বশুরের সঙ্গে আসে কম্পিউটার ট্রেনিং নেবে বলে। ধীরে ধীরে বোরখাকে অস্বীকার করে তরুণী মেয়েটি কীভাবে সকলের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করল বোরখার আড়ালকে—এ গল্প সেই অবরোধমুক্তির কথা তুলে ধরেছে। আর তারই অনুপুঙ্খে এ গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি, পরিযাণ কিংবা বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার কথা—

> চলে গেল শ্বশুর সমিরুদ্দিন।
>
> তানিয়ার সঙ্গে হাসিনার তেমন পরিচয়ই হয়নি, তানিয়া জানতে পারেনি তাকে তেমন করে। শুধু প্রশ্ন ও তার উত্তর বিনিময় হয়েছে। অথচ তানিয়াকে তার ভারি পছন্দ হয়েছে। খুবই মিশুকে মেয়ে। তেমন আচরণ তানিয়াকে দিতে পারেনি সে। সে কি জানে হাসিনা হায়ার সেকেন্ডারিতে সতেরো র‍্যাঙ্ক করেছিল? চার মাস আগে তার বিয়ে হয়েছে, ডিসেম্বরে। আরিফ পনেরো দিনের জন্য কুয়েত থেকে এসেছিল, বিয়ে করে তাকে তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে গেছে। এসব জানানোর তার সুযোগ হয়নি। সে স্বামীহীন শ্বশুরবাড়িতে থাকে। একজন দেওরও নেই, একজন ননদও নেই। শুধু একজন জা আছে, আর শ্বশুর-শাশুড়ি। মাঝে মাঝে আরিফ ফোন করে। আরিফ একজন ইঞ্জিনিয়র। কুয়েতে নানা প্রজেক্টে কাজ করে। তার শুধু কাজ আর কাজ।[৫২]

এ গল্পে এইভাবে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন-পরবর্তী পরিযাণ কিংবা তার ফলে সৃষ্ট মানবিক সম্পর্কের নতুন ধরনের মাত্রাসমূহ। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জনের কারণে দাম্পত্যের মতো ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ককেও মানুষ সরিয়ে রেখে প্রবাসী হতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে সেই ব্যবস্থারই অনুসারী প্রযুক্তিশিক্ষায় অগ্রসর হয়েছে হাসিনা—

> ক্লাসরুমে একটা কম্পিউটারের সামনে হাসিনাকে বসিয়ে দিয়ে গেল তানিয়া।
>
> হলঘরের মাপে বড়ো ঘর। পর পর কম্পিউটার। সাত-আটজন ছাত্র ছাত্রী। তিনজন ছাত্র, পাঁচজন ছাত্রী। শিক্ষক সুলগ্না আর সোহম।[৫৩]

এরপরেই এ গল্পে উঠে এসেছে ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার কথা, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নেরই একটি ব্যর্থতার দিক। এর ফলে আমেরিকার পাশাপাশি ভারতের মতো পৃথিবীর আরও বেশ কিছু দেশে কর্মহীনতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল—

> সোহম বলল, 'যুদ্ধ তো যে কোনো দেশে যে কোনো সময় হতে পারে। এই যে বিশ্বে আর্থিক মন্দা, এটা কি কম যুদ্ধ পরিস্থিতি ? প্রাইভেট সেক্টরগুলো তো দেখছ, কী নাভিশ্বাস দশা ! তুমি যে এখানে আছ, যে কোনো দিন আসতে বারণ করে দেবে। আমেরিকাতে কত ভারতীয় ছুটি নিয়ে দেশে ফিরতে ভয় করছে, যদি তাদের চাকরি চলে যায়। এখানেই দেখ না কতজন চেনা পরিচিতদের চাকরি চলে যাচ্ছে। কী বলছে হাসিনা আলি খান ?'[৫৪]

বিশ্বায়ন ও তার একাধিক অনুপুঙ্খ এইভাবেই বিভিন্ন মাত্রায় লেখক আফসার আমেদের ছোটোগল্পে উঠে এসেছে।

৭.১০॥ **সাত্যকি হালদার**

বর্তমান বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় সাত্যকি হালদার (জন্ম-১৯৬৫) একটি ব্যতিক্রমী নাম। তিনি পেশায় চিকিৎসক। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় স্কুল ম্যাগাজিনে। এর পর নানা পত্র-পত্রিকায়

প্রকাশিত হতে থাকে সাত্যকির নানা স্বাদের গল্প। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম, সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া গ্রামের মানুষ, সমকাল তার বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে ভিড় করে আছে সাত্যকির গল্পে।[৫৫] পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চারটি উপন্যাস। *ইছাই নদীর পালা* উপন্যাসের জন্য 'সোপান' পুরস্কার এবং একমাত্র নাটক *খরিস*-এর জন্য 'সুন্দরম' পুরস্কার লাভ করেন তিনি। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ *একাত্তরের রক্তস্মৃতি মহিলাদের মৌখিক বয়ান*।[৫৬]

সাত্যকি হালদারের ছোটোগল্পে বার বার উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ। পাইনের বন, পাহাড়, রেলস্টেশন ইত্যাদির কথা। ধরা পড়েছে মফসসলের জীবন আর তার ধীরে ধীরে পালটে যাওয়া। কোনো কোনো ছোটোগল্পে উঠে এসেছে জঙ্গলমহল, পুলিশ-মিলিটারি কিংবা মাওবাদী প্রসঙ্গ। সীমান্ত এলাকা কিংবা পাচার ইত্যাদি হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটোগল্পের বিষয়। অন্যদিকে দু-একটি গল্পে ধরা পড়েছে তাঁর পেশাগত জীবনের প্রভাব। সেইসব গল্পে দেখা গিয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একাকী চিকিৎসকের জীবন। এইসব বিষয় ছাড়াও তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটোগল্পে অবধারিতভাবেই উঠে এসেছে বিশ্বায়ন। কখনো তা নতুন প্রজন্মের বদলে যাওয়া আচরণের প্রসঙ্গে আবার কখনো শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। তাঁর এইরকম কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'শঙ্খের ডাক', 'সহজ পাঠ', 'স্বপ্নদিন', 'অসুখ', 'দাগ', 'একটি সবুজ রূপকথা', 'তোর্সা চরের পাঁচালি' ইত্যাদি।

'শঙ্খের ডাক' গল্পটিতে উঠে এসেছে যৌথ পরিবার ভেঙে অণু পরিবার তৈরি হওয়ার কাহিনি। গ্রামীণ বাড়ি ছেড়ে এক দম্পতি ছেলেকে নিয়ে আলাদা হয়ে শহরের উপকণ্ঠে নতুন বাড়ি তৈরি করে। স্ত্রীর উৎসাহে ধীরে ধীরে স্বামীও রাজি হয় ছেলেকে ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে। কিংবা পরবর্তী সময়ে তাকে হোস্টেলে রাখতে। কিন্তু বড়ো হওয়ার পর সেই উজ্জ্বল

ছাত্রটি আর বাড়িতে ফিরতে চায় না। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মা খুঁজে পায় না ছেলের বাড়িতে না ফেরার কারণ। এ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে দ্রুত পালটে যাচ্ছে মানুষের সামগ্রিক মূল্যবোধ। একান্নবর্তী পরিবার ভাঙছে। সরকারি বাংলামাধ্যম স্কুল দ্রুত ছাত্রশূন্য হয়ে ভরে উঠছে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল। সন্তানকে সফল করার তীব্র প্রতিযোগিতায় বাবা-মায়েরা অবতীর্ণ হচ্ছে। আর এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে কোথাও পূর্বপ্রজন্মের মূল্যবোধহীনতা চারিয়ে যাচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মে—

> শহরের আশেপাশে তখন ইংলিশ মিডিয়ামের ছড়াছড়ি। তাদের যেমন বাহারি সব নাম তেমনি উজ্জ্বল পোশাক আর বিভিন্ন কায়দার গাড়ি। যেখানটায় আমরা বাড়ি বানালাম তার আশেপাশের মানুষদের সঙ্গে একটা ব্যাপারে আমাদের মিল ছিল। আগে বেশিরভাগই তারা গ্রামে বা মফসসলে থাকত, পরে স্বামী-স্ত্রীতে নতুন জায়গায় উঠে এসেছে। তাছাড়া জায়গাটাও ছিল আমাদের মতো নতুন। এক সময়ের বিরাট জলাভূমি, জেলেরা সারাদিন মাছ ধরে বেড়াত, পরে সেসব ভরাট করে বার করা হয়েছে জায়গাটা।
>
> আমাদের প্রতিবেশীদের বাড়ির সামনে ইংলিশ মিডিয়ামের গাড়িগুলো এসে থামত। তাদের বাচ্চারা মায়ের গালে চুমু খেয়ে হাত নাড়তে নাড়তে উঠে পড়ত গাড়িতে। ফলে অনীককেও ওরকম একটা স্কুলে ঢোকাবার ইচ্ছাটা স্নিগ্ধার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠল। তবে ইচ্ছাটা শুধু ওরই বলা ঠিক নয়। মনে মনে আমিও চেয়েছি ছেলেটা সেজেগুজে ওরকম কোনও স্কুলে পড়তে যাক।
>
> ছেলের সঙ্গে আমাদের বাড়িতেও শুরু হয়ে গেল প্রবল ইংরাজি চর্চা। ক্যালেন্ডার থেকে উঠে গেল সোম মঙ্গল বুধবারের নাম—তারা তখন অমুক ডে আর তমুক ডে। দুপুরবেলা দুধ খেয়ে জানালা গলে পালিয়ে যাওয়া বিড়ালটা পাজি নয়, নটি হয়ে গেল। চারপাশের পশুপাখি গাছপালা এমনকী আত্মীয়স্বজনের নামগুলো ইংরাজিতে শিখতে থাকল অনীক।[৫৭]

নিজের ভাষা কিংবা সংস্কৃতিকে ভোলার কিংবা ভোলানোর এই প্রয়াস কিছুটা হলেও আত্মঘাতী হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে তা সার্বিকভাবে ভুলিয়ে দেয় সম্পর্কসূত্রের যে কোনও প্রান্তকে। একসময় তা ছিন্ন করে ফেলে গভীরতম সম্পর্ককেও—

> স্নিগ্ধা এসে পাশে দাঁড়াল। কান্নাভেজা চোখ। খানিকটা আমার উদ্দেশে, খানিকটা স্বগতোক্তির মতো বলল—ওর জন্য কিছু কি বাকি রেখেছি আমরা, যা চেয়েছে তাই তো খুঁজে নিয়ে এসেছি, ওর কি কোনও চাহিদা অপূর্ণ থেকে গেছে !
>
> স্নিগ্ধার এই প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না। আমি চুপ করে থাকি। ভারী গলায় ও আরও অনেক কথা বলে যায়। ওকে আড়াল করে আমি নিজের মনে বলার মতো করে বলি—সবই প্রায় দিয়েছি, শুধু শঙ্খের ডাকে ওকে আমরা ঘরে ফিরতে শেখাইনি...।[৫৮]

বিশ্বায়ন কিংবা তার উপযোগী সংস্কৃতি কোনও এক কেন্দ্রাতিগ বলে মানুষকে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে, ঘরে ফেরানো সেই বলের ধর্ম নয়।

'সহজ পাঠ' গল্পে লেখক সাত্যকি হালদার সরাসরি দেখিয়েছেন কীভাবে দ্রুত বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়ের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, সমসময়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়। অভিভাবক-অভিভাবিকারা আকৃষ্ট হচ্ছেন ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের চাকচিক্যে। এমনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের স্ত্রীও চাইছেন সন্তানকে তাঁর স্বামীর বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াতে। এ গল্প সেই সময়ের কথা বলে, যখন সকলে বিশ্বায়নের পুঁজির অংশভাক হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষায় জোর দেয়। এভাবে মাতৃভাষাশিক্ষা কিংবা মূল্যবোধ অথবা অনুভূতির শিক্ষা পরিত্যক্ত হতে থাকে দ্রুত। এইভাবেই পুঁজির সম্প্রসারণ বিশ্বায়ন নামে দিকে দিকে হত্যা করেছিল আঞ্চলিক ভাষা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ কিংবা সরকারি

উদ্যোগের কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলিকে। ভাবতে শিখিয়েছিল, এই পথই সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ। সরিয়ে নিয়েছিল মানুষের সামনের বিকল্পগুলিকে—

> ছাত্র কমে যাওয়ার বিষয়টা এক দিনে হয়নি। বলতে গেলে তার শুরু প্রায় দু'বছর আগে। সেই যখন পাড়ার মধ্যে অ্যাডভোকেট সাহেব এলেন তার ঠিক পরপর। উনি এসেই কেজি স্কুল খুলে বসলেন নিজের বাড়িতে। আর তখন থেকেই মন্দা শুরু আমাদের স্কুলটায়।
>
> এমনটা যে হবে প্রথমে তা ভাবতে পারিনি। কেজি স্কুল খুলতে না খুলতে প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়ে আমাদের ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। পরের বছর আরও অনেকে। তাছাড়া আমাদের স্কুলে নতুন ভর্তিও মোটামুটি বন্ধ। সমস্ত পাড়া জুড়ে তখন এক আশ্চর্য হুজুগ। এমনকী সে হুজুগ আশেপাশের পাড়াতেও। মোড়ের মাথায় দুটো কাপড়ের দোকান। পুজোর মুখে ছাড়া কখনোই তেমন বেচাকেনা নেই তাদের। অথচ অ্যাডভোকেট সাহেব স্কুল খোলার পর দোকান দুটোর চেহারাই বদলে গেল। দোকানের সামনে পরপর টাঙানো কেজি স্কুলের পোশাক। সকাল-সন্ধে সেখানে বাবা-মায়েদের ভিড়। জুতোর দোকানেও ছোট কেডস, সাদা মোজা। অ্যাডভোকেট সাহেব এসে বাচ্চাদের চেহারাতেও কেমন পরিবর্তন এনে দিলেন।
>
> স্কুলের ভর্তির ব্যাপারে বেশ একটা সুবিধা করে রেখেছেন অ্যাডভোকেট সাহেব। বছরের মাঝখানে যে-কোনও সময় ওনার ওখানে ভর্তি হওয়া যায়। শুধু আগের মাসের টাকাগুলো দিয়ে দিলে হল। আর বাবা-মায়েরাও বেশ খুশি এই নতুন ব্যবস্থায়। প্রায় প্রতি মাসেই এক-দুজন করে বাবা-মা আমাদের কাছে আসেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে এটা-ওটা বলেন। এবং তারপর জানান আমাদের স্কুল ছাড়িয়ে বাচ্চাকে নতুন কেজি স্কুলে নিয়ে যেতে চান।
>
> আর এভাবেই কমতে কমতে আমাদের বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী এখন মাত্র তিন-এ। এই তিন জনকে নিয়েই আমাদের রোজকার পাঠশালা।[৫৯]

এ গল্পে বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়ের মৃত্যু দেখিয়েছেন লেখক। দেখিয়েছেন ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের মহাসমারোহে বেড়ে ওঠা, তার সঙ্গে ব্যবসায়ী সংস্কৃতির আগমন। অর্থই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। মননের জগতটি হয়ে পড়েছে পরিত্যক্ত—

> সকালবেলা পরিপাটি পোশাকে অ্যাডভোকেট সাহেবের স্কুলে যায় বাচ্চারা। নমিতার মতে সেও এক ছবির মতো দৃশ্য। এই দৃশ্যে আরও আপ্লুত হয় ও। তবে ব্যাপারটা যে ছবির মতো তা আমারও মনে হয়। আমাদের ওই বুনিয়াদি স্কুল, বছর পাঁচেক আগেও যখন জমজমাট ছিল ওটা, তখন স্কুল শুরুর আগে মাঠে দাঁড়ালে সে দৃশ্যও ছবির মতো লাগত।
>
> তবু মন ওঠে না নমিতার। আমাদের বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে কোনও স্কুল ড্রেস নেই। সাধারণ জামাকাপড় পরে স্কুলে আসে বাচ্চারা। অ্যাডভোকেট সাহেবের স্কুলের মতো গাড়ি নেই আমাদের। সবাইকে পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে হয়। আরও সব নানারকম ব্যাপার। আমাদের স্কুলে লম্বা-চওড়া গেট নেই। চারপাশে রঙচঙে পাঁচিল নেই। পাঁচিলে ব্যাব্যা-ব্ল্যাকশিপের ছবি নেই। এবং সব শেষে ও যেটা বলে সেটাই সব চাইতে ধারালো। —অ্যাডভোকেট সাহেবের স্কুলের মিসরাও অনেক অন্যরকম। হাঁটাচলা, কথা বলার ভঙ্গি সবই আলাদা...।[৬০]

বিশ্বায়নের পণ্যসংস্কৃতিতে শিক্ষাও একটি পণ্য। অন্যান্য পণ্যের মতোই তাকে ‘বাজারে’ ছাড়তে গেলে ঝাঁ চকচকে মোড়কে ছাড়তে হয়। এ গল্পে শিক্ষাকে সেইরকম মোড়কে পেশ করেছে ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়। তার সব কিছুই অত্যন্ত ধোপদুরস্ত, পেশাদারি। জনগণও হয়তো তাই চেয়েছিল—

> গেট দিয়ে বেরিয়ে যাব আমি। সুমিতের মার কথা তখনও শেষ হয় না। পাশে এসে খলবলিয়ে বলেন— ঠিক যে করেছে তা আমারও এখন মনে হয়। নতুন স্কুলে বুক-লিস্ট দিয়েছে। ক্লাস ফোরে পনেরোখানা বই। আর যা হোক ওরা কিন্তু বেশ চাপে রাখে বাচ্চাদের। বড় হওয়ার জন্য এই চাপটুকু তো দরকার।

গেট দিয়ে বেরোতে বেরোতে আমি সম্মতি জানাই সুমিতের মায়ের কথায়। যদিও একটু কষ্ট হয় সুমিতের জন্য। ভালো ছবি আঁকে ছেলেটা। টিফিনের সময় একমনে বসে খাতার পাতা ভরায়। স্কুলের মাঠে দাঁড়ানো বকুল গাছটার ছবি এঁকে একবার দেখিয়েছিল আমাদের। পনেরোখানা বই পড়তে হলে নিজের মনে ছবি আঁকার আর কি সময় পাবে ও !...

সকালে অ্যাডভোকেট সাহেবের স্কুলের সামনে দিয়ে আসতে হয় আমাদের। সেখানে তখন স্কুল শুরুর জটলা। খাঁচাওয়ালা রিক্সাগুলো পেট ভরে বাচ্চাদের এনে উগরে দেয় গেটের সামনে। উঁচু পাঁচিল এবং পাঁচিলের মাথায় তার-কাঁটা দেওয়া অ্যাডভোকেট সাহেবের বাড়ি। সামনের লোহার গেটে অল্প একটু ফাঁক। সেই ফাঁক গলে স্কুলের মধ্যে নিমেষে হারিয়ে যায় বাচ্চারা।[৬১]

এইভাবেই ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয় নামে নতুন এক খাঁচা নির্মিত হয়েছিল। আর তা নির্মাণ করেছিল বিশ্বায়িত পৃথিবীর 'পুঁজি' নামক চালিকাশক্তি।

'স্বপ্নদিন' নামক ছোটোগল্পে লেখক কলকাতা থেকে অনেক দূরের এক মফসসল শহরের কথা তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ গল্পে লেখক তুলে এনেছেন বাংলা গানের জগতের এক বিবর্তনকে। বিশ্বায়নকালের আগে মানুষ যে ধরনের গান কিংবা বিনোদন পছন্দ করত, বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ে পূর্বেকার সেই স্বাদবোধ বহুলাংশে বদলে যায়। খুব অগভীর মননের কিছু গান, চটুল সংস্কৃতি কিংবা বাজনার যন্ত্রবহুলতা এইসময়ের বিনোদনের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। এইরকম একটি সময়ে মফসসলের একসময়ের বাংলা গানের জনপ্রিয় শিক্ষক তথা শিল্পী 'সুবোলদা'-র জীবনের উত্থান-পতনকে এ গল্পে বদলে যাওয়া জনরুচির নিরিখে স্থাপন করেন লেখক। গভীর মননের সেই মানুষটি নতুন এই সময়ে বোঝেন যে, তাঁর দিন ফুরিয়েছে—

সেই সময় গোবরডাঙার বদলটাও চোখে পড়ার মতো। বহু কালের পুরানো এবং স্মৃতিবাহী জমিদারবাড়ি, তার আমবাগান বিক্রি হয়ে গেল। সমস্ত জায়গাটা পরিষ্কার করে ছোট-বড় প্লটে বিক্রির পরিকল্পনা চলতে

থাকল রাত দিন। গঞ্জের কেনাকাটাটা বেশির ভাগ ছিল নদীর পাড়ে বাজারকেন্দ্রিক। বাকিটা রেল স্টেশনের আশেপাশে। কিন্তু তখন পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হতে থাকল দোকান। গড়ে উঠতে থাকল টেলিফোন বুথ, জেরক্স, কোল্ড-ড্রিংস সাজানো পানের দোকান। কোথা থেকে কত মানুষ এল গোবরডাঙায়। তারা এসে ছোট ছোট প্লট কিনে বাড়ি বানাতে থাকল। সাইকেলের জায়গায় মটর সাইকেল বাড়ল। মটর সাইকেলের শো-রুম হল স্টেশনের কাছাকাছি। এমনকী এত কালের যে চেনা নদী, যার সঙ্গে গঞ্জের আদ্যিকালের যোগ, সে নদীও যেন ছোট হয়ে আসতে লাগল। রেল-ব্রিজের নীচে সোঁতায় পরিণত হচ্ছিল নদী।...

এত দিন আকাশবাণীতে অনুরোধের আসর শুনত মানুষ। সেখানে কথা কম, গান বেশি। কিন্তু এ বার রেডিওতে এফ-এম বাজতে লাগল। চায়ের দোকানে, সেলুনে, পানের গুমটিতে এফ-এম। সেখানে অবিরাম কথা, মাঝে অল্প অল্প গান। সে সব গানের সুরও ভিন্ন। কথাও অনেক সোজা সাপটা। গানও আর মোটেই হারমোনিয়াম তবলা নির্ভর নয়। তার জায়গায় ঝকমারি বাদ্য, নানা রকম বিট, ড্রাম, গায়ক গায়িকার উচ্চকিত উচ্চারণ। কলকাতা থেকে অনেক দূরেও সেই গান উঁকি মারতে থাকল।[৬২]

চারপাশ বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছিল মানুষের মননের জগতটিও। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল নিত্যনতুন বিনোদনের। জনরুচির পরিবর্তন ঘটেছিল—

এ ভাবেই কেটে যাচ্ছিল জীবন। চার পাশের বদলের মাঝে এক জন মানুষ পুরানো দিন আগলে বেঁচে থাকছিলেন। আমাদের এলাকা পাল্টাতে পাল্টাতে প্রায় কলকাতার মতো হয়ে এল। স্টেশনের কাছাকাছি ফ্ল্যাট বাড়ি হল, মাংসের দোকানে মোজাইক বসল, পাড়ায় পাড়ায় রেস্টুরেন্ট, এ সবের সঙ্গে মানুষগুলোও বদলে গেল আশ্চর্য রকম। সবার মধ্যেই একটা ব্যস্ততার ভাব। টাকা আয়ের নানা রকম কৌশল। কথায় কথায় কলকাতা।...

দূরে গান শিখে আর বাইরে প্রোগ্রাম করে সহেলী তখন একেবারেই আলাদা। তার ভাবভঙ্গিতে অন্য চমক। পরনে গা-টাইট জামা। সে গান গাইতে উঠল পিছনে চার জনকে নিয়ে। তাদের সঙ্গে নানা রকম যন্ত্র। সটান মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে গান শুরু করল সহেলী। জানা অজানা পথে চলেছি, একে একে দুই দুয়ে একে তিন হয়েছি...।

অনেক দিন আগে এই ক্লাবেরই এক অনুষ্ঠানে সুবোলদার গান শুনে যে অবাক হয়েছিল, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় ভিন্ন স্টাইলে, কখনও শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলে, কখনও নিজেই শ্রোতাদের তালিয়া লাগাও বলে একের পর এক গান করে যেতে লাগল। তার মধ্যে একটা গান, আমি কলকাতার রসগোল্লা... তার পরেই আবার— গোলপ্রিন্টের শাড়ি পরে, গড়িয়া হাটের মোড়ে...।

মানুষও যেন এ সব গানের জন্য তৈরি হয়ে ছিল। রুচি বদলের দিনে মানুষ এ সব গান শোনার জন্য এসেছে।[৬৩]

এরই মধ্যে কিছু মানুষ পুরানো জনরুচি কিংবা মূল্যবোধকে আঁকড়ে বাঁচতে চাইলেও তাঁরা একেবারে প্রান্তিক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের দিন ফুরিয়েছিল—

যে মানুষকে আমরা গান গাইতে দেখেছি কিন্তু কখনও আবেগপ্রবণ হননি, গানের মাঝামাঝি এসে তিনি আর ধরে রাখতে পারলেন না নিজেকে। তার দু'চোখে জলের ধারা। সুবোলদা গাইছেন, আর কাঁদছেন। চার পাশ একদম চুপ। আমরা বুঝি, ফাঁকা দর্শকাসনে বসে চোখ মুছছেন হাসিদিও। বটুদা ধীর লয়ে ঠেকা বাজিয়ে চলেছেন। সুবোলদা শেষ করছেন— পেয়ে তোমায় যদি হারাই... আমাদের স্মৃতিতে বহু পুরানো মফসসল ঝাপসা হয়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। তার পুরানো স্টেশন, কলেজের বড় মাঠ, সন্ধেবেলা অল্প আলো-জ্বলা রেল বাজার। মানুষ সেখানে নিশ্চিত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কত শরৎকাল সেখানে হাজির হত শিউলি ফোটা ভোরবেলা নিয়ে। কত বর্ষার দুপুর পথঘাটকে নির্জন করে রেখেছিল। কুয়াশা মেখে ধীরে নেমে আসত শীতের সন্ধ্যা।[৬৪]

এইভাবেই সামগ্রিকভাবে পুরানো সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল বিশ্বায়ন।

'দাগ' গল্পে লেখক জাদু বাস্তবতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এ গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে আধুনিক প্রযুক্তির কথা। যে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে টিভির ছবি একেবারে আসল ঘটনাবলি দেখাতে শুরু করে। তখন টিভির পর্দার চরিত্রেরা পর্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। তখনো পর্যন্ত অসুবিধা ছিল না, যখন খেলার মাঠ থেকে বল আর জঙ্গল থেকে জিরাফ ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

অসুবিধা দেখা দিল তখনই, যখন জওয়ানরা জঙ্গল থেকে বাঁশে টাঙানো এক তরুণ ও এক তরুণীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ কাঁধে টিভি থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের মধ্যে মৃতদেহগুলি নামিয়ে রাখল। সেই মৃতদেহ নিয়ে তারা টিভিতে ঢুকে পড়ার পরেও রক্তের দাগ আর কখনোই উঠল না মেঝে থেকে। এইভাবে এ গল্প জাদু বাস্তবতার প্রকাশ ঘটালেও তা কোথাও মধ্যবিত্তের নিরাপদ পরিসরের আরামের জায়গাটিকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়। লেখক এ গল্পে কোথাও 'মাওবাদী' শব্দটি ব্যবহার না করলেও পাঠকের সামনে নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হয়ে ওঠে জঙ্গলমহল, মাওবাদী ও যৌথবাহিনীর সংঘর্ষের কথা। সময়কাল হিসাবে উঠে আসে একবিংশ শতকের প্রথম দশক। প্রকৃতপক্ষে এই নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনগুলি তীব্রতা লাভ করেছিল রাষ্ট্রের তরফে পুঁজির স্বার্থ রক্ষার প্রতি পক্ষপাত দেখানোর কারণে। যে কাজে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তিতে স্বাক্ষর করার কারণে কিংবা মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে। তাই এ গল্পে 'রিয়্যালিটি শো'-প্রিয় নিরাপদ অবস্থানে থাকা মধ্যবিত্ত, যারা বহুজাতিক কোম্পানির পণ্য ব্যবহার করে, দেশীয় মানুষের উপরে বহুজাতিক কোম্পানির শোষণ-বঞ্চনাতে যাদের কিছু আসে যায় না, তাদের মননকে জাদু-বাস্তবতার সাহায্যে একরকম আঘাত করেন লেখক। দেখান যে, তারা শত চেষ্টা করলেও রক্তের দাগ মুছে ফেলতে পারবে না। কারণ তারাও পরোক্ষে এই রক্তপাতে অংশগ্রহণ করছে কোম্পানিগুলির উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারের দ্বারা—

> যদিও রবিবার দুপুরের পর সে সব ভাবনা কোথায় চলে গেল। পাড়ার কেবল লাইনটা ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দেওয়ানো ছিল। সেটাই নতুন দিনের মডেলের পিছনে সেঁটে গেল। প্রথম প্রথম রিমোটে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সেটাও সড়গড়। তার পর ছবি যখন জেগে উঠল, তা দেখে দুজনেই থ। এত বড় পর্দা জুড়ে এমন ঝকঝকে ছবি! সমস্ত ঘর জুড়ে বিস্তার। বসার

ঘরটাই যেন বদলে গেল মুহূর্তে। পাশাপাশি বসে ছবির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে অরিত্র বিড়বিড় করে বলল, প্লাজমা টেকনোলজি না কী যেন বলছিল দেবাংশু। একেবারে হালের ব্যাপার।

সুচেতা বলল, সত্যিই অদ্ভুত। মনে হচ্ছে যেন ঘরের মধ্যেই খবর পড়ছে। এই ঘরেই বিজ্ঞাপন।[৬৫]

প্রযুক্তি পরিচালিত হয় পুঁজিদ্বারা। আর পুঁজির বিস্তার ঘটে শোষণের মাধ্যমে। মধ্যবিত্ত মনন এই তর্ক থেকে থাকতে চায় দূরে, নিরাপদ আশ্রয়ে। লেখক জাদু বাস্তবতার প্রয়োগে সেই নিরাপত্তার বোধে প্রবেশ করিয়ে দেন একপ্রকার অস্বস্তি—

চ্যানেল না বদলে ওরা ছবি দেখে যায়। হেঁটে আসার শব্দ খানিকটা বাড়ে। ওরা দেখে, ভারী বুট, জলপাই রঙের টুপি ও পোশাক, সেনা জওয়ানদের মতো লোকগুলো বেরিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে। তার পরের দৃশ্যে প্রায় আঁতকে ওঠে সুচেতা। অরিত্রর গা ঘেঁষে আসে। এ সব কী দেখাচ্ছে তাদের টিভিটা !

সামনের দুই জওয়ানের কাঁধে একটি বাঁশ। সেই বাঁশে ঝুলছে দু'পাশে হাত পা বাঁধা একটি মেয়ের মৃতদেহ। পিছনের দুই জওয়ানের কাঁধে একই ভাবে ঝোলানো একটি যুবক। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে এদের। দু'জনেরই মাথা নীচের দিকে ঝুলছে। মেয়েটির রক্তাক্ত হলুদ সালোয়ার কামিজ মাটির দিকে নামানো।

খবরে অনেক কথা বলছিল। কিন্তু সেগুলো ঠিক কানে ঢুকল না ওদের। বরং ওরা দেখল, যে ভাবে এক দিন মাঠ থেকে বল আর জঙ্গল থেকে জিরাফ ওদের আশ্চর্য টিভি বেয়ে ঘরে এসেছিল, সে ভাবেই কাঁধে ঝোলানো ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে চার জন জওয়ান বিজ্ঞাপনের টিভির বড় পর্দা ছেড়ে ঢুকতে শুরু করল ঘরে। পুরানো ছবিতে দেখা শিকারের পর যে ভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে মৃত জন্তু আনা হত, সেই রকম। টিভি ছেড়ে সুচেতা আর অরিত্রর বসার ঘরে ঢুকে জওয়ানরা কাঁধ থেকে বাঁশ নামিয়ে মেঝেতে রাখল। তার পর ছোট চোখে দেখতে থাকল চারপাশ।[৬৬]

মধ্যবিত্ত শ্রেণিচেতনার অরিত্র আর সুচেতা আশ্বস্ত হতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও আশ্বাস তাদেরকে স্বস্তি দেয় না—

> অরিত্র আর সুচেতা নড়েচড়ে বসে। খানিকটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেও। ভাবে, টিভিটা বন্ধ করে কিছু ক্ষণের জন্য চলে যাবে। হাঁটাহাঁটি করে আসবে বাইরে থেকে। কিন্তু সোফা থেকে নামতে গিয়ে অরিত্র দেখে মেঝেয় যেখানে মেয়েটিকে শোয়ানো ছিল, সেখানে এক জায়গায় রক্তের দাগ। গোল হয়ে লেগে থাকা রক্ত।
>
> সুচেতা ঘাবড়ে যায়। আবারও সোফায় উঠে পড়ে। কিন্তু অরিত্র দাগের ওপর জল ঢালে, সার্ফ এনে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু দাগ কিছুতে ওঠে না। সামান্য ফিকেও হয় না।[৬৭]

পুঁজির সম্প্রসারণ ঘটতে গিয়ে যারা এই ব্যবস্থার সহায়ক হয়ে উঠেছে, তারাও যে রক্তের দাগ মুছতে পারবে না, এ গল্প সেই অমোঘ সত্যকে মনে করিয়ে দেয়। লেখক সাত্যকি হালদার তাঁর ছোটোগল্পের মাধ্যমে এইভাবেই বিশ্বায়নের বিভিন্ন লক্ষণাবলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৭.১১॥ সোহারাব হোসেন

ছোটোগল্পকার হিসাবে বর্তমান বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া সোহারাব হোসেনের জন্ম ১৯৬৬ সালের ২৫ নভেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট এলাকায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ছোটোগল্পের উপর গবেষণা করে লাভ করেছেন পিএইচ.ডি. ডিগ্রি। কর্মজীবন বৈচিত্র্যময়—প্রথম শ্রেণির দৈনিকে সাংবাদিকতা, বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, কলেজে অধ্যাপনা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার উচ্চপদে কাজ করেছেন।

সোহারাব হোসেন একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন ‘হরেন্দ্রনাথ সাহা স্মৃতি দিবারাত্রির কাব্য পুরস্কার’, ১৯৯৯ সালে পেয়েছেন ‘সোমেন চন্দ স্মারক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার’, ২০০০ সালে পেয়েছেন সর্বভারতীয় ‘কথা পুরস্কার’ ও ‘নজরুল সাহিত্য সদভাবনা পুরস্কার’, ২০০৩ সালে পেয়েছেন যথাক্রমে ‘অন্তর্বীজ সাহিত্য পুরস্কার’ ও ‘ভাষা শহিদ বরকত স্মরণ পুরস্কার’, ২০০৪ সালে পেয়েছেন ‘আলোক পুরস্কার’, ২০০৫ সালে পেয়েছেন ‘প্যারীচরণ সরকার সম্মান’, ২০০৮ সালে পেয়েছেন ‘শিস পুরস্কার’ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর ‘ইলাচন্দ স্মৃতি পুরস্কার’ এবং ২০০৯ সালে পেয়েছেন যথাক্রমে ‘সিরাজুল হক স্মৃতি সাধনা পুরস্কার’ ও স্বর্ণপদক, ‘নতুন গতি পুরস্কার’ আর ‘বিষাদ সিন্ধু পুরস্কার’।[৬৮]

সোহারাব হোসেনের ছোটোগল্পে ধরা পড়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়। তার প্রভাব পড়েছে তাঁর গল্পের ভাষা-ভঙ্গিতে। তাঁর *শ্রেষ্ঠ গল্প* (করুণা, বইমেলা ২০১০)-এর ভূমিকাসূচক ‘সময়ের গল্প দুঃসময়ের গল্প’ শিরোনামের লেখাটিতে অধ্যাপক মানস মজুমদারের বক্তব্য এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—

> সমকালীন সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সবকিছুই তাঁর গল্পে ভিড় করে। নানাবিধ শোষণ-পীড়ন, অন্যায়-অবিচার, প্রমত্ত আধুনিকতা, বিশ্বায়ন, ভোগবাদ, যৌনতা, সন্ত্রাসবাদ তাঁর গল্পের উপজীব্য। তাঁর নিজের কথায় : ‘আমার কেবলই মনে হয়, আমার সময় পোকালাগা সময়। কতো বিচিত্র সব পোকা—কাম-ক্রোধ-লালসা-বাসনা-দ্বেষযুক্ত প্রবৃত্তির পোকা, সাম্প্রদায়িকতার পোকা, ভোগসর্বস্ব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পোকা, সমাজবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদীর দাপটের পোকা, রাজনীতির ভগবান রূপ ও সুবিধাবাদের পোকা, যন্ত্র-প্রযুক্তির কামড়বিদ্ধ স্বার্থসর্বস্ব মানবত্ব ও মনুষ্যত্বহীনতার পোকা। অ্যাতো সব পোকারা আমার সময় ও সময়-সন্তান মানুষকে ঘিরে ধরেছে। এই পোকালাগা সময় দ্রুত, অতি দ্রুত, আমার চারপাশের সমাজকে ও মানুষকে পালটে দিচ্ছে। পালটে যাচ্ছে আমার বাংলাদেশের মানুষ অনেক ভেতর থেকে।

চেনাজানা মানুষগুলো য্যানো পলক ফেলতে-না-ফেলতেই অচিন মানুষ হয়ে যাচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যামনটা হচ্ছে।' (ভূমিকা : আমার সময় আমার গল্প)[৬৯]

...সোহারাবের গল্প-ভাষা নির্মেদ, কিন্তু জীবনীশক্তিতে ভরপুর। তাঁর কথনের ভাষা এবং সংলাপের ভাষা আলাদা। কথনের ভাষা ঝরঝরে, গতিময়। সংলাপে পাই উত্তর চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের মাটির ভাষা। এভাষা চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। সোহারাব মুখের ভাষা সমেত তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীদের আস্ত তুলে এনেছেন। এজন্য তিনি কৃতিত্ব দাবি করতেই পারেন।[৭০]

সোহারাব হোসেনের একাধিক গল্পগ্রন্থের বেশ কয়েকটি ছোটোগল্পের মধ্যে বিশ্বায়নের প্রভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন 'রাজদূত রাজদূত', 'বাঙাল কিংবা বকনা', 'রাজেশ, রাজপুত্র এবং রাক্ষস', 'ম্যাজিক গাছ কিংবা মহানেতা', (*বোবাযুদ্ধ*, অভিযান, ফেব্রুয়ারি ২০০৮) 'কবির লড়াই', 'ভেন্ন কামধেনু' (*শ্রেষ্ঠ গল্প*, করুণা, বইমেলা ২০১০) ইত্যাদি।

'রাজদূত রাজদূত' (*গল্পগুচ্ছ*, শারদ ২০০৫) গল্পের ভাষারীতি কিংবা উপস্থাপনার মধ্যে নতুনত্ব দেখা যায়। এ গল্পের মধ্যে একদিকে যেমন মিশে থাকে রাজনীতি, অন্যদিকে এর অঙ্গীভূত হয়েছে মহাকাব্যচেতনা। তার পাশাপাশি গল্পে উঠে এসেছে আধুনিক প্রযুক্তির একাধিক অনুপুঙ্খ। চরিত্রের নামকরণ কিংবা উপস্থাপনার অভিনবত্বে এ গল্প ধরে রেখেছে বিশ্বায়নকে—

অতঃপর বস্-অবতার শলাকক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এবং উপস্থিত ফ্লপি সিডিদের অবাক করে দিয়ে শলাকক্ষের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিলেন। তারপর গমগমে গলায় কথা ছাড়লেন:

—ফ্লপি-নম্বর-অ্যাক দূতের কাজ ছাড়তে চাইছে না। পুনর্বহালের দাবি-সনদ ফাইল করেছে। ব্যাপারটা সংবিধান বিরোধী। তোরা কী বলিস ?

—আমরাও তাই বলি বস্ ! ফ্লপি-সিডিরা অ্যাকবাক্যে মান্যতা দ্যায়।

—চোপ্ শালারা ! রাজব্যক্তি হুংকার দ্যান— এটা কি জনসভা নাকি যে শোর মাচাচ্ছিস ?

—না বস্ !—ফ্লপি -সিডিরা মিইয়ে যায় !

—অ্যাক অ্যাক করে মত দে !—বস্-অবতার চাপা গর্জনে বলেন—শালো কি লেঙ্গিবাজি করতে চাইছে ? ফ্লপি-নম্বর-দুই, মত দে।

—না বস্ ! — ফ্লপি-নম্বর-দুই বলতে শুরু করে—এটা লেঙ্গিবাজি নয়। বৈকুণ্ঠ রাজদূত বংশের পয়দা। ভেতরের জবান হলো—বস্, ও তুবড়িরে বহুত পিরিত করে। দেহ গরম হলে তুবড়ির কাছে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়। অ্যাখন চাকরি গেলে তুবড়িরে পাবে না। মানবতার কারণে বস্ ওকে পুনর্বহাল করা হোক ![৭১]

ফ্লপি, সিডি ইত্যাদি নামকরণের মধ্যে দিয়ে এ গল্পে সময়ের যান্ত্রিকতা প্রকাশিত হয়েছে। মনুষ্যোচিত নামকরণ কিংবা আচরণকে পরিহার করে চরিত্রগুলিও হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক—

—বিভীষণ-বিভীষণ ! —বস্-অবতার মুখ ফসকে বৈকুণ্ঠের মুদ্রাদোষের অনুরণন তোলেন—ফ্লপি-নম্বর-চার সুইচ অন কর্। ঠিক পাঁচদিন আগে, বৈকুণ্ঠ-হারামজাদাকে আমার অ্যান্টি-মহারাজা-ব্যক্তির দরবারের একশো মিটারের মধ্যে দ্যাখা গিয়েছিল ক্যানো ? ও কি নতুন কিস্তি মাত করতে চাইছে ?

—না বস্। —ফ্লপি-নম্বর-চার নিজস্ব কমপিউটারে বিদ্যুৎ সংযোগ করে — দূত হিসেবে গেছিলো বস্ ! ওর ওপর দায়িত্ব ছিলো, বিগত নির্বাচনে মহারাজা-ব্যক্তির হয়ে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে, আপনার সঙ্গে ওপরে-বিবাদ ভেতরে-ইকড়ম্ নীতির রফার সেটেলমেন্ট করার। তার ওপর বস্, এই মহারাজা-ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম এগ্রিমেন্টটা আপনি বৈকুণ্ঠ মারফতই করেছিলেন। সেই সেটেলমেন্টে আপনার দেহ থেকে বস্, সমাজবিরোধীর দুর্গন্ধটা চলে গেছিলো।

—হুম্ ! —রাজব্যক্তি গলা খাঁকরানি দ্যান—সিডি-নম্বর-দুই, নাচ দেখি। বৈকুণ্ঠ সত্যি সত্যি কী চাইছে বল্ দেখি !

— না বস্ না, আপনি যেটা ভাবছেন তা নয়—সিডি-নম্বর-দুই কল পুতুল হয়ে নাচে—বরং ওকে বিদেয় করে দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অ্যাখন তো যে-কেউ বস্-অবতার হতে পারছে যখন-তখন। যে-কেউ বৈকুণ্ঠকে হাত করে নিজ দলে টেনে নিতে পারে।[৭২]

দেখা যায় এ গল্পে সংলাপে কিংবা চরিত্রের নামকরণে প্রযুক্তির প্রভাব উঠে আসে, যা কিনা তুলে ধরে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ের যান্ত্রিকতা এবং জটিল সমাজব্যবস্থাকে। এ গল্প পাঠককে কিছুটা হলেও মনে করায় রবীন্দ্রনাথের 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (আষাঢ়, ১২৯৯) নামক ছোটোগল্পটির কথা।

'কবির লড়াই' গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন এক কাল্পনিক রাজসভাকে। যেখানে রাজা তাঁর সভাকবি স্থির করার জন্য এক লড়াই আহ্বান করেন। সেখানে পুরানো সভাকবি নিজের স্থানটি অটুট রাখবার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। এতদিনের চাকরিটি বজায় রাখতে গেলে তাঁকে কাব্যে নতুন উপাদান প্রবেশ করাতে হবে। সেই উপাদানগুলিকে দিয়ে রাজসভার কাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আদিরস অর্থাৎ শৃঙ্গার-কে তুলে ধরতে হবে। তাতে রাজা এবং জনগণ—উভয়পক্ষই তুষ্ট হবেন। বজায় থাকবে পূর্বতন সভাকবির আসনটি। পাঠকের মনে পড়ে যাবে, মধ্যযুগের শেষদিকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে *অন্নদামঙ্গল* রচয়িতা ভারতচন্দ্রকে রচনা করতে হয়েছিল 'অমাবস্যার গান' আদিরসের আধার *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য, যা করতে হয়েছিল রাজসভায় তাঁর আসনটি টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। অন্তর সায় না দিলেও তা তিনি করেছিলেন। আর এই গল্পে কবি 'বাণিজ্যবর্ম দাস' নিজ আসন টিকিয়ে রাখার দায়ে আদিরসের কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে নিজের যৌবনবতী কন্যার স্নানরত অবস্থার দেহ-বর্ণনাকে তুলে ধরেন, সঙ্গে উঠে আসে বিশ্বায়নের চিহ্ন হিসাবে বহুজাতিক কোক-পেপসির মতো পানীয়ের কথা। ভোগবাদী সময়ের এই দুই উপকরণের উল্লেখে রাজা এবং জনগণ উভয়েই বাণিজ্যবর্মর জয়গান করেন এবং সভাকবি হিসাবে তাঁর স্থানটি সুদৃঢ় হয়। প্রকৃতপক্ষে এও হয়ে ওঠে এক কালো সময়ের গান। সেইসঙ্গে কবির 'বাণিজ্যবর্ম দাস' নামটি সময়ের নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজা নিজে হয়ে ওঠেন ভারত সরকারের প্রতিভূ। গল্পের অন্তরালে লেখক তুলে ধরেন বিশ্বায়নের অমাবস্যাকে—

ক্ষেপে উঠলেন বাণিজ্যবর্ম। তিনি কষে ধরলেন তাঁর শোলোক। বেশ তালে-তালে তিনি পড়লেন:

যৌবনের দুইটি ফল—যুবক যুবতি।
যৌনতার নেশায় রচে জাতীয় সংহতি॥
যুবতি নারীর দেহ রসরাজ্যের খাল।
প্রেমপাগল ছাওয়ালেরা চালাতেছে হাল॥
পেপসি-কোকের নেশায় তাদের জমে ওঠে চান।
যৌনতার গানে গানে ওড়ায় নিশান॥

শোলোক শেষ করে রাজকবি নতুন কবির দিকে একটা চোখ টিপে দিলেন। ... মহারাজ বাক্য দিলেন—'ওঠো নতুন কবি। এবার শেষ সুযোগ। বিষয়—নতুন পানীয়, পেপসি-কোক। পড়ো শোলোক।'...

...নতুন কবি বসতেই রসের ফুলুরি ছাড়লেন তিনি :

রসরাজের ঝোঁক। / পেপসি এবং কোক॥
খাও কোক-পেপসি। / দেখতে হবে সেকসি॥
পেপসি খেতে মগ্ন। / যুবতি দেহ নগ্ন॥
চানঘরের জল। / বক্ষে মধুফল॥
দেখলে বাড়ে বল। / এতো রসরাজের কল॥

রাজ সভাকবি বাণিজ্যবর্ম তাঁর ভাঁড়ারের শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করে শোলোক শেষ করতেই দলে দলে লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। ... রাজা ঘোষণা করলেন— "হে রসপিয়াসী দরবারিরা শুনুন। আমরা তিন বিচারক মিলে ঠিক করেছি, আজকে কবির লড়াইতে রাজকবি বাণিজ্যবর্ম দাসেরই জয় হয়েছে। ...আমি তাই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, বাণিজ্যবর্মই ফের রাজকবির আসনে অভিষিক্ত হল। এবং আমৃত্যু। আর, এই আনন্দে রসনগরে টানা সাতদিন উৎসব চলবে। উৎসব শুরু হবে এই মুহূর্ত থেকেই।"

রাজঘোষণা শেষ হতেই দলে দলে লোক রাস্তায় নেমে পড়ল। নগরের পথে পথে আলো জ্বলে উঠল। রাজকবির গাওয়া শোলোক তাদের কণ্ঠে—'যদি খাও পেপসি/দেখতে হবে সেকসি।'[৭৩]

এভাবেই এ গল্প তুলে ধরেছে বিশ্বায়নের পণ্যসংস্কৃতি-দ্বারা আক্রান্ত এমন এক সময়কে, যে সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজস্বার্থে পণ্য করে তোলে নিজ কন্যার সম্ভ্রম, নিভৃত মুহূর্ত কিংবা গোপনীয়তাকে। প্রকৃত পক্ষে এ এক অবক্ষয়িত সময়কেই তুলে ধরে।

'ভেন্ন কামধেনু' গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন ছয় ভিখারির কথা, যারা রোজ সকালবেলায় গান গেয়ে ভিক্ষা করে। দলে আছে দুই বুড়ো আর চার বুড়ি ভিখারিনি। অদ্ভুত তাদের গান, অদ্ভুত তাদের ভাষাভঙ্গি—

'একে অন্ন যাচি রোজ দিনমান।
ক্যাডবেরি লজেন খাবো টাটায় জাহান॥'[৭৪]

এহেন ভিখারির দলের সঙ্গে এক 'ভিডিওবাবু'-র দেখা হয়। তিনি ক্যাডবেরির বিনিময়ে তাদের ছবি তোলেন। এরপর একদিন তিনি তাদেরকে মহাশক্তিধর তেল, যা মাখলে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়, সেই তেল এবং এককালীন কিছু অর্থের বিনিময়ে তাদের নাচগানের আসরের ভিডিও তুলে টিভিতে সম্প্রচার করে দেন। এভাবেই ভিখারির দলটি সেলিব্রিটি হয়ে যায়। অন্যদিকে তাদের অজান্তেই তারা হয়ে যায় বিদেশি তেলের কোম্পানির মডেল। তাদের সেই অজানা তেল মাখা ও তারপর উদ্দাম নাচগানের অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখিয়ে বিক্রি হতে থাকে বিদেশি কোম্পানির তেল। এরপর ঘরে ঘরে ভিক্ষা করতে গেলে লোকে আর তাদের ভিক্ষা দেয় না, কারণ তারা এখন সেলিব্রিটি হয়ে গেছে। তাদের ভিডিও টিভিতে দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ মনে করে এতে তারা অনেক টাকা পাচ্ছে। আর এইভাবে বন্ধ হয়ে যায় ভিখারিদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। ভিখারিরা এর কিছুই প্রথমত বুঝতে পারে না। অন্যদিকে অল্পদিনের সুবিধা দিয়ে তাদের ভিডিও বিক্রি

করে দিয়ে মুনাফা অর্জন করে সরে পড়ে 'ভিডিওবাবু'। পরে তার কাছে পৌঁছাতে পারলেও সে ভিখারিদেরকে আর কিছু দিতে অস্বীকার করে। ফলস্বরূপ তাদেরকে সেই এলাকা থেকে পাততাড়ি গোটাতে হয়। এ গল্প চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কীভাবে পুঁজি সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে মুনাফার কাজে লাগায় এবং কাজ শেষ হয়ে গেলে তাদের কথা আর ভাবার কেউ থাকে না। বন্ধ হয়ে যায় তাদের জীবনধারণের মাধ্যমগুলি—

> কঙ্কেদের দলটা অবাক হয়ে দেখে তালগাছের মাথা থেকে নেমে আসছে কালকের সেই ক্যাডবেরি সাহেব। নেমেই সে সবার হাতে একটা করে পারফিউমের শিশি দেয়। বলে—'এই নাও মহাশক্তিধর তেল। গায়ে মালিশ করবে। করলে তোমরা যৌবন ফিরে পাবে। নাচে জোর পাবে। যাও সব্বাই বাড়ি গিয়ে তেল মেখে নাচ করো গে।'[৭৫]

কথা মতো সবাই মিলে নাচ শুরু করে সেই রাতে। উদ্দাম সংগীত সহযোগে সেই নাচ চলে বহুক্ষণ। সাময়িকভাবে বয়সকে যেন ভুলে যায় তারা—

> সেদিন রাতে কঙ্কে বুড়ির কুঁড়েতে ছ-টা চাঁদের উদয় হয়। একটু শীত-শীত ভাব। চাঁদগুলো টা উপেক্ষা করে। হাতে-পায়ে-সারা-গায়ে সেই অলৌকিক তেল মাখে তারা। মেখে তেতে ওঠে। তারপর নাচ শুরু করে। 'ঝুম্মা চুমা দে' 'প্যার-দে প্যার-দে' 'জিলে-লে জিলে-লে' 'কালে হ্যায় তো কেয়া হুয়া দিলবালে হ্যায়' ইত্যাদি তুখোড় তালে-তালে দলটা পুরোপুরি জীবনের উষ্ণতায় মেতে ওঠে। মাতনের মাথায় চাপতে-চাপতে তারা আবারো কিছু বিদ্যুৎকে চমকাতে দেখে। বেশ কয়বার। ভ্রূক্ষেপ করে না। তারা নাচতে থাকে। মাতালের মতন। চ্যাংড়ার মতন—চেংড়ির মতন। যতক্ষণ-না তাদের বুড়ো হাড় ও পেশি শ্রান্তিতে এলিয়ে পড়ে ততক্ষণ চলে এক অবিশ্বাস্য নাচগানের মহা আসর। এবং মজা। পরদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে তারা দেখে—গোছা-গোছা টাকা পড়ে রয়েছে তাদের মাথার কাছে। তারা চমকে ওঠে—'ভিডুয়াবাবু দে গেছে। বোধ হয় ছবি তোলার জন্যিতি।'[৭৬]

পুঁজি তাদের এই স্বাভাবিক আনন্দের প্রকাশকে পণ্য বানিয়ে ফেলে। বিনিময়ে দিয়ে যায় এককালীন কিছু অর্থ। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা তাদের জীবন জীবিকায় প্রভাব ফেলে। তাদের আচরণের স্বতঃস্ফূর্ততাকে বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করা হয়—

> দলটাকে অবাক করে দিয়ে ভিডিওবাবু তার নাড়ি-পাকানো তারঘরে ঢোকে। পিছনে দলটা। ভিডিওবাবু পটাপট বাক্সের গায়ে তার ঢোকায়। বোতাম টেপে। শোঁ-শোঁ শব্দ হয়। আর বাক্সের পেটে ভেসে ওঠে তাদের সেই মহা-নাচগানের আসর। ক্যাডবেরি খাওয়ার দৃশ্য। দুই-বুড়ো চার-বুড়ির চোখ দাঁড়িয়ে যায়। রঙিন-রঙিন দেহ তাদের। নিজেরাই চিনতে পারছে না। আর নাচের সে কী বাহার। ঘাড় বেঁকিয়ে, মাজা দুলিয়ে, পা ঠুকে, বুক নাচিয়ে, নাচছে মেহের-লঙ্কাপতি-হাসি-চ্যাটাই-কিসমত। নাচ থামিয়ে তারা তেল মাখছে। তারপর আবার নাচ। এবং মজার কাণ্ড—নাচতে-নাচতে তারা যুবক-যুবতি হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই এখন তাদের বিশ-পঁচিশের যৌবনে। কী চেহারা ! কী যৌবন ! কী সুখ কী সুখ ! শর্টপ্যান্ট-পরা-বডিস-পরা তাদের কী মাদকতা। তারা নাচছে। নাচতে-নাচতে সেই মালিশ তেলের বোতলগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে। আর সেই বোতলগুলোর দখল নেবার জন্য সারা বালুরঘাটের যুবক-যুবতিরা বোতলগুলোর ওপর হামলে পড়ছে। হুল্লোড় করছে।[৭৭]

প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বাভাবিকতাকে পুঁজি তার পণ্যে পরিণত করে। তাকে ব্যবহার করে নিজস্ব মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে। এর ফলে সেইসব মানুষের জীবনধারণের পন্থাসমূহ নির্মূল হয়ে গেলেও পুঁজি তার দায়িত্ব গ্রহণ করে না। অন্যদিকে বিশ্বায়িত পৃথিবীতে স্থানিক বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে মুছে যায়। গল্পকার সোহারাব হোসেন এইভাবেই তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে বিশ্বায়নের প্রভাবকে তুলে ধরেছেন।

৭.১২॥ **অরিন্দম বসু**

বর্তমান সময়ের বাংলা ছোটোগল্পের জগতে এক ভিন্ন জীবনদর্শনের লেখক অরিন্দম বসুর জন্ম ১৯৬৭ সালে কলকাতায়। তাঁর গল্প লেখার সূত্রপাত ১৯৯৫ সালের শেষদিক থেকে।[৭৮] সময়ের

নিরিখে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার কিছু পরেই তাঁর ছোটোগল্পের জগতে প্রবেশ। শৈশবের কিছু সময় কেটেছে অসম, বিহার এবং আসানসোলে। প্রথাগত শিক্ষা স্নাতক পর্যন্ত। একসময় দল গড়ে নাটক, সেলসম্যানের চাকরি, নানা ব্যবসাও করেছেন। পেশাগত ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে চিত্রশিল্পীর চাকরি দিয়ে শুরু। তারপর বারো বছরেরও বেশি সময় কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমে সাংবাদিকতা। সম্পাদনা করেছেন একটি বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। বর্তমানে স্বাধীন বৃত্তিতে যুক্ত। লেখালেখির শুরু চব্বিশ বছর বয়সে। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত আটটি উপন্যাস, দেড় শতাধিক গল্প ও একটি ভ্রমণকাহিনি। প্রকাশিত গ্রন্থ বারোটি। ছোটোদের জন্যও গল্প লিখেছেন। অনুবাদ করেছেন অন্য ভারতীয় ভাষার গল্প। গল্পের জন্য পেয়েছেন ‘গল্পসরণি’ ও ‘গল্পমেলা’ পুরস্কার। উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন ‘পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি’র পুরস্কার, ‘নমিতা চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পুরস্কার’, নবীন সাহিত্যিক হিসেবে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’-এর পুরস্কার।[৭৯]

তাঁর গল্পে উঠে এসেছে বদলে যাওয়া সংস্কৃতি, ‘পাড়া’ নামক ব্যবস্থাকে ভেঙে দ্রুত গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাট-কেন্দ্রিকতা কিংবা আবাসন সংস্কৃতি, বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে ক্ষুদ্র পুঁজির লড়াই, ক্রমাগত ক্ষুদ্র পুঁজির হেরে যাওয়া, যুবকদের কর্মহীনতা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অর্থের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারার কারণে প্রেমের মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অপমৃত্যু, ধুঁকতে থাকা সরকারি ব্যবস্থাপনা আর তার বিপরীতে পুঁজিনির্ভর বাণিজ্য অর্থনীতির দ্রুত অগ্রসরণ, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির জন্মগ্রহণ ইত্যাদি বহু অনুপুঙ্খ। সেই সঙ্গে প্রযুক্তি-জগতের দ্রুত ঘটে যাওয়া বদলগুলিও উঠে এসেছে তাঁর লেখা গল্পে। *আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, সানন্দা, বর্তমান, মাতৃশক্তি, প্রতিদিন* কিংবা *সৃষ্টির একুশ শতক*-এর মতো বহু পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এই গল্পগুলি থেকে খুঁজে নেওয়া যায় বিশ্বায়নের বিভিন্ন মাত্রাকে। গল্পকার অরিন্দম বসুর এইধরনের

কয়েকটি ছোটোগল্প হল—'হাড়মাস', 'কালপুরুষ', 'পুনশ্চ', 'স্বপ্ন উপত্যকা', 'কুড়ি নম্বর লোক' ইত্যাদি।

'হাড়মাস' (শারদীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*) গল্পে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের দিকটি উঠে এসেছে। একই গোস্বামী পরিবারের তিনভাই ভালো চাকরি করে, ভালো থাকে, আলাদা খায়, কিন্তু ছোটোভাই পল্টু দালালি করে সংসার চালায় স্ত্রী সন্ধ্যা আর শিশুপুত্রকে নিয়ে। তার জীবনসংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। তার ঘর আলাদা, দাদাদের বিরোধিতায় কারেন্টও নিতে দেয়নি তাকে। শিশুপুত্রটি মেঝেতে শোয়। অনেক কষ্টে পল্টু একটি খাট জোগাড় করার চেষ্টা করলেও তা শেষপর্যন্ত সম্ভব হয় না। অন্যদিকে দালালির পেশাতেও উঠে এসেছে তীব্র প্রতিযোগিতার বিবরণ। নতুন গড়ে ওঠা ফ্ল্যাটবাড়ি বিক্রি কিংবা ভাড়া দেওয়া নিয়ে সেখানেও প্রবল প্রতিযোগিতা উঠে আসে। এ গল্পে সেই প্রতিযোগিতায় পল্টু হয়ে ওঠে হেরে যাওয়া মানুষের প্রতিনিধি। সেই হেরে যাওয়ার সূত্র ধরেই এ গল্পে এসেছে অদৃষ্ট নির্ভরতা। অন্যদিকে এ গল্পে উঠে এসেছে দ্রুত নগরায়ণ কিংবা প্রযুক্তির প্রসার—

> নতুন দোকান, মার্কেট কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট বেহালাকে জমিয়ে দিয়েছে। খেয়াল করে দেখেছে পল্টু এতদিন এইসব এলাকা যা শহরতলি ছিল তার ফাঁকফোকরে গজিয়ে উঠছে ওনারশিপ ফ্ল্যাট। এস টি ডি-আই এস ডি বুথ। জেরক্স। বিউটি পার্লার আর কমপিউটার সেন্টার।
>
> সারাদিন ধরে কলকাতাকে ফ্রাই করে এই সাড়ে পাঁচটায় চায়ের দোকানের সামনে থেকে পিছু হঠছিল রোদ। সেদিকে তাকিয়ে পল্টু প্রমোদকে বলল, 'আচ্ছা প্রমোদ, এই যে আমরা এতসব জমি জায়গা, পুকুর, ঘরবাড়ি বেচে দিচ্ছি, এসব কি ঠিক হচ্ছে? ধর আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি আর থাকার জায়গা না পায়।'[৮০]

তবে শুধু বিশ্বায়নের নিছক বিবরণই নয়, গল্পটিতে পল্টু নামক হেরে যাওয়া চরিত্রটির মাধ্যমে উঠে এসেছে এই ব্যবস্থার প্রতি একধরনের জিজ্ঞাসা, প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা মানুষের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে, নাকি তা কেবলই প্রসারিত হবে আর সমস্যাসমূহ হয়ে উঠতে থাকবে ক্রমবর্ধমান। প্রশ্নগুলি বজায় রেখেই এ গল্পে জাগরূক থাকে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হেরে যাওয়া এক হতভাগ্য পিতা এবং আরও বেশি করে অর্থনৈতিক শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়া সমাজ—

মাদুরের ওপর বাবলু একতাল কাদা। সন্ধ্যার কোমরের কাছে হাত দিতেই উঁচু হয়ে থাকা হাড় ঠেকে। সন্ধ্যা আরও রোগা হল ? তাহলে তো বাবলুর পাঁজরও গোনা যাবে পরিষ্কার।

'কাল পয়লা বৈশাখ। বাবলুর জন্য একটা জামা—'

পল্টু মুখ বুজে থাকে। জামা নয়, শাড়ি নয়, আমাদের গায়ে একটু মাংস দরকার সন্ধ্যা। বাবলুর রোগা চিবুক, তোমার কনুই, কোমরের হাড় ভ্যানিশ হয়ে যাবে—ততটুকু মাংস।

একটু পরে হাওয়ার ঝটকায় পর্দা খসে যায়। সন্ধ্যার বুকের ওপর থেকে মুখ তুলতেই পল্টু ধবধবে চাঁদের মুখোমুখি। শাড়ি, শায়া সব বুকের কাছে নিয়ে সন্ধ্যা ছিটকে সরে যায়। ঘন অন্ধকার খোঁজে।

পল্টু ছাতে গিয়ে চাঁদের দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। চারপাশের বাড়িগুলো জোছনায় মোলায়েম দেখাচ্ছে। গাছ, মাঠ, ওয়্যালেসের টাওয়ার—সব। যেন সিমেন্টের বাগান। সকালে এগুলোকে হাড় পাঁজরার মতো দেখায় কেন ? কলকাতাও কি রোগা হয়ে যাচ্ছে তাহলে। সেই কলকাতাকেই ছাল ছাড়িয়ে কেটেকুটে বিক্রি করে দিচ্ছি আমরা? কলকাতার গায়েও মাংস লাগা দরকার তবে।

মানুষের শোয়া-বসা থাকা-খাওয়া আড়ালের জন্য এতসব ঘরবাড়ি। ওইসব বাড়ির অনেক ঘরে নীল আলো। পাখার হাওয়ায় ফুলে উঠেছে মশারি। ওইসব মানুষ ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। বাজারে ভালোমন্দ কেনে। রুমালে মুখ মোছে। জুতো চকচকে রাখে। মাঝেমধ্যে বেড়াতে যায়। সব গোছানো। একেই বলে ভাগ্য ?[৮১]

পুঁজিনির্ভর সমাজব্যবস্থার বৈষম্যের দিকগুলি এ গল্পে এইভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'কালপুরুষ' (*জলার্ক*) গল্পটিতে লেখক তুলে ধরেছেন বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে ক্ষুদ্র পুঁজির টিকে থাকার অসম লড়াই। এ গল্পে সন্তোষ এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যুবক। ছোটো কোম্পানির কাছ থেকে বিভিন্ন পণ্য কিনে সে সাপ্লাই করে একাধিক দোকানে। তার আনা পণ্যগুলি অতটা ঝাঁ চকচকে নয়। টিভিতে কিংবা খবরের কাগজে সেগুলির বিজ্ঞাপন হয় না। তাই সেগুলি বড়ো কোম্পানির পণ্যের মতো দ্রুত বিক্রি হয় না। অন্যদিকে মানুষ পণ্য কেনে টিভি কিংবা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে। তাই সন্তোষ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে থাকে। তার আনা পণ্য অবিক্রীত থেকে যায়। দোকান থেকে পণ্য বিক্রির কোনো টাকা সেভাবে সে পায় না। এরফলে একসময় অর্থনৈতিকভাবে হেরে যাওয়া এই যুবকটির কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে তার প্রেমিকাও। এভাবেই এ গল্পে লেখক সেই ধরনের মানুষের এক প্রতিনিধিকে এ গল্পে তুলে ধরেছেন, যারা বিশ্বায়নের পুঁজির লড়াইতে হেরে গিয়েছে। বিশ্বায়ন যাদের বেঁচে থাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্নগুলিকে ভারি রোলারের মতো পিষে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে তার আগ্রাসী অভিযানে—

> ওরা টিভি স্টেশনের পাশের রাস্তায় চলে এসেছে। এখানে একটা পার্ক আছে। বসা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু ছেলে দল বেঁধে এসে উৎপাত করে। ওরা সেদিকে গেল না। সন্তোষ টিভি স্টেশনের দিকে তাকিয়ে ছিল। যাবে একবার ভেতরে ? গিয়ে বলে আসবে—সামনের মাস থেকেই আমাদের জ্যাম জেলি আচার আর ভিনিগারের বিজ্ঞাপন কিন্তু শুরু হবে। কোনো কোম্পানি আর দাঁড়াতে পারবে না। আমি—সন্তোষ বিশ্বাস—নিজেই বিজ্ঞাপন দেব। একটা সুখী পরিবারের ছবি। শেলী তার ছেলে আর মেয়েকে ব্রেকফাস্টে পাঁউরুটিতে মাখিয়ে দিচ্ছে মিক্সড ফ্রুট জ্যাম। গোছানো রান্নাঘরে সাজানো জ্যাম জেলি আচারের বোতল। সঙ্গে বাজবে নামী গায়িকার গাওয়া জিংগল। হু হু করে বিক্রি বাড়বে কোম্পানির। সঙ্গে সন্তোষেরও।[৮২]

বিশ্বায়নের পুঁজি প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতমের উদবর্তনকে প্রতিষ্ঠা করে। তাই সন্তোষের কল্পনার স্বপ্নগুলি কখনোই বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে না। এমনকি তার পছন্দের নারীকেও নিয়ে চলে যায় কোনও এক যোগ্যতম—

> ওরা দুজন চলে গেল খানিক পরেই। মানস আর সন্তোষ হাঁটছিল। পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করল মানস। 'শেলীর খবর কী রে ?'
>
> 'নতুন খবর আর কী হবে।'
>
> 'আছে বলেই তো বলছি। খবর একটু-আধটু রাখ এবার। সেদিন দেখলাম ওদের পাড়ার মন্টুর বাইকের পেছনে।'
>
> 'বাইকে ! মন্টু কে ?'
>
> 'বাব্বা, মন্টু এখন ওদের এরিয়ায় প্রোমোটারদের ইট-বালির সাপ্লায়ার। উন্নতি করছে হেভি। দেখবি নিজেই একদিন প্রোমোটার হয়ে যাবে ঠিক। দারুণ সেজেছিল মাইরি শেলী। এই অব্দি কাটা কামিজ পরেছে একটা।' মানস নিজের বুকের মাঝখান অব্দি আঙুল ঠেকায়।
>
> সন্তোষের মুখে তেতো কষ উঠে আসছে। হতে পারে সিগারেটের জন্য। মনে হয় তার—শেলীও কি তাহলে নিজের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বিজ্ঞাপনেই কি সব চলে তাহলে ?[৮৩]

এইভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন পণ্যে পরিণত হয়। কিন্তু সেই পণ্যের পৃথিবী দ্রুত হারিয়ে ফেলে মানবিক সম্পর্কগুলিকে। তুলনায় দুর্বল মানুষ প্রতিযোগিতা থেকে দ্রুত হারিয়ে যেতে থাকে—

> সন্তোষের মাথার ভেতরে অনেক কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। সেভাবেই সে সাইকেল চালাতে চালাতে লক্ষ্মীনারায়ণ স্টোর্সের সামনে গিয়ে নামে। তারপর একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। টেম্পো-ভ্যান থেকে বড়ো কোম্পানির মাল নামাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটরের লোক। গায়ে মাখার সাবান, পেস্ট, আফটার শেভ লোশন, স্যানিটারি ন্যাপকিন, নুডলস। জ্যাম জেলি টমেটো সসের বোতলে চোখ আটকে যায় সন্তোষের।

তাজা ফলের ছবি। আম, আনারস, কমলালেবু, আঙুর—যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। আর তার ব্যাগের ভেতরে ভরা বোতলের লেবেলে ম্যাড়মেড়ে রঙে ছাপা শুধু ব্র্যান্ডনেম।[৮৪]

একদিকে বিশ্বায়নের ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপনের পৃথিবী আর অন্যদিকে দুর্বলের হারিয়ে যাওয়ার কাহিনিকে এ গল্পে পাশাপাশি তুলে ধরেন লেখক।

'স্বপ্ন উপত্যকা' (*সৃষ্টির একুশ শতক*) গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন বিশ্বায়ন পরবর্তীকালীন ফ্ল্যাটকেন্দ্রিক আবাসন শিল্পের বিকাশ এবং মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষের সেই পণ্যজগতের ক্রেতা হয়ে ওঠার কক্ষপথকে। এ গল্পে উঠে আসে পেশায় রেজিস্ট্রি অফিসের বড়বাবু তপন চাকলাদারের কথা, চাকরির পাশাপাশি অসাধু উপায়ে যাঁর প্রচুর উপার্জন। তিনি নিজস্ব বাড়ি, গাড়ির পর এবার ফ্ল্যাট কিনতে প্রয়াসী হয়েছেন, সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী এবং শ্যালক। প্রকৃতপক্ষে আবাসন কোম্পানিগুলি শুধুই ফ্ল্যাট বিক্রি করে না, তার পাশাপাশি তারা আসলে বিক্রি করে একটি স্বপ্ন, যে স্বপ্ন মধ্যবিত্তকে তার প্রতিবেশকে অতিক্রম করে উচ্চবিত্ত এবং আরও সুখী আর নির্ভার জীবনের দিকে চালিত করার হাতছানি দেয়, এ গল্পে সেই সত্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। অন্যদিকে এ গল্পে তিনি তুলে ধরেছেন অসততার অর্থের প্রাবল্যের বিপরীতে পুঁজির প্রতি একরকম প্রতিস্পর্ধাকে, বিকাশ নামের এক নিরাপত্তারক্ষীর চরিত্রের মাধ্যমে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিরাপত্তারক্ষীর চাকরি করতে আসা বিকাশ কোনোমতেই তপন চাকলাদারের দেওয়া বকশিশ গ্রহণ করে না। লেখক এভাবেই তাঁর গল্পগুলিতে রেখে যান কিছু মৃদু এবং অনুচ্চ স্বর, যারা প্রয়োজনবোধকে সীমিত রেখে অস্বীকার করতে চায় এই অর্থচালিত পণ্যভুবনকে—

মানব বলল, 'আপনাদের ওই কমপ্লেক্সের বিজ্ঞাপনে তো কলকাতা ছেয়ে দিয়েছে। ড্রিম ভ্যালি। স্বপ্ন উপত্যকা। নামটা কিন্তু দারুণ।'

'আরে জায়গাটাও দারুণ। যাচ্ছ তো, দেখতে পাবে। ওটা আগে ছিল কারখানা। এরা একেবারে ভোল পালটে দিয়েছে। চারতলা থেকে শুরু করে চোদ্দতলা পর্যন্ত অ্যাপার্টমেন্ট হচ্ছে। গোটা কমপ্লেক্সে ষোলোশো ফ্ল্যাট। আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যাস লাইন, শপিং মল, জিম, কমিউনিটি হল, পার্ক, মন্দির, সুইমিং পুল—কী নেই ! তাছাড়া মাঝখানে মাঝখানে ছোটো ছোটো ওয়াটার বডি থাকবে। আমাদের জন্য একদম আলাদা একটা দেশ। একেবারে স্বপ্নই বুঝলে। ড্রিম ভ্যালি !'

ঠোঁটের কানাচে হাসিটা দেখতে দিল না মানব। বলল, 'স্বপ্নের কত দাম পড়ছে তপনদা? 'সিক্সটিন, ষোলো লাখ ! আমি তো পার্কিং স্পেসের জন্যেও অ্যাপ্লাই করেছি। এক্সট্রা আরও দু-লাখ। তাই নেব শালা !'

মানব চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আপনাদের বৈষ্ণবঘাটার বাড়িটা কী হবে ?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মানবের দিদি বলে উঠল—'ওখানে আমি থাকব। ও বাড়িও তো বলতে গেলে ওর পয়সাতেই তৈরি। শ্বশুর-শাশুড়ি তো আর নেই। ফ্ল্যাট যদিও আমার নামে কেনা হচ্ছে কিন্তু আমি বলে দিয়েছি, বাড়ি আমার, ফ্ল্যাট তোমার। ছেলে আমার, মেয়ে তোমার।'[৮৫]

উন্নত জীবনযাত্রার হাতছানি এইভাবেই পূর্বতন গৃহের পরিসর ছেড়ে ফ্ল্যাট কিংবা আবাসনের দিকে চালিত করেছিল মানুষকে। পরিবর্তন ঘটেছিল মূল্যবোধের—

তখন তপন চাকলাদারের দিকে সিকিউরিটির একজন তিনটে হলুদ রংয়ের হেলমেট বাড়িয়ে ধরছিল। তিনি বললেন, 'হেলমেট মাথায় দিতে হবে ? আজ কি কাজ হচ্ছে নাকি ? আজ তো মে ডে ! ছুটির দিন !'

সিকিউরিটি একটু হেসে বলল, 'আমাদের এখানে স্যার ছুটি বলে কিছু নেই। সব দিনই কাজের দিন। আজ অবশ্য কাজ কম। তবু এদিক-ওদিক হচ্ছে তো। তাছাড়া এটা নিয়ম স্যার। আপনি তো এসেছেন আগে, জানেন, আপনাদের হেলমেট না দিলে আমাদের কথা শুনতে হবে।'[৮৬]

বিশ্বায়ন এইভাবেই যে শ্রমিকের অধিকারকে সংকুচিত করেছিল, মে দিবসে ছুটি না থাকার মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বায়িত পৃথিবীতে শ্রমিকের অবসরকেও কেড়ে নিয়ে পুঁজি

এইভাবেই উৎপাদনবৃদ্ধিতে কাজে লাগিয়েছে। তার শ্রমকে চুরি করে তৈরি করতে চেয়েছে ‘স্বপ্ন উপত্যকা’—

> হলঘরের বাঁদিকের দেওয়ালে ঢাউস পোস্টার। সেখানে গাছপালা ঘেরা জায়গায় শতরঞ্চি পেতে বসে পিকনিক করছে কয়েকজন। পাশের ছবিতে ছেলেকে নিয়ে সুইমিং পুলে বাবার সাঁতার। তার পাশে টেনিস কোর্টে সার্ভ করছে মিনিস্কার্ট পরা মেয়ে। তারও পাশে একটা ছেলে ব্যায়াম করছে জিমনাসিয়ামে। সকলের মুখেই হাসি। ড্রিম ভ্যালিতে সকলেই খুশি। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড টেবিলে কাচের বাক্সের ভেতরে ড্রিম ভ্যালির মডেল। মানব তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আসলে যা যা থাকবে তার সবই রয়েছে এই নকলে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট এমনকি ছোটো ছোটো গাড়ি অবধি নিখুঁত সাজানো।[৮৭]

এই স্বপ্ন উপত্যকার আড়ালে বিশ্বায়ন সব কিছু কিনে নিতে চায় অর্থের দাঁড়িপাল্লায়। তবু কিছু কিছু মানুষ তাদের সামান্য ক্ষমতার সর্বশক্তি দিয়ে গড়ে তুলতে চায় প্রতিরোধ—

> বিকাশ মাথা নাড়ছে জোরে জোরে। ‘না না, আমার কিছু লাগবে না স্যার। আমি আমার কাজ করেছি। মাইনের বাইরে আমাদের কোনো টাকা নেওয়ার নিয়ম নেই স্যার।’
>
> চাকলাদারের মুখ শক্ত হয়ে উঠল। এবার শালার কাছে চলে গেলেন তিনি। ‘খুব নিয়ম দেখাচ্ছে ছেলেটা। যেন জীবনের কোনোদিন কারও কাছ থেকে টিপস নেয়নি। দেখবে ? কুড়ির বদলে পঞ্চাশ দিলে এক্ষুনি ল্যা ল্যা করে নিয়ে দৌড় দেবে।’ বলেই এবার নিজের পার্স খুলে টাকাটা বের করলেন তিনি। ‘নাও ধরো, এবার হয়েছে তো ? কেউ জানতেও যাচ্ছে না কথাটা।’
>
> বিকাশ হাত দুটো পিছনে নিয়ে ফেলল। ‘না স্যার, সেজন্যে নয়। আমি কারও কাছ থেকেই নিই না স্যার।’[৮৮]

লেখক স্বপ্ন দেখেন এভাবেই। হয়তো কিছু মানুষ এইভাবেই প্রত্যাখ্যান করবেন বিশ্বায়নের আগ্রাসনকে।

‘কুড়ি নম্বর লোক’ (*আজকাল*) গল্পটিতে উঠে এসেছে অজয় নামক একটি কেরানি চরিত্র। সামান্য বেতনে একটি কোম্পানিতে সে চাকরি করে। সৎভাবে কষ্ট করে সংসার চালায়, কোনো নেশাভাঙ করে না। অন্যের জিনিসে লোভ করে না। এক বিকালে তাকে ধরে একটি মদ কোম্পানির কিছু এজেন্ট। তাকে অনুরোধ করে তাদের কোম্পানির সদ্য চালু হওয়া মদ বিনামূল্যে খেয়ে দেখতে। এর বিনিময়ে সে পাবে একটি কাচের গেলাস। তার মনে পড়ে যায়, তার বাচ্চা মেয়েটি একদিন কাচের গেলাসে দুধ খেতে চেয়েছিল। অবশেষে রাজি হয় সে। কোম্পানির সেদিনের লক্ষ্য ছিল কুড়িজন ব্যক্তিকে তাদের পণ্যটি খাওয়ানোর মাধ্যমে প্রচার করার। অজয় ছিল সেই কুড়ি নম্বর ব্যক্তি। এইভাবে একজন নেশাহীন ব্যক্তিকে মদ্যপায়ী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করে কোম্পানির এজেন্টরা। তাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়া হয় যে, সে এরপর থেকে মদ খাবে এবং ওই কোম্পানির মদই খাবে। এরপর তার হাতে তুলে দেওয়া হয় উপহারের কাচের গেলাসটি। সেটি হাতে নিয়ে নেশাতুর অজয় আর বাড়ি ফিরতে পারে না। গেলাসটি তার হাত থেকে ফুটপাথে পড়ে ভেঙে যায়। মেয়ের কাছে আর সেটি নিয়ে পৌঁছানো হয় না তার। ফুটপাথে বমি করে সেখানেই পড়ে থাকে অজয়। এ গল্প বিশ্বায়নের পণ্য সংস্কৃতি মানুষকে ব্যবহার করে কীভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সেই সত্যকেই তুলে ধরেছে অব্যর্থভাবে—

> ওরা তাকে ঘিরে ধরল প্রায়। ‘স্যার প্লিজ, রিফিউজ করবেন না। সত্যি কথা বলব স্যার ? আমরা তো ওই কোম্পানিতে চাকরি করি না। আমরা স্যার এজেন্সির লোক। এজেন্সিই ব্যাপারটা অ্যারেঞ্জ করেছে। আমাদের বলেছে কুড়ি জনকে জোগাড় করতে। ওই কোটা কমপ্লিট করতেই হবে। উনিশ জনকে পেয়ে গেছি। আর একজনের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আপনিই সেই কুড়ি নাম্বার স্যার। সাড়ে সাতটা থেকে ড্রিংক সার্ভ করা শুরু হবে। আপনাকে না নিয়ে যেতে পারলে ওরা ওদের কাজ করে বেরিয়ে যাবে। আমরা কিছু পেমেন্ট পাব না। প্লিজ, আমাদের একটু হেল্প করুন স্যার।’[৮৯]

বিশ্বায়ন প্রকৃতপক্ষে চায় বাজার। আর সেই কারণে মানুষকে তারা কল্পনা করে শুধুমাত্র ক্রেতা হিসাবে। সেই বাজার দখলের সংস্কৃতির প্রতি কোনও মানুষের সাময়িক অনুকম্পা তৈরি হলেও তার পরিণাম হয়ে ওঠে ভয়াবহ—

> কাগজে জড়ানো কাচের গেলাসটা বুকের কাছে নিয়ে হাঁটছিল অজয়। বেরোতে না বেরোতেই পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। চোখের পাতা ভারী। পেট গুলিয়ে উঠছে। মুখের ভেতর পাক খাচ্ছে তেতো থুতু। রাস্তার ধারে উবু হয়ে বসে পড়ল সে। ওয়াক উঠছে। কিন্তু বমি হচ্ছে না তো। এই মদ কি বের করে দেওয়া যায় না ? উঠে দাঁড়াতেই ঠনাৎ করে শব্দ হল জোর। হাতে যে গেলাসটা ছিল মনেই রাখেনি। রাস্তায় ছড়িয়ে গিয়ে কাচের টুকরোগুলো অজয়ের চোখে আবছা হয়ে আসছিল।
>
> তার ঠিক পিছনেই তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল অনেক সাদা জামা কালো প্যান্ট। ওরা গাড়িতে মাল তুলছে। কথা বলছে। হাসছে। তাদেরই কেউ একজন আঙুল তুলে অজয়কে দেখাল। রাজীব বলল, 'ইটস ও কে। ওদিক কেউ যাবে না। ওর ব্যাপার ওকে বুঝতে দাও। ওখানে আমাদের কোনো কাজ নেই। আমাদের কাজ শেষ।'
>
> ওরা অজয়কে রেখে চলে যাচ্ছিল।[৯০]

পুঁজি মানুষকে এইভাবে ব্যবহার করে। নিঃস্ব, রিক্ত, শোষিত মানুষের কথা পুঁজি কখনও ভাবে না। এই গল্পে সেই কথাই তুলে ধরেছেন লেখক। আর এভাবেই তাঁর একাধিক ছোটোগল্পের মাধ্যমে বিশ্বায়ন নামক ব্যবস্থাটির স্বরূপকে তুলে ধরেছেন লেখক অরিন্দম বসু।

৭.১৩॥ **নীহারুল ইসলাম**

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী লেখক নীহারুল ইসলাম। তাঁর জন্ম **১২** ফেব্রুয়ারি **১৯৬৭**, মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির হরহরি গ্রামে (মাতুলালয়)। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। পেশায় শিক্ষা সম্প্রসারক।

নব্বইয়ের দশকের প্রথম থেকেই তাঁর লেখালেখি শুরু। এপর্যন্ত তিন শতাধিক ছোটোগল্প লিখেছেন তিনি। সম্মানিত হয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কারে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক 'ইলা চন্দ স্মৃতি পুরস্কার' (২০১০), *ট্যাকের মাঠে মাধবী অপেরা* গল্পগ্রন্থটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত 'সোমেন চন্দ স্মারক পুরস্কার' (২০১০), কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি-র 'শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পকার সম্মাননা' (২০১৩) সহ নানা পুরস্কারে সম্মানিত। তাঁর শৈশব-যাপন মাতুলালয়ে। তারপর, ১৯৮৫ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সীমান্ত শহর লালগোলায় বসবাস।[৯১]

কলকাতা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও লেখকের বসবাস কলকাতা থেকে দূরে, মুর্শিদাবাদে। তাঁর লেখা একাধিক ছোটোগল্পের ভূগোল হিসাবেও উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা। উঠে এসেছে পদ্মা নদীর কথা কিংবা বারবার তাঁর ছোটোগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে ভারত-বাংলাদেশ 'বর্ডার'। সেইসূত্রে উঠে এসেছে চোরাচালান, গরুপাচার, স্মাগলিং, উগ্রপন্থী কার্যকলাপের মতো একাধিক বিষয়। এর পাশাপাশি তাঁর ছোটোগল্পের জগতে একাধিকবার জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বায়ন, কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো পরোক্ষে। তবে একথা পুনর্বার মনে রাখা যেতে পারে যে, কলকাতাকেন্দ্রিক ছোটোগল্পের বৃত্তে বিশ্বায়ন যে যে বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়েছে, সুদূর মুর্শিদাবাদে তার প্রেক্ষিত কিংবা প্রাসঙ্গিকতা হয়ে উঠেছে বেশ কিছুটা পৃথক। সেই বিষয়গুলিকে খুঁজে নেওয়া যায় তাঁর যে যে ছোটোগল্পে, তার কয়েকটি হল—'নুরুদ্দি হাজির গল্প নয়', 'প্রকাশ চরিত', 'উগ্রপন্থী', ফুলজানের সংসার', 'দীনবন্ধু', 'ভিড়', 'তর্পণ', 'ঘাইহরিণী' ইত্যাদি।

'নুরুদ্দি হাজির গল্প নয়' (*সাংস্কৃতিক সমসময়,* এপ্রিল ১৯৯৯) গল্পটিতে সীমান্তসংলগ্ন ধুলাউড়ি বাজার এলাকার কথা উঠে আসে। এ গল্পে ব্যবসায়ী চরিত্র নুরুদ্দি হাজির বিভিন্ন ব্যবসার

মাধ্যমে বড়লোক হওয়ার কথা জানা যায়। গল্পের সূত্রপাতেই খুঁজে নেওয়া যায় বিশ্বায়নের ছোঁয়া। নুরুদ্দি হাজির বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় ডিশ অ্যান্টেনা, যা গ্রামের লোকের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার হিসাবে উঠে আসে। প্রকৃতপক্ষে এ গল্পে বার বার উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তি কীভাবে গ্রামে গঞ্জে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সেই বিবরণ। অন্যদিকে এ গল্পে লেখক তুলে এনেছেন ধর্মনির্ভর ইসলামি সমাজের কথা। প্রযুক্তির মাধ্যমে ধীরে ধীরে কীভাবে পূর্বপ্রচলিত অনুশাসন ভেঙে যাচ্ছে, এ গল্পে সেই দিকগুলিও উঠে এসেছে—

> নুরুদ্দি হাজি নিজের বাড়ির ছাদে 'ইয়া বড়ো টিনের তাওয়া' বসিয়েছে। কখন বসিয়েছে গ্রামের কেউ তা জানতে পারেনি। একদিন পোঁহাতে ঘুম থেকে উঠে হিমচকচকে তাওয়াটার দিকে তাদের চোখ পড়ে। আর তারা অবাক হয়। ভাবে, হাজি আবার ই কুন যন্তর বসাইলে ছাতে ![৯২]

এইভাবে একেবারে অপরিচিত প্রযুক্তি ঢুকে পড়েছে গ্রামে গঞ্জে। লক্ষ করার বিষয় হল অপেক্ষাকৃত সচ্ছলরাই এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের কাছে ধর্মীয় অনুশাসনও কোনও বাধা তৈরি করতে পারে না—

> নুরুদ্দি হাজি যা করে, খোদার কী মহিমা লোকে তা জেনে যায়। এতে তার যেমন আনন্দ হয়, তেমনি দুঃখ। দুঃখ হয় তার নতুন প্রতিবেশীদের জন্য। নতুন প্রতিবেশী বলতে চামাপাড়া লোকজনেরা। কী জানি কেন তারা শুধু তার বদনাম ছড়ায়। নিজের বাড়িতে যখন টিভি লাগাল, তা নিয়ে কি কম কথা গেয়েছে তারা ? হাজি টিভি দেখবে রে ? হাজি হয়েছে বলেই যেন তার শখ-আহ্লাদ থাকবে না। তা ছাড়া টিভি দেখাতে তো পাপের কিছু নাই। খোদ খোদার মুলুক মক্কাতেই লোকে টিভি দেখে। তবে কি হাদিস কোরানের ওরা কিছু বোঝে না নাকি ?
>
> মক্কাতে ওসব দেখেই তো সে টিভি কিনেছে। তার বিবি বাড়িতে একা থাকে। খোদা তাকে বালবাচ্চা দেয়নি। তা নিয়ে বেচারির খুব দুঃখ। সেই দুঃখ ঘোচাতেই তো ধুলাউড়ি 'রেডিয়ো-সেন্টার' থেকে ফিলিপস-এর কুড়ি ইঞ্চি রঙিন একখান বসিয়েছে তার শোবার ঘরে। তার কিছুদিন বাদে একটা

ভিসিপি জোগাড় করেছে। ওটাও মক্কাতেই দেখেছিল। কিনবার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু ওই টাকায় সোনা আনলে বেশি ফায়দা বলে ওটা নিয়ে আসেনি, সোনা নিয়ে এসেছিল। তা ছাড়া ওটার আবার তেমন কাজ কী তার সংসারে এমনই ভেবেছিল সে। কিন্তু টিভিটা কেনার পর ওটার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রয়োজনের অনুভবটা রেডিয়ো সেন্টারের বাক্কার জাগিয়েছিল তার মধ্যে। নানা, একখান ভিসিপি লিয়ে ল্যান এবার। নানিতে আপনাতে মুনমতুন সিনেমা দেখবেন। টিভি ফিট করতে এসে বাক্কার তাকে এমন কথা বলেছিল। তার পরপরই ভিসিপি জোগাড়ের ঘটনাটা। এক বাংলাদেশি খরিদ্দার তার, যার কাছে পাঁচ হাজার টাকা পেত সে। কিন্তু লোকটার বহুদিন পাত্তা ছিল না। তবে শুনেছিল লোকটা ধুলাউড়ি বাজারে আসে ঠিকই, কিন্তু তার দোকানে ওঠে না। ওঠে অন্য দোকানে। শুনে খুব রাগ হয় তার। এবং লোকটাকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতে। আর সেই ফাঁদে লোকটা ভিসিপি সহ ধরাও পড়ে। নুরুদ্দি হাজি তখন পাওনা টাকার বদলে ভিসিপিটা নিয়ে নেয়।[৯৩]

এইভাবে একদিকে গ্রামীণ জীবনে প্রযুক্তি প্রবেশ করে, অন্যদিকে ধর্মীয় বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। অন্যদিকে একের পর এক প্রযুক্তির চাহিদা ইতোপূর্বের গ্রামীণ জীবনের সন্তুষ্টিকে দূরীভূত করে—

... নিজের বাড়ির ছাদে ডিশ বসিয়েছে সে।

এ-যুক্তিটাও তাকে দিয়েছিল রেডিয়ো সেন্টারের ওই বাক্কার। ভিসিপিটার কী যে হয়েছে, ছবি কাঁপছে শুধু। সেটা ঠিক করতে এসে বাক্কার যুক্তিটা দেয়। 'নানা, বাড়িতে একটা ডিশ বসিয়ে ল্যান। ছবি কাঁপার ঝামেলা থাকবে না, তার উপর অনেক গুলান চ্যানেল। যখন যা খুশি দেখবেন। কুনোটায় খালি গান, কুনোটায় খালি সিনেমা। আপনাতে-নানিতে দুজনায় দেখবেন।'[৯৪]

বিনোদনের হাতছানি এইভাবেই প্রযুক্তিকে প্রসারিত করেছিল। অন্যদিকে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বিনোদন বিশ্বায়িত হয়ে উঠেছিল প্রযুক্তির মাধ্যমে।

'ফুলজানের সংসার' (*প্রচ্ছায়া,* অক্টোবর ২০০০) গল্পে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণের কথা উঠে এসেছে। বিশ্বায়নের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিংবা বিদেশে নানা ক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই কারণে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তের মূলত বাণিজ্যসমৃদ্ধ

এলাকাগুলিতে শ্রমিকদের পরিযাণ বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলি থেকে শ্রমিকরা উপার্জনের তাগিদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে তাদের অভাবজীর্ণ পরিবারে কিছুটা হলেও গ্রাসাচ্ছাদন জুটেছিল। অন্যদিকে তাদের অনুপস্থিতিতে পরিবারে তৈরি হয়েছিল একধরনের শূন্যতা। সেই বেদনাকে এ গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক। আর তারই আড়াল দিয়ে এ গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিযাণের বিবরণ—

> ইদের একদিন আগে দুটি মোরগ জইনুদ্দিন কিনে এনেছিল হাট থেকে। ইদের দিন মাংস খাবে বলে। এমনিতে ইদের দিন সবাই গোরুর মাংস খায়। আগে থেকে টাকা তুলে ভাগাভাগিতে গোরু কেনে। জইনুদ্দিনের সেটা সম্ভব হয় না। গ্রামে থাকে না বলে। রোজগারের ধান্দায় বিদেশে থাকে। বিদেশে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। পরবের এক-দু-দিন বাড়ি আসে। তখন আর গোরুর ভাগ তার ভাগ্যে জোটে না।[৯৫]

গল্পে দেখা যায়, বিশ্বায়ন শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের কর্মনিযুক্তির জায়গাই বৃদ্ধি করেনি, বরং তা শিশুশ্রমের ক্ষেত্রটিকেও প্রসারিত করেছিল—

> জইনুদ্দিন এবার বিদেশ থেকে এসে বলেছিল, ফুলু কিছু যদি মুনে না করিস তো একটা কথা বলি। প্রায় তিন মাস পর স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হয়ে জইনুদ্দিন বলেছিল।
>
> —কী মুনে করব আবার, যা বুলবার বুলো। মরদের বুকে মাথা রেখে বলেছিল ফুলজান।
>
> —বলছি কী জমিলের বয়স তো সাত বছর হতে চলল। তা ছোঁড়াকে ইবার সাথে কর্যা লিয়ে গেলে হয় না। লিয়ে গেলে দিন তিরিশ টাকা বেশি রোজগার হত। পাড়ায় জমিলের থেকে ছোটো অনেকেই তো গেছে। কালুর বেটা শুকরুদ্দি, আলতাবের বেটা মাহাতাব। এক এক করে জইনুদ্দিন নাম বলে যাচ্ছিল। ওরা প্রত্যেকেই জমিলের বয়সি। তাই ফুলজান সাত-পাঁচ না ভেবে খুব সহজেই বলেছিল, লিয়ে যাবা তো আমাকে শোধাবার কী আছে। তুমি যা ভালো বুঝবা, করবা। তুমি যখন তার বাপ।[৯৬]

বলাই বাহুল্য, আলোচ্য ছোটোগল্পটির প্রকাশকালের দুই দশকের বেশি সময় পর একথা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যন্ত জেলাগুলি থেকে আরও বেশি পরিমাণে শ্রমিক পরিযায়ী হয়ে পড়েছে। এতে সেই পরিবারগুলির আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিছু পরিমাণে ঘটলেও অনেকসময়েই প্রিয়জনকে হারানোর মতো ঘটনাও ঘটে চলেছে।

'দীনবন্ধু' (*বোধ*, অক্টোবর ২০০০) গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন বিশ্বায়নের আর একরকম বাস্তবতার দিক। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে বিদেশি কোম্পানিসমূহ দ্রুত ভারতে ঢুকতে থাকে। ভারতের বাজার দখল করে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে সেগুলি। এইসময়ে কয়েকটি কোম্পানি (যেমন আমেরিকান কোম্পানি অ্যামওয়ে) মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং শুরু করে। এদের লক্ষ্য ছিল চেন বিজনেসের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাওয়া। কোনো একজন এজেন্ট এইভাবে তাঁর পরিচিত বৃত্তে ব্যবসাটিকে সম্প্রসারিত করতেন। উল্লেখিত গল্পে সেইরকম একজন এজেন্ট দীনবন্ধুর কথা উঠে আসে। পড়াশোনা এবং চাকরিক্ষেত্রে সফল দীনবন্ধু আরও রোজগারের আশায় তার মফসসলের বন্ধুদের কাছে তুলে ধরে সেই কোম্পানির কথা। তাদেরকে প্রলুব্ধ করে কোম্পানির এজেন্ট হতে। স্বপ্ন দেখায় তাদের, যে স্বপ্ন পুঁজির গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে। তবে সেই স্বপ্ন দেখার জন্য প্রত্যেক এজেন্টকেও নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে বলে জানা যায়। এইভাবে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলিও হয়ে ওঠে পুঁজি প্রসারের হাতিয়ার—

> আমাদের জমজমাট আড্ডায় দীনবন্ধু এসে কথাগুলি বলল। দীনবন্ধু আমাদের বন্ধু। একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করে। সন্তোষপুরে কোম্পানির বাংলোয় থাকে বউ-বাচ্চা নিয়ে। ভালো স্যালারি পায়।[৯৭]

বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি তুলে ধরে সচ্ছলতা কিংবা শহরবাসের অধিকারকে। তা উচ্চ বেতনের সঙ্গে সংযুক্তও বটে। তবু উচ্চ বেতন মানেই মানসিক সন্তুষ্টি নয়। তা আরও ভোগের সন্ধানে মানুষকে ব্যাপৃত করে। দীনবন্ধু নিজে সেই পথে হাঁটার পাশাপাশি বন্ধুদেরকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলতে চায় এক বহুস্তরীয় শৃঙ্খল, যা তাকে উপার্জনের আরও শীর্ষে নিয়ে যাবে—

> ডাঃ মুখার্জি বললেন, আমাদের এই দেশে নাইন্টি এইটে একটি আমেরিকান কোম্পানি লঞ্চ করেছে। সেই কোম্পানির হরেক প্রোডাক্টের মধ্যে ডিটারজেন্টও আছে। খুব ভালো প্রোডাক্ট। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, ব্যবহার করুন। সুফল পাবেন। তবে প্রোডাক্টটি কিন্তু বাজারে পাবেন না। আমি একজনের ঠিকানা দিচ্ছি, তার কাছে গিয়ে সংগ্রহ করবেন। অবশ্য আপনার যদি ইচ্ছা হয়। ডাঃ মুখার্জি প্রেসক্রিপশন লিখলেন না। বদলে একটা ছোটো চিরকুটে একজনের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর লিখে দিলেন। আর ফিজ বাবদ আড়াইশো টাকা গুনে নিলেন। এ-জন্যে ডাঃ মুখার্জির ওপর আমি খানিকটা বীতশ্রদ্ধ হলাম। তবু সবিতার কথা ভেবে ডাঃ মুখার্জির দেওয়া ফোন নম্বরে ফোন করে সেই ঠিকানায় আমি গেছলাম।
>
> স্থানটি বেহালায়। সেখানে না গেলে এমন গোল্ডেন অপারচুনিটি আমারও হাতছাড়া হয়ে যেত। যেটা বলতেই অফিস ছুটি নিয়ে আমার তোদের কাছে ছুটে আসা।
>
> বেহালায় আমি যার কাছে গেলাম, তার নাম মি. সুমন চ্যাটার্জি। যিনি ওই আমেরিকান কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর। ওই কোম্পানির প্রায় সাড়ে চারশো প্রোডাক্ট। সুচ থেকে হাতি পর্যন্ত। মি. চ্যাটার্জির কাছেই সে-সব জানলাম আমি। তারপর আরও জানলাম যে, ইচ্ছে করলে আমিও নাকি ওই কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটরশিপ পেতে পারি। তাতে ওই কোম্পানির প্রোডাক্টে আমার নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে যেমন দামে ছাড় থাকবে, তেমনি ব্যবসা করলে লাভও হবে। যে সে লাভ নয়, রীতিমতো লাখ লাখ টাকা ! মি. চ্যাটার্জি আমাকে অঙ্ক কষে বোঝালেন ব্যাপারটা। প্রথমে অবিশ্বাস করলেও অঙ্ক দেখে বিশ্বাস না করে আর পারলাম না। সেই অঙ্কটাই এখন বলব তোদের। তোরা মন দিয়ে শোন...
>
> দীনবন্ধু আমাদের বোঝাচ্ছে। আর আমরা কলকলির পাড়ে বসে পশ্চিম দিগন্তে রঙের প্রকারভেদ দেখছি। সূর্যটা তখন সবেই অস্ত গেছে। অন্ধকার ঘনাচ্ছে আস্তে আস্তে। যার মধ্যে বসে

> আমরা দীনবন্ধুর কাছে শুনছি যে, আমরা প্রত্যেকেই মাত্র পাঁচহাজার করে টাকা দিয়ে ওই কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটরশিপ কীভাবে পাব, সেই রূপকথা ! যাতে করে আমাদের বেকারত্ব ঘুচবে। আমরা বাড়ি-গাড়ি হাঁকাতে পারব। আমরা দীনবন্ধুর মতো সিগারেটের ব্র্যান্ড বদলাতে পারব।[৯৮]

বিশ্বায়ন তার পুঁজি প্রসারের বিনিময়ে মানুষকে এভাবেই স্বপ্ন দেখিয়েছে। সেই স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে পরিণত হয়েছে এক অনন্ত অভিযাত্রায়, যার কোনও সমাপ্তি নেই। সেই তৃষ্ণা কেবলই বেড়েই চলে। লেখক নীহারুল ইসলামের একাধিক ছোটোগল্পে বিশ্বায়ন এইভাবে তার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যসহ উপস্থিত হয়েছে।

৭.১৪॥ **অহনা বিশ্বাস**

কবি ও কথাকার অহনা বিশ্বাস বর্তমান সময়ের এক জরুরি সাহিত্যকর্মী। তাঁর জন্ম ১৬ই মার্চ, ১৯৭০ আসানসোলে। বিদ্যাচর্চা শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা। *দেশ, সানন্দা, যুবমানস, সৃষ্টির একুশ শতক, অমৃতলোক, জিজ্ঞাসা* সহ অসংখ্য পত্রপত্রিকায় লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ। বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর কবিতা ও গল্প। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: *অষ্টাবক্ররমণীকথা, সবুজ শাড়িপরাদের দেশ* ইত্যাদি। উপন্যাস: *আরশিনগরে তাঁবু, আমাদের মায়াবী সময়, তিনপুরুষ এক লতা* ইত্যাদি।

তিনি লাভ করেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে ‘প্রতিমা মিত্র স্মৃতি পুরস্কার’, ২০০১। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষে ‘সুচারু দত্ত স্মৃতি পুরস্কার’, ২০০৩, ‘ভরতব্যাস পুরস্কার’ ২০০৫ ইত্যাদি।[৯৯]

উনিশশো নব্বইয়ের দশক থেকে লেখিকা অহনা বিশ্বাসের ছোটোগল্প রচনার সূত্রপাত। প্রথম ছোটোগল্প[১০০] ‘খালি শিশি’ প্রকাশিত হয় *দেশ* পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৯৩ সংখ্যায়। তাঁর

অহনার গল্প (২০০৬, *একুশ শতক*) গ্রন্থের চল্লিশটি ছোটোগল্প ১৯৯৩ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মোটামুটি এক দশকে লিখিত। বিবিধ বিষয় উঠে এসেছে তাঁর ছোটোগল্পের জগতটিতে। কলেজ কিংবা হোস্টেল জীবন, দাম্পত্য সম্পর্ক, পরকীয়া প্রেম, আধুনিক সময়ের গতিময় জীবন, ব্যক্তিসম্পর্কের টানাপোড়েন, নারীবাদী ভাবনা কিংবা গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারের অনুপুঙ্খ হয়ে উঠেছে তাঁর লেখা ছোটোগল্পের বিষয় আশয়। আর এইধরনের কয়েকটি ছোটোগল্পের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের ছাপ। তাঁর এইধরনের কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'ঋতুকাল', 'কার্তিক নামানো', 'একদিন, কোনোদিন', 'অনন্যাকে যে পায়নি', 'হাস্যরসের ওপারে', 'কেবলই যাতনাময়', 'জিজীবিষা', 'বিবর্তন' ইত্যাদি।

'ঋতুকাল' (*মায়ামৃদঙ্গ*, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০১) নামক ছোটোগল্পটিতে উঠে এসেছে ট্রেনের নিত্যযাত্রী প্রণব ও শ্বেতার মধ্যেকার পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক। প্রণব একটি ছোটোখাটো কারখানায় কাজ করে, শ্বেতা চাকরি করে একটা নামী ইউনিসেক্স বিউটি অ্যান্ড হেলথক্লাবে। সেই চাকরির অঙ্গ হিসাবে কখনো কখনো তাকে রাত কাটাতে হয় কোনো ক্লায়েন্টের সঙ্গে। এইধরনের হেলথক্লাব ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন ব্যবস্থারই ফসল, যেখানে নারীর শ্রম কিংবা যৌনতাকে অত্যন্ত অল্পদামের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাই শ্বেতার মতো এম. এ. পাশ মেয়েরাও এই কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে সংসার নির্বাহের কোনো উপায় না পেয়ে। শ্বেতার স্বামী সুবাস স্ত্রীর এই কাজের কথা জানলেও আপত্তি করে না, বরং সে মেনে নেয়। সে শ্বেতাকে আঘাত করে তখনই, যখন শ্বেতা জানায়, সে বাইরে যাচ্ছে কোনো ক্লায়েন্টের সঙ্গে নয়, তার প্রেমিকের সঙ্গে। এ গল্পে লেখিকার কলমে উঠে আসে একরকমের ভিন্ন মূল্যবোধ, যে বোধে শ্বেতার স্বামী স্ত্রীর দেহের উপর অধিকার হারানোর ভয় পায়নি, পেয়েছে স্ত্রীর মনে অন্য পুরুষ এসে বাসা বাঁধার খবর পেয়ে। নির্দিষ্ট এক অর্থনৈতিক সময়ের দ্বারা চালিত হয়ে এক অংশের

মানুষ ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কোথাও কি অস্বীকার করতে চেয়েছিল শারীরিক শুচিতার ধারণাকে? বিশ্বায়নকালে লেখা এই গল্প হয়তো সেই কথাই বলতে চেয়েছে—

> স্নান করে সিঁদুর পরল শ্বেতা। সুবাস উঠে পড়েছে। তারজন্য চা চাপিয়েছে। টোস্ট করে ফেলেছে যতক্ষণ বাথরুমে ছিল তার মধ্যেই। এই প্রথম প্রেমিকের সঙ্গে সে যাচ্ছে। নইলে তিনবার সে গেছে অন্য অন্য লোকের সঙ্গে। এই হেলথক্লাবে কত সুযোগ পয়সা করার। খুব যে খারাপ লেগেছিল শ্বেতার তাও নয়। কাজের তুলনায় পয়সা বেশি। সামান্য অভিনয়ও করতে হয়। এটুকু। পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ। তবু তার সহকর্মীদের তুলনায় সে কিছুই নয়। হয়ত প্রণবই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওর প্রেমের টানে প্রতিদিন বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা হয়। নইলে গতবছর ঠিক বিবাহবার্ষিকীর দিনে সুবাস খুব নিরুত্তাপ গলায় বলেছিল : এবার আমায় ছেড়ে যেতে পারো শ্বেতা। সতেরো বছর তো কাটালে। জবাব দেয়নি শ্বেতা। চল্লিশ বছর বয়সেই প্রায় বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া মানুষটাকে দেখছিল। মাঝেমাঝে এত নুয়ে পড়া নির্জীব মানুষটার প্রতি বিরক্তিবোধ হয় বইকী।[১০১]

মানুষের পুরানো মূল্যবোধ এইভাবেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে। মর্যাদা হারিয়েছে বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পারস্পরিক সম্পর্কও উষ্ণতা হারিয়েছে এই নির্দিষ্ট সময়ে—

> সুবাস সহজ গলাতেই বলল—এই ক্লায়েন্ট তেমন মালদার নয় বুঝি ? ম্যানেজমেন্টকে প্রভাবিত করে কোন ক্ষতিটতি করতে পারবে না তো ?
>
> বাইরে যাবার পোষাক খুলতে খুলতে শ্বেতা সুবাসের কথা শুনছিল। সুবাসের আশঙ্কা মিথ্যে নয়। এমনই হয়। এসব তাদের চাকরির শর্ত নয় বটে। তবে তেমন খদ্দের হলে বাড়তি টিপসের জন্য, মোটা কিছু টাকার জন্য বাইরে অ্যারেঞ্জ করতে শ্বেতা পারে। শ্বেতা সব শিখে নিয়েছে। সুবাস আবার বলল, দ্যাখো ভুল কোরো না। ক্লায়েন্ট তেমন ইনফ্ল্যুয়েনশিয়াল নয় তো ?

—ক্লায়েন্টই নয়। শ্বেতা শাড়ি ভাঁজ করতে করতে নিস্পৃহ গলায় বলে। সুবাস ঘুরে দাঁড়ায়। তার চোখেমুখে মুহূর্তে রক্ত খেলে। —তবে কে ?

—প্রেমিক, আমার প্রেমিক। আমি প্রেমে পড়েছি।

—মজা মারছ ?

—মজা মারার মত জীবন যেন আমার ! শ্বেতা জবাব দেয়। কিন্তু কথাটা শেষ হয় না। নুয়ে পড়া লোকটার বিষম চড়ে সে আলনাটার ওপর আছড়ে পড়ে।[১০২]

শুধুমাত্র অর্থের পশ্চাতে ধাবমান এই সময়ে মানুষ সত্যিই হয়তো ভয় পায় নিষ্প্রাণতা অতিক্রমকারী কোনও মানবিক সম্পর্ককে। এ গল্পে সেই দিকটিকেই তুলে ধরেছেন গল্পকার।

'একদিন, কোনোদিন' (দৈনিক *বর্তমান*, জুলাই ২০০০) গল্পে উঠে এসেছে কর্পোরেট সংস্থার জোনাল ম্যানেজার পৃথা চরিত্রের কথা। সে পদোন্নতির জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করে চলে। নিজের কিংবা পরিবারের জন্য রাখে না কোনো সময়। এরফলে সাংঘাতিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তার পারিবারিক জীবন। স্বামী অমিত পৃথার চাকরির উন্নতির জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট হলেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাড়তে থাকা দূরত্বকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এরইমধ্যে একদিন সে ছুটি নেয় বর্ধমানে তার ছোটোবেলার স্কুলটিকে দেখতে যাবে বলে। হাওড়া স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা হয় বর্তমানে তুলনামূলকভাবে কম সচ্ছল একসময়ের দু'জন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে। তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। জীবনে সফলতা কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য তাদের সেইভাবে না থাকলেও তাদের মধ্যেকার প্রণয় কিংবা একত্রযাপন পৃথাকে নতুন করে ভাবায় নিজের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে। তার আর বর্ধমান যাওয়া হয় না। মাঝপথে অন্য স্টেশনে নেমে পড়ে সে—

কদিন ধরেই মনটা বড় উৎফুল্ল ছিল পৃথার। সময় পেলেই ফোন করেছে, ফোন ধরেছে। এই সময়টায় কি ফোনও এসেছে কম নাকি। মাত্র দিন পনেরো আগেই পৃথার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। দিদি ফোনে

তো প্রায় লাফাচ্ছিলই। সত্যি, তুই এই বয়সে জোনাল ম্যানেজার ! তুই তো তোর জামাইবাবুর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিস। তার ওপর ষোলশ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট দিয়েছে কোম্পানি। গাড়ি দিচ্ছে। অবশ্য কয়েক মাস আগে, তার বর অমিতও গাড়ি কিনেছে। সত্যি, গর্বে পৃথা নিজেই ফেটে পড়েছিল। বন্ধু-বান্ধব, কোলিগ, চাকরিপ্রার্থী কতজনেরই যে ফোন এ কদিনে পেয়েছে।...

অমিত চায়, খুব চায়, পৃথার উন্নতি হোক। অনেক উঁচু পোস্ট হোক পৃথার। পৃথাকে সে এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে পৃথা দাঁড়াতই না। ও শর্মিলা মুনিয়াদের স্বামীদের মতো নয়। তবু পৃথা বুঝতে পারে কোথায় যেন টানটান সুতোটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। অমিত সে অমিত নেই। কিন্তু পৃথাই কি সেই পৃথা আছে? প্রায় মফস্বল থেকে তাদের দুজনের প্রেসিডেন্সিতে পড়তে আসা। শহরের ব্যস্ততা, কুটিলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা কিংবা অপমানকে ভাগ করে নিতে নিতে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া দুজন আজ এক বিন্দুতে। একটা সংসারে, একটা ফ্ল্যাটে, একই পদবিতে। সরকারী চাকরি ছেড়ে অমিত ব্যবসা করছে, পৃথাও চাকরি নিয়েছে। হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। শহরের বন্ধুদের ছাড়িয়ে, আরও শহুরে হয়ে, পোশাকে আষাকে সচ্ছলতা ছড়িয়ে, ব্যাঙ্কে টাকা রেখে, শেয়ার কিনে বাতাস কেটে কেটে এগিয়ে যাবার আত্মতৃপ্তিই তো সুখ। পরম সুখ। পৃথার গাল লাল হয়ে যায়। পৃথা সুন্দরী, বন্ধুরা বলে দিন দিন তার গ্ল্যামার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

খুব সুখী পৃথা, খুব সুখী সে। অমিত আর তার একই লক্ষ্য, একই জীবন। তবু পৃথার মনে কোথাও একটা কিছু যেন চিনচিন করে। অমিতকে কাছে পায় না। কাছে থেকেও তার মন অন্যদিকে। পৃথার মনও। নিজেদের কাজ ছাড়া দুজনের মধ্যে কোনও কথাই হয়না। সফলতা পৃথাদের আবর্তন করে ঘুরছে। তার জন্য কিছু তো প্রতিদান দিতেই হয়। স্যাক্রিফাইস। কিছুটা আত্মহত্যা। জীবনকে ভোগ করার সময় কি কম পড়ে আছে ?[১০৩]

বিশ্বায়ন-চালিত এই ব্যস্ত সময় এভাবেই আপাত সাফল্যের আড়ালে ধীরে ধীরে হত্যা করে মানুষের অন্তর্গত মানুষটিকে। দূরবর্তী করে তোলে কাছের মানুষের থেকে। তখন সমস্ত উষ্ণতাই হারিয়ে যায়। বেঁচে থাকাটাই হয়ে ওঠে এক লড়াই—

> পৃথা কেঁদে উঠল। কতদিন পর ডুকরে কেঁদে উঠল। নির্জন স্টেশনে জামগাছের তলায় বসে, চূড়ান্ত সফল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির জোনাল ম্যানেজার হাউহাউ করে কাঁদছে। পৃথা নিজেই জানে না কেন সে এমন পাগলামো করছে। কিন্তু কেন যে পৃথা এমন হয়ে গেল তা কে বলতে পারবে ? অমিত কি পারবে ? সাত্যকি ? শ্রীবাস্তব সাহেব কিংবা তার পরিচিত কেউ, কোনও একজনও।[১০৪]

এ গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী কর্পোরেট সংস্কৃতি, যেখানে অর্থের বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় সময় কিংবা পারিবারিক-সামাজিক জীবন। কেবলই সাফল্যের পিছনে ছুটতে থাকে মানুষ। একসময় দিশাহারা হয়ে সাফল্য আসলে কী, তা নিয়েই মনে প্রশ্ন জাগে। সেই প্রশ্নটিকেই এ গল্পে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন লেখিকা।

'হাস্যরসের ওপারে' (*মুক্তবাংলা,* শরৎ ১৯৯৮) গল্পটিতে বিশ্বায়ন আর একরকম মাত্রায় উঠে এসেছে। এ গল্পে পড়াশোনায় মাঝারিমানের দীপা সংসার চালানোর জন্য সামান্য বেতনে একটি নার্সারি স্কুলে চাকরি করে। তার বন্ধু সুবীর আই আই টি-র ইঞ্জিনিয়ার। এ গল্পে দীপার সঙ্গে সুবীরের একটি প্রেম-সম্পর্কের সূত্রপাত হলেও সম্পর্কটিকে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যায় না সে। দীপাকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর দীপা অর্থের আবর্তে সমাজের ঘূর্ণিস্রোতে পাক খেতে থাকে। সুবীরও কারোর সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারে না। শেষপর্যন্ত আবার তারা একত্রিত হয়। দীপার ব্যবসা করার মূলধন যোগায় সুবীর। গল্পটিতে একদিকে দীপার অতি সাধারণ জীবন যেমন উঠে এসেছে, অন্যদিকে ধরা পড়েছে সুবীরের বিলাসবহুল জীবন। লেখিকা দেখিয়েছেন দুটি জীবনই কষ্টের। দীপার গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট, অন্যদিকে বিপুল প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও সুবীরের শ্রেণিচ্যুতি ঘটার কষ্ট। পুঁজিনির্ভর অর্থনীতির একজন ক্রীড়নক সে। সেই ব্যবস্থায় মানুষের মনের সন্ধান কেউ রাখে না—

> সুবীর বলে, আমাদের সোসাইটি বদলে গেছে দীপা। সে সোসাইটিতে তোদের মত পিওর, তোর মত পবিত্র বলে কিছু নেই। সেই বংশীকে বিয়ে করছে সুনু—আমি তো ভাবতেই পারছি না। সুনু তো দেখতে বেশ ভালোই। কত ভালো ওর বিয়ে হতে পারত। এই সমাজে এখনও ভালোবাসা আছে, স্নেহমায়া আছে বুঝলি। এখন এইখানে ফিরে আসতে খুব ইচ্ছা হয়। বাবার মত একটা সামান্য চাকরি করতে ইচ্ছা হয়। আতা গাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে দাদুর মত বিকেলবেলায় ঝিমোতে ইচ্ছে হয়। আমি একেবারে সুখী হইনি রে দীপা। স্ট্যাটাস রক্ষা করতে গিয়ে সব চলে যাচ্ছে।[১০৫]

সামাজিক বদলের একাধিক দিক এই গল্পে উঠে এসেছে। তার সঙ্গে ধরা পড়েছে পূর্বেকার জীবনযাত্রার প্রশান্তির সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের জীবনের প্রশান্তিহীনতার একপ্রকার তুলনা। নির্দিষ্ট এই সময়ে সামাজিক সম্পর্ক কিংবা মূল্যবোধের বদলের সঙ্গে সব মানুষ যে মানিয়ে নিতে পারে নি, সেই দিকটি এ গল্পে ধরা পড়েছে। অন্যদিকে সম্পর্কের বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তির কথা উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে, যা এক নির্দিষ্ট সময়ের মূল্যবোধের অবক্ষয়কে তুলে ধরে—

> সুবীরের কথা ভুলতে পারে না দীপা। হাজার হোক দীপাকে সে সবচেয়ে বেশি রেটই দিয়েছিল। দরাদরি করেনি, কোনও অতিরিক্ত কথা বলেনি, বরঞ্চ বাঁচার পথটা দেখিয়ে দিয়েছিল। নার্সারি স্কুলের কীই বা মাইনে। দীপার আর কোনও যোগ্যতা না থাক, এটা আছে তা প্রমাণের জন্য হয়ত সুবীরের প্রয়োজন ছিল। না সুবীর খারাপ হতে যাবে কেন ? আই আই টি ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার টাক্তার ছাড়া কাকেই বা বিয়ে করবে। দীপার তো খুব ইচ্ছে করে ওর ফ্ল্যাটে যেতে। ওর বৌ তো দীপাকে চিনবে না, উল্টে দরজা খুলে ভাববে কাজ-টাজ চাইতে লোক এসেছে। হয়ত কত টাকা মাইনে চায় জিজ্ঞেস করবে।[১০৬]

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সমাজে সামাজিক সম্পর্কনির্মাণের পথগুলিও অনেকাংশে রুদ্ধ হয়েছে। সেই জগতেও ক্রিয়াশীল হয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। যোগ্যতমের সঙ্গে যোগ্যতমই সম্পর্কসূত্রে বাঁধা পড়তে পারে, অন্য কেউ নয়—এ হেন সমীকরণ নতুন অর্থনীতিতে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। তবু মানুষের পক্ষ থেকে মানবিক মূল্যবোধে ফিরে আসার প্রচেষ্টা কখনও কখনও জারি থাকে—

খুব খারাপ ছেলে হয়ে গেছিরে দীপা। নষ্ট ছেলে, স্যাডিস্টও কিছুক্ষেত্রে। আজ পর্যন্ত কত মেয়ে...। যখন দেখলাম তুই জড়িয়ে পড়ছিস তখন বিয়ের কথাটা বাজালাম। দীপা স্থির হয়ে বসেছিল। কিন্তু সুবীর বলেই যাচ্ছিল, তুই বিশ্বাস কর ঐ ঘটনার পর খুব আফশোস হয়েছে, খুব। তুই খারাপ হয়ে গেলি, অভাবে। আমি টাকার প্রাচুর্যে নষ্ট হলাম। স্বভাবটাই হয়ত খারাপ। তবু বিশ্বাস কর তোকে দেখলে আমার ছেলে বেলাকার কথা মনে হয়। কী পবিত্র তুই, কী পবিত্র আমি। তোকে ভালোবাসতাম—এতদিন পর এভাবে বললে তুই আবার সেইরকম নিশ্চয় হাসবি। কিন্তু শোন, তুই তো ভালো হতে পারিস। একটা সেলাই এর দোকান খুলতে পারিস। তোর জন্য একটা চেক রেখেছি। হাজার চল্লিশের। সেলামি হয়ে যাবে। নিবি ? ভাব না, সেই তিনদিনের জন্য দিচ্ছি। এক হাজার টাকাটা কিছু নয়। ওই টাকার কী মূল্য এই বাজারে।[১০৭]

কোনও কোনও সময়ে হয়তো বা বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতাময় জীবন থেকে বেরিয়ে ফেলে আসা দিনের মূল্যবোধে আশ্রয় নিতে চায় ক্লান্ত মানুষ। এই গল্পে লেখিকা সেই দিকগুলিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

‘জিজীবিষা’ (*উৎসব*, নভেম্বর ২০০১) গল্পে নারীবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ গল্পের চরিত্র প্রৌঢ়া পার্বতী পালিত একজন আইনজীবী। তার পাশাপাশি তিনি বিশিষ্ট ‘ফেমিনিস্ট’, ‘মহিলাবন্ধু সমিতি’-র প্রেসিডেন্ট। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলারা আসেন তাঁর কাছে, প্রতিকার প্রার্থনায়। তাঁর স্বামী অনিমেষ অত্যন্ত গুণী অধ্যাপক। দু’জনের এই আপাত সফল সংসারের অন্তরালে দেখা যায় অনিমেষ তাঁদের মেয়ের বয়সী কঙ্কার প্রতি আসক্ত। এ গল্পে পার্বতী, যিনি নারীবাদী, যিনি অন্যের সমস্যা সমাধান করেন, তিনি নিজেই অসহায় হয়ে পড়েন পুরুষতন্ত্রের কাছে। গল্পের শেষে দেখা যায় পুরুষনির্মিত সমাজনির্মাণ অনুযায়ী স্বামীর দাবি নিয়ে তিনি পতিব্রতা নারীর মতো ভূমিকা পালন করেন। তাতে তাঁর এতদিনের যুক্তিনির্ভর অবস্থানের চেয়ে

প্রথানুগত্যই বেশি পরিমাণে উঠে আসে। অন্যদিকে এ গল্পে প্রযুক্তি কীভাবে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরিয়েছে, সেই দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

> অনিমেষ বিছানায় শুয়েই কর্ডলেসে ফিসফিস করে কঙ্কার সঙ্গে কথা বলে। পার্বতীর কান খাড়া হয়ে থাকে। সব কথা বিছানার ও-প্রান্ত থেকে শোনা যায় এমন নয়। তবু পঁয়ত্রিশ বছরের এই সঙ্গীর কাতরতা, সমর্পণ, অনুরোধের আর্তি সবই এত পরিচিত যে পার্বতীর অজানা কিছুই থাকে না। যদিও ফোনের ভলিউম কম থাকে, তবুও মাঝরাতে প্রেমালাপ শুনেই ঘুম ভেঙে যায় পার্বতীর। ঘুমের ওষুধ খেতে হয় মাঝে মাঝে।[১০৮]

প্রযুক্তি একদিকে যেমন মানুষের মধ্যেকার ভৌত দূরত্বকে কমিয়েছে, তেমনই বাড়িয়ে দিয়েছে মানসিক দূরত্বকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অন্যকে ভরসা জোগানো মানুষও হয়ে পড়ে অনন্যোপায়—

> সেই প্রথম ক্লায়েন্টের দুঃখে কেঁদে ফেলেছিল পার্বতী। সে জানে সে বোঝে একই বিছানায় দ্বিতীয় নারীর উপস্থিতি। ফোন নামে যন্ত্রটা কেন যে পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়েছে।[১০৯]

প্রযুক্তি এইভাবে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহও করে তুলেছে।

'বিবর্তন' (*অমৃতলোক*, জানুয়ারি ২০০১) নামক ছোটোগল্পটিতে লেখিকা তুলে ধরেছেন বিশ্বায়নের একপ্রকার বিপক্ষতাকে। এ গল্পে অখিল এক প্রাক্তন নকশাল। সেইসময়ে বোমা তৈরি করতে গিয়ে তার ডান হাতের দুটি আঙুল নেই, ডান চোখের ভিতরে পাথর, একটি পা ক্ষতিগ্রস্ত। সে একটি সরকারি অফিসের ক্লার্ক। যে বিপ্লবের স্বপ্ন সে দেখত, তা থেকে সরে বর্তমানে সে প্রচলিত পথের সাফল্যে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তার স্বপ্নগুলি বদলে যায়। স্ত্রী মালা আর দুই সন্তান বিপ্লব এবং সংহতিকে নিয়ে তার সংসার। অখিলের স্কুলের বন্ধু শ্যামল একজন বিদেশফেরত সফল ডাক্তার, তার স্ত্রী হিমাচল প্রদেশের মেয়ে মধুও বিদেশফেরত ডাক্তার। তাদের একমাত্র

সন্তান অচিন পড়াশোনায় অত্যন্ত ভাল। দুটি পরিবারের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হলেও অখিল আর শ্যামলের সন্তানদের স্বপ্ন কিংবা সাফল্যের ধারণা হয়ে ওঠে আলাদা। এককালের নকশাল অখিল চায় তার সন্তানরা বহুজাতিক কোম্পানির চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যাক, তার বর্তমান ধারণায় সেটাই সাফল্য। অন্যদিকে শ্যামল-মধু-র সন্তান অচিন সফলতার ভিন্ন সংজ্ঞায় বিশ্বাসী। সে পড়াশোনায় অত্যন্ত সফল হওয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত বিদেশযাত্রা স্থগিত করে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে আদিবাসীদের গ্রাম রক্ষার্থে যাত্রা করে। এইভাবে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে মানুষের নীতি আদর্শের একপ্রকার বিবর্তন ধরা পড়েছে এ গল্পে। অন্যদিকে বিশ্বায়ন নামক পুঁজির সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত সফল পরিবারের এক সফল ছাত্র অচিন—

> কয়েক বছর পর হায়ার সেকেন্ডারীতে সংহতি দারুণ রেজাল্ট করে। আমি কল্পনা করিনি বিপ্লবের থেকে ওর মাথা এতটা ভালো। ও ইঞ্জিনিয়ারং, মেডিক্যাল দুটোতেই চান্স পায়। দুটোতেই ভালো র‍্যাঙ্ক। সংহতি সম্ভবত মধুকে দেখেই ডাক্তার হতে চায়। আমি চাই না। ওকে বোঝাই কত বেশিদিনের কোর্স। তারপরও তুমি প্রতিষ্ঠিত হবে কী হবে না তা নিয়ে সমস্যা। তার থেকে তুমি কম্প্যুটারে যাও। এ দিকেই এখন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। বিল গেটস। ইনফরমেশন টেকনোলজি।[১১০]

মানুষের পেশা নির্বাচনকেও প্রভাবিত করেছিল বিশ্বায়ন। মানবসেবার পরিবর্তে চটজলদি অর্থাগমের উপায় হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল এই সময়ে। কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং আরও বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের কারণে। অভিভাবকরা দ্রুত উপার্জনের আশায় তাই একেই বিকল্প হিসাবে বেছে নিয়েছিল অন্য সুযোগসমূহকে সরিয়ে রেখে। তবে সমস্ত মেধাবী ছাত্রই সাফল্যের এই দ্রুত পথকে বেছে নেয়নি। কেউ কেউ এর বাইরে গিয়েও ভাবতে চেয়েছে ভিন্ন পথে—

ও বলল, বিদেশে গিয়ে কী হবে ? ওদের বাতিল করে দেওয়া প্ল্যান আমরা দেশের লোকের টাকায় বানাব কেন ? বড় বড় কিছু শিখবই বা কেন—তা যদি আমার দেশে প্রয়োগ করা না যায়। বাবা, ও কত কথা বলছিল। সব আমি বুঝতেও পারছিলাম না। বলছিল, বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় বনজঙ্গল গ্রাম মানুষ লোপাট করে যা বানাব, তা আবার দুদিন পর ভাঙতে হবে। তখনও লোন। অচিনদা যদিও সব সরল করে বলছিল—তবু যেন সব বুঝছিলাম না।

আমার মনে পড়ল মধু শ্যামলের সামনে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, গ্যাট চুক্তি, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক। আমার মাথা ঘুরছিল। তবু আমি কোনওমতে বললাম, অচিনের কথা তোর বোঝার দরকার নেই রে।

—অচিনদা বলল, তুমি সব নাকি বোঝো। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে বাবা।

—কিচ্ছু বুঝি না বিপ্লব। অচিনের সঙ্গে বেশি মিশিস না। আমার বুকের যন্ত্রণা শুরু হল। আমার ছেলেমেয়েদের, আমার একমাত্র পুঁজিকে বোধহয় আর রক্ষা করতে পারলাম না।[১১১]

কেউ কেউ বিশ্বায়নের স্বরূপকে বুঝে নিয়ে এর বিপরীত পথে হাঁটতে চেয়েছে। আবার প্রাথমিকভাবে আদর্শবান কোনও কোনও চরিত্র বদলে ফেলেছে নিজেকে। বিশ্বায়নের পুঁজিব্যবস্থার অংশ করে তুলতে চেয়েছে সন্তানকে। এইভাবে সরাসরি এ গল্পে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরেছেন লেখিকা অহনা বিশ্বাস। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে তাঁর গল্পের জগতে এভাবেই বিভিন্ন অনুপুঙ্খে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন নামক ব্যবস্থাটি।

৭.১৫॥

বিশ্বায়ন সার্বিকভাবে মানুষের মননের জগতটিকে প্রভাবিত করেছিল। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ের মানুষের মূল্যবোধ আর বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ের মূল্যবোধের মধ্যে তফাত তৈরি হয়েছিল বহুল পরিমাণে। অল্প উপার্জনে বহু মানুষ একজায়গায় মানসিক প্রশান্তি নিয়ে বাঁচার পরিবর্তে বেশি

উপার্জনে অল্প মানুষ বিলাসবহুল জীবনযাপনের বিনিময়ে হারিয়েছিল মানসিক প্রশান্তির জায়গাগুলিকে। নৈতিকতার ভাববাদকে সরিয়ে রেখে বেশি করে ভোগবাদকে আঁকড়ে ধরেছিল বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ের মানুষ। শিশুদেরকে পণ্যভুবনের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার মানুষ সংখ্যায় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তাদেরকে পণ্য করে তোলার ব্যাপারে উৎসাহী মানুষের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে নারী পাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল। গার্হস্থ্য জীবনেও নারীর পরিসরটি সঙ্কুচিত হয়েছিল। নারীকে এই সময়ে সাধারণভাবে জনপরিসরে বেশি করে দেখা গেলেও যেহেতু পুঁজি তাদেরকে পণ্যায়িত করেছিল, সেই কারণে তারা হয়ে পড়েছিল নিরাপত্তাহীন।

বিশ্বায়ন ধর্মীয় অদৃষ্টবাদী চিন্তা থেকে মানুষকে খুব বেশি সরিয়ে আনতে পারেনি। বরং বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রযুক্তির উন্নয়নকে ব্যবহার করে অদৃষ্টবাদ আরও জাঁকিয়ে বসে। অন্যদিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তীব্র হয়ে ওঠে। গ্রামসমাজ কিংবা মফসসল থেকে মানুষ বিচ্যুত হয়। 'গৃহ' নামক পরিসরের ধারণাটি পালটে যায়। পরিবেশ ধ্বংস করে একের পর এক এলাকায় নগরায়ণ হয়। জলাভূমি বুজিয়ে, পুরানো বাড়িঘর জোর করে চাপ দিয়ে দখল করে প্রোমোটিং হতে থাকে। বাড়ির পরিবর্তে মানুষের সামনে ফ্ল্যাটবাড়ির অবশ্যম্ভাবিতাকে হাজির করা হয়।

বিশ্বায়নের পুঁজির দাপটে প্রযুক্তির ঝড় বয়ে যায়। একের পর এক নতুন প্রযুক্তির আগমনের ফলে পুরানো পেশাসমূহের অপমৃত্যু ঘটে। নতুন যুগের পেশায় স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় প্রযুক্তিনির্ভরতা।

বিশ্বায়নের ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত বেসরকারিকরণ ঘটতে থাকে। মাতৃভাষার বদলে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, যেহেতু তা বিশ্বায়নের ভাষা ছিল।

বিনোদন-ব্যবস্থাতেও একরকমের বদল ঘটে এইসময়। যে ধরনের বিনোদন কিংবা গান-বাজনা মানসিক শান্তি এনে দিত, তাকে বর্জন করে অস্থিরতা এবং শারীরিক ক্রিয়াবহুল গান-

বাজনার সূত্রপাত ও বৃদ্ধি ঘটে। এই ক্ষেত্রে বিদেশি যন্ত্রপাতির প্রয়োগ বৃদ্ধি পায়। জনগণের একাংশ পুরানো বিনোদনকে বর্জন করে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৃহৎ অংশ বিশ্বায়নকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে এই ব্যবস্থার উপযোগী হয়ে উঠতে চেয়েছিল। ভোগসর্বস্বতা কিছুটা হলেও এই শ্রেণিকে গ্রাস করেছিল। ফলে রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলেও শ্রেণিগতভাবে তারা প্রতিবাদী না হয়ে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে কোম্পানিগুলি তাদের ব্যবসার নীতি অনুযায়ী মানুষকে বাজার কিংবা নিছক ক্রেতা হিসাবে দেখত। এর সামগ্রিক প্রভাব সমাজব্যবস্থায় এসে পড়েছিল। যার ফলে মধ্যবিত্ত জনগণ নিজেই পুঁজির অংশ হয়ে ওঠার দুরাশায় বিদেশি কোম্পানির মাল্টি-লেভেল-মার্কেটিং-এর অংশ হয়ে ওঠে। আরও বেশি মুনাফার লোভ দেখিয়ে কোম্পানিগুলি তাদের সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ব্যবহার করতে থাকে। এইভাবে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বদল ঘটে।

বাংলা ছোটোগল্প শুধু উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে ধারণ করেছিল তাই নয়, ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল নির্দিষ্ট কিছু বদল। গল্পকারদের সবাই যেমন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তেমনই এর বিভিন্ন প্রভাবকে তাঁরা গল্পের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। বেশ কয়েকজন লেখক আদর্শগতভাবে বিশ্বায়নের বিরোধী অবস্থান নেন। তাঁরা বিশ্বায়নের মানব-বিরোধী দিকগুলিকে তুলে ধরেন রচিত গল্পের মাধ্যমে। গল্পের গঠনের ক্ষেত্রেও তাঁরা পূর্বের ধারাকে অনেকসময় বর্জন করেছেন। নিছক কাহিনিসর্বস্ব না হয়ে ছোটোগল্প কখনো কখনো সামগ্রিকভাবে এক অস্থির সময়কে প্রকাশ করেছে। গল্পের ভাষায় ঢুকে পড়েছে প্রযুক্তিনির্ভর শব্দাবলি। যাপিত সময়ের একাধিক বিষয়ের শব্দাবলিও ছোটোগল্পের ভাষারীতিতে স্থান করে

নিয়েছে। পুঁজির দাপটে একরকম সাংস্কৃতিক মিশ্রণে ভাষার মধ্যে সংগতভাবেই ঢুকে পড়েছে অন্য প্রাদেশিক ভাষা কিংবা বিদেশি ভাষার শব্দাবলি। এইরকম পুঁজি-চালিত সময়কে উপেক্ষা করার জন্য কোনও কোনও ছোটোগল্পকার আবার সচেতনভাবে গল্পের মধ্যে ব্যবহার করেছেন দেশীয় মহাকাব্য, রূপকথা কিংবা উপকথার কথনরীতি। কয়েকজন ছোটোগল্পকার নগরকেন্দ্রিক বিশ্বায়ন-ব্যবস্থাকে এড়িয়ে গিয়ে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন প্রান্তিক মানুষের জনজীবনভিত্তিক ছোটোগল্প রচনাকে। এইসমস্ত উদাহরণের নিরিখে বলা যায়, বিশ্বায়ন পরবর্তী বাংলা ছোটোগল্প তার বিষয় কিংবা আঙ্গিকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যাবলিকে ধারণ করেছিল, যেগুলির দ্বারা এই সময়ের ছোটোগল্পকে পূর্ববর্তী সময়ের ছোটোগল্প থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়।

উল্লেখপঞ্জি:

১. Stegar, Manfred B. *GLOBALIZATION: A Very Short Introduction.* Great Britain: Oxford University Press.2020, pp 1

২. লস্কর, ইন্দ্রাণী, 'কুইনের ফটোগ্রাফ—একটি ফ্যান্টাসি', *ঢাক*, কলকাতা: পরশপাথর, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৭৩

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮১

৫. দাশ, শচীন, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *হেঁতালের মানুষেরা,* দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, অক্টোবর ২০১৮

৬. 'নাগরের দিনরাত', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৩

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮০

৮. 'নীল কাঁকড়া', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮০

৯. দাশ, শচীন, *হেঁতালের মানুষেরা,* দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, অক্টোবর ২০১৮

১০. 'বিশ্বায়ন', শচীন দাশ, *বিভাব,* ১৪১১, পৃষ্ঠা ৬৮

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭২

১২. বেরা, নলিনী, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *সেরা ৫০টি গল্প,* কলকাতা: দে'জ, এপ্রিল ২০১৫

১৩. https://www.anandabazar.com/west-bengal/writer-nalini-bera-awarded- with-ananda-puraskar-in-2019-1.985071 Accessed on 29.05.2022 at 20.55 pm

১৪. বেরা, নলিনী, 'কুসুমতলা', *সেরা ৫০টি গল্প,* কলকাতা: দে'জ, এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৮

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩

১৮. 'অঙ্গনওয়াড়ি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৮

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৫

২০. 'হারমোনিয়াম', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৫

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৬

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৩

২৩. রক্ষিত, সৈকত, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল, ২০১৫

২৪. 'গল্প আমার কাছে শুধুই কাহিনির অনুষ্ঠান নয়', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭

২৫. রক্ষিত, সৈকত, 'মুখোশ', *দশটি গল্প,* কলকাতা: পরশপাথর, অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭

২৬. রক্ষিত, সৈকত, 'চাঁদমারি', *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৯৩

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯৭

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯৮-৩৯৯

২৯. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'গাঁ-ঘরের কথা', *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪১৯

৩০. 'পরিক্রমা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৮

৩১. 'ধ্বংসস্তূপে প্রেমালাপ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭৫

৩২. মুর্শিদ এ এম, 'লেখক-পরিচিতি' (ব্লার্ব), *প্রথম পঁচিশ,* কলকাতা: একুশ শতক, বইমেলা ২০১৫

৩৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'একটি নতুন তারার আবির্ভাব', *জাড়কাঁটা,* মুর্শিদ এ এম, কলকাতা: একুশ শতক, বৈশাখ ১৪২৬, পৃষ্ঠা ১৩-১৪

৩৪. মুর্শিদ এ এম, 'নীলরঙা তেল', *জাড়কাঁটা*, কলকাতা: একুশ শতক, বৈশাখ ১৪২৬, পৃষ্ঠা ১৬০

৩৫. মুর্শিদ এ এম, 'মুখোমুখি ব্রজনাথ', *প্রথম পঁচিশ*, কলকাতা: একুশ শতক, বইমেলা ২০১৫, পৃষ্ঠা ৭১

৩৬. 'বীজ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯

৩৭. গুহ, শুভংকর, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: করুণা, বইমেলা, ২০১৭

৩৮. গুহ, শুভংকর, 'ঘরে ফেরার দিন', *প্রত্নযামিনী*, কলকাতা: একুশ শতক, অক্টোবর ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৯

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০

৪০. মাজী, বিপ্লব, 'বাঙলা ছোট গল্পে মায়াবী-বাস্তবতার জগৎ', *পঞ্চাশটি গল্প*, শুভংকর গুহ, কলকাতা: করুণা, বইমেলা, ২০১৭

৪১. গুহ, শুভংকর, 'কাহার কথা', *পঞ্চাশটি গল্প*, কলকাতা: করুণা, বইমেলা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪০৬

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০৯

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪

৪৪. আফসার আমেদ, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে'জ, সেপ্টেম্বর ২০১২

৪৫. 'লেখক পরিচিতি (ব্লার্ব)', পূর্বোক্ত

৪৬. আফসার আমেদ, 'প্রবাসের রূপক', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: দে'জ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা ২৩১

৪৭. আফসার আমেদ, 'সাড়ে বারোটায় রান্না শেষ হচ্ছে', *সেরা ৫০টি গল্প*, কলকাতা: দে'জ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা ২৭৫

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮০

৪৯. ‘রাত কত হল’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৮

৫০. ‘সন্ধ্যার মেঘমালা’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪২-৩৪৩

৫১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪৬

৫২. ‘এলাটিং বেলাটিং সই লো’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫২

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫৪

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫৭

৫৫. হালদার, সাত্যকি, লেখক পরিচিতি (ব্লার্ব), *কুড়িটি গল্প*, নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫

৫৬. হালদার, সাত্যকি, লেখক পরিচিতি (ব্লার্ব), *রামবিলাসের এক একটি দিন*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০২০

৫৭. হালদার, সাত্যকি, ‘শঙ্খের ডাক’, *কুড়িটি গল্প*, নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭

৫৯. ‘সহজ পাঠ’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

৬০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০

৬১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২

৬২. হালদার, সাত্যকি, ‘স্বপ্নদিন’, *রামবিলাসের এক একটি দিন*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০২০, পৃষ্ঠা ৭৫

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৯

৬৫. হালদার, সাত্যকি, ‘দাগ’, *রামবিলাসের এক একটি দিন*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০২০, পৃষ্ঠা ৯৫

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৮

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৯

৬৮. সোহারাব হোসেন, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: করুণা, বইমেলা ২০১০

৬৯. মজুমদার, মানস, 'সময়ের গল্প দুঃসময়ের গল্প', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, সোহারাব হোসেন, কলকাতা: করুণা, বইমেলা ২০১০, পৃষ্ঠা ৫

৭০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭

৭১. সোহারাব হোসেন, 'রাজদূত রাজদূত', *বোবাযুদ্ধ*, কলকাতা: অভিযান, পৃষ্ঠা ৩৮

৭২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯

৭৩. সোহারাব হোসেন, 'কবির লড়াই', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: করুণা, বইমেলা ২০১০, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০

৭৪. 'ভেন্ন কামধেনু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩১

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫

৭৮. বসু, অরিন্দম, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *নির্বাচিত পঁচিশ গল্প*, কলকাতা: একুশশতক, জুলাই ২০০৯

৭৯. বসু, অরিন্দম, 'লেখক পরিচিতি' (ব্লার্ব), *রংকলের মাঠে* , কলকাতা: দে'জ, জানুয়ারি ২০১৭

৮০. বসু, অরিন্দম, 'হাড়মাস', *নির্বাচিত পঁচিশ গল্প*, কলকাতা: একুশশতক, জুলাই ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৪

৮১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬

৮২. 'কালপুরুষ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৭

৮৫. ‘স্বপ্ন উপত্যকা’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৮

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৯

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬০-২৬১

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৩

৮৯. ‘কুড়ি নম্বর লোক’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৭

৯০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭০

৯১. নীহারুল ইসলাম, ‘লেখক পরিচিতি’ (ব্লার্ব), *ঘাট আঘাটের বৃত্তান্ত*, কলকাতা: অভিযান, জানুয়ারি ২০১৪

৯২. ‘নুরুদ্দি হাজির গল্প নয়’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০

৯৫. ‘ফুলজানের সংসার’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬

৯৭. ‘দীনবন্ধু’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১০-১১১

৯৯. বিশ্বাস, অহনা, ‘লেখক পরিচিতি’ (ব্লার্ব), *অহনার গল্প*, কলকাতা: একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৬

১০০. বিশ্বাস, অহনা, ‘আমার কথা’, *অহনার গল্প*, কলকাতা: একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৬

১০১. ‘ঋতুকাল’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১-৫২

১০২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪

১০৩. 'একদিন, কোনোদিন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০০

১০৫. 'হাস্যরসের ওপারে', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৭

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮

১০৮. 'জিজীবিষা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৮

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮২

১১০. 'বিবর্তন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬০

১১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৩

উপসংহার

১৯৯১ সালের ২৪ শে জুলাই ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকার করে নেওয়া মুক্ত অর্থনীতি এবং তার ফলে আগত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অভিঘাত দেশের বহু ক্ষেত্রের পাশাপাশি ছাপ রেখেছিল দেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রটিতেও। বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই মুক্ত অর্থনীতি কিংবা বিশ্বায়ন বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিকে যে যে ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা কয়েকটি প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে 'বিশ্বায়ন ও নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প (১৯৯২-২০১২)' শিরোনামাঙ্কিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে।

মুক্ত অর্থনীতি কিংবা তৎসংলগ্ন বিশ্বায়ন নামক একটি বৃহৎ প্রক্রিয়া বহুলাংশে বদলে দিয়েছিল দেশের অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্যসহ অন্যান্য আরও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রুত বদল ঘটেছিল। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছিল, বিভিন্ন প্রকারে কিংবা মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল পরিযাণ। চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইসব কারণে পরিবারব্যবস্থা, ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মানুষের ভাবনার ধরন কিংবা মূল্যবোধ—সর্বত্রই যে বদল দেখা গিয়েছিল, বাংলা ছোটোগল্পের পরিসরে তা ধারণ করেছেন একাধিক লেখক। চারপাশের বদলে যাওয়া প্রতিবেশ কিংবা নতুন যুগের ভাষাভঙ্গিকে তাঁরা তুলে ধরেছেন তাঁদের গল্পের মাধ্যমে। সে গল্প কখনো গল্প বলার পুরানো রীতিকে অনুসরণ করেছে, কখনো আবার সূত্রপাত ঘটিয়েছে নতুন বাকভঙ্গির। চরিত্ররা তাদের বয়স অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থার সাপেক্ষে উঠে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ায়। মানুষের জীবনযাপনের ধরন, প্রচলিত মূল্যবোধ ইত্যাদি সমস্তকিছুর উপরে ক্রিয়াশীল হয়ে বিশ্বায়ন মানুষকে বাধ্য করেছিল নতুন যুগের

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আগ্রাসনকে স্বীকার করে নিতে। খুব কম মানুষই এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, অন্তত ছোটোগল্পের চরিত্ররা সেইভাবেই উঠে এসেছে।

ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিতে যে যে লেখক বিশ্বায়ন পরবর্তী দুই দশকে অবদান রেখেছেন, তাঁদের অনেকে প্রাতিষ্ঠানিক লেখক, অনেকে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী। তবে উভয়ধরনের লেখকদের মধ্যেই উপস্থিত ছিল জীবনবোধের এক-একরকম ধরন, যার ফলে তাঁদের গল্পে বিশ্বায়ন উপস্থিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়। কারও গল্পে বিশ্বায়ন-প্রভাবিত নগর কিংবা গ্রামজীবন তার অনুপুঙ্খসহ উঠে এসেছে, আবার কোনো কোনো লেখক বিশ্বায়নের প্রবল জোয়ারের সময়েও প্রান্তিক মানুষের জীবনকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় তাঁদের লেখায় প্রায় বর্জন করেছেন এই প্রক্রিয়াটিকে। হয়তো এর মাধ্যমে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, মূলত অর্থনৈতিক এবং এই নগরকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া প্রান্তিক শ্রেণির গ্রামের মানুষের জীবনে ততখানি প্রভাব ফেলতে পারে না। তবে বর্জন করার চেষ্টা করলেও তাঁদের দু-একটি গল্পে গ্রামসমাজের কিংবা দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের প্রেক্ষিতেও ধরা পড়েছে বিশ্বায়নের আগ্রাসন।

মূলত পুঁজির প্রসার হিসাবে ভূমিকা পালন করে যাওয়া বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি কী সর্বার্থেই মানব-বিরোধী হিসাবে কাজ করেছিল? তা বললে হয়তো সত্যকে আংশিকভাবে উপস্থিত করা হবে। পুঁজির প্রসার, জমি অধিগ্রহণ, কৃষি-শ্রমিকের শিল্প-শ্রমিকে পরিণত হওয়া, শিক্ষা, চিকিৎসা, উপার্জনের জন্য পরিযাণ বৃদ্ধি, পরিবার-ব্যবস্থার ভাঙন ইত্যাদি নানা প্রভাব রেখে এগিয়ে চলা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে বিশ্বায়নের কিছু ভালো দিকও অবশ্যই উঠে এসেছে। পরিযায়ী হয়ে শিল্প-শ্রমিক হয়ে পড়লেও নিরন্ন কৃষি-শ্রমিকের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ বেড়েছিল বিশ্বায়নের কারণে। শ্রমের মূল্য নিয়ে তারা কিছু হলেও দরাদরির সুযোগ পেয়েছিল বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে। পূর্বে একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থেকে কর্মশক্তির যে অপচয় ঘটছিল, কিংবা স্বল্প

মূল্যে শ্রমকে বিক্রি করতে বাধ্য হতে হচ্ছিল, সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসাপরিষেবা প্রাপ্তির আশা কিছুটা বেশি পরিমাণে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ভিন-দেশে কিংবা রাজ্যে গিয়ে হলেও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের কিছুটা হলেও সুযোগ বাড়ে। প্রযুক্তির প্রসার কিংবা তার সহজলভ্যতা বাড়ে। সাধারণ মানুষের কাছে সেই প্রযুক্তি পৌঁছানোর ফলে তাদের জীবনেও বেশকিছু বদল আসে। প্রযুক্তির প্রয়োগ উপার্জনের নিশ্চয়তা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি করে। প্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টায় গ্রাম-ভারতে বিদ্যুতায়ন কিংবা পুঁজির প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টায় রাস্তাঘাটের উন্নতি পরোক্ষে মানুষের জীবনযাত্রাকে উন্নত করেছিল। এই প্রক্রিয়াগুলির আড়ালে অনেক বিপরীত সত্য লুকিয়ে থাকলেও অন্তত উপজাত হিসাবে কিছু সুবিধা পেয়েছিল সাধারণ মানুষ। বাংলা ছোটোগল্পের মাধ্যমে সেই দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন একাধিক লেখক।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার উপজাত হিসাবে কিছু ভালো দিক উঠে আসলেও মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার পর দূরদর্শী চিন্তাবিদ কিংবা লেখকরা যে যে আশঙ্কা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে তুলে ধরেছিলেন, পরবর্তী তিন দশক পর তার অনেকটাই আজ সবার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আসছে। মুক্ত অর্থনীতির সূত্রপাতে দেশীয় বাজারকে যে প্রতিযোগিতার মুখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তার ভালো দিক হিসাবে দেশের অর্থনীতি মজবুত হওয়ার কথা বলা হলেও তিন দশক পরে সেই মজবুতির বনিয়াদে বড়ো বড়ো খুঁত দেখা যাচ্ছে একথা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে আশঙ্কাকে সত্যি করে মুক্ত অর্থনীতি বেসরকারিকরণকে দ্রুত বৃদ্ধি করেছিল এবং এখনো করে চলেছে। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপরে মানুষ ভরসা হারিয়েছে। ভরসা দিতে এগিয়ে আসছে যারা, তারা চিকিৎসার বিনিময়ে কখনো মানুষের সর্বস্ব অধিগ্রহণ করে ফেলছে। শিক্ষাব্যবস্থাতেও সেই একইধরনের চিত্র দেখা যাচ্ছে। দ্রুতহারে একেবারে প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায়

বেসরকারিকরণ ঘটে চলেছে। সরকারি মাতৃভাষামাধ্যম বিদ্যালয়গুলি ধুঁকতে ধুঁকতে বন্ধ হয়ে চলেছে, বেসরকারি শিক্ষার মূল্য আকাশছোঁয়া, সেখানে রাষ্ট্র দ্রুত তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। দেশীয় কিংবা বিদেশি পুঁজি নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা কল্যাণের পরিবর্তে মুনাফার কথা ভাবছে। এর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তী বিগত তিন দশকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এসেছে বহু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। সরকার নিয়ন্ত্রিত একাধিক ক্ষেত্র চলে গিয়েছে কিংবা যাচ্ছে বেসরকারি পুঁজির হাতে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে স্থায়ী সরকারি চাকরির পরিমাণ। বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ। সরকারি চাকরিতে পেনশন ব্যবস্থা উঠে যাচ্ছে। কর্মচারীর নিজ উদ্যোগে জমানো ভবিষ্যনিধিকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বাজারের ওঠাপড়ার সঙ্গে। বেসরকারি ক্ষেত্রগুলি মানুষকে কাজ করানোর ক্ষেত্রে শ্রম আইনকে অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করছে। নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকারি উদ্যোগ আপাতদৃষ্টিতে বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃতপক্ষে পরিষেবা ক্রয় করতে হচ্ছে মানুষকে। বাজারের উপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ সামগ্রিকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে প্রতিযোগিতার নামে এক একটি কোম্পানি একচেটিয়াভাবে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে, ক্রেতাকে বাধ্য হতে হচ্ছে তাদের পরিষেবা ক্রয় করতে। এইভাবে তিনদশক পরে মুক্ত অর্থনীতির স্বরূপ উঠে আসছে মানুষের কাছে। বাংলা ছোটোগল্পের অনেক লেখকই তাঁদের ছোটোগল্পে মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তী দুই দশক ধরে কিছুটা বাস্তব পরিস্থিতির উপরে দাঁড়িয়ে আর কিছুটা ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো এই পরিণতিকে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন, যেগুলি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিশ্বায়নের ফলে বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে ক্ষুদ্র পুঁজির টিকে থাকার লড়াই তৈরি হয়েছিল। ক্ষুদ্র উদ্যোগ কিংবা ক্ষুদ্র পুঁজিনির্ভর জীবনযোদ্ধারা টিকে থাকতে পারছিলেন না বড়ো বড়ো ব্র্যান্ডের সঙ্গে। গ্রাসাচ্ছাদনের মতো উপার্জনটুকুও না করতে পারায় তরুণ প্রজন্মের এইধরনের বহু

মানুষের জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছিল প্রেম কিংবা ঘর বাঁধার আকাঙ্ক্ষা। একাধিক ছোটোগল্পকার তাঁদের গল্পে তুলে ধরেছেন সেই বাস্তবতার দিকগুলি। জীবন-আকাঙ্ক্ষা কিংবা মানবিক অনুভূতির নিয়ন্তা হিসাবে পুঁজির এই উপস্থিতিই ছিল বিশ্বায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক লেখকের একাধিক ছোটোগল্পে।

উল্লেখিত পর্বের ছোটোগল্পকারদের একাংশের মধ্য থেকে বিশ্বায়নের পণ্যসংস্কৃতির একরকম বিরোধিতা তৈরি হয়েছিল। তাঁদের নিজস্ব বাস্তব কিংবা তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁদের দূরদৃষ্টি তাঁদের সৃষ্ট ছোটোগল্পে বিশ্বায়নের একপ্রকার বিরোধিতা তৈরি করেছিল। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ের জীবনপদ্ধতি, সংস্কৃতি কিংবা মূল্যবোধে তাঁরা স্থিত থাকার একরকম প্রয়াস তুলে ধরলেও তার বিপরীতে পরিবর্তনকারী শক্তি হিসাবে পুঁজির ক্ষমতাদর্পী প্রভাবকে তুলে ধরে দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ বাধ্য হচ্ছে নতুন এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে। হারিয়ে ফেলছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, বিনোদন কিংবা ভাবনার পরিসরকে। মানসিক সন্তুষ্টি কিংবা প্রশান্তিবিহীনতার দিকে সেই অভিগমন যে মানুষকে নির্ভরযোগ্য কোনো গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে না, তা তাঁরা অনুভব করেছিলেন। তুলে ধরেছিলেন তাঁদের ছোটোগল্পে।

১৯৯২-২০১২ সময়পর্ব বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বিশ্বায়নের ঢেউ ভারতে তার অভিঘাতসহ যেভাবে এসে পড়েছিল, তার সূত্রপাত কিংবা পরিণতির অনেকখানি এই সময়কাল থেকে বুঝে নেওয়া সম্ভব। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে। বিশ্বায়নের প্রাথমিক পর্বে প্রযুক্তি কিংবা পুঁজি যেভাবে ভারতের প্রেক্ষিতে তার যাত্রা শুরু করেছিল, মধ্যভাগে তা দ্রুতগতি লাভ করেছে। দুই দশক পরে তার ফলাফল পরিণতিসহ অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাথমিকপর্বে যে বাংলা ছোটোগল্প গড়ে উঠেছিল, তা যে ধরনের প্রযুক্তির কথা তুলে এনেছিল, দুই দশক পরের গল্পে সেইধরনের প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে, কিংবা

সেই সংক্রান্ত খুঁটিনাটি আরও স্বাভাবিকতার সঙ্গে গল্পে ঢুকে পড়েছে। উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তের পাশাপাশি নিম্নবিত্ত মানুষের গল্পেও প্রযুক্তির একাধিক ব্যবহার কিংবা উপাদানকে আবিষ্কার করে নেওয়া গিয়েছে দুই দশকের শেষের দিকে। বেসরকারি চিকিৎসা-পরিষেবাক্ষেত্রের উপভোক্তা হিসাবে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছোটোগল্পের অন্দরে ধরা পড়েছে। প্রাথমিক পর্বে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিযাণ পরবর্তী পর্বে বিদেশগমনে পরিণতিলাভ করেছে। দ্রুত ঘটেছে ব্যক্তি কিংবা পরিবারসম্পর্কসমূহের বদল। অন্যদিকে শুধু শহরেই নয়, গ্রামেগঞ্জেও প্রসারিত হয়েছে বিশ্বায়নের প্রভাব। মোবাইল, দ্রুতগতির ইন্টারনেট, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা মানুষের জীবনে বদল ঘটিয়েছে। বাংলা ছোটোগল্পের গল্পকাররা নাগরিক অবস্থান কিংবা বিভিন্ন প্রান্তীয় অবস্থান থেকে এইধরনের একাধিক বিষয়সমূহকে যেভাবে তাঁদের ছোটোগল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, সেইগুলিই হয়ে উঠেছে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিশ্লেষণের উপাদান।

১৯৯১ সালের ২৪ শে জুলাই তারিখে মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নিয়ে ভারত যে বিশ্বায়ন ব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠেছিল, তার প্রভাব আজও ক্রিয়াশীল। এই প্রক্রিয়াকে স্বীকার করে নেওয়ার উদ্যোক্তারা এর ইতিবাচক দিকগুলিকেই তুলে ধরলেও পরবর্তীকালে এর বহু নেতিবাচকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক-অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সিংহভাগ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। অপ্রতিহত গতিতে পুঁজির প্রসার ঘটে। সরকারি ব্যবস্থাপনা সংকুচিত হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারিকরণ বৃদ্ধি পায়। এতৎসত্ত্বেও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কিছু ইতিবাচক দিকও যে ভারতের নিরিখে ক্রিয়াশীল হয়েছে, সে কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, ভারতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটার সময় থেকে তিন দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই প্রক্রিয়ার যে ধরনের বৈশিষ্ট্যাবলি প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তা আগামী বছরগুলিতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: GATT চুক্তির একটি পৃষ্ঠা

সূত্র: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf Accessed on 18.03.2022 at 7.32 pm

THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

The Governments of the COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, the KKINGDOM OF BELGIUM, the UNITED STATES OF BRAZIL, BURMA, CANADA, CEYLON, the REPUBLIC OF CHILE, the REPUBLIC OF CHINA, the REPUBLIC OF CUBA, the CZECHOSLOVAK REPUBLIC, the FRENCH REPUBLIC, INDIA, LEBANON, the GRAND-DUCHY OF LUXEMBURG, the KINGDOM OF THE NETHERLANDS, NEW ZEALAND, the KINGDOM OF NORWAY, PAKISTAN, SOUTHERN RHODESIA, SYRIA, the UNION OF SOUTH AFRICA, the UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, and the UNITED STATES OF AMERICA:

Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods,

Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce,

Have through their Representatives agreed as follows:

1

পরিশিষ্ট ২: ১৯৯১ সালের ২৪ শে জুলাই ভারতের অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট বক্তৃতার প্রারম্ভিক অংশ।

সূত্র: https://www.indiabudget.gov.in/budget2021-22/doc/bspeech/bs199192.pdf Accessed on 21.03.2022 at 8.17 pm

Budget 1991-92

Speech of

Shri Manmohan Singh
Minister of Finance

24th July, 1991

PART A

Sir,

I rise to present the budget for 1991-92. As I rise, I am overpowered by a strange feeling of loneliness. I miss a handsome, smiling, face listening intently to the Budget Speech. Shri Rajiv Gandhi is no more. But his dream lives on; his dream of ushering India into the twenty-first century; his dream of a strong, united, technologically sophisticated but humane India. I dedicate this budget to his inspiring memory.

2. The new Government, which assumed office barely a month ago, inherited an economy in deep crisis. The balance of payments situation is precarious. International confidence in our economy was strong until November 1989 when our Party was in office. However, due to the combined impact of political instability witnessed thereafter, the accentuation of fiscal imbalances and the Gulf crisis, there was a great weakening of international confidence. There has been a sharp decline in capital inflows through commercial borrowing and non-resident deposits. As a result, despite large borrowings from the International Monetary Fund in July 1990 and January 1991, there was a sharp reduction in our foreign exchange reserves. We have been at the edge of a precipice since December 1990 and more so since April 1991. The foreign exchange crisis constitutes a serious threat to the sustainability of growth processes and orderly implementation of our development programmes. Due to the combination of unfavourable internal and external factors, the inflationary pressures on the price level have increased very substantially since mid-1990. The people of India have to face double digit inflation which hurts most the poorer sections of our society. In sum, the crisis in the economy is both acute and deep. We have not experienced anything similar in the history of independent India.

3. The origins of the problem are directly traceable to large and persistent macro-economic imbalances and the low productivity of investment, in particular the poor rates of return on past investments. There has been an unsustainable increase in Government expenditure. Budgetary subsidies, with questionable social

1

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

অগ্নিহোত্রী, অনিতা. *দশটি গল্প.* কলকাতা: পরশপাথর. বৈশাখ ১৪১৭

অগ্নিহোত্রী, অনিতা. *পঞ্চাশটি গল্প* .কলকাতা: আনন্দ. জানুয়ারি ২০১৯

অগ্নিহোত্রী, অনিতা. *পঞ্চাশটি গল্প* .কলকাতা: করুণা. বৈশাখ ১৪১৯

অগ্নিহোত্রী, অনিতা. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: করুণা. সেপ্টেম্বর ২০১৮

অগ্নিহোত্রী, অনিতা. *সেরা ৫০টি গল্প* .কলকাতা: দে'জ. মাঘ ১৪২৪

আমেদ, আফসার. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: দে'জ. জানুয়ারি ২০১৮

আমেদ, আফসার. *সেরা ৫০টি গল্প.* কলকাতা: দে'জ. সেপ্টেম্বর ২০১২

ইসলাম, নীহারুল. *ঘাট আঘাটের বৃত্তান্ত.* কলকাতা: অভিযান. জানুয়ারি ২০১৪

ইসলাম, নীহারুল. *জমিন আসমান.* কলকাতা: নিউ ভারত সাহিত্য কুটির. আগস্ট ২০১৮

ইসলাম, নীহারুল. *যাদুলাঠি.* কলকাতা: নিউ ভারত সাহিত্য কুটির. জুলাই ২০১৯

এ এম, মুর্শিদ. *জাড়কাঁটা.* কলকাতা: একুশশতক. বৈশাখ ১৪২৬

এ এম, মুর্শিদ. *প্রথম পঁচিশ.* কলকাতা: একুশশতক. ২০১৫

গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত. *গল্প ৫১.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ. জানুয়ারি ২০১৭

গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত. *পঞ্চাশটি গল্প.* কলকাতা: আনন্দ. এপ্রিল ২০১২

গুপ্ত, প্রচেত. *পঞ্চাশটি গল্প.* কলকাতা: আনন্দ. জুলাই ২০১৭

গুপ্ত, প্রচেত. *প্রচেত গুপ্তর গল্প.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ. শ্রাবণ ১৪২৮

গুহ, শুভংকর. *পঞ্চাশটি গল্প.* কলকাতা: করুণা. ২০১৭

গুহ, শুভংকর. *প্রত্নযামিনী.* কলকাতা: একুশশতক. অক্টোবর ২০০৮

গুহ, শুভংকর. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: অভিযান. জানুয়ারি ২০১৯

ঘোষাল, বিনোদ. *আশ্চর্য মানুষ.* কলকাতা: অভিযান. জানুয়ারি ২০১৮

ঘোষাল, বিনোদ. *একটি সাহসী দৃশ্য.* কলকাতা: অরণ্যমন. সেপ্টেম্বর,২০২১

ঘোষাল, বিনোদ. *কালো গল্প.* কলকাতা: অভিযান. মে ২০২১

ঘোষাল, বিনোদ. *নতুন গল্প ২৫.* কলকাতা: অভিযান. নভেম্বর ২০১৩

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়. *অষ্টচরণ ষোল হাঁটু* .কলকাতা: পুনশ্চ. জানুয়ারি ২০১৫

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়. *পঞ্চাশটি গল্প.* কলকাতা: আনন্দ. মার্চ ২০১৬

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: দে'জ. ডিসেম্বর ২০১৪

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়. *সেরা ৫০টি গল্প.* কলকাতা: দে'জ. এপ্রিল ২০১১

চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ. *উনিশ কুড়ির প্রেম.* কলকাতা: আনন্দ. নভেম্বর ২০০৮

চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ. *প্রেমের উনিশ-কুড়ি.* কলকাতা: আনন্দ. নভেম্বর ২০১৬

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: দে'জ. জানুয়ারি ২০০৪

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর. *সেরা ৫০টি গল্প.* কলকাতা: দে'জ. জুলাই ২০১১

চট্টোপাধ্যায়, সাধন. *গল্প ৫০.* কলকাতা: প্রকাশভবন. জানুয়ারি ২০১৭

চট্টোপাধ্যায়, সাধন. *গল্প সমগ্র ১.* কলকাতা: করুণা. ২০১০

চট্টোপাধ্যায়, সাধন. *গল্প সমগ্র ২.* কলকাতা: করুণা. ২০১১

চট্টোপাধ্যায়, সাধন. *গল্প সমগ্র ৩.* কলকাতা: করুণা. বৈশাখ ১৪২৫

চট্টোপাধ্যায়, সাধন. *বাছাই ৪৯.* কলকাতা:একুশশতক. জানুয়ারি ২০১৫

চট্টোপাধ্যায়, সাধন. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: করুণা. ফেব্রুয়ারি ২০০৯

দত্ত, সুকান্তি. *স্বপ্নে নদীর খোঁজ.* কলকাতা: করুণা. ২০০৭

দত্ত, সুকান্তি. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: অভিযান. জানুয়ারি ২০২০

দাশ, শচীন. *পঁচিশটি গল্প.* কলকাতা: যূথিকা বুক স্টল. জানুয়ারি ২০১৬

দাশ, শচীন. *হেঁতালের মানুষেরা.* দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি. ২০১৮

দাস, বিপুল. *পঞ্চাশটি গল্প.* কলকাতা: আনন্দ. এপ্রিল ২০১২

দাস, বিপুল. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: অভিযান. ২০২০

বসাক, তৃষ্ণা. *গল্প ৪৯* .কলকাতা: কৃতি. ২০১৯

বসাক, তৃষ্ণা. *ছায়াযাপন.* কলকাতা: একুশ শতক. ২০০৯

বসাক, তৃষ্ণা. *দশটি গল্প.* কলকাতা: পরশপাথর. পৌষ ১৪১৭

বসাক, তৃষ্ণা. *নির্বাচিত পঁচিশটি গল্প.* কলকাতা: একুশ শতক. এপ্রিল ২০১৪

বসু, অরিন্দম. *রংকলের মাঠে.* কলকাতা: দে'জ. জানুয়ারি ২০১৭

বসু, অরিন্দম. *নির্বাচিত পঁচিশ গল্প.* কলকাতা: একুশ শতক. জুলাই ২০০৯

বিশ্বাস, অহনা. *অহনার গল্প.* কলকাতা: একুশ শতক. জানুয়ারি ২০০৬

বিশ্বাস, অহনা. *অহনা বিচিত্রা.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ. শ্রাবণ ১৪২০

বেরা, নলিনী. *সেরা পঞ্চাশটি গল্প.* কলকাতা: দে'জ. এপ্রিল ২০১৫

মজুমদার, তিলোত্তমা. *ঋ.* কলকাতা: আনন্দ. ডিসেম্বর ২০০৩

মজুমদার, তিলোত্তমা. *গল্প সংগ্রহ.* কলকাতা: আনন্দ. এপ্রিল ২০২০

মজুমদার, তিলোত্তমা. *পঞ্চাশটি গল্প.* কলকাতা: আনন্দ. এপ্রিল ২০১২

মল্লিক, উল্লাস. *পঞ্চাশটি গল্প.* কলকাতা: আনন্দ. জানুয়ারি ২০১৯

মিত্র, অমর. *২১ টি গল্প.* কলকাতা: সৃষ্টিসুখ. ডিসেম্বর ২০১৯

মিত্র, অমর. *সেরা ৫০টি গল্প.* কলকাতা: দে'জ. জুলাই ২০১২

মিত্র, অমর. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: করুণা. ২০১২

মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু. *পঞ্চাশটি গল্প* .কলকাতা: আনন্দ. জানুয়ারি ২০১৬

মুখোপাধ্যায়, রামকুমার. *গল্পসমগ্র.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ. মাঘ ১৪১৯

মুখোপাধ্যায়, রামকুমার. *দশটি গল্প.* কলকাতা: পরশপাথর. অগ্রহায়ণ ১৪১৬

রক্ষিত, সৈকত. *উত্তরকথা.* কলকাতা: পারুল. ২০১৫

রক্ষিত, সৈকত. *দশটি গল্প.* কলকাতা: পরশপাথর. অগ্রহায়ণ ১৪১৬

রায়, কিন্নর. *গল্পসল্প.* কলকাতা: দে'জ. জানুয়ারি ২০১৯

রায়, কিন্নর. *চন্দ্রাভিসার.* কলকাতা: করুণা. বইমেলা ২০০৬

রায়, কিন্নর. *দশটি গল্প.* কলকাতা: পরশপাথর. অগ্রহায়ণ ১৪১৬

রায়, কিন্নর. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: দে'জ. আগস্ট ২০১১

রায়, কিন্নর. *সেরা ৫০টি গল্প.* কলকাতা: দে'জ. জানুয়ারি ২০১১

লস্কর, ইন্দ্রাণী. *ঢাক.* কলকাতা: পরশপাথর. বৈশাখ ২০০

লস্কর, বসন্ত. *আয়ান ঘোষ-জন্মে এবং জন্মান্তরে.* কলকাতা: এবং মুশায়েরা. জানুয়ারি ২০১৫

সান্ত্রা, তৃপ্তি. *অষ্টমীটোলা ও ৫০টি গল্প.* কলকাতা: পুনশ্চ. ২০১৯

হালদার, তন্বী. *খুকি ও নিশিপদ্ম.* কলকাতা: উবুদশ. জানুয়ারি ২০১৪

হালদার, তন্বী. *জালাঙ্গীর গান অথবা গোখরো সাপের ভয়.* কলকাতা: উবুদশ. ২০০৯

হালদার, তন্বী. *নতুন গল্প ২৫.* কলকাতা: অভিযান. জানুয়ারি ২০১৬

হালদার, তন্বী. *বাছাই ২৫.* কলকাতা: সৃষ্টিসুখ. ডিসেম্বর ২০১৯

হালদার, তন্বী. *মজুররত্ন.* কলকাতা: গুরুচণ্ডা৯. বইমেলা ২০১৯

হালদার, সাত্যকি. *কুড়িটি গল্প.* নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ২০০৮

হালদার, সাত্যকি. *রামবিলাসের এক একটি দিন.* কলকাতা: গাঙচিল. ২০২০

হোসেন, সোহারাব. *বোবাযুদ্ধ.* কলকাতা অভিযান ফেব্রুয়ারি ২০০৮

হোসেন, সোহারাব. *ভেজা তুলোর নৌকা.* কলকাতা: অভিযান. জানুয়ারি ২০১৭

হোসেন, সোহারাব. *শ্রেষ্ঠ গল্প.* কলকাতা: করুণা. ২০১০

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

ঈগলটন, টেরী. *মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা.* নিরঞ্জন গোস্বামী অনূদিত. কলকাতা: দীপায়ন. জুলাই ২০০৮

উমর, বদরুদ্দিন. *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি.* কলকাতা: চিরায়ত. আগস্ট ২০০৮

খাসনবিশ, রতন. *বিশ্বায়ন উন্নয়ন ও বিশ্বমন্দা.* কলকাতা: প্রমা. ২০০৯

খাসনবিশ, রতন. *বিশ্বায়ন ও ভারতবর্ষ অর্থনীতির ইডিওলজি.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ. মে ২০০5

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন. *রাজনীতির অভিধান.* কলকাতা: আনন্দ. জানুয়ারি ২০১৬

গুহ, রামচন্দ্র. *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ.* কলকাতা: আনন্দ. জুন ২০১৬

ঘোষ, মুরারি. *বিশ্বায়ন, ডলার ও বিকল্প বিশ্বের সন্ধানে.* কলকাতা: গ্রন্থমিত্র. অক্টোবর ২০১১

চক্রবর্তী, অচিন. *উন্নয়নের ভালোমন্দ.* কলকাতা: অবভাস. জানুয়ারি ২০০৮

চট্টোপাধ্যায়, আবীর. *বিশ্বায়ন গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ. মে ২০১৩

চন্দ্র, বিপন, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী. (আশীষ লাহিড়ী অনূ.). *ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে.* কলকাতা: আনন্দ. এপ্রিল ২০১৩

নস্কর, সনৎকুমার(সম্পা.). *বিশ্বায়ন ও বাংলা সাহিত্য.* কলকাতা: সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন. নভেম্বর ২০১৬

পলমল, অরূপ. *কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত.* কলকাতা: ডাভ. ২০১৩

পাল, শ্রাবণী. *পরিবর্তমান গ্রামসমাজ: গল্পকারদের ভাবনা.* কলকাতা: অক্ষর, জুলাই ২০১১

বসাক, তৃষ্ণা. *প্রযুক্তি ও নারী.* কলকাতা: গাঙচিল. অগস্ট ২০১০

বসু, কৌশিক. *অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প.* কলকাতা: আনন্দ. ডিসেম্বর ২০১৬

বসু, পথিক. *তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বে পল্লীভুবন.* কলকাতা: এবং মুশায়েরা. জানুয়ারি ২০১৩

বসু, পথিক (সম্পা.). *বিশ্বায়ন বিজ্ঞান ও কৌশল.* কলকাতা: শ্রয়ণ. জুন ২০০২

বসু, বিষাণ. *কিনে আনা স্বাস্থ্য.* কলকাতা: ধানসিড়ি. অক্টোবর ২০২০

বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পা.). *বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা ১.* কলকাতা: এন বি এ. নভেম্বর ২০০২

বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পা.). *বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা ২.* কলকাতা: এন বি এ. নভেম্বর ২০০২

ভুক্ত অনিন্দ্য. *উদার অর্থনীতি অনুদার উন্নয়ন.* কলকাতা: একুশশতক. সেপ্টেম্বর ২০১১

ভুক্ত অনিন্দ্য. *বিশ্বায়ন ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি.* কলকাতা: গ্রন্থমিত্র. জানুয়ারি ২০০৭

ভুক্ত, অনিন্দ্য. *বিশ্বায়ন শব্দকোষ.* কলকাতা: বাংলার মুখ. জুলাই ২০১৫

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, *প্রবন্ধ সংগ্রহ ২*, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, এপ্রিল ২০২১

মার্কস, কার্ল. ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস. *কমিউনিস্ট ইস্তাহার* (বাংলা সংস্করণ). মস্কো: প্রগতি. ১৯৮৬

মারজিৎ, সুগত. *উন্নয়নের যুক্তি তক্কো* .কলকাতা: অনুষ্টুপ. ডিসেম্বর ২০০৯

লাহিড়ী, সৌমিত্র. দাস, মানসপ্রতিম (সম্পা.). *তথ্যপ্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন.* কলকাতা: একুশ শতক.২০০২

সামন্ত, সুবল(সম্পা.). *বাংলা গল্প ও গল্পকার.* খণ্ড ১-২. কলকাতা: এবং মুশায়েরা. সেপ্টেম্বর ২০০৯

সামন্ত, সুবল(সম্পা.). *বাংলা গল্প ও গল্পকার.* খণ্ড ৩. কলকাতা: এবং মুশায়েরা. জানুয়ারি ২০২০

সামন্ত, সুবল(সম্পা.). *বাংলা গল্প ও গল্পকার.* খণ্ড ৪. কলকাতা: এবং মুশায়েরা. জুলাই ২০১০

সামন্ত, সুবল(সম্পা.). *বাংলা গল্প ও গল্পকার.* খণ্ড ৫. কলকাতা: এবং মুশায়েরা. এপ্রিল ২০১৪

সামন্ত, সুবল(সম্পা.). *বাংলা গল্প ও গল্পকার.* খণ্ড ৬. কলকাতা: এবং মুশায়েরা. জানুয়ারি ২০০৭

সামন্ত, সুবল(সম্পা.). *বাংলা গল্প ও গল্পকার.* খণ্ড ৭. কলকাতা: এবং মুশায়েরা. জানুয়ারি ২০১৩

সামন্ত, সুবল(সম্পা.). *বাংলা গল্প ও গল্পকার.* খণ্ড ৮. কলকাতা: এবং মুশায়েরা. জানুয়ারি ২০১৭

সেনমজুমদার, জহর. *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. এপ্রিল ২০১৭

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

World Commission on the Social Dimension of Globalization. *A Fair Globalization: Creating Opportunities for All*. New Delhi: Academic Foundation. 2006

Bhagwati, Jagdish. *In Defense of Globalization*. New York: Oxford University Press.2004

Chatterjee, Biswajit. *Globalisation and Health Sector in India*. New Delhi: Deep & Deep. 2009

Hiro, Dilip. *INDIANS IN A GLOBALIZING WORLD*. Noida: HarperCollins.2014

Hoogvelt, Ankie. *Globalization and the Post Colonial World*. London: Palgrave.2001

Kar, Samit (Ed.). *Globalisation: One World, Many Voices*. Jaipur: Rawat Publications. 2005

Livesey, Finbarr. *FROM GLOBAL TO LOCAL*. London: Profile Books. 2017

Mishra, Deepak K(Ed.). *Internal Migration in Contemporary INDIA*.New Delhi:Sage. 2016

Narula, Uma. *Rising Expectations India's Transformation*. New Delhi: ATLANTIC. 2009

OBIA, JYOTI, MOHAMMAD ASIF.*GLOBALIZATION AND REGIONAL INEQUALITIES IN INDIA*. New Delhi: SERIALS.2016

Panagariya, Arvind. *India: The Emerging Giant*. New York: Oxford University Press.2008

Pathak, Avijit. *Modernity, GLOBALIZATION and IDENTITY*. Delhi: AAKAR BOOKS. 2018

Pitroda, Sam. *Dreaming Big: My Journey to Connect India*. Haryana: Penguin.2016

Prasad, Govind, Anil Dutta Mishra (Ed.). *GLOBALIZATION: MYTH AND REALITY*. New Delhi: CONCEPT. 2004

Samantroy, Ellina, Indu Upadhyay, *GLOBALIZATION and SOCIAL CHANGE*. Jaipur: Rawat Publications. 2012

Scrase, Ruchira Ganguly, Timothy J. Scrase. *Globalisation and the Middle Classes in India*. London: Routledge.2009

Sikdar, Soumyen. *Contemporary Issues in Globalization: An Introduction to Theory and Policy in India*. New Delhi: Oxford University Press. 2002

Sitapati, Vinay. *HALF LION*. Haryana: Penguin. 2017

Stegar, Manfred B. *GLOBALIZATION*. Great Britain: Oxford University Press.2020

Steger, Manfred B Et al (Ed). *The SAGE Handbook of Globalization*. London: SAGE. 2014

Stiglitz, Joseph E. *FREEFALL*. New Delhi: Penguin. 2009

Stiglitz, Joseph E. *Globalization And Its Discontents*. Haryana: Penguin. 2012

Stiglitz, Joseph E. *Making Globalization Work*. New Delhi: Penguin. 2007

Vaguet, Alain (Ed.). *Indian Health Landscapes under Globalization*. New Delhi: Manohar. 2009

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

আচার্য, অনিল (সম্পা.). *অনুষ্টুপ.* ৫৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা. শীত ২০২১

কুণ্ডু, অরুণ (সম্পা.). *সৃষ্টির একুশ শতক.* উৎসব সংখ্যা ১৪২৬

গুহ, স্বাতী ও অন্যান্য (সম্পা.). *আরশি নগর* (সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা). বইমেলা ২০২০

ঘোষ, দীপেন (সম্পা.). *গণশক্তি.* শারদ সংখ্যা ১৪০৬, ১৯৯৯

ঘোষ, দীপেন (সম্পা.). *গণশক্তি.* শারদ সংখ্যা ১৪০৮, ২০০১

চক্রবর্তী, কাকলি (সম্পা.). *বর্তমান.* শারদ সংখ্যা. ১৪০৮

চক্রবর্তী, দীপংকর, রতন খাসনবিশ (সম্পা.). *অনীক.* সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০০

চক্রবর্তী, দীপংকর, রতন খাসনবিশ (সম্পা.). *অনীক.* জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৯

চক্রবর্তী, দীপংকর, রতন খাসনবিশ (সম্পা.). *অনীক.* জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১০

চক্রবর্তী, দীপংকর, রতন খাসনবিশ (সম্পা.). *অনীক.* সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৪

চক্রবর্তী, দীপংকর, রতন খাসনবিশ (সম্পা.). *অনীক.* জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৫

চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত (সম্পা.). *পরিকথা.* ডিসেম্বর ২০১৩

চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত (সম্পা.). *পরিকথা.* মে ২০১৪

চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত (সম্পা.). *পরিকথা.* ডিসেম্বর ২০১৫

চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত (সম্পা.). *পরিকথা.* ডিসেম্বর ২০১৬

দত্ত, অভীক (সম্পা.). *গণশক্তি.* শারদ সংখ্যা. ১৪২৫

দত্ত, নারায়ণ (সম্পা.). *গণশক্তি,* শারদ সংখ্যা. ১৪১১/২০০৪

দত্ত, নারায়ণ (সম্পা.). *গণশক্তি,* শারদ সংখ্যা. ১৪২০

দাশগুপ্ত, বিপ্লব (সম্পা.). *নন্দন,* শারদ সংখ্যা. ১৪০৪

দাশগুপ্ত, বিপ্লব (সম্পা.). *নন্দন,* শারদ সংখ্যা. ১৪০৫

দাশগুপ্ত, বিপ্লব (সম্পা.). *নন্দন,* শারদ সংখ্যা. ১৪০৬

বসু, সমীর (সম্পা.). *পদক্ষেপ ৩৪* (ক্রোড়পত্র: বঙ্গসংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন). বইমেলা সংকলন. ডিসেম্বর ২০০৩

বিশ্বায়নের গোলকধাঁধায়. নাগরিক মঞ্চ ১৯৯৯

বিশ্বায়নের ভেলকি. লোকায়ত পত্রিকা. পঞ্চদশ সংকলন. ১৪০৮

মণ্ডল, জয়গোপাল (সম্পা.). *সাহিত্য অঙ্গন.* ফেব্রুয়ারি ২০১৯

মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পা.). *সমকালের জিয়নকাঠি.* শচীন দাশ স্মরণ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১৬

রায়চৌধুরী, পঙ্কজ (সম্পা.). *রবিশস্য* বিশেষ শরৎ সংখ্যা: অক্টোবর ১৯৯৮

রায়চৌধুরী, পঙ্কজ (সম্পা.). *রবিশস্য.* চতুর্থ বর্ষ বইমেলা সংখ্যা. ফেব্রুয়ারি ২০০২

সমাদ্দার, শেখর(সম্পা.). *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা* ২০১৭-২০১৮. কলকাতা. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়. মার্চ ২০১৮

সরকার, শান্তনু (সম্পা.). *শুভশ্রী.* ছোটগল্পকার: স্মরণে-বিস্মরণে. ৫০ বর্ষ. ১৪১৮: ২০১১-১২

সরদার, মনোরঞ্জন (সম্পা.). *পথ.* একাদশ বর্ষ. জুলাই ২০১৮

অভিধান (বাংলা)

আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পা.). *আকাদেমি বানান অভিধান.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. ২০০৫

আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. সেপ্টেম্বর ২০১০

চৌধুরী, জামিল (সম্পা.). *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান.* ঢাকা: বাংলা একাডেমি. ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* প্রথম খণ্ড॥ অ-ন. নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ২০১১

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* দ্বিতীয় খণ্ড॥ প-হ. নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ২০১১

মুখোপাধ্যায়, অশোক. *সংসদ বানান অভিধান.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. জুলাই ২০১৬

অভিধান (ইংরেজি)

Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Delhi: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 2008

DASGUPTA, BIRENDRAMOHAN (Ed.). *SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY.* KOLKATA: SAHITYA SAMSAD. January, 2012

SOANES, CATHERINE (Ed.). *The Compact Oxford Reference Dictionary.* New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS. 2001

Wehmeier, Sally (Ed.). *Oxford Advanced Learner's Dictionary.* New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS. 2000

গবেষণা-পদ্ধতি গ্রন্থ

ইসলাম, শেখ মকবুল. *গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ. ডিসেম্বর ২০১২

গোস্বামী, জয়ন্ত. *সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. জুন ২০১৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি. *গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি.* কলকাতা: দে'জ. জানুয়ারি ২০১১

মুখোপাধ্যায়, জগমোহন. *গবেষণা-পত্র অনুসন্ধান ও রচনা.* কলকাতা: আনন্দ মার্চ ২০১২

বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি (অন্তর্জাল সূত্র)

https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization Accessed on 30/10/2017 at 7.45 pm

http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introduction.html Accessed on 30/10/2017 at 8.12 pm

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/14/globalisation-the-rise-and-fall-of-an-idea-that-swept-the-world Accessed on 30/10/2017 at 8.35 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Globalisation_in_India Accessed on 30/10/2017 at 8.55 pm

http://www.thehindu.com/opinion/lead/The-dark-side-of-globalisation/article15514462.ece Accessed on 31/10/2017 at 7.15 pm

http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/globalisation-and-indias-performing-arts/article2761382.ece Accessed on 31/10/2017 at 7.24 pm

https://www.mainstreamweekly.net/article849.html Accessed on 31/10/2017 at 7.55 pm

http://vle.du.ac.in/mod/book/view.php?id=12855&chapterid=27527 Accessed on 31/10/2017 at 8.25 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization Accessed on 31/10/2017 at 9.12 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade Accessed on 31/10/2017 at 9.33 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_market Accessed on 31/10/2017 at 9.50 pm

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm Accessed on 31/10/2017 at 10.21 pm

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr00_e.htm Accessed on 31/10/2017 at 10.37 pm

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm Accessed on 31/10/2017 at 10.52 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberalization Accessed on 31/10/2017 at 11.07 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade Accessed on 31/10/2017 at 11.32 pm

https://www.indiatoday.in/india/story/exclusive-the-story-of-sam-pitroda-and-indian-telecom-revolution-269082-2015-10-20 Accessed on 06/09/2019 at 12:13 AM

https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Pitroda Accessed on 06/09/2019 at 12:15 AM

https://www.thehindu.com/books/literary-review/govindan-nair-reviews-sam-pitrodas-autobiography-dreaming-big/article8483087.ece

Accessed on 06/09/2019 at 12:32 AM

http://www.legalservicesindia.com/article/1018/Globalization-&-its-impact-on-Indian-Economy:-Developments-and-Challenges.html Accessed on 06/09/2019 at 12:53 AM

https://innovareacademics.in/journals/index.php/ijbm/article/view/725 Accessed on 06/09/2019 at 1:02 AM

https://www.civilserviceindia.com/subject/General-Studies/notes/effects-of-globalisation-on-indian-society.html Accessed on 06/09/2019 at 1:20 AM

https://www.rbi.org.in/scripts/pm_earlyissues.aspx Accessed on 27.02.2021 at 7.25 pm

https://www.businessmanagementideas.com/banking/evolution-of-banking/list-of-4-banks-in-india-before-independence/5336 Accessed on 27.02.2021 at 7.37 pm

https://groww.in/blog/the-evolution-of-banking-in-india/ Accessed on 28.02.2021 at 7.15 pm

https://www.rbi.org.in/scripts/chro_1968.aspx Accessed on 01.03.2021 at 7.09 pm

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/pdfs/71207.pdf Accessed on 01.03.2021 at 7.19 pm

https://www.forbesindia.com/article/weschool/digital-revolution-in-the-

indian-banking- sector/47811/1 Accessed on 01.03.2021 at 7.27 pm

https://www.researchgate.net/publication/322428014_Growth_and_Development_of_ATM_in_India Accessed on 05.03.2021 at 2.35 pm

https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd14180.pdf < Impact of Globalization on Retail Banking Services> Ms. Gagandeep Chadha et al. Accessed on 05.03.2021 at 2.55 pm

https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana-pmjdy#tab=tab-1 Accessed on 06.03.2021 at 3.27 pm

https://www.indiatoday.in/india/story/5-ways-how-rajiv-gandhi-changed-india-forever-1318979-2018-08-20 Accessed on 07.03.2021 at 7.17 pm

https://www.csmonitor.com/1989/0817/fcomp.html Accessed on 07.03.2021 at 7.32 pm

https://www.zaubacorp.com/company/AAMAR-PC-PRIVATE-LIMITED/U72900WB2005PTC101801 Accessed on 07.03.2021 at 7.49 pm

https://www.sirfnews.com/coronavirus-forced-cpim-party-that-once-protested-against-computers/ Accessed on 10.03.2021 at 8.25 pm

https://www.mondaq.com/india/antitrust-eu-competition-/1037960/ccis-market-study-on-the-telecom-sector-an-overview Accessed on 10.03.2021 at 8.55 pm

https://www.nextbigbrand.in/telecom-sector-in-india-from-monopolistic-to-duopoly/ Accessed on 10.03.2021 at 9.25 pm

https://www.indiatoday.in/technology/features/story/bsnl-may-shut-down-it-has-no-money-to-pay-employees-all-you-need-to-know-about-bsnl-crisis-1556217-2019-06-26 Accessed on 15.03.2021 at 7.39 pm

https://restofworld.org/2020/how-india-mobile-data-became-worlds-cheapest/ Accessed on 15.03.2021 at 7.57 pm

https://taxguru.in/corporate-law/reliance-jio-proved-free-services-anti-competitive.html Accessed on 21.03.2021 at 7.29 pm

https://www.fonearena.com/blog/2285/china-mobiles-movement-in-india.html Accessed on 21.03.2021 at 7.37 pm

https://www.foundingfuel.com/article/a-brief-history-of-the-internet-in-india/ Accessed on 25.03.2021 at 10.23 pm

https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/the-internet-turns-25-in-india-a-timeline/the-1980s/slideshow/77589569.cms Accessed on 25.03.2021 at 10.52 pm

https://www.indiatoday.in/fyi/story/what-is-2g-scam-in-india-2g-scam-verdict-upa-a-raja-cbi-judge-op-saini-verdict-things-to-know-1113444-2017-12-21 Accessed on 27.03.2021 at 9.11 pm

https://taxguru.in/corporate-law/reliance-jio-proved-free-services-anti-competitive.html Accessed on 27.03.2021 at 9.31 pm

https://prasarbharati.gov.in/all-india-radio-2/#1588508332867-217ff0f1-f4fe Accessed On 11.04.2021 at 5.57 pm

https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/from-walkman-to-smartphones-how-portable-music-has-evolved/articleshow/79791151.cmsf4fe Accessed On 11.04.2021 at 6.18 pm

https://www.philips.com/a-w/research/technologies/cd/beginning.html Accessed on 15.04.2021 at 8.11 pm

https://lowendmac.com/2014/history-of-the-compact-disc/ Accessed on 15.04.2021 at 8.25 pm

https://www.crutchfield.com/S-9rOa7IhXQ2B/learn/home-theater-history.html Accessed on 15.04.2021 at 8.56 pm

https://web.archive.org/web/20110214191909/http://www.smu.edu.in/view page.php?c=SMU_WELCOME&t=h Accessed on 19.04.2021 at 7.05 pm

https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated%20list%20of%20All%20Universities.pdf Accessed on 29.06.2021 at 10.15 pm

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14649373.2015.1037084?scroll=top&needAccess=true Accessed on 30.06.2021 at 7.35 pm

https://link.springer.com/article/10.1007/s41959-019-00010-7 < Management education in India: the challenges of changing scenario > Accessed on 25.04.2021 at 9.45 pm

https://www.britannica.com/topic/great-recession Accessed on 25.04.2021 at 10.25 pm

https://www.news18.com/news/india/nearly-40-engineering-seats-in-

jadavpur-university-remain-vacant-even-after-three-rounds-of-counselling-3177197.html Accessed on 02.05.2021 at 8.12 pm

https://www.researchgate.net/publication/297702921_The_'New_Left'_globalisation_and_trade_unions_in_West_Bengal_What_is_to_be_done Accessed on 02.05.2021 at 8.37 pm

https://journals.openedition.org/samaj/4103 Accessed on 02.05.2021 at 9.06 pm

https://www.joghr.org/article/11915-globalisation-and-health-a-blessing-or-a-curse-case-review-of-the-indian-health-system Accessed on 06.05.2021 at 8.55 pm

https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/madhusudan-gupta-first-indian-trained-in-western-medicine-to-dissect-a-human-corpse-1.811168 Accessed on 06.05.2021 at 11.27 pm

http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-1%20Issue-1/H0114649.pdf Accessed on 08.05.2021 at 9.56 pm

https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated%20list%20of%20All%20Universities.pdf Accessed on 29.06.2021 at 10.15 pm

https://tnrd.gov.in/schemes/cen_pmgsy_13.html Accessed on 14.05.2021 at 9.35 pm

https://www.ibef.org/industry/roads-presentation Accessed on 14.05.2021 at 10.06 pm

https://www.railway-technology.com/projects/kolkatametro/ Accessed on 14.05.2021 at 11.23 pm

https://web.archive.org/web/20191230065707/https://www.wttc.org /-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2019/india2019.pdf Accessed on 17.05.2021 at 8.45 pm

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/ countries-2018/india2018.pdf Accessed on 17.05.2021 at 9.15 pm

https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/indian-medical-tourism-industry-to-touch-8-billion-by-2020-grant-thornton/articleshow/49615898.cms Accessed on 19.05.2021 at 7.16 pm

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=144633 Accessed on 19.05.2021 at 8.29 pm

https://tourism.gov.in/sites/default/files/202009/ITS%20at%20a%20glance_Book%20%282%29.pdf Accessed on 25.05.2021 at 9.31 pm

https://www.ibef.org/industry/tourism-hospitality-india.aspx Accessed on 25.05.2021 at 10.02 pm

https://www.cbsnews.com/pictures/then-and-now-a-history-of-social-networking-sites/ Accessed on 09.06.2021 at 5.09 pm

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ Accessed on 09.06.2021 at 5.09 pm

https://backlinko.com/facebook-users Accessed on 09.06.2021 at 5.21 pm

https://backlinko.com/whatsapp-users Accessed on 09.06.2021 at 5.27 pm

https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/ Accessed on 09.06.2021 at 5.29 pm

https://www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx Accessed on 11.06.2021 at 6.53 pm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3549840/ Accessed on 11.06.2021 at 7.30 pm

https://www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx Accessed on 14.06.2021 at 8.05 pm

https://www.joghr.org/article/11915-globalisation-and-health-a-blessing-or-a-curse-case-review-of-the-indian-health-system Accessed on 14.06.2021 at 8.43 pm

https://nift.ac.in/theinstitute Accessed on 17.06.2021 at 7pm

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2009-07-25/news/27640843_1_fashion-designer-indian-fashion-industry-international-fashion-arena Accessed on 17.06.2021 at 7.15 pm

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008075/lang--en/index.htm Accessed on 17.06.2021 at 7.23 pm

https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Periodicals/De/pdf/00_02_03.pdf Accessed on 24.06.2021 at 9.50 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Shopping_mall Accessed on 20.06.2021 at

9.07 pm

https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/retail/jiomart-currently-serviced-by-reliance-smart-reliance-fresh-no-links-yet-with-kiranas-whatsapp-analysts/articleshow/75999944.cms Accessed on 20.06.2021 at 10.11 pm

https://www.ibef.org/ Accessed on 24.06.2021 at 9.15 pm

https://www.forbesindia.com/article/big-bet/amazons-perfect-timing-for-india/35517/1 Accessed on 24.06.2021 at 9.34 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company) Accessed on 27.06.2021 at 7.09 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Flipkart Accessed on 27.06.2021 at 7.39 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Snapdeal Accessed on 28.06.2021 at 9.23 pm

https://www.ibef.org/industry/ecommerce/infographic Accessed on 01.07.2021 at 9.45 pm

https://yourstory.com/2021/05/snapdeal-indias-value-e-commerce-journey/amp Accessed on 03.07.2021 at 9.24 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_India Accessed on 22/09/2019 at 7.15 pm

https://www.news18.com/news/tech/on-this-day-20-years-ago-the-first-mobile-phone-call-was-made-in-india-1028471.html Accessed on 22/09/2019 at 7.37 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_India Accessed on 22/09/2019 at 8.12 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Conception_and_PreNatal_Diagnostic_Techniques_Act,_1994 Accessed on 28/01/2021 at 22:37 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_India#:~:text=Abortion%20in%20 India%20is%20legal,it%20is%20called%20induced%20abortion. Accessed on 28/01/2021 at 23:18 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Breast_cancer_awareness Accessed on 28/01/2021 at 23:31 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_ribbon Accessed on 28/01/2021 at 23:45 Pm

https://nandita-bagchi.weebly.com/ Accessed on 17.05.2022 at 12.20 AM

https://www.banglanews24.com/art-literature/news/bd/922674.details Accessed on 23.04.2022 at 2.08 AM

https://en.wikipedia.org/wiki/Pinki_Buli Accessed on 23.04.2022 at 3.31 am

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_magic Accessed on 23.04.2022 at 3.48 am

https://www.thequint.com/podcast/podcast-what-you-need-to-know-maharashtra-ban-dance-bars#read-more Accessed on 24.04.2022 at 11.30 pm

https://www.britannica.com/topic/great-recession Accessed on 24.04.2022 at 11.51 pm

https://www.anandabazar.com/west-bengal/writer-nalini-bera-awarded-with-ananda-puraskar-in-2019-1.985071 Accessed on 29.05.2022 at 20.55 pm

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf Accessed on 18.03.2022 at 7.32 pm

https://www.indiabudget.gov.in/budget2021-22/doc/bspeech/bs199192.pdf Accessed on 21.03.2022 at 8.17 pm